শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
হারিয়ে যাওয়া লেখা

হারিয়ে যাওয়া লেখা

তৃ তী য় খ ণ্ড

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

হারিয়ে যাওয়া লেখা

সংগ্রাহক
রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়

www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সুব্রত মাজি
ব্যাক কভার পোট্রেট প্রত্যয়ভাস্বর জানা

HARIYE JAWA LEKHA—Vol. 3
by Shirsendu Mukhopadhyay
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones +91-33-22411175, 9433075550, 9830806799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-599-4

" রা-স্বা "

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

লেখকের পত্রভারতী প্রকাশিত বই

হারিয়ে যাওয়া লেখা ১
হারিয়ে যাওয়া লেখা ২
সিন্দুক খুললেই চল্লিশ
শীর্ষেন্দু ৭৫
এককুড়ি একডজন
মনের অসুখ
ঈগলের চোখ
ভ্রমণ সমগ্র। ভবকুঁড়ের বাইরে-দূরে
ঝুড়ি কুড়ি গল্প
শীর্ষেন্দু। বিন্দু থেকে সিন্ধু
শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১
পাঁচটি উপন্যাস
ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত
রূপ মারীচ রহস্য
ভৌতিক গল্পসমগ্র

কয়েকটি কথা

এই সংকলনে, যে তিনটি উপন্যাস আছে, তাতে 'পাপ' উপন্যাসটা আমার পছন্দের নয়। এটা আমি লিখতে চাইনি। কিন্তু কিভাবে যেন লেখক-জীবনের প্রথমদিকে এটা লিখেছিলাম। 'চরিত্র' এবং 'বেরালের প্রাণ' মোটামুটি ঠিক আছে। আর বড়গল্প 'মৌমাছি', 'দূরত্ব পৌনে এক সেকেন্ড', 'প্রেমপত্র', 'ভালবাসা', 'বনের মধ্যে'—এদের মধ্যে তিনটি গল্প মনে নেই, দুটি গল্প মনে আছে। এগুলোর ইতিহাস যদি কিছু থাকে তবে সেটা আমার পক্ষে আজ আর মনে করা সম্ভব নয়।

'হেমেন-মিনতি সংবাদ'—এটি এমন একটি গল্প যা আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আমি এম.এ. পরীক্ষা ড্রপ করে পালিয়ে গিয়েছিলাম এক গ্রামে। সেখানে কিছুদিন মাস্টারি করেছিলাম। একমাসও নয়; ওই স্বল্পসময়ে এই 'হেমেন-মিনতি সংবাদ' গল্পটি লিখেছিলাম, এটুকু আমার মনে আছে। 'নয়নিকা আর চয়নিকা' একটা প্রেমের গল্প। দুই বোনকে নিয়ে লেখা। 'কাঁইবিচি'-টা আমার মনে আছে, এটাও প্রেমের গল্প। বাদবাকি গল্পগুলো এখন আর মনে পড়ছে না। 'যুদ্ধ'-টা হয়ত আবছা মনে পড়ছে। 'সেই সাহেব' গল্পটাও মনে হয় 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। অল্পস্বল্প মনে আছে এই আর কি! 'বিষাদ বিন্দু' গল্পটাও মনে আছে। অনেকদিন আগের লেখা। তারপরে আরও অনেকগুলো গল্প আছে।

'লামডিং-এর গল্প' আমার একটা সিরিজ ছিল। এই লামডিং নিয়ে আমি অনেক অদ্ভুতুড়ে ধরনের গল্প লিখেছিলাম। যে গল্পগুলো বাস্তব নয় আবার অবাস্তবও নয়; খানিকটা প্রতীকী খানিকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ধরনের। তো লামডিং-এর গল্পটা আসলে একটা মজার গল্প।

'আগুনের ঘর, জাফরির ছায়া'—আমার জীবনের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা। কারণ সেই বছর 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম লিখতে শুরু করেছি। একটা গল্প ছাপা হয়েছে, আরেকটা গল্প ছাপার মুখে। সেসময় আমাকে ডেকে পুজোসংখ্যার গল্প চাওয়া হয়। বিরলতম সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। তখন ওই 'আগুনের ঘর, জাফরির ছায়া' গল্পটা লিখেছিলাম। আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, গল্পটা যাবে কি যাবে না তার কোনো ঠিক নেই। তবে স্পেস পেলে আমরা ছাপব। গল্পটা ছাপা হয়েছিল। এই যে ছাপা হল এটা আমার জীবনের কী বলব, মস্তবড় প্রাপ্তি। যে সবে লিখতে শুরু করেছে তার গল্প পুজোসংখ্যায় সেবছরই বেরোচ্ছে, যেবছর সে লিখতে শুরু করল, এটা অত্যন্ত বিরল ঘটনা।

'চেনা অচেনা'—এটাও অনেকদিন আগেকার লেখা গল্প। এই গল্পটা অনেকের খুব একটা ভালো লাগেনি। কিন্তু আমার দিক থেকে গল্পটা লেখার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়। 'চাঁদ ও অতসীকে ভালবাসি'—এটা পুরো রোমান্টিক গল্প।

আর স্মৃতি-কথায় আছে 'আমার জীবনকথা', 'মনে পড়ে', 'প্রতিদিন মায়ের কথা মনে পড়ে' এগুলো আমার মা'কে নিয়ে লেখা। মা'কে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম। সম্ভবত আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য লিখেছিলাম। এখন আর ঠিক মনে নেই। আর যেগুলো এখানে আছে সেগুলো বেশিরভাগই আমার ফিচার। লিখতাম আনন্দবাজার পত্রিকায় বা 'দেশ'-এ। স্বভাবতই জীবনে এত ফিচার লিখেছি যে আমার মনে থাকার কথা নয়, মনে নেই। তারপরে এই মানস-ভ্রমণ—এগুলোও তাই। 'কলকাতার আলো, অন্ধকার', 'অমৃতযাত্রা'—এসবই আমার ওই ধরনের লেখা, লিখেছিলাম চাকরির সুবাদে। তো পাঠকরা পড়ে দেখতে পারেন এগুলো কেমন!

'হারিয়ে যাওয়া লেখা' তৃতীয় খণ্ড হয়ে গেল। এর যত খণ্ড বেরোবে তত আমার লাভ। কেননা এই লেখাগুলো প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল, আবার সেগুলো উদ্ধার করা গেছে। এবং রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও সুমন্ত

চট্টোপাধ্যায়—এই দুজন আমার পরম বন্ধুর মতো লেখাগুলো খুঁজে বের করেছেন এবং সংকলিত করেছেন।

তাঁরা কী পেলেন, আমি জানি না। তবে আমার মস্ত লাভ হল। তাদের আমি আমার বুকভরা ভালোবাসা জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। এবং তারা যদি আরও কিছু উদ্ধার করে দেন তাহলে তাদের এই অসহায় দাদাটির খুব উপকার হয়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

২১ নভেম্বর ২০১৯
কলকাতা

সূচিপত্র

সাধ

সুরেন

নিধে

যুদ্ধ

এক প্রাচীন বাতাসে কিছুক্ষণ

সেই সাহেব

বিষাদ বিন্দু

একটি কান্নার জন্ম

ভূত ও ভাসান

পুরোনো ছবি

গণেশের বিপদ

বিকল্প

আনন্দ

টুলটুলের দুঃখ

বটকেষ্ট

রাম ও হরি

মায়া

চোর

লামডিং-এর গল্প

এক আশ্চর্য শহর

আগুনের ঘর, জাফরির ছায়া

চেনা অচেনা

চালচিত্র

চাঁদ ও অতসীকে ভালবাসি

স্মৃতি-কথা

আমার জীবনকথা

মনে পড়ে...

প্রতিদিন মায়ের কথা মনে পড়ে

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি

কণ্ঠলাবণ্যে পরিপূর্ণ পরিবেশন

এ ছবিতে অনেকেই আত্মদর্শন করবেন

এক বিরল অভিনেতা

শাশ্বত আবেদনের ছবি

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

তবু অর্পণে পূর্ণ রাজলক্ষ্মী

প্রেমযাত্রা ফুরিয়ে যায়নি আজও

লেখাই তাঁর জীবনের ব্রত

বুদ্ধদেব—এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

বাঙালিয়ানা

কেন লিখি?

'পথের পাঁচালী'-ই সেই উপন্যাস!

ব্যোমকেশ ছিলেন আদ্যন্ত বাঙালি গোয়েন্দা

সমাজ-চিন্তা

নারী স্বভাবতই এককচারিণী

ঘুষ দেওয়া ও ঘুষ নেওয়া নৈতিক বিচারে সমান অপরাধ

বাঙালি-জীবনটাই হিউমারাস!

দেহবর্জিত ভাববাদী, রোম্যান্টিক প্রেম নিশ্চয়ই আছে

মানস-ভ্রমণ

উদযাপনের ছুতো খুঁজি

উপবীতে আত্মোপলব্ধি

কলকাতার আলো, অন্ধকার

অমৃতযাত্রা

পরিশিষ্ট

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্বহস্তে লিখিত কুলপঞ্জি

উপন্যাস

পাপ

এক

খুব ভোরে হিরন্ময়ের জন্য চা করতে উঠে উমা দেখল যে ভাঁড়ার ঘরটা ঠিক যেমন রাত্রিতে রেখে গিয়েছিল ঠিক তেমন নেই। দরজাটা না খুলে শুধু একবার চোখ বুলিয়েই সে বুঝতে পারল কোথাও একটা কিছু ঘটেছে। এ ঘরটায় তালা দেওয়া থাকে না, শুধু কড়া দুটো রোজ দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে শুতে যায় উমা। যাতে সকালে উঠে তাড়াতাড়ির মাথায় সহজেই খোলা যায় সে জন্য দড়িটাতে উমা একটা হটকা দিয়ে রাখে।

রোজকার অভ্যাসমতো হটকার ঢিলে দড়িটা ধরে টানতে গিয়ে উমা দেখল দড়িটা সহজভাবে খুলে এল না। উমা নীচু হয়ে দেখল দড়িটাতে হটকার বদলে তিনটে গিঁট দেওয়া। দড়িটাকে কেউ এলোমেলো ভাবে তাড়াতাড়ি কড়া দুটোর মাঝখান দিয়ে পেঁচিয়েছে, তারপর খুব শক্ত করে গিঁট দিয়েছে দড়িতে। সবশুদ্ধ তিনটে গিঁট। যদি হটকার দড়িটা সরে গিয়ে থাকে কোনোক্রমে তাহলে দুটো গিঁট হ'ত। তাছাড়া এরকম এলোমেলো ভাবে সে দড়ি পেঁচায় না। সে যা করে তা আস্তে আস্তে গুছিয়ে করে। সে ভেবে দেখল কাল রাতেও সে রোজকার মতো দড়ি বেঁধেছিল। তারপর শুতে গিয়েছিল।

প্রথমেই চোরের কথা মনে হ'ল উমার। দড়ির প্রান্তটা ধরা অবস্থাতেই তার হাতটা কাঁপতে লাগল। সে শুনতে পেল তার দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করে শব্দ হচ্ছে।

এ ঘরে কোন দামি জিনিসপত্র থাকে না শুধু একটা কাঠের বাক্সে দু'একটা বাসনপত্র ছাড়া। সুতরাং চোর এলেও তেমন কিছু চুরি যায়নি। তবু চোর এসেছিল এ কথাটা ভাবতে গিয়েই ভয়ে হাত-পা হিম হ'ল উমার।

উমা দাঁতে দাঁত টিপে দড়ির গিঁটটা খুলতে চেষ্টা করল। গিঁটগুলো আলপিনের মাথার মতো ছোট আর শক্ত। তা ছাড়া উমার দুটো হাতই ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপছে এবং নিজের বুকে একটা অদ্ভুত গুরগুর শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। হাতটা বারবার প্রথম গিঁটটা খুলতে গিয়ে দ্বিতীয় গিঁটটা নিয়ে টানাটানি করছে।

অবশেষে অতি কষ্টে খানিকটা খুলে খানিকটা টেনে ছিঁড়ে উমা দরজাটা খুলতে পারল।

দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। দু'হাট হয়ে উমার পথ করে দিল। উমা হাঁপাতে হাঁপাতে চৌকাঠের বাইরে থেকে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। কারণ ঘরের ভেতরে ভোরের আবছা আলো এখনো ঢোকেনি। ঘরটা অন্ধকার। উমা ঘরে ঢুকে সেই অন্ধকারে নিজের শরীরের কাঁপুনি থামাতে চেষ্টা করল। কিছুক্ষণের জন্য তার মনে হ'ল যে তার শরীরটা কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তার নিয়ন্ত্রণের একেবারে বাইরে চলে গেছে, যেন এই শরীরটা তার নিজের নয়।

অন্ধকারে সে কিছুই দেখছিল না। সে ভাবল এ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে তার মৃত্যু হবে। সুতরাং সে অনেক সাহস সঞ্চয় করে ঘরটা পেরিয়ে উল্টো দিকের রাস্তা-মুখো

জানালাটা খুলে দিল। এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া শিশির মাখা জলকণা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাল দেওয়া বালির মতো বিবর্ণ আলো ফুটল ঘরে। এবং উমা মুখ ফিরিয়ে দেখল—! প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারল না। তারপর আস্তে আস্তে খানিকটা বুঝল।

সে যা ভেবেছিল তার চেয়ে বহুগুণে গুরুতর ঘটনা ঘটে আছে।

দুই

হিরণ্ময়ের দোষ উপুড় হয়ে শোওয়া। ভোরের ঠান্ডা হাওয়াতে সে আরো কুঁকড়ে ছোট হয়ে কাঁকড়ার মতো আকৃতি নিয়ে শুয়েছিল। এবং সেই অবস্থাতেই শুয়ে, 'এক্ষুনি উমা চা আনবে'—এই ভাবনা নিয়ে হালকা তন্দ্রার মধ্যে সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল। সে দেখছিল উমা তার দিকে চেয়ে একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করছে। ভাষাটা সে একদম বুঝতে পারছে না, তবে তার মধ্যে দু'একবার 'বাচ্চা—একটা বাচ্চা'—এই শব্দটা শুনতে পাচ্ছে। সে ভাবছিল স্বপনকে জিগ্যেস করবে যে তাদের স্কুলে এই ধরনের কোনো ভাষা শেখানো হয় কিনা।

ঠিক এই সময়ে মাথায় একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সে চোখ মেলল। সে অবাক হয়ে দেখল যে একটা অদ্ভুত মুখ তার মশারীর ভেতর। সেই মুখটা তার খুব পরিচিত বলে মনে হল তবু সে ঠিক বুঝতে পারল না। কারণ, সেই মুখে দুটো অস্বাভাবিক বড় চোখ সে দেখতে পেল। সেই চোখের সাদা গোলাকার অংশদুটোকে তার মুরগির ডিমের মতো বড় বলে মনে হ'ল।

সেই মুখটা অস্বাভাবিক ভাবে তাকে কিছু বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারছে না। একটু আগে স্বপ্নে শোনা ভাষাটার সঙ্গে বহু অনুসর্গযুক্ত এই ভাষাটার কিছু মিল আছে।

এই ভাবেই ঘুমের প্রথম ঝোঁকটা কেটে যেতে সে নিজের স্ত্রী উমাকে চিনতে পারল। তার হৃৎপিণ্ডটা একবার লাফিয়ে উঠেই থেমে যেতে চাইল, কারণ সে শুনল উমা বলছে— 'ভাঁ—ঘ—ভাঁ—ঘ—একটা বাচ্চা।' উমার দুটো ঠোঁটের পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে স্রোতের মতো। কপালটা হয়তো মুছেছে উমা, সিঁদুরে কপালটা ভর্তি।

প্রথমে আত্মরক্ষা করবার জন্যেই সে খানিকটা পেছনে সরে গেল। তার শরীরের ধাক্কা খেয়ে পাশে শুয়ে থাকা সাত বছরের স্বপন কঁকিয়ে উঠল। অতিকষ্টে হাত-পায়ের কাঁপুনি থামাতে চেষ্টা করতে করতে হিরণ্ময় দেখল স্বপন জেগে উঠে বিস্মিত চোখে তার মাকে দেখছে।

কিছুক্ষণ ঠান্ডা ইস্পাতের স্পর্শের মতো ভয়কে অনুভব করে নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা করল। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বলল—'কি হয়েছে?'

উমার হাতে ধরা মশারীটা থরথর করে কাঁপছে। মশারীটা টান হয়ে আছে, হয়তো এক্ষুনি ছিঁড়ে পড়বে। দু'চোখ বেয়ে তেলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে জল নামছে, সমস্ত মুখটা চামড়া ছাড়ানো মাংসের মতো অস্বাভাবিক লাল। দুটো কষ বেয়ে লালা পড়ছে। দু'পাটি দাঁতে খটখট শব্দ, এলিয়ে যাওয়া জিভ আর গলার মোটা বিশ্রী আওয়াজ মেশিন চালানোর শব্দের মতো একটা অস্বাভাবিক ধ্বনি তরঙ্গ তুলছে।

হয় উমা পাগল হয়ে গেছে, নয়ত, কোনো গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে। হিরণ্ময় শুনেছিল উমার বড়মার মাথা খারাপ হয়েছিল বেশি বয়সে। সে কথাটা হঠাৎ মনে হয়ে যাওয়াতে আরো ঠান্ডা আরো স্থির হয়ে গেল হিরণ্ময়। স্বপনের দুটো হাত হিরণ্ময়ের গলা জড়িয়ে ধরল অস্বাভাবিক জোরে।

চিৎকার করে সব শব্দকে ডুবিয়ে দিয়ে কেঁদে উঠল স্বপন।

কান্নার শব্দ হিরণ্ময়কে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করে দিল। সামনের পাশ-বালিশটাকে লাথি মেরে সরিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল হিরণ্ময়। উমার একটা হাত চেপে ধরল। চাপা সুরে বলল,—'কি হয়েছে? কি হয়েছে? কি হয়েছে? উমা? উমা? উমা?'

উমা কথা বলল না। আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল। দুটো অস্বাভাবিক ডিমের মতো বড় চোখ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। উপুড় হয়ে হিরণ্ময়ের পায়ের কাছে মাথা রাখল উমা। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

স্বপন হিরণ্ময়ের ঝাঁকুনিতে ছিটকে পড়েছিল। ওর কান্নার শব্দে হিরণ্ময়ের নিজের মাথাটাই কেমন ধোঁয়াটে হয়ে যেতে লাগল।

দাঁতে দাঁত চেপে সে উমাকে দু'হাতে ধরে সোজা করল। তারপর যেন এক্ষুনি উমাকে মেরে ফেলবে এই রকম ভাবে ঝাঁকি দিল। ঝাঁকি দিতে লাগল। উমার অবশ মাথাটা সামনে পিছনে অসহায় ভাবে লটকে লটকে পড়ল। তারপর অতিকষ্টে স্খলিত কণ্ঠে সে বলতে পারল,—'ভাঁড়ার ঘরে একটা বাচ্চা।'

—'কার বাচ্চা?' হিরণ্ময় হাঁটুগেড়ে উঠে বসল।

—'জানি না, বাচ্চাটা মরা।' আরো অশ্রুত কণ্ঠে বলল উমা।

—'কতটুকু বাচ্চা? মানুষের?' হিরণ্ময়ের ইচ্ছে হ'ল নিজের কপাল চাপড়ায়। '—জানি না, জানি না, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।' উমা আবার উপুড় হয়ে পড়ল।

প্রথমে হিরণ্ময়—হিরণ্ময় নামক নিরীহ ব্যক্তিটি কিছুই ভাবতে পারল না। কেন না আজ পর্যন্ত সকালে ঘুম থেকে উঠে সে সাধারণত চা খায় এবং চা খেয়ে আবার ঘুমোয়। ঘুম থেকে শেষ পর্যন্ত উঠে সে স্নান করে ভাত খেয়ে অফিসে যায়। এ রকম নিরীহ জীবনে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে পারে বলে তার ধারণা ছিল না।

খুব অস্বাভাবিক ভাবে স্বভাববশত হিরণ্ময় বালিশের তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট মুখে দিতে গিয়ে হাত কেঁপে নাকের গর্তে ঢোকাল এবং খানিকটা স্থির হয়ে অবশেষে ঠোঁটে চেপে ধরে দেশলাইটা খুঁজতে লাগল। রোজকার মতোই দেশলাইটা হিরণ্ময় কোথায় রেখেছে মনে না করতে পেরে খুঁজে পেল না। অভ্যাস মতোই সে উমাকে জিগ্যেস করল,—'দেশলাইটা?' জিগ্যেস করতে গিয়ে সে দেখল উমা একটুও নড়ছে না এবং সে ভাবল খুব সম্ভবত এখনো সে ঘুমোচ্ছে এবং ঘুমোতে ঘুমোতে বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। এই ভাবে সে নিজের গায়ে চিমটি কাটল, উমার চুল ধরে টানল এবং স্বপনকে ঘুঁসি মারবে না চড় মারবে তা ভাবতে লাগল।

অবশেষে হিরণ্ময় নিশ্চিন্ত হ'ল যে সে জেগে আছে। সে আস্তে আস্তে উমাকে ঠেলল। উমা মুখ তুলল। হিরণ্ময় বলল,—'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ে উমা বলল,—'আমি জানি না, আমি কিছু জানি না। তুমি যা হোক কিছু করো।' উমা অধৈর্যভাবে পা ছুঁড়ল। জল রাখার ছোট টুলটা শব্দ করে উল্টে পড়ল। ঝনাৎ করে কাচের গ্লাসটা চৌচির হয়ে ফাটল, ছোট ছোট কাচের টুকরোগুলো টুং টাং করে শানের ওপর ছড়িয়ে গেল। স্বপন চুপ করে শব্দটা শুনল। উমা মুখ তুলল। দেশলাই-খুঁজে-না-পাওয়া হিরণ্ময় চিন্তিত ভাবে তার লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে খাট থেকে নামল। তার হাত পায়ের কাঁপুনি বন্ধ হয়েছিল। ভয়টাও নেই। হিরণ্ময় অনুভব করল একটা তীব্র বিস্ময় ছাড়া তার মনে আর কিছু নেই।

লুঙ্গিটাকে ঠিকমতো পরল হিরণ্ময় তারপর উমার দিকে করুণ চোখে তাকাল। উমার পিঠে একটা হাত রেখে বলল,—'চল, দেখি ব্যাপারটা কি।'

উমা সর্ব শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল,—'অসম্ভব। আমি পারব না। আমি কক্ষনো ও ঘরে আর যেতে পারব না। তুমি যাও।'

হিরণ্ময়ের নিজের মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। সে কিছু ভেবে স্থির করতে না পেরে উমার মাথার কাছে ঝুঁকে পড়ে শুধু বলতে পারল,—প্লিজ প্লিজ উমা, এখন পাগলামী করার সময় নয়। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে দাও।'

উমা মুখ তুলল। ওর গাল চোখের জলে ভিজে চকচক করছে, ঠোঁটের কষে লালার দাগ, সিঁদুরে মাখামাখি কপাল আর অস্বাভাবিক সাদা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে হিরণ্ময় দুঃখ পেতে লাগল।

হিরণ্ময় আর কিছু বলতে পারল না। শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের আবছা জিনিষগুলোকে দেখে যেতে লাগল। কিছুই তার কাছে বোধগম্য মনে হল না। আলনায় শাড়ি, কাপড়, শায়া, ব্লাউজ জামা, টেবিলের ওপর কাগজের থাক, বই পেন, চশমার খাপ, টুথব্রাশের প্যাকেট, র‍্যাকে ঝোলানো পাঞ্জাবি, বেলেমাটির কুঁজো—এ সবের ওপর তার অনির্দিষ্ট দৃষ্টি পাথরের চোখের মতো নিরর্থক ঘুরতে লাগল।

উমা আস্তে আস্তে উঠল। কেউ কোনো কথা বলল না। হিরণ্ময় টেবিলের ওপর থেকে চশমাটা তুলে নিল।

তারা দুজন, আগে উমা পিছনে হিরণ্ময় দরজার কাছে এল। ধড়মড় করে উঠে বসে স্বপন বলে—'বাবা আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।'

চমকে উঠে দু'জনেই ফিরল। উমা স্থির হয়ে রইল। হিরণ্ময় তাড়াতাড়ি খাটের কাছে হেঁটে আসতে গিয়ে কাচের টুকরো আর জলের ওপর পিছলে পড়তে গিয়ে সামলে নিল। পা'টা কেটে গেল কিনা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। মশারীর কাছে নীচু হয়ে বলল,—'না বাপি, তুমি চুপ করে থাকো। নড়বে না, কথা বলবে না। মনে রেখো একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটেছে।' বইয়ের পড়া গদ্যের মতো কথা বলল হিরণ্ময়।

—'ওকে আবার ওসব বলছ কেন!' উমা সচেতন হয়ে বলে। স্বপন কাঁদল,—'আমি যাব-ও।'

হিরণ্ময় বলল,—'না।'

—আমি যাব।'

—'না।'

—'বাপি, আমি এক্ষুনি আসছি।' উমা বলে, তার গলার স্বরটা ভেজা ভেজা—'একটু চুপ করে থাকো। আমি এক্ষুনি এসে পড়ব।'

'স্বপন স্তিমিত গলায় কি বলল হিরণ্ময় না শুনে দরজার কাছে সাবধানে পা টিপে টিপে এগিয়ে এল।

ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে এসে উমা বলল,—'তুমি যাও।'

—'আমি? হিরণ্ময় একটু দাঁড়িয়ে রইল। রঙ্গমঞ্চের পট খোলার আগে দর্শকের যেমন বুকচাপা প্রতীক্ষা। হিরণ্ময় একটু একটু করে চৌকাঠ ডিঙোল। তারপর ক্রমে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

ছোট লম্বাটে ঘর। বাঁ-ধারে সবুজ রঙের বড় কাঠের বাক্স, তার ওপর থাকে থাকে কাগজের প্যাকিং বাক্স। ওতে চীনেমাটির বাসন থাকে। ওপাশে জানালার নীচে দেওয়ালে পিঠ দেওয়া ঠাকুরের কাঠের সিংহাসন। সিংহাসনের ওপর রঙিন কাপড় চাপা হয়ে কালীঘাটের পট আর পেতলের গোপাল ঘুমোচ্ছে। ডান ধারে মেঝের ওপর সাজিয়ে রাখা ষ্টোভ, চায়ের কেটলি চিনির কৌটো।

হিরণ্ময় তার চোখ দুটোকে এক পলকে চারদিকে ঘুরিয়ে আনল। তার নিঃশ্বাস দ্রুত হ'ল। তারপর অবশেষে সে দেখতে পেল। কাঠের ছোট প্যাকিং বাক্সটার ওপর ময়লা টুকরো টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে জড়ানো ছোট একটা দেহ। এত ছোট যে হিরণ্ময়ের মনে হ'ল তার হাতের চেটো প্রসারিত করলে দেহটার মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাপতে পারবে। সমস্ত দেহটা ঢাকা শুধু ছোট্ট রবারের বলের মতো মাথাটা বেরিয়ে আছে! চোখ দুটো বোঁজা।

হিরণ্ময় প্রথমে চোখ বুঁজে স্থির হয়ে রইল। দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর ছোট দেহটার কথা ভাবল। তারপর হয়তো দেহটার ক্ষুদ্রত্ব তার মনে কিছুটা সাহস দিল। সে চোখ মেলে একটু হাসতে চেষ্টা করল। সেই মুহূর্তে সে বোধহয় দেহের অনিত্যতা সম্পর্কে কিছু ভাবতে চাইছিল।

বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ তুলে উমা দৌড়ে গিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকল। ঝনাৎ করে দরজা বন্ধ করার শব্দ পায় হিরণ্ময়। একটা অস্পষ্ট ক্রোধ তার মনে পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

দূর থেকে সে দেহটাকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল। দেখতে দেখতে সে স্থির হয়ে যেতে লাগল। তারপর সে অনুভব করল আস্তে আস্তে আলো ফুটছে ভোরের। শহরতলীর মানুষরা জেগে উঠেছে। সে কাশির শব্দ পেল, খড়মের খট খট আওয়াজ পেল। ঘটি থেকে জল ঢালবার শব্দ শুনল। এ-পাশের ও-পাশের বাড়ির লোকেরা আস্তে আস্তে জেগে উঠছে।

একটা গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ ভোরের বাতাসের ওপর যেন ভারী গম্ভীর হাতুড়ির ঘায়ের মতো আঘাত করছে।

স্থির হিরণ্ময় নিজের হাত মুঠো করে আবার খোলে, আবার মুঠো করে।

হিরণ্ময় চলে যেতে পারল না। সে অস্থির হয়ে প্যাকিং বাক্সটার কাছে এসে দাঁড়াল। কম্পিত হাতটা প্রসারিত করে সরিয়ে নেয়। নিজেকে কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিয়ে আস্তে আস্তে সে ছোট শীর্ণ দেহটার ওপর থেকে ঢাকাটা সরিয়ে নিতে থাকে। প্রতিবার আর্শোলার খড় খড় শব্দ কিংবা ইঁদুরের কিচিরমিচিরের সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা কাঁপতে থাকে। নিষিদ্ধ অশুচি কোনো কাজ করার মতো একটা সংকোচ, একটু ঘেন্না হতে লাগল হিরণ্ময়ের। ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেল, উমার পায়ের শব্দ।

সকালের প্রথম রোদ দেওয়ালে রক্তের স্রোতের মতো প্রতিহিত হ'ল। উমার পায়ের শব্দটা সেই মুহূর্তে দরজায় থামল। হিরণ্ময়ের চোখের সামনে সেই শীর্ণ মৃত শিশুর গলায় বাসি ফুলের মালার দাগের মতো অস্পষ্ট গাঢ় রঙের কয়েকটি দাগ স্পষ্ট হ'ল।

তিন

এটা উমার ঠাকুর ঘর। হিরণ্ময় নিজের বাসার ছকটা ভেবে নিতে চাইল। ঠাকুর ঘরের ওপাশে রাস্তা। তাতে এখন লোক চলাচল শুরু হয়েছে। এ পাশে ছোট্ট একটু বারান্দা তারপর শোওয়ার ঘর। ও পাশে একটু উঠোনের মতো, কোণের দিকে বাথরুম ইত্যাদি। চারদিকের উঠোন উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তিনদিকে বাড়ি। যে এসেছিল সে কি করে এসেছিল তা হিরণ্ময় খুঁজতে লাগল। উঠোনে নেমে সে দ্রুত পিছনের খিড়কির দরজার কাছে এল। দরজাটা বন্ধ। ভিতর থেকে খিল তোলা। চারদিকে দু'মানুষ সমান উঁচু দেওয়াল।

হিরণ্ময় হতাশ ভাবে চারিদিকে তাকায়। বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে উমা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে। যেন উমা আশা করছে হিরণ্ময় এক্ষুনি সব সমস্যার সমাধান কোনো অচিন্তনীয় উপায়ে করে ফেলবে। চারিদিকে তাকিয়ে হিরণ্ময়ের একটা আশা হতে লাগল। ক্রমে সেই আশা বিশ্বাসে পরিণত হ'ল। তার বিশ্বাস হ'ল যে কেউ তাদের সঙ্গে একটা মর্মান্তিক রসিকতা করেছে। সেই ব্যক্তিটি ভোরেই খুব অনুতপ্ত হবে এবং এসে বলবে—'ভাই হিরণ্ময় ওটা রবারের পুতুল। আমি শুধু একটু ঠাট্টা করছিলুম। কিছু মনে কোরো না।' হিরণ্ময় ভোরের আলোয় তার ডান হাতের দুটো আঙুল দেখছিল। দুটো আঙুল দিয়ে সে বাচ্চাটার গালে স্পর্শ করেছিল। আঙুল দুটো একটু শির শির করল। বাচ্চার গলাটা রবারের মতো ছিল কিনা হিরণ্ময় মনে করতে পারল না।

—'ও কি এখন ওখানেই থাকবে?' উমা কান্না ভেজা গলায় বলে।

—'কে? কার কথা বলছ?' হিরণ্ময় অন্যমনস্ক।

—'যে ভাঁড়ার ঘরে আছে!' উমা জবাব দিল। হিরণ্ময় ভাবল উমা কোনো জীবিত মানুষের কথা বলছে। হিরণ্ময় একটু কাঁপে। উমা কি অদ্ভুত ভাবে কথা বলে! হিরণ্ময় গলা চুলকোল। তারপর শূন্য গলায় স্বগতোক্তির মতো বলল,—'আমি কি করব? আমি কি করতে পারি?

—'পুলিশে খবর দাও। সবাই জানুক।' উমা ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে সংযত করতে চাইল। এখনো সে মাঝে মাঝে ফোঁপাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে এখনো। কি করতে হবে হিরণ্ময় সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারছে না। প্রত্যহের কিছু কিছু ঘটনাকে সে চেনে জানে। সেগুলো অভ্যাসবশত আপনা থেকেই ঘটে যায়। সে জন্যে ভাবতে হয় না। সত্যিকথা স্বীকার করতে হিরণ্ময়ের বাধা নেই যে, আজ পর্যন্ত মৌলিক চিন্তার প্রয়োজন হয় এমন কাজ সে খুব কমই করেছে।

পুলিশের কথা ভাবতে গিয়ে হিরণ্ময় অস্বস্তি বোধ করে। আজ পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ হয়নি। এমনকী কি-ভাবে এসব ক্ষেত্রে পুলিশে খবর দিতে হয় হিরণ্ময় তাও জানে না। এ ছাড়া যে এ কাজ করেছে সে নিশ্চয়ই হিরণ্ময়ের কোনো জঘন্যতম শত্রু। সে উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করেছে। সে

নিশ্চয়ই জানে যে হিরণ্ময় পুলিশে খবর দেবে এবং তারপর কি ঘটবে তা আন্দাজ করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। হিরণ্ময় সতর্ক হয়ে বলল,—'এ নিয়ে হই-চই করা বোধহয় ঠিক নয়, ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে দাও। এখন কাউকে জানতে দিও না। এর পেছনে উদ্দেশ্য আছে।'

—'তবে এই জঘন্য ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কি করব।' হতাশায় ভেঙে পড়ে আবার কাঁদতে শুরু করে উমা। হিরণ্ময় টের পেল তার ওপর উমার নির্ভরশীলতা কম। হিরণ্ময় শক্ত হয়ে উমার কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত রাখল। সে দ্রুত চিন্তা করছিল। এক্ষুনি ঠিকে ঝি আসবে, খবরের কাগজওলা আসবে, গয়লা আসবে, স্বপনের মাস্টারমশাই আসবে। একের পর এক আসবে, না, একসঙ্গে সবাই আসবে সেটাই ভাবছিল হিরণ্ময়।

—'শোনো'—হিরণ্ময় বলল,—'এটা ভেঙে পড়বার সময় নয়।'

—'আমি কি করব'—উমা তার লাল, জলভরা ফোলা চোখ তুলল।

সদর দরজায় কড়ার শব্দ হ'ল কড়কড় করে। দু'জনেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেঁপে উঠল। তারপর উমার হাত ধরল হিরণ্ময়। উমা ফিসফিস করে বলল,—'মঙ্গলা!'

—'শোনো'—প্রায় স্খলিত কণ্ঠে হিরণ্ময় বলল,—'ওটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। কেউ যেন দেখতে না পায়।'

—'এক্ষুনি মঙ্গলা এসে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকবে।' কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে বলে উমা।

নিজের শরীরেও একটা কাঁপুনি অনুভব করে হিরণ্ময়। নিজের গলার স্বরটা বিকৃত শোনায়। বলে,—'তুমি স্বপনকে নিয়ে কলতলায় চলে যাও। সদর দরজা খুলো না। আমি সেই ফাঁকে শোবার ঘরে খাটের নীচে ওটাকে রাখব।'

কড়কড় কড়াৎ করে কড়ার শব্দ হচ্ছে। মঙ্গলা ডাকছে,—'ওমা মাগো, দোরটা খুলে দাও। আমার তো অন্য বাড়িতে কাজ আছে বাছা!'

পাছে স্বপন উঠে দরজা খুলে দেয় এই ভয়ে উমা তাড়াতাড়ি উঠল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দ্রুত পায়ে ঘরে গেল। হিরণ্ময় আস্তে আস্তে অবশ শরীরটা নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল। ঢুকে দরজা বন্ধ করে বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

আলোকিত ঘরটার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে প্যাকিং বাক্সটার ওপর থেকে ছোট্ট নরম পাঁউরুটির মতো বাচ্চাটাকে তুলে নিল। ন্যাকড়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ল। শুধু একটা ন্যাকড়া ছোট্ট ফুলে থাকা পেটটার ওপর রক্তে ভিজে লেগে রইল। ওর নাভিটা ভালোভাবে কাটা হয়নি। হিরণ্ময় দেখল। রক্তগুলো জমাট বেঁধে পেটের ওপর, মাথার পাশে, কানের পেছনে শুকনো রঙের মতো লেগে আছে। ছোট্ট বলের মতো মাথাটা হিরণ্ময়ের হাতের তেলো থেকে অবোধভাবে ঝুলছে। হিরণ্ময়ের হাতটা ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে। তার মনে হ'ল মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখুনি মেঝের ওপর পড়ে ফটাস করে ফেটে যাবে। তারপর খুলির টুকরোগুলো কাচের টুকরোর মতো শানের ওপর টুং টাং করে ছড়িয়ে যাবে আর তক্ষুনি প্রতিবেশীরা এখানে জমায়েৎ হবে দরজার সামনে।

কাঁপতে কাঁপতে হিরণ্ময় বসে পড়ে। ন্যাকড়াগুলো তুলে ঢেকে দিতে থাকে শরীরটা। তার অনভ্যস্ত হাতে কাজটা ভালোভাবে হয় না। কাঁপা কাঁপা হাত থেকে ন্যাকড়াগুলো ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দাঁতে দাঁত চাপে হিরণ্ময়। নিজের ওপর অকারণে রাগ হতে থাকে।

উমার হাত ধরে চলতে চলতে স্বপন ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায়,—'কি হয়েছে মা?'

—'কিছু না।' ছেলেকে টেনে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে নিতে নিতে উমা বলে।

—'তা হলে বাবা কোথায়?'

—'বাথরুমে গেছে। তুমি এসো শিগগির।'

দু'জনের পায়ের শব্দ শুনতে পায় হিরণ্ময়। ওরা কলতলার দিকে চলে গেল। ছোট্ট দেহটাকে মেঝের ওপর রেখে ন্যাকড়াগুলো দিয়ে প্যাকেটের মতো জড়ায় হিরণ্ময়। ছোট কোঁচকানো বলের মতো মুখটা ঢেকে দেয়।

ওর চোখদুটো বোঁজা, কপাল কোঁচকানো হাত দুটো মুঠো করা। গম্ভীর দার্শনিকের মতো চোখ বুঁজে বাচ্চাটা যেন ভাবছে। নাড়া দিলে এক্ষুনি চোখ খুলে তাকিয়ে হাসবে। দৃশ্যটা কল্পনা করতে রোমাঞ্চিত হয় হিরণ্ময়। বাচ্চাটাকে অস্বাভাবিক জোরে বুকে চেপে ধরে দরজাটা খুলে ফেলে। শোওয়ার ঘরে ঢোকে।

কড় কড় কড়াৎ করে কড়া নড়ছে। বোধহয় এতক্ষণে রাস্তার লোক জমে গেছে মঙ্গলার কাণ্ড দেখে।

দ্রুত নিজের শরীর বেঁকিয়ে খাটের নীচে বাচ্চাটাকে মেঝের ওপর রাখে। তারপর যতদূর হাত যায় ঠেলে ঠেলে ভিতরের অন্ধকারে সরিয়ে দেয় প্যাকেটটাকে। সতর্ক চোখ দিয়ে দেখে বাইরে থেকে দেখা যায় কিনা। তারপর তোষকের তলা থেকে শতরঞ্চিটা টেনে টেনে পর্দার মতো ঝুলিয়ে দিতে থাকে হিরণ্ময়। তার ফলে সমস্ত বিছানাটাই কুঁচকে যেতে থাকে, মশারীটা হেলে নীচু হয়, তোষক ঝুলে পড়ে এবং ধপাস করে পাশ বালিশটা গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে। চমকে উঠে দাঁড়ায় হিরণ্ময়। পাশ বালিশটা হাতে তুলে নিয়ে ভাবে আর কি করা যায়। মশারী তুলে বালিশটা বিছানায় ছুঁড়ে দেয় তারপর লুঙ্গিতে ঘষে ঘষে হাতটা মুছতে থাকে।

উমাকে কি যেন বলতে বলতে স্বপন ঘরে ঢুকে বাবার দিকে তাকিয়ে থমকে যায়। স্বপন লক্ষ্য করল তার বাবা মাকে চোখ দিয়ে ইশারা করে দরজাটা দেখাল তারপর বিছানাটায় হাত রাখল। তারপর ছেলের দিকে চেয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে হিরণ্ময় বলল,—'চল বাপি, আমরা উঠোনের রোদে দাঁড়াই।' স্বপনকে নিয়ে হিরণ্ময় বেরিয়ে গেল।

উমা সদর দরজা খুলে দিল।

উমাকে দেখে এক পা পিছিয়ে গেল মঙ্গলা,—'কি হয়েছে গো মা? চোখ মুখ অমন ফ্যাকাসে কেন গো? আমি ভাবনু বুঝি ঘুমোচ্ছ, তাই—'

উমা টের পায় দরজার পাল্লায় তার হাতটা থরথর করছে যেন এক্ষুনি ঝুলে পড়বে। মঙ্গলার পেছনে সদর রাস্তায় দু'একজন লোক হাঁটতে হাঁটতে তাকিয়ে দেখে গেল। প্রায় ফিসফিস করে বলল উমা,—'কিছু হয়নি। তুমি ভেতরে এসো।'

কেমন যেন সন্দেহের ছায়া নামল মঙ্গলার মুখে। চোখটা ঘুরিয়ে মুখ বেঁকিয়ে একটু হাসল, 'তাই বুঝি? আমি ভাবলাম কি বুঝি হ'ল—'

—'কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি ভেতরে এসো।' প্রায় ধমকে উঠল উমা। নিজের চোখ মুখকে স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করল। হাত জোরে চেপে কাঁপুনি থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। অনুভব করল জিভটা কাঁপছে। এক্ষুনি আবার দাঁতে দাঁতে ঠকঠক শুরু হয়ে যাবে।

—'যাচ্ছি গো। ভেতরে যাওয়ার জন্যেই তো ডাকাডাকি করছি কোন সকাল থেকে। কেউ দোর খুলল না —আবার দত্তবাড়ির গিন্নি তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে'—কথা শেষ না করে মঙ্গলা সিঁড়িতে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা নীচু হয়ে তুলে নিল। তারপর উমার পাশ ঘেষে আড়চোখে তার দিকে চেয়ে ঘরের ভেতর এল।

—'এ কি গো বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছিল? টুল ওল্টানো, গ্লাস ভাঙা, বিছানাপত্র তুলকালাম—

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল উমা। অতিরিক্ত গম্ভীর বিকৃত স্বরে বলল,—'মঙ্গলা, তুমি ভিতরে যাও।'

মঙ্গলা দুটো গোল চোখ নিয়ে উমাকে দেখছে,—'ওকি সদর বন্ধ করলে যে? ঘরে ঝাঁট পাট দিতে হবে না, বিছানাপত্র গোছাতে হবে না? তোমার আজ কেমন কাণ্ড গো? জানলাগুলোও তো খোলোনি দেখছি।

জানালা খোলার জন্য মঙ্গলা এগোচ্ছিল। প্রায় চিৎকার করে ধমক দিল উমা,—'তোমাকে কিছু করতে হবে না—আ। তুমি বাইরে যাও।'

মঙ্গলা থমকে দাঁড়ায়। বিড়বিড় করে কি যেন বলে। তারপর ফিরে উঠোনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। উমা শুনতে পায় মঙ্গলা বারান্দা দিয়ে কলতলায় এঁটো বাসনপত্রগুলোর কাছে যেতে যেতে বলছে,—'কে জানে বাপু কি নিয়ে ঝগড়া। সকালেই কুরুক্ষেত্তর বেধে গেল—'

উমা আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিতে থাকল। সমস্ত ঘরটায় ময়লা জামাকাপড়, বদ্ধ-বাতাস আর জলে ভেজা মেঝের সোঁদা গন্ধ। ঘরটা এখনো অন্ধকার। জানালা খুলে দিলে আলো বাতাস আসবে। কিন্তু আজ আর আলো বাতাসের প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর আলো বাতাস যেন কে তার চোখ-মুখের সামনে থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল।

এখন কি করবে উমা? কি করতে পারে? সত্যিই তো আর ঘরটাকে এমনিভাবে সারাদিন রাখা যাবে না। মঙ্গলা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখবে তারপর দত্তবাড়িতে বলবে, মুখুজ্জে বাড়িতে বলবে। কল্পনা করতেও গায়ে কাঁটা দিল উমার। এই একটা ছাড়া আর ঘর নেই। একটু পরে স্বপনের মাস্টার-মশাই এসে এ ঘরে বসবে। ঘর ছাড়া অন্য কোথাও যাবে না। আর সারাদিন ধরে একটা ছোট্ট শিশুর দেহ খাটের তলায় অন্ধকারে ধুলোর মধ্যে পচবে। সকলের চোখের সামনে ইঁদুরগুলো দৌড়োদৌড়ি করবে ওর মাংস মুখে নিয়ে।

আবার কড়া নাড়ল। এবার দুধওয়ালা।

উমার মাথাটা আবার কেমন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে লাগল। বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে। চোখের ওপর একটা গোলাপী আভা, মাথার ভেতর হাতুড়ি পিটছে কেউ। উমা হাত বাড়িয়ে খাটের বাজুটা ধরতে গিয়ে টলতে থাকে।

স্বপনকে বারান্দায় বসিয়ে হিরন্ময় ঘরে এল। এসে দেখল মশারীর কোণা ছিঁড়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে উমা। শাড়িটা কোমরের কাছে আলগা। কাঁধে আঁচল নেই।

দরজায় কড়া নাড়বার শব্দ। স্বপন কখন উঠে এসে ভেতরের দরজার চৌকাঠের ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

হিরণ্ময় ভয় পেয়ে গেল। উমার পিঠে হাত রেখে বলল,—'এটা কাঁদবার সময় নয়, ওঠো, শাড়িটা ঠিক করে নাও।'

—'বাইরে দুধওলা ডাকছে।

আমি কি করব?

—'আমি দুধ নিচ্ছি, ও বাইরে থেকেই চলে যাবে তুমি ঠিক হও। শক্ত হও। ঘর ছেড়ে নড়বে না।'

হিরণ্ময় অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিটা বাড়িয়ে বাইরে থেকে দুধ নিয়ে ঘরে এল। দরজা বন্ধ করে দেখল উমা আস্তে আস্তে মশারীর কোণাটা টাঙিয়েছে। মশারীর ঘেরটা তুলে দিয়েছে চালের ওপর। তাতে ঘরটাকে কিছুটা বড় আর পরিচ্ছন্ন মনে হয় হিরণ্ময়ের। খাটের কোণায় বসে বাজুর ওপর হাত রেখে মাথা চেপে চুপ করে বসে আছে উমা। সম্ভবত উমা কিছু ভাবছে। খুব সাবধানে শক্ত করে ডেকচিটা ধরে, যেন এই ডেকচিটার ওপর তার জীবন নির্ভর করছে এমনি ভাবে হিরণ্ময় বারান্দায় এল। স্বপন মাথা ঘুরিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার বাবাকে দেখতে লাগল। সে ইতিপূর্বে দুধের ডেকচি হাতে তার বাবাকে কখনো দেখেনি।

উমা আস্তে আস্তে বিছানার চাদরটা টান করল, বালিশ-গুলোকে গুছিয়ে রাখল। সে তোষকটা বা শতরঞ্চিটা ঠিক করবার চেষ্টা করল না। শতরঞ্চিটা তেমনি ঝুলতে থাকল পর্দার মতো। খুব সাবধানে উমা রাস্তার দিকের জানালার একটা পাট খুলল। একটু নিঃশ্বাস নিল তারপর আবার জানালাটা বন্ধ করে দিল।

চার

হিরণ্ময় বারান্দা থেকে দেখল মঙ্গলা মাজা বাসনের পাঁজা ভাঁড়ার ঘরের দরজায় রেখে ফুল-ঝাঁটা তুলে নিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকছে। হিরণ্ময় দ্রুতপায়ে মঙ্গলার পিছনে দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়াল।

সেই সময়ে আবার কড়া নড়ল কড়কড় কড়াৎ। উমা চমকে মঙ্গলার দিকে তাকাল। হিরণ্ময়কে দেখল। হিরণ্ময় চুপ। উমা খাটের বার বাজুটা ধরে ভেঙে পড়তে থাকে। মঙ্গলা ঝাঁটাটা মাটিতে রেখে দরজা খোলার

জন্য তৈরি হয়।

আচম্বিতে চেতনা ফেরে হিরণ্ময়ের। প্রায় লাফিয়ে ধাক্কা দিয়ে মঙ্গলাকে সরিয়ে দিয়ে দরজাটা আটকে দাঁড়ায়,—'তুমি এখানে কি চাও? চলে যাও এখান থেকে।' এই বলে খিল খুলে হিরণ্ময় দরজাটা সামান্য ফাঁক করল।

বুড়ো মাস্টারমশাই তাঁর চশমাটা খুলে হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু হাসল। তারপর নিজেই দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে চাইল। হিরণ্ময় শক্ত ইটের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এতটুকু নড়ল না। বলল, —'স্বপনের আজ অসুখ।' সে মাস্টারমশাইয়ের মুখটা ঝাপসা ঝাপসা দেখল।

—'সে কি গো?'—মঙ্গলা হিরণ্ময়ের প্রায় ঘাড়ের কাছে চেঁচাল,—দাদাবাবু তো—'

—'এই-ই'—একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে উমা,—'তুমি গেলে এই ঘর থেকে! পাজি, ছুঁচো, বেরোও।' ঝপাস করে ঝাঁটা ফেলে কাঁপতে কাঁপতে মঙ্গলা গেল। উমার দুটো চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। মাস্টারমশাই চমকে উঠলো উমার গলার শব্দে।

—'অসুখ? কি অসুখ?' মাস্টারমশাই চশমাটা খুলল। হিরণ্ময় কি বলতে চাইছিল তা গুলিয়ে গেল। সে নিজেই বুঝতে পারল না সে কি বলছে। নিজের অদ্ভুত মোটা গলার বিকৃত আওয়াজ তার কানে গেল। মাস্টারমশাই চশমাটা মুছে চোখে পরে খুব বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকাল। হিরণ্ময় শুনতে পেল অনেকগুলো অনুসর্গ অব্যয় মিলিয়ে সে যা বলছে তা অনেকটা তার স্বপ্নে উমার মুখে শোনা সেই অদ্ভুত ভাষার মতো। মাস্টারমশাই দরজাটা আর একবার ঠেলবার চেষ্টা করে বলল,—'আমি ওকে একটু দেখতে পারি?'

—'কাকে?' প্রায় চিৎকার করে উঠল হিরণ্ময়।

'তুমি চলে এসো। দরজাটা বন্ধ করে দাও'—হিরণ্ময়ের হাত ধরে টানতে টানতে উমা বলে।

ততক্ষণে স্বপন ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। উমা দৌড়ে স্বপনকে জড়িয়ে ধরল। তার মুখে হাত চাপা দিল।

—'তবে'—মাস্টারমশাই বলল,—আচ্ছা তা হলে'—মাস্টারমশাই আস্তে আস্তে পেছলো। খুব চিন্তিত দেখাল মাস্টারমশাইকে।

দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে হিরণ্ময় পিছনে সরে এল। সে দেখল চৌকাঠের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে উমা স্বপনকে বুকে জড়িয়ে আছে। উমা বলছে,—'আজ তুমি তাড়াতাড়ি স্কুলে যাবে। আজ ভাত হবে না, দুধ-মুড়ি খেয়ে যেও, ফিরে এসে ভাত খাবে।

লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে ইস্কুলে, কেমন? সোজা বাড়ি ফিরবে, হুঁ?'

খুব ঠাণ্ডা বিস্মিত চোখে স্বপন তার দিকে দেখল। কোন কথা বলল না। হিরণ্ময় অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। স্বপন উমার কাছ থেকে সরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে খাটের কাছে এগিয়ে যেতে থাকে।

—'স্বপন!' হিরণ্ময় চেঁচাল। স্বপন ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা গলায় বলল,—'আমার খেলনার বাক্সটা খাটের তলার আছে।

হিরণ্ময় ধমকে উঠল,—'কি করবে এখন তুমি খেলনার বাক্স দিয়ে?

লক্ষ্মী ছাড়া ছেলে, স্কুলের বেলা হতে চলল না? স্বপন ঘুরে দাঁড়িয়ে কান্নার বেগ সামলে ঘর থেকে ঠোঁট ফুলিয়ে বেরিয়ে গেল। উমা দুটো হাত কোলে রেখে অসহায়ের মতো চেয়ে রইল। কোণের চেয়ারটায় ধপ করে বসে চোখ বুঁজল হিরণ্ময়। শুধু শুনল উমা বলছে,—'কে আমাদের এত বড় শত্রু—'

কে এ কাজ করতে পারে? হিরণ্ময় ভাবতে চেষ্টা করল। আর কেনই বা কেউ এ কাজ করবে? এটা যে তাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? সে জ্ঞানত কারোর শত্রুতা ইচ্ছে করে করেনি। শত্রুতাকে সে ছেলেবেলা থেকেই পাপ বলে জানে। অবশ্য পাপ সে দু'একটা করেছে। তবে ইচ্ছে না

থাকলেও সকলেই দু'একটা পাপ করতে বাধ্য হয়। আসলে পাপ করতে চাইলেও করা যায় না। তার ছকে বাঁধা নিরীহ জীবনে কোথাও একটা গণ্ডী আছে তা পেরিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য। সে ভেবে দেখল অন্য আর পাঁচজন মানুষের চেয়ে বেশি পাপ সে করেনি। শত্রু হিসেবে যে কয়েকজনের কথা মনে পড়ল তারাও ভয়ঙ্কর রকমের প্রতিশোধ নিতে পারে বলে তার ধারণা হ'ল না। শত্রু হিসেবে সে কারো মুখ যে ভাবতেই পারল না। বরং স্বপনের বুড়ো মাষ্টারমশাইকে তার মনে পড়ল।

মাস্টারমশায়ের কোঁচকানো, লালচে, প্রশস্ত কপালওলা মুখটায় সন্দেহের ছায়া দুলছে। মাস্টারমশাই চিন্তিত, বিস্মিত। মাস্টারমশাইকে তার শত্রু বলে মনে হ'ল। একটু গভীরভাবে তলিয়ে সে দেখল যে আসলে এ রকম একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আজ যে কেউ আসবে তাকেই তার শত্রু বলে মনে হবে। যেন সবাই তাকে কিছুক্ষণ পাপের শাস্তি দিতে আসবে। আরো দু'একজনের মুখ তার মনে আবছা ভাবে মনে পড়ে। কিন্তু বিবেচনা করে দেখলে তার সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্র ছাড়া তারা সবাই নিরীহ এবং ছা-পোষা। সুতরাং অসহায় হিরণ্ময় ক্রুদ্ধ হয়ে মুঠো পাকাল।

চোখ চেয়ে হিরণ্ময় দেখল টেবিলের ওপর দেশলাইটা পড়ে আছে। সে সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজতে উঠল। জামার পকেটে, ড্রেসিং টেবিলে কোথাও খুঁজে না পেয়ে আবার হতাশ হয়ে চেয়ারে বসল। তার মন তেতো হয়ে গেল। এ সব হঠাৎ ভুলে যাওয়া বা মনে না পড়ার ক্ষেত্রে সাধারণত সে উমার স্মরণশক্তির সাহায্য নিয়ে থাকে। কিন্তু এ সামান্য ব্যাপারে সে উমাকে আজ বিরক্ত করতে চায় না। তার মনে পড়ল যে উমা তাকে চা দেয়নি। মাথাটা সামান্য ধরেছে।

চোখ বুঁজে শুয়ে সে টের পেল স্বপন বারান্দায় বসে দুধমুড়ি খাচ্ছে। উমা তাকে খাইয়ে দিচ্ছে। আর মঙ্গলা যাবার সময় স্বপনকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে যাবে বলে ভিতরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। স্বপনের ইস্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে, ওর ইস্কুল সাড়ে ন'টায়। তার নিজের অফিসে যাওয়ার সময়ও প্রায় হ'ল, কিন্তু সে আজ অফিসে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারল না। চোখ বুঁজে সে পাপের কথা ভাবতে লাগল।

পাপ সকলেই কিছু কিছু করে। সে নিজেও দু'একটা করেছে। সে রেণুর কাছে যেত। সে ছেলেবেলায় শুনেছিল রেণুর মতো মেয়ে যারা, তাদের কাছে যাওয়া পাপ। বয়স হলে সেই পাপ রহস্যের মতো তাকে আকর্ষণ করেছিল। রেণু সেই রহস্য। রেণু সেই পাপ। রেণু মারা যাওয়ার পর সে পাপের স্বরূপ কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। অনেকদিন পর্যন্ত সে নিজের চামড়ায় ফুস্কুড়ি খুঁজেছিল। রেণুর জন্য তার দুঃখ হয়নি। উমা রেণুর দুঃখ তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, কেন না উমা রেণুর কথা জানত না। হয়তো তার নিজের মতোই কেউ রেণুর মতো কারো কাছে গিয়েছিল। কারণ, রেণু রহস্য, এবং সে পাপ করতেই শুধু রেণুর কাছে যেতে পারে। এবং সেই পাপ নিঃশব্দে হিরণ্ময়কে লিপ্ত করতে অতীতের হিরণ্ময়ের মতো কেউ—কিংবা রেণুর মতো কেউ—অসম্ভব একটা চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে। সে ক্রমশঃ এই চাতুর্যের জালে—নির্বোধের মতো নিজেকে জড়াচ্ছে।

নিজের উত্তপ্ত মাথাটা নিয়ে হিরণ্ময় উঠে দাঁড়াল। সে ভাবল সে যা করেছে তা অনুচিত। এতে ঢেকে রাখবার কিছু নেই। সে সোজা পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে দারোগা, কিম্বা ইন্সপেক্টরকে—সে জানে না দারোগা এবং ইন্সপেক্টর একই ব্যক্তি কিনা,—বলবে যে এই ব্যাপার ঘটেছে। ব্যাপারটা যদিও অসম্ভব রকমের এবং তারা খুব অবাক হবে কিন্তু হিরণ্ময় ভাবল, তার অন্য কিছু করার নেই।

হিরণ্ময় আলনায় ঝোলানো শার্ট পেড়ে নিয়ে পরতে লাগল। আপন মনে বিড় বিড় করে কথা সাজাতে লাগল। কিন্তু তার পর হিরণ্ময়কে থামতে হ'ল। একটা কথা মনে পড়ায় তার সমস্ত শরীরটাতে ভূমিকম্প হতে লাগল।

যদি কেউ আগেই পুলিশে খবর দিয়ে থাকে! যে এই অদ্ভুত কাজ করেছে সে নিশ্চয় হিরণ্ময়কে চেনে, তার বাড়িতে ঢুকবার পথ জানে। হয়তো সে এখনো হিরণ্ময়কে লক্ষ্য করছে। যদি সে ইচ্ছে করে তবে হিরণ্ময়কে যতদূর সম্ভব পাকে পাকে জড়াবে। ইচ্ছে করলে সে যে কোন গল্প বানিয়ে বলবে পুলিশকে, তার

চরিত্র নিয়ে চাপা ইঙ্গিত করবে। তারপর ভারী বুটের আওয়াজ তুলে পুলিশ এসে বলবে 'আপনার বাড়ি আমরা সার্চ করতে চাই। আমাদের সন্দেহ হয় এ বাড়িতে খুঁজলে একটা শিশুর দেহ পাওয়া যাবে।' অসহায়ের মতো হিরণ্ময় বসল। এ রকম অদ্ভুত চিন্তা হিরণ্ময় কখনো করেনি। সে হাত পা ছড়িয়ে দিল। তার সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম করতে থাকে। সে ভাবল সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। স্বপন তার জুতোর শব্দ তুলে এ ঘরে এল। একটু দাঁড়াল। তার বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে মঙ্গলার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। তারপর উমা ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে খিল তুলল! হিরণ্ময় কিছু দেখল না। চোখ বুঁজে রইল। তার চোখের সামনে ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট ঘরটা দুলতে থাকে। সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছে ভেবে নিজের মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে হিরণ্ময়।

উমা দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—'তুমি ওঠো'—উমা বলে।

হিরণ্ময় চুপ করে থাকে।

—শুনছ, ওঠো। মুখ হাত ধুয়ে নাও।'

হিরণ্ময় অর্থহীন চোখে তাকায়। তার কাছে এখন সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হতে থাকে। হয়তো সত্যিই খাটের তলায় কিছু নেই!' হয়তো এখনো তার ঘুম ভাঙেনি। এই অসহ্য দুঃস্বপ্নের মতো কারণহীন ঘটনার কোনো সমাধান যেন কেউ কখনো করে দিতে পারবে না।

—'আমি কি করব? আমরা এখনো জানি না ওটা কার শয়তানী। আমরা কখনো কোনো দিন জানব না।' হিরণ্ময়ের গলা কাঁপতে থাকে। স্পষ্টই সে কান্না চেপে রাখতে পারছে না।

—'তুমি ওঠো।' উমার গলায় দৃঢ়তার আভাষ পাওয়া যায়। তার দু'চোখের দৃষ্টি শান্ত, স্থির। সে বলে 'উঠে মুখ হাত ধুয়ে নাও।'

—'তারপর?' হিরণ্ময়ের গলায় হতাশা।

—'তারপর তুমি পুলিশের কাছে যাবে। সব বুঝিয়ে বলবে।

আমরা এ ব্যাপারের জন্য দায়ী নই। কেউ আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে, নিজে পাপ ঢাকতে চেয়েছে।' প্রায় কঠিন গলায় উমা বলে।

—'কিন্তু আইন আছে' পুলিশ আমাদের ছাড়বে কেন? মনে রেখো ওটা আমাদের ঘরে পাওয়া গেছে।

উমা ভেঙে পড়ল না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েও রইল না। হিরণ্ময় দেখল ওর সমস্ত শরীরটা নমনীয় স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে। এ যেন রোজ দেখে উমা। ওর চোখ দুটো শান্ত স্থির কঠিন, কি যেন ভেবে ও আবার শক্তি ফিরে পেয়েছে। হিরণ্ময় অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসতে চাইল। কি ভেবে কোন উপায়ে উমা স্বাভাবিক হয়ে যেতে পেরেছে তা জানতে খুব ইচ্ছে হল হিরণ্ময়ের।

উমা হিরণ্ময়ের সামনে দাঁড়িয়েও রইল না। এলোমেলো ঘরটাকে ত্রস্ত হাতে গুছিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে উমা। হিরণ্ময়ের দিকে চাইছে না।

খানিকটা বিস্ময় নিয়ে উমাকে দেখতে লাগল হিরণ্ময়। যেন উমাকে দেখা ছাড়া আর গতি নেই। উমা নিজের শরীরটা বদ্ধ ঘরের বাতাসের মধ্যে মাছের মতো স্বাভাবিকভাবে খেলাচ্ছে। আলনাটা এলোমেলো! কাল বিকেলে হিরণ্ময় ফিরে এসে জামা কাপড়গুলো দ্রুত হাতে যে ভাবে ছুঁড়ে দিয়েছিল আলনার দিকে এখনো সেগুলো ঠিক সে ভাবেই ঝুলছে। ভাঁজ ভাঙা জামা কাপড় পাটে পাটে নিপুণ হাতে ভাঁজ করে তুলে রাখছে উমা।

হিরণ্ময় দেখল উমা আলনা গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল। নিজেকে একা নিঃসহায় মনে হল হিরণ্ময়ের! চোখ বুঁজল। তার মাথায় ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবটা এখনো কমছে না। সে ভাবল উমাকে ডাকবে। ততক্ষণে উমার পায়ের শব্দটা বারান্দা থেকে ঘরের দরজায় এসে থেমেছে। হিরণ্ময় চোখ খুলে দেখল উমা খুব সাবধানে

কাচের টুকরোগুলো ঝাঁট দিয়ে জড়ো করছে। জলটা এখনো শুকিয়ে যায়নি। উমার ঝাঁটের দাগে সমস্ত ঘরের মেঝেটা চিত্রিত হতে লাগল। টুং টাং করে কাচের টুকরোর শব্দ।

হিরণ্ময় দেখল খাটের কাছে মেঝের ওপর কোনো দাগ নেই। উমা নীচু হয়ে আলনার তলা ড্রেসিং টেবিলের কোণা থেকে ধুলো বের করছে। উমা খাটের কাছে গেল না যেন ঐ জায়গাটা অপবিত্র, জঘন্য বীজানুযুক্ত। নিজের মধ্যে খানিকটা অকারণ হতাশা বোধ করল হিরণ্ময় কেন তা বুঝতে পারল না। সে চোখ খুলে নিবিষ্টমনে উমাকে দেখতে লাগল। উমা নরম বাঁকে নিজেকে ভেঙে নীচু হয়েছে। ওর কাঁধে আঁচল। হাতের পাশ দিয়ে ওর স্তন, বুকের বাঁক পেটের খাঁজ দেখা যায়। উমার শরীরে ঔদ্ধত্য কম। দেখলেই বোঝা যায় ও একজন মা হয়ে যাওয়া যুবতী। বুকের আকার ঢিলে, পেটের কাছে চামড়া দৃঢ় নয়। সমস্ত শরীরটা যেন ক্রমশ করুণায় মমতায় সিক্ত হয়ে ভরে উঠেছে কিন্তু হিরণ্ময় এ সব কিছু নিরর্থক ভাবে দেখল। হিরণ্ময় ভাবল উমার শরীরে যেন তার প্রয়োজন নেই। উমার শরীরে কোনো আকর্ষণ নেই।

উমা ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা মুছল। পাউডার স্নো-এর কৌটো ঠুকঠুক শব্দ করে গুছোল। হিরণ্ময় ভাবল তারা অনেকক্ষণ চুপ করে আছে। ঘরের বাতাস ভারী পাথরের মতো। জানালাগুলো খুলে দিলে হ'ত। কিন্তু উমা জানালা খুলল না।

নিঃশব্দে ঘরের আসবাবপত্র মুছতে লাগল, গুছিয়ে তুলতে লাগল, ঘরটা খানিকটা অন্ধকার। কিন্তু বাইরে রোদ্দুর কটকট করছে। ঘরে বসেও তার আঁচ পেল হিরণ্ময়।

—'আমি আজ অফিসে যাব না।' হিরণ্ময় বলল। নিজের কাছেই তার গলাটা অদ্ভুত শোনাল। মোটা ভারী শব্দটা গমগম করল ঘরের বাতাসে। উমার কথার শব্দ শোনার জন্যে অপেক্ষা করল হিরণ্ময়। উমা কথা বলল না। হিরণ্ময় লজ্জা পেল। তারপর রাগে তার শরীর জ্বলতে লাগল। একটা প্রবল অস্থিরতায় সে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে উমার দিকে তাকিয়ে থাকে। উমা কি ভাবছে তা জানবার জন্য,—সে ভাবল,—সে পাগল হয়ে যাবে।

উমা ঝাঁটাটা অবহেলায় ফেলে দিয়ে আঁচল তুলে মুখ মুছতে লাগল। উমা কাজটা এত স্বাভাবিক ভাবে করল যেন বাড়িতে আজ কিছু ঘটেনি। যেন আজ দিনটা অন্য পাঁচটা দিনের মতোই স্বাভাবিক। হিরণ্ময়ের মনে হ'ল সে সব কিছু ভুল দেখছে। হিরণ্ময় উমাকে বেরিয়ে যেতে দেখল।

গালে হাত দিতে খড়খড়ে দাড়ি তার হাতের তেলোয় লাগে। আজ দাড়ি কামানো হয়নি। উমা রোজকার মতো বারান্দার আলোতে ছোট্ট জলচৌকী পেতে দেয়নি, সব সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখেনি। নিজেকে এ রকম অনিয়মিত মনে হতে খারাপ লাগে। সম্ভবত ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। দম দিতে ভুলেছে হিরণ্ময়।

পাঁচ

আস্তে আস্তে বেলা বাড়ছে। বেলা এখন অনেক। দিনটা ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। একমুখী স্রোতের মতো এই দিনটা হিরণ্ময়কে যেন কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। সে এই স্রোতে ওলট-পালট, কেন্দ্রচ্যুত অনিয়মিত। দম-না দেওয়া ঘড়ির মতো সময় এবং পরিবেশ সম্পর্কে অচেতন। এখন কটা বাজে তা সে মনে মনে জানতে চাইল। উঠল না। হিরণ্ময় নিজেকে নড়ালো না, যেন নড়লেই এই বাতাস দীর্ঘশ্বাসের মতো কম্পিত হবে।

হিরণ্ময় ধোঁয়ার গন্ধ পায়। আস্তে আস্তে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ঘরে বদ্ধ বাতাসে জমছে। উমা উনুনে আগুন দিয়েছে। নিজের না-ধোওয়া মুখে, জিভ বিস্বাদ লাগে। ধোঁয়ার গন্ধে সকাল-সকাল মনে হয়।

হিরণ্ময় কোনো রকমে উঠে দরজার কাছে এসে বলে,—'তুমি কি আজ রাঁধবে?' উমা উনুনের কাছে উবু হয়ে বসা। বলল,—'তবে না খেয়ে থাকবে?'

—'তোমার ইচ্ছে হলে খেয়ো। আমার রুচি নেই। নিজের গলার ঝাঁঝ টের পায় হিরণ্ময়। উমার স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা তার কাছে অসহ্য লাগে।

এক ঘটি জল ঝপ ঝপ করে উনুনের ওপর ঢেলে উমা উঠে দাঁড়ায়। চোখ দুটো শুষ্ক, তীক্ষ্ণ। এতটুকু বন্ধুত্ব নেই দৃষ্টিতে।

—'তুমি না আইনের কথা বলছিলে।' উমা চাপা গলায় বলে। হিরণ্ময় চুপ।

—'আইনকে তোমার এত ভয় কেন? বে-আইনী কাজ যদি কেউ করে থাকে তবে সে শাস্তি পাবে।'

হিরণ্ময় আইন সম্পর্কে উমাকে কি যেন বোঝাতে চাইল। আইন সব সময়েই দোষীকে সাজা দেয় না, মাঝে মাঝে নির্দোষীরাও সাজা পায়। হিরণ্ময় ভাবল এই কথাটা উমাকে বলবে। কিন্তু সে দেখল সাদামাটা ভাবে এটুকু বলা ছাড়া তার আর কিছুই বলার নেই। আইন সম্পর্কে সে সামান্যই জানে। আর পাঁচজন ভদ্রলোকের মতো—যারা আইন পড়েনি বা আইন ভাঙেনি—হিরণ্ময়ও দেখল যে সে এ বিষয়ে কোনোকালেই গভীর আসক্ত ছিল না। সে দু'একটা ধারার কথা জানে এবং সাধ্যমতো সেগুলোকে ভয় করে। অবশ্য মাঝে মাঝে এখানে সেখানে কারো কারো সংস্পর্শে সে আইনের কথা শুনেছে, কিন্তু তাতে তার জ্ঞান বাড়েনি। কোন ঘটনা কোন আইনের পর্যায়ে পড়ে। আর তার শাস্তি কি তার জানা নেই। সে দু'একটা ভালোমন্দ চেনে কিন্তু সেগুলো আইনের পর্যায়ে পড়ে না। সে জানে সব ভালোকেই আইন স্বীকার করে না, আবার সব মন্দই শাস্তি পায় না।

হিরণ্ময় নিজের কপালে হাত দিয়ে চিন্তিত ভাবে দু'তিনবার 'আইন' শব্দটি আপন মনে উচ্চারণ করে চুপ করে থাকে। সে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করে। আইন, পুলিশ কাছারী—এই কথাগুলো তার মনে আসতে থাকে। সে ক্রমশ গম্ভীর হয়ে যেতে থাকে। জলে ডুবে যাওয়া মানুষের কুটো ধরবার মতো সে একটা সূত্র ধরতে চেষ্টা করে।

—'আইন যদি শাস্তি দেয় আমরা শাস্তি পাব। কিন্তু চোরের কিল খাব কেন?' উমা বলে,—'ওই জঘন্য ঘটনাটার জন্য যে দায়ী—সে শাস্তি পাক। আমাদের...মান...সম্মান...ভবিষ্যৎ...কুচ্ছিৎ...কি কুচ্ছিৎ সব...' প্রবল কান্নার মাঝে মাঝে গলা ভেঙে যায় উমার। চোখের জল গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা বুকের ওপর পড়ছে। চোখের জলে, কান্নার শব্দে ওর গলার স্বর যেন জলের ভেতর থেকে শুনতে পায় হিরণ্ময়।

এগিয়ে এসে উমা দরজার পাল্লা ধরে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদে। হিরণ্ময় ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। হিরণ্ময় ভাবল উমা আবার ভেঙে পড়বে। সে তার পিঠের কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু উমা ভেঙে পড়ল না। শুধু হেঁচকী তোলার মতো আওয়াজ ওর বুক পিঠকে কাঁপাতে লাগল।

উমা চোখ তুলল। জল টলটল করা দুটো তীব্র চোখ। সাপিনীর মতো দুলল উমা, তীব্র স্বরে বলল, —'আইনকে তোমার এত ভয় কেন? কেন? কেন?'

কথার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে হিরণ্ময়ের রোগা কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল উমা,—'আইনকে তুমি ফাঁকি দিতে চাও?'

উমার চোখ তীব্র, স্বর তীব্র। তার কথায় গূঢ় ইঙ্গিত হিরণ্ময় টের পেল। কি বলতে চায় উমা! হিরণ্ময় সচেতন হয়ে কি যেন বলতে চাইল। তার ঠোঁট নড়ল কিন্তু উমা তাকে বলতে দিল না। উমাকে বলতে দিতে হ'ল।

উমা পাগলের মতো, যান্ত্রিক বেগে হিরণ্ময়কে ঝাঁকি দিয়ে বলল,—'তুমি বলতে চাও তুমি কিছু জানো না?...তবে এ পাপ আমাদের বাড়িতে কেন? আর কারো বাড়িতে এ ব্যাপার ঘটল না...কেবল আমরা শাস্তি পাব কেন?'

কান্নার ঝোঁকে ঝোঁকে ও দুলছে। প্রতিটি কথার টানে ওর গলায় বাতাস আটকানোর শব্দ। সেই শব্দ ভয়ঙ্কর তীব্র। আঁচল খসে পড়েছে। উমা কিছু দেখছে না। হিরণ্ময় কাঠ হয়ে কঠোর চোখ নিয়ে উমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চেতনা ক্রমশ গূঢ় জটিল আবর্তের মধ্যে হারাচ্ছে। সে উমাকে দেখছে কিন্তু সে-দেখা

উমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্পর্শ করছে না। সে উমার কথাও সব শুনতে পেল না, শুধু তার দেহের ভঙ্গীর তীব্রতা —ওর সমস্ত শরীরের তীব্রতাকে অনুভব করল।

—'যে এ কাজ করেছে সে তোমাকে ভালো করে চেনে।...তোমাকে চিনতে আর বাকি নেই।...জানি কেন তুমি পুলিশের কাছে যাচ্ছ না...জানি, কেন তুমি আইনের কথা বলছ। ...সব জানি...জানি..জানি...যদি পাপ করে থাক তবে সে তার শোধ নিয়েছে...' উমা ক্রমশ শান্ত স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল। ওর কথার শেষে নিঃশ্বাসের বেগ ঘন, গভীর। কথায় টান দীর্ঘ। ওর সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষে ধুয়ে নিয়ে চোখের জল ধারায় ধারায় নামছিল। উমা চোখের সামনে সমস্ত ঘরটাতে ছায়া ছায়া—দীর্ঘ ছায়া দেখতে পাচ্ছিল। ক্রমশ চেতনা লুপ্ত হচ্ছিল উমার। হিরণ্ময়ের মুখটা লাল সাদা, লাল সাদা হয়ে হয়ে ওর দুটো চোখ প্রকাণ্ড গুহার মতো উমার চোখে স্থির। এখন শুধু সে চোখ দুটোকেই দেখতে পাচ্ছিল উমা। কি গভীর ঘন চোখ! গুহার মতো।

গুহার মতো শূন্য চোখ নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হিরণ্ময়। তারপর আস্তে আস্তে তার চেতনা ফিরতে লাগল। প্রতি শিরায় আগুনের মতো রক্তের উচ্ছ্বাস গতি হিরণ্ময় টের পেল। সে অনুভব করল তার শরীরের মধ্যে বন্য পশুর মতো ক্রোধ গজরাচ্ছে। সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল হিরণ্ময়ের কাছে। উমার মুখ, নিটোল ভেজা গাল, নরম ঠোঁট দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই সে উমাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য হাত তুলল...

পেছনে খিড়কির দরজায় মৃদু শব্দ বাজল খুট খুট খুট। সেই সঙ্গে হিরণ্ময়ের চড়টা সশব্দে উমার গালে পড়ল। উমার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠে ভেঙে গেল। উমা গড়িয়ে গেল মেঝের ওপর। হিংস্র পশুর মতো নীচু হয়ে হিরণ্ময় উমার নরম খুব নরম সাদা সারসের মতো গলার দিকে লোভীর মতো তাকাল। হাত জড়ো করল...

এবার শব্দটা আরো জোরে। খট খট খট। মেয়েলী গলায় কে ডাকল,—'উমাদি!'

ছয়

হিরণ্ময়ের চড়টা সমস্ত চেতনায় রক্তপ্রবাহের মতো গতি সঞ্চার করল। ছায়া-ছায়া ভাবটা সরে গেল চোখ থেকে। উমা চোখ খুলল। হিরণ্ময় দরজার শব্দ শুনেছিল। সে উঠে দাঁড়াল! দু'পা হাঁটতে গিয়ে দেখল পা অবশ, দেহ শিথিল। কোনো রকমে চেয়ারের ওপর নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল হিরণ্ময়!

উমা উঠে বসে তাড়াতাড়ি চুল ঠিক করল। কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিল। তারপর উঠে মুখ মুছল। উমা হিরণ্ময়কে দেখল না। হিরণ্ময় চোখ তুলল না।

উমা স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে বারান্দা পার হয়ে উঠোনে নামল। খিড়কীর দরজা খুলে দিল। পাশের বাড়ির বউ বন্দনা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়ে বলল,—'বাব্বাঃ, কতক্ষণ ধরে ডাকছি। শুনতেই পান না। খুব ব্যস্ত বুঝি।'

বন্দনা ভিতরে এল। উমা দরজা বন্ধ করে।

বন্দনা ফিরে বলল,—এত শুকনো দেখছি যে। চান করেননি?

—'করতে নেই।'

বন্দনা ফিক করে হেসে বলে,—শুকনো শুকনো আপনাকে বেশ দেখায় কিন্তু।' উমা হাসে। সহজ ভাবে কথা বলতে চেষ্টা করে। বলে,—'তুমি বসবে?'

ভ্রূ কোঁচকায় বন্দনা,—'বেশিক্ষণ না। ভাত খেয়ে দেখলাম পান নেই। পান না খেলে যা বিশ্রী লাগে। আছে পান?'

দ্রুত চিন্তা করে উমা। পানের বাটা খাটের তলায়। অন্ধকারে।

—'আনা হয়নি।' উমা হাসে,—ভুলে গেছে আনতে। যা ভুলো মন।'

বন্দনা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘরের কাছে আসে। পাশাপাশি উমা। বন্দনা উমার দিকে তাকায়। বলে,—বাঁ-গালটা অমন লাল যে! কিছু কামড়েছে বুঝি। ইস ফুলেছে কতটা...'

উমা গালে হাত দেয়। মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে।

হাসতে হাসতে বন্দনা ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিভ কাটে। ফিসফিস করে বলে, —'কর্তাবাড়িতে বুঝি! অফিস নেই?

কোনো রকমে গলা পরিষ্কার করে উমা বলে,—'এমনি। শরীর খারাপ। ভালো আর ক'দিন থাকে!'

খিলখিল করে হাসে বন্দনা,—'তাই গালটা অত লাল। এসে বুঝি ডিস্টার্ব করলাম!'

—'দূর!' উমা হাসে। তির তির করে চোখ কাঁপায়।

ভেজা জলঢালা উনুনের দিকে চেয়ে বন্দনা থমকায়। বারান্দা দিয়ে খানিকটা দ্রুত চলতে চলতে বলে, —'এ কি! আজ রান্নাবান্না নেই!'

উমা নিজেকে সংযত করে। গলার স্বর ঠিক রাখে, চোখ স্থির রাখতে চেষ্টা করে।

বন্দনা বলে,—'একটা বেজে গেছে, এখনো রান্না চাপাননি!'

উমার গলাটা এবার গম্ভীর হয়, বলে,—'ওর শরীর খারাপ, খায়নি। একার জন্য হাঙ্গামা আর কে করে!'

—'আর স্বপন?'

—'ও দুধ-মুড়ি খেয়ে গেছে। এলে ভাত চাপাব।'

বন্দনা খিল খিল করে হাসে। উমার কথা বিশ্বাস করে না। বলে—'রাগ বুঝি! আট বছর বিয়ের পরও? বুঝেছি, মান-ভঞ্জনের সময়ে গালটা লাল হয়েছে।'

বন্দনা হাসতে হাসতে উঠোনে নামে। পেছনে উমা। উমা মস্তবড় একটা নিশ্বাস ফেলে। স্থির হয়। আস্তে আস্তে বন্দনার পেছনে দরজার কাছে আসে।

দরজা খুলে বাইরে এক পা রেখে বন্দনা ফিরে বলে,—'ও গালটাও লাল হোক। আর ডিস্টার্ব করব না।' ও চলে যায়।

দরজা বন্ধ করে উমা আস্তে উঠোন পার হয়। বারান্দায় আসে।

সাত

হিরণ্ময়ের ঘুম পাচ্ছে। এ ঘরে কেমন একটা চাপা গন্ধ। গন্ধটা রোদ-পড়া ভেজা মাটির কিংবা এ ঘরের বাতাস একটা ছোট্ট মৃত শিশুর দেহ থেকে এ গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে কিংবা উমার চোখের জলে ভিজে যাওয়া মেঝের গন্ধ পাচ্ছে হিরণ্ময়! ভারী মাথাটা আস্তে আস্তে কোলের ওপরে রাখা হাতের তেলোয় ঝুলে পড়তে থাকে। হিরণ্ময় ঘুমের কথা ভেবে সোজা হতে চাইল। তার মাথার ভেতর নুপূরের শব্দের মতো ঝিম ঝিম শব্দ। কেউ যেন নাচছে। হিরণ্ময় দেখল, কেউ না। রক্তের স্রোত আলগা ভাঁটিতে সমস্ত শরীর শীতল করে দিয়ে সরে যাচ্ছে। খোলা বুকে বাতাসের আঁচড়। হিরণ্ময় চোখ চাইতে পারে না। চারদিক অন্ধকার দেখল। হাত বাড়িয়ে কি যেন খুঁজল, চোখের সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে উমার চোখ জ্বলছে। হিরণ্ময়ের বুক পুড়ে যেতে থাকে। কি যেন বলতে চায় হিরণ্ময়। ঘড়ঘড় করে শব্দ হয় গলায়।

কখন উমার চোখ সরে গেল। হিরণ্ময় দেখল অন্ধকার রাত্রি। এখন অনেক রাত। কত রাত সে জানে না। বোধহয় এটা অসীম রাত্রি। কূলকিনারাহীন অন্ধকারে স্রোত সমুদ্রের মতো বহমান। কোনোদিন সূর্য উঠবে না, চাঁদ না, তারা না। শুধু কুলকুল করা অন্ধকারের স্রোত। ঢেউ। ভেজা মাটির গন্ধ। অচেনা ফুলের গন্ধ, জলের গন্ধ। সব অন্ধকারে ঢাকা। যেন কেউ অনেক দুঃখের কান্না দিয়ে এই অন্ধকার ছড়িয়ে গেছে। আকাশ ছোঁয়া

অন্ধকারের ঢেউ। কিন্তু আকাশ নেই। কোনোকালে ছিল না। শুধু হিরণ্ময়—আর তার সত্ত্বা, চেতনা সজাগ। কোন দিকে এ অন্ধকার বিস্তৃত তা সে বুঝতে পারল না। না পূর্ব, না পশ্চিম—কোনো দিক নেই—

হিরণ্ময় যে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা অথৈ অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারে চলে গেছে। সোজা, সরলভাবে টানা। নিয়তির মতো অমোঘ। সে পথের ওপর আলোর দণ্ডের মতো একটু নিশানা। পথের পাশে সরলরেখার মতো দণ্ড—সামান্য আলোকিত হিরণ্ময় ভাবে ওটা গ্যাস লাইটের পোষ্ট। হিরণ্ময়...ভয়ে জর্জরিত হিরণ্ময় সেই আলোর দিকে ক্লান্ত একটা পোকার মতো হাঁটতে থাকে। কেন হাঁটছে তার কোথায় সে জানে না।

আলোর কাছে হিরণ্ময় থামে। ভয়। এ কেমন আলো! আলোর রঙ পাথরের মতো কঠিন ধূসর। বৃত্তের মতো নিটোল। সেই সুবৃত্ত গোলাকার আলোয় পথ কঠিন, নির্মম। আর সেই আলোর নীচে নিজের পুঞ্জীভূত ছায়ার ওপর প্রকাণ্ড এক প্রহরী। তার পাথরের মতো মুখ-চোখ। সে চোখে পলক নেই। সে দেহে স্পন্দনের অভাব। যেন চিরকাল সে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের দীর্ঘ বর্শা কয়েক শতাব্দী ধরে স্থির। সে এই কূল কিনারাহীন অন্ধকারে দুর্লভ আলোটুকুকে পাহারা দিচ্ছে। তার দেহের ভঙ্গী আদেশের মতো কঠিন, সরল।

হাতের ছোট্ট ঝোলাটার দিকে হিরণ্ময় তাকায়। সে ঝোলার ভেতরে স্পন্দন-হীন, শ্বাসহীন, প্রাণহীন মৃত শিশুর দেহ। অন্ধকারে চাপা। হিরণ্ময়ের ভয়ের মতো, পাপের মতো। সে এই শিশুকে আরো নিশ্চিন্ত অন্ধকারের হাতে রেখে আসবে। পেছনে ফেরবার পথ নেই। যেন অন্ধকার, বহুকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার পুরোনো জংধরা লোহার কালো দরজার মতো পথ আটকেছে। সামনে আলো। এই আলোর বৃত্তটুকু পার হলে হিরণ্ময়কে আর কেউ দেখবে না। তার বাঁ-হাতে শাবল সেই অন্ধকারে গর্ত খুঁড়বে, তারপর আস্তে আস্তে হিরণ্ময় ছোট্ট একটু অচেনা শিশুর দেহকে ঢাকবে।

হিরণ্ময় এই আলোর বৃত্তটুকু পার হবে। কিন্তু কেমন করে? হিরণ্ময় এই আত্মজিজ্ঞাসার জবাব পেল না। আলোর বৃত্তের মধ্যে যাওয়া নিষিদ্ধ। কোনো পাপ, কোনো অশুচি তাকে স্পর্শ করবে না। পাহারাওলার কণ্ঠস্বর বজ্রের মতো বাজবে—গম্ভীর পর্বতশ্রেণিতে প্রতিহত প্রতিধ্বনির মতো গভীরতর হবে অসহায় দুর্বল হিরণ্ময়কে কম্পিত করবে।

প্রাণপণে কাঁদল হিরণ্ময়। সে কাঁদতে থাকল। পাহারাওলা ফিরে দেখল না। আলোর বৃত্ত। স্থির অন্ধকার বহমান। ঢেউয়ের শব্দ গভীর গুহাতে প্রতিহত। অচেনা ফুলের গন্ধ, অচেনা শিশুর মৃতদেহের গন্ধ, মাটির গন্ধ। নিজের কান্নার শব্দ সে শুনল না। অসীম অনন্তকালের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময় অসীম অনন্তকালের আলোর দিকে চেয়ে থাকল। সে স্থির পাথরের দেহের মতো হয়ে যেতে লাগল—

প্রথমে হিরণ্ময়ের দেহটা পড়ল সশব্দে। তারপর চেয়ারটা। শানের ওপর অস্বাভাবিক শব্দ হ'ল। সেই শব্দে বারান্দায় খুঁটির সঙ্গে ঠেস-দিয়ে-বসে-থাকা উমা চমকাল। থরথর করে কাঁপল উমা। সে শব্দ কান্নার ঢেউ তুলল গলায়। উমা দাঁড়াল। খুঁটি ধরে ঝোঁক সামলাল।

উমা ঘরে আসে। প্রকাণ্ড এক মাকড়সার মতো মেঝের ওপর, মেঝের সঙ্গে লেপ্টে আছে হিরণ্ময়। মৃতদেহের মতো স্থির। উমা ভাবল হিরণ্ময় আর চোখ খুলবে না। আর কোনোদিন হিরণ্ময় স্পন্দিত হবে না। হিরণ্ময় মৃত।

হিরণ্ময় চোখ খুলে উমাকে দেখল। উমার দুটো চোখ রক্ত-গোলাপের পাপড়ির মতো। ভেজা ভেজা। হাত পাখাটা দ্রুতগতিতে তার মুখের ওপর বারবার উমার মুখটা ঢেকে দিচ্ছে। সাঁই সাঁই বাতাসের শব্দে। নিজের চোখেমুখে জলের ছিটে অনুভব করে হিরণ্ময়। বিন্দু বিন্দু জল চোখ গাল বেয়ে গলায় বুকে পড়ছে। জলের স্বাদে নিজের পিপাসাকে তীব্রভাবে অনুভব করে হিরণ্ময়। রক্তস্রোত শীতল। প্রবাহিত। না-খাওয়া, না-স্নান করা শরীর দুর্বল।

—'উমা!' হিরণ্ময় ডাকল।

—'উঠো না।' উমা বলে।

—'উমা!'

উমা উঠে দরজার কাছে সরে গেল। স্থির হয়ে হিরণ্ময়কে দেখতে লাগল। সেই চোখে অবহেলা। ঘৃণা। যে ভাবে উমা পাশের বাড়ির বেড়ালটাকে দেখে সে ভাবে দেখল হিরণ্ময় উঠে বসেছে। হাতের ওপর ভর। হাতটা কাঁপছে।

স্খলিত গলায় হিরণ্ময় ডাকে, '—উমা! প্লিজ, উমা, প্লিজ, বিশ্বাস কর।'

—'কি?' উমা বলে।

হিরণ্ময় নিজের ঠান্ডা কম্পিত শরীরকে হামাগুড়ি দিয়ে উমার কাছে আনল। হাঁটু গেড়ে বসল উমার পায়ের কাছে। উমা নড়ল না। হিরণ্ময় দু'হাতে উমার দু'হাত নিজের গালে চেপে ধরল। উমার হাতের ওপর হিরণ্ময়ের চোখের জল টুপটাপ পড়তে লাগল। বিস্মিত উমা হিরণ্ময়কে প্রথম কাঁদতে দেখল।

—'আমি রেণুর কাছে যেতাম'—অদ্ভুত এক আবেগ হিরণ্ময়ের গলা চেপে ধরল।

উমা দেখল সামান্য রোদ্দুর হিরণ্ময়ের রুক্ষ চুলের ওপর পড়েছে। ওর জলে ভেজা মুখ আলোকিত, দুটো চোখ ভাষাবহুল। ওর গালের হাড় ভেজা মুখের ওপর স্পষ্ট। খুব রোগা দেখাল হিরণ্ময়কে।

—'কে রেণু!' উমা নিশ্বাস বন্ধ করে বলে।

—'রেণুর সমস্ত শরীরে ঘা হয়েছিল। সে ঘায়ে ভুগে ভুগে রেণু দশ বছর আগে মারা গেছে—'

নিজের স্পন্দনহীন শরীরে একটা আবর্ত অনুভব করে উমা। বমি বমি ভাব। নিজেকে স্থির রেখে উমা বলে,—'তুমি আমাকে ছুঁয়ো না।'

—'কিন্তু সে দশবছর আগে মারা গেছে!' ব্যাকুল ভাবে হিরণ্ময় তাকায়।

—'তুমি আমাকে ছুঁয়ো না।' উমার গলা স্থির।

—'কিন্তু সে দশবছর হ'ল মারা গেছে।' হিরণ্ময় কাঁপে। রেণুকে তার পর্বতের মতো প্রকাণ্ড আর কঠিন মনে হয়।

—'তার মানে রেণু নামে এক বেশ্যা—। তুমি তার কাছে যেতে!'

—'তুমি সবটা শোনো। তুমি জানো না—'

'—তুমি কথা বোলো না। আমি শুনতে চাই না—বোলো না—' সে অদ্ভুত ক্রুর দৃষ্টিতে হিরণ্ময়কে দেখে —'যে একবার যায় সে বারবার যায়—'

উমা হিরণ্ময়কে ঠেলে দেয়। হিরণ্ময় রবারের পুতুলের মতো বসে থাকে। বলে— 'আমাকে তুমি কি করতে বল!'

উমা বারান্দার দিকে সরে যায়! হিরণ্ময় তীব্র পিপাসাকে অনুভব করে। সে উমার দিকে তাকিয়ে থাকে। উমার প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে দূরে, পঙ্কিল কোনো আবর্তের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। যেন উমার ওপর তার জীবন মরণ নির্ভরশীল—এমনি ভাবে হিরণ্ময় তাকিয়ে থাকে। নিজেকে রিক্ত, শূন্য মনে হয় তার।

—'তুমি পুলিশের কাছে যাবে'—উমার উন্নত বুক দ্রুত শ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করে। উমা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে,—'তোমার পাপের জন্য আমরা শাস্তি পাব না'—

—'আমাকে কি করতে বল!' হিরণ্ময় উঠে দাঁড়ায়।

—'পুলিশকে আসতে দাও। যা হয় তারা করবে!' উমা বলে,—'যেই করুক এ কাজ, তারা তাকে ধরবে। সবাইকে জানতে দাও।'

হিরণ্ময় হতাশ হয়ে কপালে হাত রাখে। বলে,—'তোমার কি মনে হয় এ কাজ—'

—'জানি না।'—উমা পিছন ফিরে উঠোনের দিকে চলে যায়।

অন্ধকারে ফিরে এসে হিরণ্ময় অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ। আস্তে আস্তে জামাটা গায়ে দেয় হিরণ্ময়। দরজা খোলো। উমা নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়াল। কেউ কোনো কথা বলল না।

হিরণ্ময় পথে নামল। উমার দিকে ফিরে তাকাতে সাহস হল না।

চলতে চলতে হিরণ্ময় পেছনে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেল।

আট

প্রায় বিকেল। দরজায় ধাক্কা শুনে উমা বারান্দা থেকে ঘরে এল। দরজা খুলল! প্রথমে হিরণ্ময়ের রুক্ষ চুল আর মাথা তার চোখে পড়ল। তার পেছনে তিনটে টুপি, চামড়ার বেল্ট, খাকি জামা। রাস্তার ওপর অনেক লোক জড়ো হয়েছে। তাদের কাটা কাটা কথা—চাপা শব্দ—বিস্ময়ের ধ্বনি উমার কানে গেল।

হিরণ্ময়ের পিছনে দুটো টুপি-ওলা লোক ঘরে ঢুকল! ভারী জুতোর লোহার নালের শব্দ। একজন দরজার বাইরে রইল। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করল হিরণ্ময়। চাপা সুরে কি যেন বলল!

স্কুল থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে স্বপন বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসেছিল। দরজার শব্দে চোখ ঘুরিয়ে সে তার বাবা আর দু'জন পুলিশকে ঢুকতে দেখল! টপ করে বারান্দা থেকে নেমে উঠোনের কোণে গিয়ে দাঁড়াল স্বপন।

ছায়া-ছায়া অস্পষ্টভাবে উমার চোখের সামনে ক্ষীণ বিকেলের আলো ক্ষীণতর হয়। ভারী জুতোর আওয়াজ মেঝের ওপর হাতুড়ির মতো। বাতাস কম্পিত। চকচকে চামড়ার বেল্ট—চৌকো মুখের দুজন কঠিন মানুষ—হিরণ্ময়ের রুক্ষ চুল শুকনো মুখ উমার সামনে কাটা কাটা ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘরের আসবাবপত্রগুলো এত অর্থহীন যে উমা ভেবে পেল না সে কোথায় আছে। এটা অন্য কারো বাড়ি—তার মনে হয়। অন্ধকার ঘরটাতে দু'একটা আলোর রেখা কোথা থেকে এসেছে। ঘরটা মোটা তুলির টানে আঁকা কোনো অর্থহীন ছবির মতো। উমা এই ছবির কোনো মানে বুঝল না।

চৌকো কঠিন মুখের একজন নীচু হয়ে অন্ধকারে খাটের তলায় হাত বাড়াল। এক্ষুনি একটা কিছু ঘটবে। কি ঘটবে তা উমা জানে না। হয়তো কিছুই ঘটবে না। আসলে হয়তো কিছুই ঘটেনি। খাটের তলাটা ফাঁকা।

কে যেন সুইচ টিপল। আলো তীব্র তীক্ষ্ণ ঢেউ তুলে ঝলসে উঠল। উমা ভাবল বুকচাপা কবরের অন্ধকারে সে এতক্ষণ বসে ছিল। কেউ আলো জ্বালল। উমা নিঃশ্বাস টানে।

শিরশির করে মেঝের উপর শব্দ হয়। উমা চেয়ে দেখল ন্যাকড়ায় জড়ানো পুঁটলির মতো বাচ্চাটা নিশ্চিন্ত নীরব হয়ে ঘুমোচ্ছে। মেঝের ওপর। কঠিন মেঝের ওপর ওর নরম ছোট্ট অবিশ্বাস্য আকৃতি সহজভাবে শুয়ে। চৌকো মুখওলা লোকটা প্রকাণ্ড ছায়া দানবের মতো ওকে ঢেকে আছে। সহজভাবে দেখছে ওকে।

যেন কিছুই ঘটেনি এমনি সহজভাবে লোকটা উঠে দাঁড়াল। কি যেন বলল। কাটা কাটা কঠিন অস্পষ্ট শব্দ। ধাতব শব্দ। উমা কোনো অর্থ খুঁজে পেল না। হিরণ্ময় চাপা গলায় কথা বলছে। সবাই কথা বলছে। উমা ড্রেসিং টেবিলের ওপর ভর দিয়ে ঘরের দিকে মুখ রেখে আলোয় ঘরটা দেখছে।

দুটো তীব্র চোখ উমার ওপর পড়ল। খাকি পোশাক পরা একজন উমাকে দেখছে। উমা শুনল লোকটা কথা বলছে তাকে। উমা শুনতে চাইল, বুঝতে চাইল। কিন্তু তার কাছে কিছুই বোধগম্য হ'ল না। সম্ভবত হিরণ্ময় সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিতে চায়। কিছু একটা ঘটবে—কোনো অপ্রাকৃত ঘটনা। যে ঘটনার সঙ্গে তাদের সংসারের পরিচিত জীবনের, ভাবনার কোনো মিল নেই। হয়তো অদ্ভুত কিছু তাকে বলবে লোকটা।

হিরণ্ময় অধৈর্যভাবে উমাকে দেখল।

হিরণ্ময় উমার কাছে আসে। তার কাঁধে হাত রাখে। উমা কোনো স্পর্শকে অনুভব করে না।

হিরণ্ময় উমার কানের কাছে নীচু হয়ে বলে,—'তুমি যা জানো, বল।'

—'আমি জানি না'—উমার স্বর প্রায় অস্পষ্ট শোনায়।

লোকটার চোখ আরো তীব্র।

উমা ভয় পায়। লোকটা তাকে অদ্ভুত ভাবে দেখছে। উমা কথা বলতে চেষ্টা করে। এই প্রথম সে নিজের গলার স্বর শুনল। সে স্বর অর্থহীন—এড়িয়ে যাওয়া। ভাষা স্পষ্ট নয়। সে বুঝতে পারল একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে চলেছে—যে ঘটনা তাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে।

উমা তার গালে গরম জলের স্পর্শ পায়। সে বুঝল সে কাঁদছে। সে শুনল সে বলতে চাইছে—সে কিছু জানে না। তাদের কোনো দোষ নেই।

লোকটা হাসে। মৃদু বাতাস বয়। উমা স্থিরতর হয়।

আবার ভারী জুতোর শব্দ বাতাসে তরঙ্গ তোলে। ওদের পেছনে হিরণ্ময় দরজার কাছ থেকে বারান্দায় সরে যায়। উমা ঘরে দাঁড়িয়ে অনুভব করে তিন জোড়া পা সমস্ত উঠোন ভাঁড়ায় ঘর ঘুরে ঘুরে কি যেন খুঁজছে।

—'তুমি ক'টায় স্কুলে যাও?'—কে যেন জিগ্যেস করল। ভারী মোটা গলা।

—'সাড়ে নটায়।'—স্বপনের বিস্মিত গলা। পাখির মতো সরু।

—'আচ্ছা, আচ্ছা। বে-শ। তুমি খেলা করতে যাও।'—ভারী মোটা গলা। স্বপনের ছায়া দরজার কাছে কাঁপে। স্বপন ভেতরে ঢোকে না কিংবা বাইরে যাবে বলে সদর দরজার কাছেও আসে না। স্বপন চৌকাঠের ওপর স্থির।

উমা স্থির হয়ে থাকে। অনুভব করে সময় স্রোতের মতো স্পন্দশীল হয়ে বইছে। শ্বাসরোধ করা যন্ত্রণায় উমা ক্রমশ দুর্বলতর। সে ভাবে সে আর কোনোদিন স্বাভাবিক হবে না।

কতক্ষণ সময় কাটে তা উমা জানে না। বোধহয় একটা যুগ।

আবার পায়ের শব্দ। নিকটতর। গলার আওয়াজ। তিন জোড়া পা।

—'মেথর আসবার জন্য বাথরুমের পেছনে দেয়ালে একটা ফোকর আছে।'

—ভারী মোটা গলা।

'ওঃ।'—অন্য জন বলে।

হিরণ্ময় কি যেন বলে অস্পষ্ট ভাবে। শোনা যায় না।

তারপর ওরা দরজার কাছে আসে। জুতোর শব্দ। প্রথমে হিরণ্ময়।

—'এটা একটা চালাকি।'—হিরণ্ময়ের পেছন থেকে কে বলল। উমা সেই শব্দে কাঁপে।

—'মানুষের রীতিনীতি যতদিন না বদলাবে, ততদিন—' মোটা ভারী গলা। কথা শেষ হওয়ার আগেই ওরা তিনজন পাশাপাশি ঘরের মেঝের ওপর দাঁড়ায়। একজোড়া কালো প্রকাণ্ড জুতো বাচ্চাটার পায়ের কাছে। আর একটু এগোলে বাচ্চাটার পায়ের আঙ্গুল থেঁতলে যাবে।

মুখে হাত তুলে চিৎকার করতে গিয়েও নিজেকে সামলায় উমা। চোখ বেয়ে জল পড়ে। চৌকো কঠিন মুখ দুটো চিন্তিত। ভ্রূ কোঁচকানো। হিরণ্ময় অসহায়ের মতো।

তারপর ওরা তিনজন রীতিনীতি আইন পাপ পুণ্য নিয়ে কথা বলতে থাকে। উমা উল্টো পাল্টা শোনে। কিছু বুঝতে পারে। কিছু পারে না।

—'ঘাবড়াবার কিছু নেই। এ রকম হামেশাই হচ্ছে—' একটা ভারী মোটা গলা। একটা চৌকো মুখ! ক্রূর চোয়াল হিরণ্ময়ের দিকে ফেরানো,—'তবে এ ঘটনা নতুন। এর কোনো অর্থ নেই। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব।'

লোকটা হিরণ্ময়ের ঘাড়ে সান্ত্বনার ভঙ্গীতে হাত রাখে। হিরণ্ময় হাসতে চেষ্টা করে। তারপর লোকটা কার যেন নাম ধরে ডাকল। উঁচু পর্দায় সে স্বর ধমকের মতো শোনায়। সেই শব্দই যেন সদর দরজাকে নাড়া দিল। ঝনাৎ করে দরজা খুলে আর একজন ভেতরে আসে।

উমা দেখল লোকটার টুপির ছায়া মুখের ওপর পড়েছে। লোকটার মুখ অস্পষ্ট ঋজু। সাদা দেয়ালের ওপর ওর মুখের আকৃতির একটা আভাষ উমা দেখল।

আঙ্গুল দিয়ে বাচ্চাটকে দেখিয়ে অন্যজন কিছু বলল। দরজা খুলে যে ঢুকেছিল সে নীচু হয়ে বাচ্চাটার দিকে হাত বাড়াল।

উমা তীব্র ভাবে কাঁপে। মোটা ভারী কালো হাত। বাঁকানো এবড়ো খেবড়ো আঙুল। কুচ্ছিৎ। সমস্ত হাতটা আর তার প্রকাণ্ড ছায়া কালো হয়ে বাচ্চাটাকে ঢাকল।

কখন জুতোর শব্দ থামল। ওরা কখন চলে গেল উমা টের পেল না। সে ড্রেসিং টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল।

অর্থহীনভাবে চোখ তুলে দেখল অনেক মানুষের ছায়ায় ঘরটা ভর্তি। কারা যেন ঘরে ঢুকছে। কাতারে কাতারে। ছোট ঘরটা তাদের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার। হিরণ্ময় তাদের কাছে কিছু বলছে। অস্পষ্ট শব্দ। মৌমাছির গুঞ্জনের মতো। উমা কিছু শুনল না, স্পষ্ট ভাবে দেখল না। অনুভব করল তার শরীরটা হালকা। কিছু ঘটেনি। কোনো কিছুই না।

তারপর তার দেহটা সশব্দে পড়ল। মেঝের ওপর। পায়ের শব্দ। কারা বাইরে যাচ্ছে। হিরণ্ময়ের দ্রুত কণ্ঠ। কানের খুব কাছে স্বপনের নিঃশ্বাস। দরজার শব্দ। এলোমেলো।

তারপর ঝিঁঝি পোকার ডাক।

নয়

রাত্রি।

কত রাত হিরণ্ময় জানে না।

'আমি ভয় পেয়েছিলাম।' উমা বলে, উমার গলা স্বাভাবিক।

হিরণ্ময় উমার ছায়া দেখল। দেয়ালে বন্ধুর ছায়া। উমা হাত তুলে খোঁপার কাঁটা খুলে ড্রেসিং টেবিলের উপর ছুঁড়ে দেয়। টুংটুং করে কাঁটাগুলো ছড়িয়ে পড়ে। উমা আয়নায় নিজেকে দেখে।

মশারীর ভেতর থেকে হিরণ্ময় মশারীর বাইরে উমাকে দেখে। উমা আয়নায় নিজেকে দেখে। উমার লালচে মুখ দেখতে হিরণ্ময়ের লজ্জা করে। হিরণ্ময় কথা বলে না। ঘুমন্ত স্বপনের কাছ থেকে সরে এসে নিজেই কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়।

জলের সোঁদা সোঁদা গন্ধ। সমস্ত ঘরটা ধোয়া মোছা। দেয়ালে জলের দাগ। হিরণ্ময় মৃদু ফিনাইলের গন্ধ পায়।

উমা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে দেখে। উমা মগ্ন হয়ে আছে।

—'কিছু বলছ না যে!' উমার গলার স্বর গাঢ়।

—'কি বলব?' হিরণ্ময় বালিশে মুখ রাখে।

টিপ বোতাম খোলার মৃদু শব্দ। উমা ব্লাউজ খোলে। ফর্সা সাদা বাহু উন্মুক্ত হয়। হিরণ্ময় উমার গভীর বুকের অংশ—সাদা গজদন্তের মতো রঙ দেখে। উমার শরীরে স্বেদ মৃদু মিষ্টি গন্ধ সমস্ত ঘরটাকে আস্তে আস্তে ভরে তোলে।

সমস্ত ঘরটা ক্রমশ উমার শরীর হয়ে উঠতে থাকে। আকর্ষক উত্তেজক এই ঘর। উমার শরীর আলোতে প্রকাশমান।

হিরণ্ময় আলো দেখে। পাউডারের মৃদু কণা নরম ঘামের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। উমা পাউডারের কৌটো ঘুরিয়ে দেখে। ঠক করে শব্দ হয়।

হিরণ্ময়ের কেমন লজ্জা করে। যেন উমাকে ছোঁয়া বারণ। উমা অন্য কারো বৌ। বালিশে মাথা রাখে হিরণ্ময়। সারাদিনের ক্লান্তি এখন নেই। হাল্কা শরীর। হিরণ্ময় সারাদিনের কথা ভাবতে চাইল। ভাবতে পারল

না।

উমার শরীরে গন্ধ তার চেতনাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করেছে।

উমা মুখ টিপে হাসে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে বেঁকে দাঁড়িয়ে কপালের ওপর কুঁচো কুঁচো চুল সাজায়। বলে,—'গোঁসাইয়ের বুঝি রেণুর কথা ভাবা হচ্ছে?'

হিরণ্ময় চমকায়। তারপর চুপ করে থাকে। ভাবে, সে রেণুর কথা ভুলে যাচ্ছে। ভুলে গিয়েছিল। তারপর আলোয় রেণুর মুখ ভাসে। হিরণ্ময় চোখ চায় না। রেণুর মুখ চোখ বুজে দেখে। ক্রমশ একটা পাপবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে। যেন রেণুর জন্য চোখের জাল পেতে অপেক্ষা করে হিরণ্ময়। সেই জালে রেণু ছোট্ট ভিরু মাছের মতো কাঁপে। রঙিন মাছটা বদ্ধ জলে খেলছে।...রেণু জালের ভেতরে নিজের শরীর কাঁপায়। উমা রঙিন মাছের মতো নড়ে...রেণু কাঁপে। হিরণ্ময়ের বুকে মাথা। চুলের গন্ধ।

হিরণ্ময় পাশ ফিরে শোয়।

হিরণ্ময় উমার গলা শুনতে পায়। উমা বলে,—'আমার ইচ্ছে ছিল বাচ্চাটাকে একটু সাজিয়ে দিই। সারাদিন ছিল এ বাড়িতে—উমার গলার স্বর লালায় ভেজা! করুণ হিরণ্ময়ের কানে অনেকক্ষণ ধরে স্বরটা বাজতে লাগল।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ল বাচ্চাটার ডান হাতে একটা আঙুল ইঁদুরে কামড়ে নিয়েছিল। রক্ত ছিল না। সাদা কচি মাংস কাটা জায়গাটা থেকে ঝুলছিল। ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে যেতে লাগল হিরণ্ময়। এ ঘরে নতুন বাতাস খেলা করে। যেন কিছু ঘটেনি। এ বাড়িতে। কিছুই না। যেন দুঃস্বপ্ন এতক্ষণ সারাদিন তাকে মগ্ন রেখেছিল! সে বোকার মতো উমার কাছে নিজের পাপের কথা বলতে গিয়েছিল। উমা এখন রেণুর কথা জানে। কিন্তু উমা এখন স্বাভাবিক। হিরণ্ময় নিজের জন্য দুঃখ পেল।

সুইচ টেপার শব্দ। অন্ধকার ঢেউয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো উমা বিছানায় পড়ল। শব্দ। হিরণ্ময় চমকে ওঠে। উমার গায়ের গন্ধ। বাইরে মৃদু জ্যোৎস্না। কাচের শিশিতে সাদা আলো।

উমা বিশ্বস্তভাবে তার বুকে মুখ রাখল। হিরণ্ময় ভাবল এই অন্ধকারে সে উমা বা রেণুর তফাত চিনবে না। কে উমা, আর কেই বা রেণু—তাকে কে বলে দেবে? সে দুঃখিতভাবে চাঁদের আলো দেখল। চোখ বুঁজে অনুভব করল অন্ধকার অসীম অনন্ত সমুদ্রের মতো ঢেউ। না উমা, না রেণু, কাউকে চেনা যায় না। অন্ধকার ফুলের মতো সুগন্ধময়। স্বেদ, মানুষের ভেজা চামড়া, চুলের মৃদু গন্ধ। উমার নগ্ন শরীর হিরণ্ময়ের নগ্নতার কাছে উন্মুক্ত!

অন্ধকার শুদ্ধ সঙ্গীতের মতো স্পন্দনশীল।

ক্রমশ তারা আরো সতর্ক হবে। আরো সতর্ক, আরো ভাবলেশহীন।

চুম্বনের শব্দ।

ছোট বৃত্তে তারা ধরা পড়ল।

হিরণ্ময় একটা ঝাঁকি দিয়ে উমাকে সরিয়ে দিল। উমা কথা বলল না।

তারা ক্লান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুমোতে লাগল।

বেরালের প্রাণ

কুকুরগুলো বাইরে খ্যাঁকাচ্ছে। সে এমন চ্যাংড়ামি যে মাথা গরম হয়ে যায়। গগনচাঁদ উঠে একবার গ্যারাজঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। লাইটপোস্টের তলায় একটা ভিখিরি মেয়ে তার দুটো বাচ্চাকে নিয়ে খেতে বসেছে। কাপড়ের আঁচল ফুটপাথে পেতে তার ওপর উচ্ছিষ্ট খাবার জাড়ো করেছে। কুকুরগুলো চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে লাগাতার।

গগনচাঁদ একটা ইট কুড়িয়ে নিয়ে নির্ভুল নিশানায় ফেলে কুকুরটার পাছায় লাগিয়ে দিল ছুঁড়ে। কুকুরটার বীরত্ব ফুস করে উড়ে যায়, কেউঁ কেঁউ করতে করতে নেংচে সেটা পালায়। সঙ্গে আরগুলো। গগনচাঁদ ফের তার গ্যারাজঘরে এসে বসে। রাত অনেক হল। গগনচাঁদের ভাত ফুটছে তরকারির মশলা এখনো পেশা হয়নি।

মশলা পিষবার শিল-নোড়া গগনের নেই। আছে একটা হামানদিস্তা। তাই তো সে হলুদ গুঁড়ো করে, ধনে-জিরে ছাতু করে ফেলে। একটা অসুবিধে এল যে, হামানদিস্তায় একটা বিকট টং টং শব্দ ওঠে। আশপাশের লোক বিরক্ত হয়। আর এই বিরক্তির ব্যাপারটা গগন খুব পছন্দ করে।

এখন রাত দশটা বাজে। গ্রীষ্মকাল। চারপাশেই লোকজন জেগে আছে। রেডিও বাজছে, টুকরো-টাকরা কথা শোনা যাচ্ছে, কে এক কলি গান গাইল। বাসন-কোসনের শব্দও হয়। গগন হামানদিস্তা নিয়ে হলুদ গুঁড়ো করতে বসে। আলু ঝিঙে আর পটল কাটা আছে, ঝোলটা হলেই হয়ে যায়।

গ্যারাজটায় গাড়ি থাকে না, গগন থাকে। গ্যারাজের ওপরের নীচু ছাদে একখানা ঘর আছে, সেটাতে বাড়িওলা নরেশ মজুমদারের অফিসঘর। কয়েকখানা দোকান আছে তার কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে। নিজের ছেলেপুলে নেই, শালীদের দু-তিনটে বাচ্চাকে এনে পালে পোষে। তার বৌ শোভারাণী ভারী দজ্জাল মেয়েছেলে। শোভা মাঝে মাঝে ওপরের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে—শিল-নোড়া না থাকে তো বাজারের গুঁড়ো মশলা প্যাকেটে ভরে বিক্রি হয়। নাকি সেটা কারো চোখে পড়ে না? হাড়-হারামজাদা পাড়া জ্বালানি গু-খেগোর ব্যাটারা সব জোটে এসে আমার কপালে—

সরাসরি কথা বন্ধ। বাড়িতে একটা মাত্র কল, বেলা ন'টা পর্যন্ত তাতে জল থাকে। জলের ভাগীদার অনেক। গ্যারেজে গগন। রাতে নরেশের কিছু কর্মচারী শোয় ওপরতলার মেজেনাইন ফ্লোরে। সব মিলিয়ে পাঁচজন ভিতর-বাড়ির আরো চারঘর ভাড়াটের ষোলো-সতেরোজন মিলে মেলাই লোক। একটা টিপকল আছে, কিন্তু সেটা এত বেশি ঝকাং ঝকাং হয় যে বছরে ন'মাস বিকল হয়ে থাকে। জল উঠলেও বালি মেশানো ময়লা জল উঠে আসে তাই জলের হিসেব ওই একটা মাত্র কলে। অন্য ভাড়াটেদের অবশ্য ঘরে ঘরে কল আছে, কিন্তু মাথা উঁচু কল বলে তাতে ডিমসুতোর মতো জল পড়ে। উঠোনের কলে তাই হুড়োহুড়ি লেগেই থাকে। একমাত্র নরেশের ঘরে অঢেল জল। নিজের পাম্পে সে জল তুলে নেয়। কিন্তু সে জল কেউ পায় না, এমনকী তার কর্মচারীরাও নয়। গগনচাঁদ কিছু গম্ভীর মানুষ উপরন্তু কলেজ আর তিনটে ক্লাবের ব্যায়াম-শিক্ষক, তার বালতি কিছু বড় এবং ভারী। কাউকে সে নিজের আগে জল ভরতে দেয় না।

নরেশ মাস আষ্টেক আগে জলের বখেড়ায় গগনচাঁদকে বলেছিল—আপনার খুব তেল হয়েছে। তাতে গগনচাঁদ তার গলাটা এক হাতে ধরে অন্যহাতে চড় তুলে বলেছিল—এক থাপ্পড়ে তিনঘণ্টা কাঁদাব। সেই থেকে কথা বন্ধ।

গগন গুঁড়োমশলা কিনতে যাবে কোন দুঃখে। ভেজাল আর ধুলোবালি মেশানো ওই অখাদ্য কেউ খায়! তাছাড়া হামানদিস্তায় মশলা গুঁড়ো করলে শরীরটাকে আরো কিছু খেলানো হয়। শরীর খেলাতে গগনের ক্লান্তি নেই।

গ্যারেজের দরজা মস্ত বড়। বাতাস এসে কেরোসিনের স্টোভে আগুনটাকে নাচায়। গগন উঠে গিয়ে টিনের পাল্লা ভেজিয়ে দিতে যাচ্ছিল। নজরে পড়ল আকাশে মেঘ চমকাচ্ছে। গ্রীষ্মের শেষ, এবার বাদলা শুরু হবে। ঠান্ডা ভেজা একটা হাওয়া এল। গগন ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। অন্য ঋতু ততটা নয় যতটা এই বাদলা দিনগুলো তাকে জ্বালায়। গ্যারাজের ভিত নীচু, রাস্তার সমান সমান। একটু বৃষ্টি হলেই কল কল করে ঘরে জল ঢুকে আসে। প্রায় সময়েই বিঘৎখানেক জলে ডুবে যায় ঘরটা। সামনের নর্দমার পচা জল। সেই সঙ্গে উচ্চিংড়ে, ব্যাং এবং কখনো-সখনো ঢোঁড়া সাপ এসে ঘরে ঢুকে পড়ে। তা সেসব কীটপতঙ্গ বা সরীসৃপ নিয়ে মাথা ঘামায় না গগন। ময়লা জলটাকেই তার যত ঘেন্না। দুটো কাঠের তাক করে নিয়েছে, তোরঙ্গটা তার ওপর তুলে রাখে, কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিলে স্টোভ জ্বেলে চৌকিতে বসে সাহেবি কায়দায় রান্না করে গগন বর্ষাকালে। সে বড় ঝঞ্ঝাট। তাই আকাশে মেঘ দেখলে গগন খুশি হয় না।

এখনো হল না। কিন্তু আবার বর্ষা-বৃষ্টিকে সে ফেলতেও পারে না। এই কলকাতার শহরতলীতে বৃষ্টি যেমন তার না-পছন্দ, তেমনি আবার মুরাগাছা গাঁয়ে তার যে অল্প কিছু জমি-জিরেত আছে সেখানে বৃষ্টি না হলে মুশকিল। না হোক বছরে চল্লিশ-পঞ্চাশ মন ধান তো হয়ই। তার কিছু গগন বেচে দেয়, আর কিছু খোরাকি বাবদ লুকিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে।

মেঘ থেকে চোখ নামিয়েই দেখতে পায় ল্যাম্পপোস্টের আলোর চৌহাদ্দি ফুঁড়ে সুরেন খাঁড়া আসছে। সুরেন একসময়ে খুব শরীর করেছিল। পেটের পেশি নাচিয়ে নাম কিনেছিল। এখন একটু মোটা হয়ে গেছে। তবু তার দশাসই চেহারাটা রাস্তায় ঘাটে মানুষ দুপলক ফিরে দেখে। সুরেন গুণ্ডামী নষ্টামী করে না বটে, কিন্তু এ তল্লাটে সে চ্যাংড়াদের জ্যাঠামশাই গোছের লোক। লরির ব্যবসা আছে, আবার একটা ভাতের হোটেলও চালায়।

সুরেন রাস্তা থেকে গোঁত্তা-খাওয়া ঘুড়ির মত ঢুকে এল গ্যারাজের দিকে। বলল—কাল রাত থেকে লাশটা পড়ে আছে লাইন ধারে। এবার গন্ধ ছাড়বে। গম্ভীর গগন বলল—হুঁ।

—ছোকরাটা কে তা এখনো পর্যন্ত বোঝা গেল না। তুমি গিয়ে দেখে এসেছ নাকি?

—না। শুনেছি।

ঘরে ঢুকে সুরেন চৌকির ওপর-বসল। বলল প্রথমে শুনেছিলাম খুন। গিয়ে দেখি তা নয়। কোনখানে চোট ফোট নেই। রাতের শেষ ডাউন গাড়িটাই টক্কর দিয়ে গেছে। কচি ছেলে, সতেরো আঠারো বছর হবে বয়স। বেশ ভাল পোশাক টোশাক পরা, বড় চুল, জুলপি, গোঁফ সব আছে।

—হুঁ। গগন বলল।

হামানদিস্তার প্রবল শব্দ হচ্ছে। ভাত নেমে গেল, কড়াই চাপিয়ে জিরে ফোড়ন ছেড়ে দিয়েছে গগন। সঙ্গে একটা তেজপাতা। সাঁতলানো হয়ে গেলেই মশলার গুঁড়ো আর নুন দিয়ে ঝোল চাপিয়ে দেবে।

সুরেন খাঁড়ার খুব ঘাম হচ্ছে। টেরিলিনের প্যান্ট আর শার্ট পরা, খুব টাইট হয়েছে শরীরে। বুকের বোতাম খুলে দিয়ে বলল—বড্ড গুমোট গেছে আজ। বৃষ্টিটা যদি হয়!

—হবে। গগন বলে—হলে আর তোমার কি! দোতলা হাঁকড়েছ, টঙের ওপর উঠে বসে থাকবে।

সুরেন ময়লা রুমালে ঘাড়ের ঘাম মুছে ফেলল, তারপর সেটা গামছার মতো ব্যবহার করতে লাগল মুখে আর হাতে। ঘষে ঘষে ঘাম মুছতে মুছতে বলে—তোমার ঘরে গরম বড় বেশি, ড্রেনের পচা গন্ধে থাক কি

করে?

—প্রথমে পেতাম গন্ধটা। এখন সয়ে গেছে, আর পাই না। চার সাড়ে চার বছর একটানা আছি।

—তোমার ওপরতলার নরেশ মজুমদার হারামজাদা তো আবার বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে ঝিল রোডে। একতলা শেষ, দোতলারও ছাদ যখন-তখন ঢালাই হয়ে যাবে। একবার ধরে পড়ো না, নীচের তলাকার একখানা ঘর ভাড়া দিয়ে দেবে সস্তায়।

গগন ভাতের ফ্যান-গালা সেরে ঝোলের জল ঢেলে দিল। তারপর গামছায় হাত মুছতে মুছতে বলল—তা বললে বোধহয় দেয়। ওর বউ শোভারাণী খুব পছন্দ করে কিনা আমাকে। একটু আগেও আমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করছিল।

—একদিন উঠে গিয়ে ঝাপড় মারবে একটা, আর রা কাটবে না।

গগন মাথা নেড়ে বলে—ফুঃ! একে মেয়েছেলে, তার ওপর বউ মানুষ। বলে হাসে গগন। একটু গলা উঁচু করে, যেন ওপরতলায় জানান দেওয়ার জন্যই বলে—দিক না একটু গাল-মন্দ, আমার তো বেশ মিঠে লাগে। বুঝলে হে সুরেন, আদতে ও মাগি আমাকে পছন্দ করে, তাই ঝাল ঝেড়ে সেটা জানিয়ে দেয়। মেয়েমানুষের স্বভাব জান তো, যা বলবে তার উল্টোটা ভাববে।

বলেই একটু উৎকর্ণ হয়ে থাকে গগন। সুরেনও ছাদের দিকে চেয়ে বসে থাকে। মুখে একটু হাসি দুজনেরই। শোভারাণীর অবশ্য কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ওপরে কোন বাচ্চা বুঝি স্কিপিং করছে, তারই টিপ টিপ শব্দ আসছে, আর মেঝেতে ঘুরন্ত দড়ির ঘষা লাগার শব্দ।

নরেশচন্দ্র বড় চতুর বাড়িওলা। ভাড়াটে ওঠানোর দরকার পড়লেই সে অন্য কোন বখেড়ায় না গিয়ে বউ শোভারাণীকে টুইয়ে দেয়। শোভার মুখ হল আস্তাকুঁড়। সে তখন সেই ভাড়াটের উদ্দেশ্যে আস্তাকুঁড়ের ঢাকনা খুলে আবর্জনা ঢালতে শুরু করে। সে বাক্য যে শোনে তার কান দিয়ে তপ্ত সিসে ঢালার চেয়েও বেশি কষ্ট হয়। সে বাক্য শুনলে গত জন্মের পাপ কেটে যায় বুঝি। শোভারাণী অবশ্য এমনি এমনি গাল পাড়ে না। নতুন ভাড়াটে এলেই তার ঘরদোরে আপনজনের মত যাতাযাত শুরু করে, বাটি বাটি রান্না করা খাবার পাঠায়, দায়ে-দফায় গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে। ওইভাবেই তাদের খাবারের হাল-চাল, গুপ্ত খবর সব বের করে আনে। কোন সংসারে না দুটো চারটে গোপন ব্যাপার আছে! সেইসব খবরই গুপ্ত অস্ত্রের মতো শোভার ভাঁড়ারে মজুত থাকে। দরকার মত কিছু রং-পালিশ করে এবং আরো কিছু বানানো কথা যোগ করে শোভা দিন-রাত চেঁচায়। ভাড়াটে পালানোর পথ পায় না। গগনও শোভার দম দেখে অবাক হয়ে বলে—এ তো হামিদা বানুর চেয়ে বেশি কলজের জোর দেখতে পাই।

একমাত্র গগনেরই কিছু তেমন জানে না শোভা। না জানলেও আটকায় না। সেদিন নরেশকে ঝাঁকি দিয়েছিল গগন, সেদিন শোভারাণী একনাগাড়ে ঘণ্টা খানেক গগনের তাবৎ পরিবারের শ্রাদ্ধ করেছিল। বেশ্যার ছেলে থেকে শুরু করে যতরকম বলা যায়। গগন গায়ে মাখেনি, তবে ক্লাবের ছেলেরা পরদিন সকালে এসে বাড়ি ঘেরাও করে। ব্রজ দত্ত নামে সবচেয়ে মারকুট্টা যে চেলা আছে গগনের সে দোতলায় উঠে নরেশকে ডেকে শাসিয়ে দিয়ে যায়। মারত, কিন্তু গগন ওরকমধারা দুর্বলের গায়ে হাত তোলা পছন্দ করে না বলে মারেনি। তাতে শোভারাণীর মুখে কুলুপ পড়ে যায়। কিন্তু রাগটা তো আর যায়নি। বিশেষত গগন তখনো ইচ্ছেমত জল তোলে, ফলে কোনদিন জল না এলে নরেশের চাকরকে ডেকে ওপরতলা থেকে বালতি বালতি জল আনিয়ে নেয়। শোভা রাগ করে হয়তো, কিন্তু জল দিয়ে দেয়। ঝামেলা করে না।

ভেবে দেখলে গগন কিছু খারাপ নেই। কেবল ওই বর্ষাকালটাকেই যা তার ভয়।

—লাশটার কথা ভাবছি, বুঝলে গগন।

—কী ভাবছ?

—এখনো নেয়নি। গন্ধ ছাড়বে।

—নেবে'খন। সময় হলে ঠিক নেবে।

—ছেলেটা এখানকার নয় বোধহয়। সারাদিনে কম করে দু-চারশ' লোক দেখে গেছে, কেউ চিনতে পারছে না।

—এসেছিল বোধহয় অন্য কোথা থেকে। ক্যানিং-ট্যানিং-এর ওদিককার হতে পারে।

সুরেন মাথা নেড়ে বলে—বেশ ভদ্রঘরের ছাপ আছে চেহারায়। কসরৎ করা চেহারা।

গগন একটু কৌতূহলী হয়ে বলে—ভাল শরীর?

—বেশ ভাল। তৈরি।

—আহা। বলে শ্বাস ছেড়ে গগন বলে—অমন শরীর নষ্ট করল।

সুরেন খাঁড়া বলে—তাও তো এখনো চোখে দেখনি, আহা-উহু করতে পারলে!

—ওসব চোখে দেখা আমার সহ্য হয় না। অপঘাত দেখলেই মাথা বিগড়ে যায়, গত মাঘমাসে চেতলার দিদিমাকে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম কেওড়াতলায়। সেখানে দেখি রাজ্যের কলেজের মেয়ে হাতে বই-খাতা নিয়ে জড়ো হয়েছে। সব মালা আর ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে, একটা খাট ঘিরে ভিড়, শুনলাম, কলেজের প্রথম বছরের মেয়ে একটা। সে দেওয়ালীর দিন সিন্থেটিক ফাইবারের শাড়ি পরে বেরোতে যাচ্ছিল, আগুন লেগে তলার দিকটা পুড়ে যায়। ওইসব সিন্থেটিক কাপড়ও খুব ডেঞ্জারাস বুঝলে সুরেন। ওতে আগুন লাগলে তেমন দাউ দাউ করে জ্বলবে না, কিন্তু ফাইবার গলে গায়ের সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে যাবে, কেউ খুলতে পারবে না। মেয়েটারও তাই হয়েছিল, কয়েকমাস হাসপাতালে থেকে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। ভিড়-টিড় ডিঙিয়ে উঁকি মেরে দেখে তাই তাজ্জব হয়ে গেলাম। ঠোঁট দুটো একটু শুকনো বটে, কিন্তু কি মরি-মরি রূপ কচি, ফর্সা। ঢল ঢল করছে মুখখানা। বুকের মধ্যে কেমন যে করে উঠল।

সুরেন খাঁড়া বলে—ওরকম কত মরছে রোজ।

গগনচাঁদ ব্যাপারটা 'কত'-র মধ্যে ফেলতে চায় না, বলল—না হে, এ মেয়েটাকে সকলের সঙ্গে এক করবে না। কী বলব তোমাকে, বললে পাপ হবে কিনা তাও জানি না, সেই মরা মেয়েটাকে দেখে আমার বুকে ভালবাসা জেগে উঠল। ভাবলাম, ও যদি এক্ষুনি বেঁচে ওঠে তো ওকে বিয়ে করি। সেই ছেলেবেলা থেকে অপঘাতের মৃত্যুর ওপর আমার বড় রাগ। কেন যে মানুষ অপঘাতে মরে।

সুরেন রুমালে ঘাড় গলা ঘষতে ঘষতে বলে—তোমার শরীরটাই হোঁৎকা, মন বড্ড নরম। মনটা আর একটু শক্ত না করলে কি টিকতে পারবে। চারদিকের এত অপঘাত মৃত্যু, অভাব—এসব সইতে হবে না?

গগনচাঁদ একটু থমকে গিয়ে বলে—তোমাদের এক এক সময়ে এক এক রকমের কথা। কখনো বলছ গগনের মন নরম, কখনো বল গগনের মেজাজটা বড় গরম। ঠিক ঠিক ঠাহর পাও না নাকি?

সুরেন বলে—সে তত্ত্ব এখন থাক, আমি লাশটার কথা ভাবছি।

—ভাবছ কেন?

—ভাবছি, ছেলেটার চেহারা দেখেই, বোঝা যায় যে কসরৎ করত। তুমি তো ব্যায়াম শেখাও, তা তোমার ছাত্রদের মধ্যে কেউ কিনা তা গিয়ে একবার দেখে আসবে নাকি?

গগন ঝোল নামিয়ে এক ফুঁয়ে জনতা স্টোভ নিভিয়ে দিল। বলল—ও, তাই আগমন হয়েছে!

—তাই।

—কিন্তু ভাই, ওসব দেখলে আমার রাতের খাওয়া হবে না।

—খেয়ে নিয়েই চল, আমি ততক্ষণ বসি।

গগন মাথা নেড়ে বলে—তাও হয় না, খাওয়ার পর ওসব দেখলে আমার বমি হয়ে যেতে পারে।

সুরেন বলে—তুমি আচ্ছা লোক হে! বলছি তো তেমন ঘেন্নার দৃশ্য কিছু নয়, কাটা ফাটা নেই, এক চামচে রক্তও দেখলাম না কোথাও। তেমন বীভৎস কিছু হলে না হয় কথা ছিল।

গগনের চেহারায় যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর শান্ত দৃঢ় ভাবটা থাকে সেটা এখন আর রইল না। হঠাৎ সে ঘামছিল, অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল—কার না কার বেওয়ারিশ লাশ। তোমার তা নিয়ে অত মাথাব্যথা

কেন? ছেড়ে দাও, পুলিস বা করার করবে।

সুরেন ভ্রূ কুঁচকে গগনকে একটু দেখল। বলল—সে তো মুখ্যুও জানে। কিন্তু কথা হল, আমাদের এলাকায় ঘটনাটা ঘটে গেল। অনেকের সন্দেহ খুন। তা সে যাই হোক, ছেলেটাকে চেনা গেলে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। পুলিশ কত কি করবে তা তো জানি।

সুরেন সে অঞ্চলের প্রধান। গগন তা জানে। সে নিজে এখানে পাঁচ-সাত বছর আছে বটে, কিন্তু তার প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমন কিছু নয়। এক গোটা পাঁচেক জিমনাশিয়ামের কিছু ব্যায়ামের শিক্ষানবীশ আর স্থানীয় কয়েকজন তার পরিচিত লোক। সুরেনের মতো সে এখানকার শিকড়গাড়া লোক নয়। সুরেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ভালোই, কিন্তু এও জানে, সুরেনের মতে মত না দিয়ে চললে বিস্তর ঝামেলা। সুরেনের টাকার জোর আছে, দলের জোর আছে, নিজেকে সে এ অঞ্চলের রাজা ভাবে। বিপদ সেখানেই, এ অঞ্চলে যা ঘটে সব তার নিজের দায় বলে মনে করে সুরেন। ক্ষেপে গেলে সে অনেক দূর পর্যন্ত যায়।

গগন প্যান্ট পরল, জামা গায়ে গলিয়ে নিল। চপ্পল জোড়া পায়ে দিয়ে বলল—চল।

—খেলে না?

—না। যদি রুচি থাকে তো এসেই যা হোক দুটো মুখে দেব। নইলে আজ আর খাওয়া হল না।

দুই

একবার সন্তু একটা বেরালকে ফাঁসি দিয়েছিল। বেরালটা অবশ্য খুবই চোর ছিল, ছিনতাই করত, মাঝেমধ্যে দু-একটা ডাকাতিও করেছে। যেমন সন্তুর ছোটবোন দুধ খেতে পারে না, রোজ সকালে মারধোরের ভয় দেখিয়ে দুধের গ্লাস হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়, আর তখন খুব অনিচ্ছায় সন্তুর বোন টুটু এক চুমুক করে খায় আর দশমিনিট ধরে আগড়ম বাগড়ম বকে, খেলে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই করতে করতে এক ঘণ্টা। ততক্ষণে দুধ ঠান্ডা মেরে যায়, মাছি পড়ে। বেরালটা এ সবই জেনে তক্কে তক্কে থাকত। একসময়ে দেখা যেত, প্রায় সকালেই, সে গেলাস কাৎ করে মেঝেময় দুধ ছড়িয়ে চেটে-পুটে খেয়ে গেছে। এটা চুরি। এরকম চুরি সে হামেশাই করত, আর ছিনতাই করত আরো কৌশলে। পাড়ার বাচ্চাদের খাওয়ার সময়টা কি করে যে তার জানা থাকত কে বলবে! ঠিক ঠাক খাওয়ার সময়ে হাজির থাকত সে। মুখোমুখি বসে চোখ বুজে ঘুমনোর ভান করত, আর সুযোগ হলেই এর হাত থেকে, তার পাত থেকে মাছের টুকরো কেড়ে নিয়ে হাওয়া। ডাকাতি করত মা-মাসিদের ওপর। কেউ মাছ কুটছে, গয়লার কাছ থেকে দুধ নিচ্ছে, কি হরিণঘাটার বোতল থেকে দুধ ডেকচিতে ঢালছে, অমনি হুড়ুশ করে কোত্থেকে এসে বাঘের মাসি ঠিক বাঘের মতোই ম্যাও করে উঠত। দেখা গেছে, মা-মাসির হাত থেকে মাছ কেড়ে নিতে তার বাধে নি, দুধের ডেকচিও সে ওল্টাতে জানত মা-মাসির হাতের নাগালে গিয়ে। ওরকম বাঁদর বেরাল আর একটাও ছিল না। বিশাল সেই হুলোটা অবশ্য পরিপাটি দাঁতে-নখে ইঁদুরও মেরেছে অনেক। সিংহবাড়ির ছন্নছাড়া বাঁগানটায় একাধিক হেলে আর জাত সাপ তার হাতে প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছে। গায়ে ছিল অনেক আঁচড়-কামড়ের দাগ, রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে প্রায়দিনই তার হাতাহাতি কামড়া-কামড়ি ছিল। কুকুররাও, কে জানে কেন, বেশ একটু সমঝে চলত তাকে। রাস্তাঘাটে বেরাল দেখলেই যেমন কুকুর হামলা করে, তেমন এই হুলোকে কেউ করত না। কে যেন, বোধহয় রায়েদের বুড়ি মা-ই হবে, বেরালটার নাম দিয়েছিল গুণ্ডা। তো তাই। হুলো গুণ্ডা এ পাড়ায় যথেচ্ছাচার করে বেড়াত, ঢিল খেত, লাঠির বাড়ি খেত, গাল তো খেতই।

সন্তুকে দু-দুটো স্কুল থেকে ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমটায় যে স্কুলে সে পড়ত তা ছিল সাহেবি স্কুল, খুব আদবকায়দা ছিল, শৃঙ্খলা ছিল। সেখানে ভর্তি হওয়ার কিছু পরেই সন্তুর বাবা অধ্যাপক নানক চৌধুরীকে ডেকে স্কুলের রেকটর জানালেন—আপনার ছেলে মেন্টালি ডিরেঞ্জড। আপনারা

ওকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। আমরা আর দু-মাস ট্রায়ালে রাখব, তারপর যদি ওর উন্নতি না হয় তো দুঃখের সঙ্গে টি-সি দিতে বাধ্য হব।

নানক চৌধুরী আকাশ থেকে পড়লেন। আবার পড়লেনও না। কারণ, তাঁর মনে বারবরই একটা খটকা ছিল সন্তু সম্পর্কে। বয়সের তুলনায় সন্তু কিছু বেশি নিষ্ঠুর, কখনো কখনো মার খেলে হেসে ফেলে। এবং এমন সব দুষ্টুমী করে যার কোন মানে হয় না। যেমন, সে ছাদের আলসের ওপর সাজিয়ে রাখা ফুলের ভারী টবের একটা দুটো মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে নীচের রাস্তার ওপর ফেলে দেয়। রাস্তায় হাজার লোকে চলে। একবার একটা সন্তুর বয়সি ছেলেরই মাথায় একটা টব পড়ল। সে ছেলেটা দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে যখন ছাড়া পেল তখন বোধবুদ্ধিহীন জরদগব হয়ে গেছে। যেমন, সে একবার সেফটিপিন দিয়ে পোষা টিয়াপাখির একটা চোখ কানা করে দিয়েছিল। টিয়ার চিৎকারে সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, একটা চোখ থেকে অবিরল রক্ত পড়ছে, লাল অশ্রুর মতো। আর পাখিটা ডানা ঝাপটাচ্ছে আর ডাকছে। সে কি অমানুষিক চিৎকার। খাঁচার গায়েই সেফটিপিনটা আটকে ছিল। আর একবার সে তার ছোটবোনকে বারান্দার একধারে দাঁড় করিয়ে খুব কাছ থেকে প্রচণ্ড জোরে গুলতি মারে। মরেই যেত মেয়েটা। বুকে লেগে দমবন্ধ হয়ে অজ্ঞান। হাসপাতালে গিয়ে সেই মেয়েকে ভাল করে আনতে হয়। তাই নানক চৌধুরী অবাক হলেও সামলে গেলেন। তবে সাইক্রিয়াট্রিস্টের কাছে না গিয়ে সন্তুকে বাড়ি ফিরে একনাগাড়ে মিনিট পনেরো ধরে প্রচণ্ড মারলেন।

দু-মাস পর ঠিক কথামতই টি-সি দিয়ে দিল স্কুল। দ্বিতীয় স্কুলটি অত ভালো নয়। কিন্তু সেখানেও কিছু ডিসিপ্লিন ছিল, ছেলেদের ওপর কড়া নজর রাখা হত। দু-মাস পর সেখান থেকে চিঠি এল—আপনার ছেলে পড়াশুনোয় ভাল, কিন্তু অভ্যস্ত চঞ্চল, তার জন্য আর পাঁচটা ছেলে নষ্ট হচ্ছে।

এক বছর বাদে সন্তু সেকেণ্ড হয়ে ক্লাসে উঠল। কিন্তু প্রমোশনের সঙ্গে তাকে টি-সি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অগত্যা পাড়ার কাছাকাছি একটা গোয়ালমার্কা স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করে এবার নিশ্চিন্ত হয়েছেন নানক চৌধুরি। এই স্কুলে দুষ্টু ছেলের দঙ্গল, তার ওপর গরিব স্কুল বলে কাউকে সহজে তাড়িয়ে দেয় না। বিশেষত সন্তুর বেতন সব সময়ে পরিষ্কার থাকে, এবং ক্লাসে সে ফার্স্ট হয়। নানক চৌধুরিকে এখন সন্তুর ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হয় না, তিনি নিজের লেখাপড়ায় মগ্ন থাকেন।

সন্তু এখন ক্লাস নাইনে পড়ে। স্কুলের ফুটবল টিমে সে অপরিহার্য খেলোয়াড়। তা ছাড়া সে একটা ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম শেখে। গগনচাঁদ শেখায়। সন্তুর খুব ইচ্ছে সে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ব্যায়াম করে। তাতে শরীরের পেশি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কিন্তু গগন যন্ত্র ছুঁতেই দেয় না, বলে—ওসব করলে শরীর পাকিয়ে শক্ত জিংড়ে মেরে যাবে, বাড়বে না। গগন তাই ফ্রি-হ্যান্ড করায় আর রাজ্যের যোগব্যায়াম, ব্রিদিং, স্কিপিং আর দৌড়। সন্তু অবশ্য সে কথা শোনে না। ফাঁক পেলেই রিং করে, প্যারালাল বার-এ ওঠে, ওজন তোলে, স্প্রিং টানে। গগন দেখলে ঝাপড় মারবে, কিংবা বকবে। তাই প্রায় সময়েই রাতের দিকে জিমনাসিয়ামে যখন গগন থাকে না, দু-চারজন চাকুরে ব্যায়ামবীর এসে কসরৎ করে আর নিজেদের চেহারা আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, তখন সন্তু এসে যন্ত্রপাতি নেড়ে ব্যায়াম করে।

গুণ্ডা বেরালটাকে গতবার সন্তু ধরেছিল সিংহিদের বাগানে। বাগান বলতে আর কিছু নেই। কোমর-সমান উঁচু আগাছায় ভরে গেছে চারধার। একটা পাথরের ফোয়ারা ভেঙে ফেটে কাৎ করে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা পামগাছের গায়ে বহুদুর পর্যন্ত লতা উঠেছে বেয়ে। সিংহিদের বাড়িতে কেউই থাকে না। বছর দেড়েক আগে বুড়ো নীলমাধব সিংহ মারা গেলেন। হাড়কিপটে লোক ছিলেন। অত বড় বাড়ির মালিক, তবু থাকতেন ঠিক চাকর-বাকরের মতো, হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা জামা, পায়ে রবারের চটি। একটা চাকর ছিল, সে-ই দেখাশোনা করত। নীলমাধবের একমাত্র ছেলে বিলেতে থাকে, আর কেউ নেই। অসুখ হলে লোকটা ডাক্তার ডাকতেন না, নিজেই হোমিওপ্যাথীর বাক্স নিয়ে বসতেন। বাজার করতেন নিজের হাতে। যত সস্তা জিনিস এনে রান্না করে খেতেন। বাগানে কাশীর পেয়ারা, সফেদা, আঁশফল বা জামরুল পাড়তে বাচ্চা-কাচ্চা কেউ

ঢুকলে লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন। একটা সড়ালে কুকুর ছিল, ভারী তেজি, সেটাকেও লেলিয়ে দিতেন। নিজের ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই করতেন বসে বসে। একটা বুড়ো হরিণ ছিল, সেটা বাগানে দড়িবাঁধা হয়ে চরে বেড়াত। নীলমাধব পাড়ার লোকজনের সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না, তবে তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে খুশি হতেন, অনেক পুরোনো দিনের গল্প ফেঁদে বসতেন। এ অবশ্য নীলমাধবের পৈতৃক সম্পত্তি নয়, দূর-সম্পর্কের জ্যাঠার সম্পত্তি। নিঃসন্তান জ্যাঠা মারা গেলে দেখা যায় উইল করে তিনি নীলমাধবকেই সব দিয়ে গেছেন। লোকে বলে, নীলমাধব এক তান্ত্রিকের সাহায্যে বাপ মেরে জ্যাঠাকে খুন করে সম্পত্তি পান। লোকের ধারণা, নীলমাধব তাঁর স্ত্রীকেও খুন করেছিলেন। এ সবই অবশ্য গুজব, কোন প্রমাণ নেই। তবে কথা চলে আসছে।

সন্তু একবার নীলমাধবের হাতে ধরা পড়েছিল। সে বড় সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। চিরকালই জীবন্ত কোন কিছু দেখলেই তাকে উত্যক্ত করা সন্তুর স্বভাব, সে মানুষ বা জন্তু যাই হোক। তাদের একটা চাকর ছিল মহী। লোকটা চোখে বড় কম দেখত। তার সঙ্গে রাস্তায় বেরোলেই সন্তু তাকে বরাবর—মহীদা, গাড়ি আসছে...এই বলে হাত ধরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিত। এবং মহী কয়েকবারই এরকমভাবে বিপদে পড়েছে। সন্তু তাকে বার দুই নালার মধ্যেও ফেলে দেয়। এরকমই ছিল তার স্বভাব। তখন সিংহিদের বাগানের বুড়ো হরিণটাকে সে প্রায়ই ঢিল মারত। সিংহিদের বাগানের ঘর-দেয়াল অনেক জায়গায় ভেঙে ফেটে গেছে। টপকানো খুব সোজা। প্রায় দুপুরেই সন্তু দেয়াল টপকে আসত, বাগানে ঘুরত টুরত, আর বাঁধা হরিণটাকে তাক করে গুলতি মারত। হরিণটার গায়ে চমৎকার কয়েকটা দাগ ছিল, সেই দাগগুলো লক্ষ্য করে গুলতি দিয়ে নিশানা অভ্যাস করত সে। আর তার লক্ষ্য ছিল, হরিণের চমৎকার কাজলটানা চোখ। কখনো বা গাছের মতো দুটি প্রকাণ্ড শিংকেও লক্ষ্য করে ঢিল মারত সে। একবার সে হরিণটাকে দড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে বাগানের উত্তর দিকে একটা গহীন লতানে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে আটকে দেয়।

সন্তু জানত না যে বুড়ো নীলমাধবের দূরবীন আছে। এবং প্রায়দিনই নীলমাধব দূরবীন দিয়ে চারদিকে তাকে খুঁজত। একটা দুষ্টু ছেলে যে হরিণকে ঢিল মারে সেটা তাঁর জানা ছিল। প্রিয় হরিণের গায়ে তিনি দাগ খুঁজে পেতেন।

হরিণকে লতাগাছে আটকে দেওয়ার পরদিনই সন্তু ধরা পড়ে। সন্তু রোজকার মতোই দুপুরে বাগানে ঢুকেছে, পকেটে গুলতি, চোখে শ্যেনদৃষ্টি। চারদিকে রোদে খাঁ-খাঁ করছে সিংহিবাগান। হরিণ চরছে। গাছে গাছে পাখি ও পতঙ্গের ভিড়। শিরীষ গাছে একটা মৌচাক বাঁধছে মৌমাছিরা। বর্ষা তখনো পুরোপুরি আসেনি। চারধারে একপশলা বৃষ্টির পর ভ্যাপসা গরম।

সফেদা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সন্তু ফল দেখছিল। খয়েরি রঙের কী ফল ফলেছে গাছে। ভারে নুয়ে আছে গাছ। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে এক থোপা ফল ধরেও ফেলেছিল সন্তু। সেই সময়ে পায়ের শব্দ পেল, আর খুব কাছ থেকে কুকুরের ডাক। তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। তিন ধার থেকে তিনজন আসছে। একদিক থেকে আসছে কুকুরটা, অন্যধার থেকে চাকর, আর ঠিক সামনে একনলা বন্দুক হাতে নীলমাধব সিংহ। একটা লাফ দিয়ে সন্তু দৌড়েছিল। পারবে কেন। মস্ত সড়ালে কুকুরটাই তাকে পেল প্রথম। পায়ের ডিমে দাঁত বসিয়ে জন্তুটা ঘাস-জঙ্গলে পেড়ে ফেলল তাকে। পা তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কুকুরটা তার বুকের ওপর খাপ পেতে আধখানা শরীরের ভার দিয়ে চেপে রেখেছে। আর ধারালো ঘাসের টানে কেটে যাচ্ছে সন্তুর কানের চামড়া। ডলা ঘাসের অদ্ভুত গন্ধ আসছে নাকে। বুকের ওপর বন্দুকের নল ঠেকিয়ে নীলমাধব বললেন—ওঠো। চাকরটা এসে ঘাড় চেপে ধরল। সন্তু কোন কথাই বলতে পারছিল না।

বুড়ো নীলমাধব নিয়ে গেলেন সেই বিশাল বাড়ির ভিতরে। সেইখানে অত ভয়ভীতির মধ্যেও ভারি লজ্জা পেয়েছিল সন্তু। দেয়ালে দেয়ালে সব প্রকাণ্ড মেমসাহেবদের ন্যাংটো ছবি, আর বড় বড় উঁচু টুলে ঐরকম ন্যাংটো মেয়েমানুষের পাথরের মূর্তি দেখে।

সবশেষে একটা হলঘর। সেইখানে এনে দাঁড় করালেন নীলমাধব। মুখে কথা নেই। সিলিং থেকে একটা দড়ি টাঙানো। দড়ির নীচের দিকে ফাঁসওলা প্রান্তটা সিলিংয়ের আংটার ভিতর দিয়ে ঘুরে এসে কাছেই ঝুলছে।

নীলমাধব বললেন—তোমার ফাঁসি হবে।

এই বলে নীলমাধব দড়িটা টেনে-টুনে দেখতে লাগলেন। চাকরটাকে বললেন একটা টুল আনতে। কুকুরটা আশেপাশে ঘুর ঘুর করছিল। সন্তু বুঝল এইভাবেই ফাঁসি হয়। কিছু করার নেই।

গলায় সেই ফাঁস পরে টুলের ওপর ঘণ্টাখানে দাঁড়িয়ে থেকেছিল সন্তু। চোখের পাতা ফেলেনি। অন্যপ্রান্তের দড়িটা ধরে থেকে সেই একঘণ্টা নীলমাধব বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতাটা খুব খারাপ লাগেনি সন্তুর। নীলমাধবের পূর্বপুরুষরা কীভাবে বাঘ ভালুককে এবং মানুষ মারতেন তারই নানা কাহিনি। শেষ দিকটায় সন্তুর হাই উঠছিল। আর তাই দেখে নীলমাধব ভাবী অবাক হয়েছিলেন।

যাই হোক, একঘণ্টা পর নীলমাধব তাকে টুল থেকে নামিয়ে একটা চাবুক দিয়ে গোটাকয় সপাং সপাং মারলেন। বললেন—ফের যদি বাগানে দেখি তো পুঁতে রাখব মাটির নীচে।

এই ঘটনার পর নীলমাধব বেশিদিন বাঁচেন নি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিণটা মারা যায়। সড়ালে কুকুরটাকে নিয়ে কেটে পড়ে চাকরটা। কেবলমাত্র নীলমাধবের পেয়ারের হুলো বেরালটাই অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াত পাড়ায় পাড়ায়। বড়লোকের বেরাল বলেই কি না কে জানে, তার মেজাজ অন্য সব বেরালের চেয়ে অনেক কড়া ধাতের। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, পশুমী কোনটাই আটকাত না।

কে একজন রটাল, নীলমাধব মরে গিয়ে বেরালটায় ভর করে আছেন।

বিলেত থেকে কলকাঠি নেড়ে নীলমাধবের ছেলে কি করে যেন বাড়ি বিক্রি করে দিল। শোনা যাচ্ছে, এখানে শিগগির সব বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠবে।

তা সে উঠুক গে। গতবারের কথা বলে নিই আগে। হুলো গুণ্ডা বেরালকে সিংহিদের বাগানেই তক্কে তক্কে থেকে একদিন পাকড়াও করে সন্তু। ডাকাবুকো ছেলে। বেরালটার গলায় দড়ি বেঁধে সেই বাড়িটায় ঢুকে যায়। এবং খুঁজে খুঁজে ছাড়া-বাড়ির জানালা টপকে ভিতরে ঢুকে সেই ফাঁসির হলঘরে আসে। সিলিং থেকে দড়ি টাঙানোর সাধ্য নেই। সে চেষ্টাও করেনি সন্তু।

একটা মোটা ভারী চেয়ারে দড়িটা কপিকলের মত লাগিয়ে বেরালটাকে অন্যপ্রান্তে বেঁধে সে বলল—তোমার ফাঁসি হবে। বলেই দড়ি টেনে দিল।

এসময়ে এক বজ্রগম্ভীর গলা বলল—না, হবে না।

চমকে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সন্তু। হাতের দড়ি সেই ফাঁকে টেনে দিয়ে গলায় দড়ি সমেত গুণ্ডা পালিয়ে যায়।

কাকে দেখেছিল সন্তু তা খুবই রহস্যময়। সন্তু কিছু মনে করতে পারে না। সে চমকে উঠে চারদিকে চেয়ে দেখছিল, এসময় কে তাকে মাথার পিছন দিকে ভারী কোন কিছু দিয়ে মারে। সন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

সন্ধের পর নানক চৌধুরী এক অচেনা লোকের টেলিফোন পেয়ে সিংহিদের বাড়িতে লোকজন নিয়ে গিয়ে সন্তুকে উদ্ধার করে আনেন। এরপর দিন সাতেক সন্তু ব্রেন-ফিবারে ভোগে। তারপর ভালো হয়ে যায়। এবং এ ঘটনার পর গুণ্ডাকেও এ লোকালয়ে আর দেখা যায় নি। একটা বেরালের কথা কে-ই বা মনে রাখে।

সন্তুর কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, অলক্ষ্যে তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ আছে। সিংহদের বাড়িতে যে লোকটা তাকে মেরেছিল সে বাস্তবিক তার শত্রু নাও হতে পারে। তার বাবা নানক চৌধুরী মানুষটা খুবই নির্বিকার প্রকৃতির লোক। এ ঘটনার পর নানক চৌধুরী থানা-পুলিশ করেনি। ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করেছে। সন্তুকেও তেমন জিজ্ঞাসাবাদ করে নি। এমনকী কে একজন যে নিজের নাম গোপন রেখে টেলিফোন করেছিল তারও খোঁজ করার চেষ্টা করেনি। নামক চৌধুরী লোকটা ওইরকমই, প্রচুর পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছে, কারণ বড়লোক শ্বশুরের ছেলে ছিল না, মাত্র দুটি মেয়ে। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তি দুই

মেয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। নানক চৌধুরীর শালী, অর্থাৎ সন্তুর মাসির ছেলেপুলে নেই। বয়স অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেছে তার সন্তান-সন্তাবনা নেই। সেই মাসি সন্তুকে দত্তক চেয়ে রেখেছে। সন্তুর মা একমাত্র ছেলেকে বোনের কাছে দিতে রাজি হয় নি। সন্তুর মাসি যদি অন্য কাউকে দত্তক না নেয় তবে তার সম্পত্তিও হয়তো একদিন সন্তুই পাবে। মাসি সন্তুকে বড় ভালোবাসে। সন্তুও জানে, একমাত্র মাসি ছাড়া তাকে আর কেউ নিখাদ ভালোবাসে না। যেমন মা। মা কোনদিন সন্তুর সঙ্গে তার বোনকে কোথাও বেড়াতে পাঠায় না, বা একা খেলতে দেয় না। তার সন্দেহ, সন্তু ছোটবোনকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। বাবা সন্তুর প্রতি খুবই উদাসীন। কেবল মাঝে মাঝে পেটানো ছাড়া সন্তুর অস্তিত্বই নেই তার কাছে। লোকটা সারাদিনই লেখাপড়া নিয়ে আছে। বই ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

সন্তুর সঙ্গী-সাথী প্রায় কেউই নেই। তার কারণ, প্রথমত, সন্তু বন্ধুবান্ধব বেশি বরদাস্ত করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সে কাউকেই খুব একটা ভালোবাসতে পারে না। তৃতীয়ত, সে যে ধরনের দুষ্টুমী করে সে ধরনের দুষ্টুমি খুব খারাপ ছেলেরাও করতে সাহস পায় না। সন্তু তাই একরকম একা। দু'চারজন সঙ্গী তার আছে বটে, কিন্তু কেউই খুব ঘনিষ্ঠ নয়।

কাল সন্ধেবেলা সন্তু জিমনাসিয়াম থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময়ে কালুর সঙ্গে দেখা। কালুর বয়স বছর ষোলোর বেশি নয়। সন্তুদের ইস্কুলেই পড়ত, পড়া ছেড়ে দিয়ে এখন রিকশা চালায়। তবে রিকশা চালানো ছাড়া তার আরো কারবার আছে। স্টেশনে, বাজারে, লাইনের ধারে সে প্রায়ই চুরি-ছিনতাই করে। কখনো ক্যানিং বা বারুইপুর থেকে চাল নিয়ে এসে কালোবাজারে বেচে। এই বয়সেই সে মদ খায় এবং খুব হুল্লোড়বাজি করে। সন্তুর সঙ্গে তার খুব একটা খাতির কখনো ছিল না। কিন্তু দেখা হলে তারা দুজনে দুজনকে 'কি রে, কেমন আছিস' বলে।

কাল কালু একটু অন্যরকম ছিল। সন্তু ওকে দূর থেকে মুখোমুখি দেখতে পেয়েই বুঝল, কালু মদ খেয়েছে। রিকশায় প্যাডল মেরে গান গাইতে গাইতে আসছে। চোখদুটো চকচকে। সন্তুকে দেখেই রিকশা থামিয়ে বলল—উঠে পড়।

সন্তু ভ্রূ কুঁচকে বলল—কোথায় যাব?

—ওঠ না। তোকে একটা জিনিস দেখাব, এইমাত্র দেখে এলাম।

কৌতূহলী সন্তু উঠে পড়ল। কালু রিকশা ঘুরিয়ে পালবাজার পার হয়ে একজায়গায় নিয়ে গেল তাকে। রিকশার বাতিটা খুলে হাতে নিয়ে বলল—আয়।

তারপর খানিকদূর তারা নির্জন পথহীন জমি ভেঙে রেললাইনে উঠে এল। সেখানে একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তার দাগ। আর একটু দুরেই একটা ছেলে পড়ে আছে।

কালু বলল—এই মার্ডারটা আমার চোখের সামনে হয়েছে।

—ছেলেটা কে?

—চিনি না। তবে মার্ডারটা কে করেছে তা বলতে পারি।

—কে?

কালু খুব ওস্তাদি হেসে বলল—যে পাঁচশো টাকা দেবে তাকে বলব। তোকে বলব কেন?

তিন

সুরেন খাঁড়া আর গগনচাঁদ রেললাইনের ওপর উঠে এল। এ জায়গাটা অন্ধকার। লোকজন এখন আর কেউ নেই। সুরেন খাঁড়া টর্চ জ্বেলে চারিদিকে ফেলে বলল—হল কি! এইখানেই তো ছিল।

গগনচাঁদ ঘামছিল। অপঘাতের মড়া দেখতে তার খুবই অনিচ্ছা। বলতে কি রেলের উঁচু জমিটুকু সে প্রায় চোখ বুজেই পার হয়ে এসেছে। সুরেনের কথা শুনে চোখ খুলে বলল—নেই?

—দেখছি না।

এই কথা বলতেই সামনে অন্ধকার থেকে কে একজন বলল—এই তো একটু আগেই ধাঙড়রা নিয়ে গেছে, পুলিস এসেছিল।

সুরেন টর্চটা ঘুরিয়ে ফেলল মুখের ওপর। লাইনের ধারে পাথরের স্তূপ জড়ো করেছে কুলিরা। লাইন মেরামত হবে। সেই একটা গিটঠি পাথরের স্তূপের ওপর কালু বসে আছে।

সুরেন খাঁড়া বলে—তুই এখানে কি করছিস?

—হাওয়া খাচ্ছি। কালু উদাস উত্তর দেয়।

—কখন নিয়ে গেল?

—একটু আগে। ঘণ্টা দুয়েক হবে।

—পুলিস কিছু বলল? সুরেন জিগ্যেস করে।

ফের টর্চটা জ্বালতেই দেখা গেল, কালুর পা লম্বা হয়ে পাথরের স্তূপ থেকে নেমে এসেছে। ভূতের পায়ের মত, খুব রোগা পা। আর পায়ের পাতার কাছেই একটা দিশি মদের বোতল। আর শালপাতার ঠোঙা।

কালু একটু নড়ে উঠে বলে—পুলিস কিছু বলেনি। পুলিস কখনো কিছু বলে না। কিন্তু আমি সব জানি।

—কি জানিস?

কালু মাতাল গলায় একটু হেসে বলে—সব জানি।

সুরেন খাঁড়া একটু হেসে বলে—হাওয়া খাচ্ছিস, না আর কিছু?

কালু তেমনি নির্বিকার ভাবে বলে—যা পাই খেয়ে নিই। পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই আরাম। জায়গাটা ভরাট রাখা নিয়ে হচ্ছে কথা।

—ইঃ! মস্ত ফিলজফার।

কালু ফের মাতালগলায় হাসে।

—পুলিসকে তুই কিছু বলেছিল? সুরেন জিগ্যেস করে।

—না। আমাকে কিছু তো জিগ্যেস করেনি। বলতে যাব কোন দুঃখে?

—জিগ্যেস করলে কি বলতিস?

—কি জানি।

—শালা মাতাল। সুরেন বলে।

মাথা নেড়ে কালু বলে—জাতে মাতাল হলে কি হয়, তালে ঠিক আছে। সব জানি।

—ছেলেটা কে জানিস?

—আগে জানতাম না। একটু আগে জানতে পারলাম।

—কে?

—বলব কেন? যে ছেলেটাকে খুন করেছে তাকেও জানি।

—খুন! একটু অবাক হয় সুরেন—খুন কি রে? সবাই বলছে, রাতে ট্রেনের ধাক্কায় মরেছে।

মাথা নেড়ে কালু বলে—সন্ধের আগে, এইখানে খুন হয়। আমি নিজের চোখে দেখেছি। মাথায় প্রথমে ডাণ্ডা মারে, তখন ছেলেটা পড়ে যায়। তারপর গলায় কাপড় জড়িয়ে গলা টিপে মারে। আমি দেখেছি।

—কে মারল?

—বলব কেন? পাঁচশো টাকা পেলে বলব।

—পুলিস যখন ধরে নিয়ে গিয়ে পেঁদিয়ে কথা বের করবে তখন কি করবি?

—বলব না। যে খুন করেছে সে যদি পাঁচশো টাকা দেয় তো কিছুতেই বলব না।

—ঠিক জানিস তুই?

—জানাজানি কি! দেখেছি।

—বলবি না?

—না।

গগনচাঁদ এতক্ষণ কথা বলেনি। এইখানে একটা মৃত্যু ঘটেছে, এই ভেবে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। এবার থাকতে না পেরে বলল—খুনের খবর চেপে রাখিস না। তোর বিপদ হবে।

—আমার বিপদ আবার কি! আমি তো কিছু করিনি। কালু বলল।

দেখেছিস তো! সুরেন খাঁড়া বলে।

—দেখলে কি?

—দেখল বলে দিতে হয়। খুনের খবর চাপতে নেই। সুরেন নরম সুরে বলে।

কালু একটা হাই তুলে বলে—তাহলে দেখিনি।

—শালা মাতাল। সুরেন হেসে গগনচাঁদের দিকে তাকায়।

কালু, একটু কর্কশ স্বরে বলে—বার বার মাতাল বলবেন না। সব শালাই মাল টানে। আপনিও টানেন।

সুরেন একটা অস্ফুট শব্দ করল। ইদানীং সে বড় একটা হাঙ্গামা হুজ্জুৎ করে না। কিন্তু এখন হঠাৎ গগনচাঁদ বাধা দেওয়ার আগেই অন্ধকারে দশাসই শরীরটা নিয়ে দুই লাফে এগিয়ে গেল। আলগা নুড়ি পাথর খসে গেল পায়ের তলায়। ঠাস করে একটা প্রচণ্ড চড়ের শব্দ হল। কালু একবার 'আউ' করে চেঁচিয়ে চুপ করে গেল। আলগা পাথরে পা হড়কে সুরেন পড়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে কালুকে দেখা যাচ্ছিল না। তবে সে-ও পড়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছিল। এই সময়ে কাছেই একটা বাজ ফেটে পড়ল। বাতাস এল এলোমেলো। বৃষ্টির ফোঁটা চড়-বড় করে পড়ছে।

সুরেন টর্চটা জ্বালতে গিয়ে দেখে, আলো জ্বলছে না। একটা কাতর শব্দ আসে পাথরের স্তূপের ওধার থেকে। সুরেন একটা মাঝারি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেই শব্দটা লক্ষ্য করে করে ছুঁড়ে মারে। বলে—শালা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

কাতর শব্দটা থেমে যায়।

গগনচাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দ পায় সে। আকাশে চাঁদ বা তারা কিছুই নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। খুব দুর্যোগ আসবে। গ্যারাজঘরের অবস্থাটা কি হবে, ভাবছিল সে। বৃষ্টিতে তার বড় বিপদ।

সুরেন দাঁড়িয়ে নিজের ডানহাতের কনুইটা টিপে টিপে অনুভব করছে।

বলে...শালা, জোর লেগেছে। রক্ত পড়ছে।

আবার বিদ্যুৎ চমকায়। আবার। গগনচাঁদ দেখতে পায়, কালু লাইনের ধারে পড়ে আছে, তার ডানহাতটা রেললাইনের ওপরে পাতা। মুহুর্মুহু গাড়ি যায়। যে-কোনো মুহূর্তে ওর ডান হাতটা দু-ফালা করে বেরিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতেই খুব ক্ষীণ হলুদ একটা আলো এসে পড়ল লাইনের ওপর। বহু দূরে অন্ধকারের কপালে টিপের মতো একটা গোল হলুদ আলো স্থির হয়ে আছে। গাড়ি আসছে।

গগনচাঁদ কিছু ধীর-স্থির। টপ করে কোন কাজ করে ফেলতে পারে না। সময় লাগে। এমন কি ভাবনা-চিন্তাতেও সে বড় ধীর। কখন কি করতে হবে তা বুঝে উঠতে সময় লাগে।

তাই যে গাড়ির আলো দেখল, কালুর কথা ভাবল, কি করতে হবে তাও ভাবল। এভাবে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় কাটিয়ে সে ধীরে-সুস্থে পাথরের স্তূপ পার হয়ে এল। গাড়িটা আর খুব দূরে নেই। সে নীচু হয়ে পাঁজাকোলা করে কালুকে সরিয়ে আনল লাইন থেকে খানিকটা দূরে।

একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তা গেছে লাইন ঘেঁষে। এখানে ঘাসজমি কিছুটা পরিষ্কার। সেখানে শুইয়ে দিল। এবং টের পেল, মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। গাড়ির আলোয় দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টির তোড়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড চারদিকে। সবকিছু অস্পষ্ট। তাপদগ্ধ মাটি ভিজে একরকম তাপ উঠেও চারদিক অন্ধকার করে দিচ্ছে।

সুরেন খাঁড়া বলল—ওর জন্য চিন্তা করতে হবে না। চল।

গগনচাঁদ কালুর বুক দেখল। এত বৃষ্টিতে বুকের ধুকধুকুনিটা বোঝা যায় না। নাড়ি দেখল। নাড়ি চালু আছে।

গগনচাঁদ বৃষ্টির শব্দের ওপর গলা তুলে বলল—জ্ঞান নেই। এ অবস্থায় ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

প্রায় নিঃশব্দে বৈদ্যুতিক ট্রেনটা এল। চলে গেল। আবার দ্বিগুণ অন্ধকারে ডুবে গেল জায়গাটা। সুরেনের খেয়াল হল, গাড়িটা ডাউন লাইন দিয়ে গেল। কালুর হাতটা ছিল আপ লাইনের ওপর। এ গাড়িটায় কালুর হাত কাটা যেত না।

সুরেনের গলায় এখনো রাগ। বলল—পড়ে থাক। অনেকদিন ধরেই শালার খুব বাড় দেখছি। চল, কাকভেজা হয়ে গেলাম।

গগনচাঁদ দেখল, বৃষ্টির জল পড়ায় কালু নড়াচড়া করছে। গগন তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলে—তুমি যাও, স্টেশনের শেডের তলায় দাঁড়াও গিয়ে। আমি আর একটু দেখে যাচ্ছি।

মাটি ফুঁড়ে বৃষ্টির ফোঁটা ঢুকে যাচ্ছে, এত তোড়। কোন মানুষই দাঁড়াতে পারে না, চামড়া ফেটে যায়। সুরেন একটা বজ্রপাতের শব্দের মধ্যে চেঁচিয়ে বলল—দেরি কোর না।

বলে কোলকুঁজো হয়ে দৌড় মারল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির ঝাপটায় কালুর মাথার অন্ধকার কেটে গেছে। গগনচাঁদ অন্ধকারেই তাকে ঠাহর করে বগলের তলায় হাত দিয়ে তুলে বসাল। কালু বসে ফোঁপাচ্ছে।

গগন কালুর মুখ দেখতে পেল না। কেবল অন্ধকারে একটা মানুষের আবছায়া। গগন বলল—ওঠ!

কালু উঠল।

অল্প দূরেই একটা না-হাওয়া বাড়ি। ভারা বাঁধা রয়েছে। একতলায় ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে, এখন দোতলা উঠছে। পিছল পথ বেয়ে কালুকে ধরে সেইখানে নিয়ে এল গগনচাঁদ।

গা মুছবার কিছু নেই। সারা গা বেয়ে জল পড়ছে। গগন গায়ের জামাটা খুলে নিংড়ে নিয়ে মাথা আর মুখ মুছল। কালু উবু হয়ে বসে বমি করছে, একবার তাকিয়ে দেখল গগন। বমি করে নিজেই উঠে গিয়ে বৃষ্টির জল হাত বাড়িয়ে কোষে ধরে মুখে-চোখে ঝাপটা দিল।

তারপর ফের মেঝেয় বসে পড়ে বলল—শরীরে কি কিছু আছে নাকি। মাল খেয়ে আর গাঁজা টেনে সব ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

গগনচাঁদ সে কথায় কান না দিয়ে বলল—তোর রিকশা কোথায়?

—সে আজ মাতু চালাচ্ছে। আমি ছুটি নিয়েছি আজকের দিনটা।

—কেন?

—মনে করেছিলাম আজ পাঁচশো টাকা পাব।

গগন চুপ করে থাকে। কালুটা বোকা। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে।

গগন বলল—যে ছেলেটা খুন হয়েছে সে এখানকার নয়?

কালু হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভেজা গায়ে বসেছিল। প্রথমটায় উত্তর দিল না।

তারপর বলল—বিড়ি-টিড়ি আছে?

কালু ট্যাঁক হাতড়ে বলল—আমার ছিল। কিন্তু সব ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে। ভেজা বিড়ি বের করে কালু অন্ধকারেই টিপে দেখল, ম্যাচিস থেকে এক কোষ জল বেরোল, সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা অস্পষ্ট খিস্তি করে কালু বলে—সুরেন সালার খুব তেল হয়েছে গগনদা। জানলে?

গগন অন্ধকারে কালুর দিকে চাইল। তেল কালুরও হয়েছে। আজকাল সকলেরই খুব তেল।
গগন বলল, ছেলেটা কি এখানকার?
—কেমন ছেলেটা?
—যে খুন হল?
—সে সব বলতে পারব না।
—কেন?
—বলা বারণ। কালু উদাস গলায় বলে।
গগনচাঁদ একটু চুপ করে থেকে একটা মিথ্যে কথা বলল—শোন, একটু আগে সুরেন যখন তোকে মেরেছিল, তখন তুই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলি। তোর ডান হাতটা রেললাইনের ওপর গিয়ে পড়েছিল। আর ঠিক সেই সময়ে গাড়ি আসছিল। আমি তোকে সরিয়ে না আনলে ঠিক তোর হাতটা চলে যেত আজ।
কালু নড়ল না, কেবল বলল—মাইরি!
—তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?
কালু হঠাৎ আবার উদাস হয়ে গিয়ে বলল—তাতে কি হয়েছে? তুমি না সরালে একটা হাত চলে যেত। তা যেত তো যেত। এক আধটা হাত-পা গেলেই কি থাকলেই কি?
গগনচাঁদ একটা রাগ চেপে গিয়ে বলল—দুর ব্যাটা, হাত কাটা হয়ে ঘুরে বেড়াতিস তাহলে। রিকশা চালাত কে?
—চালাতাম না। ভিক্ষে করে খেতাম। ভিক্ষেই ভালো, জানলে, গগনদা। তোমাদের এলাকার রাস্তাঘাট যা তাতে রিকশা টানতে জান বেরিয়ে যায়। পোষায় না। শরীরেও কিছু নেই।
—কথাটা বলবি না তাহলে?
কালু একটু চুপ করে থেকে বলে—বলব, পাঁচটা টাকা দাও।
গগন একটু অবাক হয়ে বলে,—টাকা! টাকা কেন?
—নইলে বলব না।
গগন একটু হেসে বলে,—খুব টাকা চিনেছিস! কিন্তু এটা এমন কিছু খবর নয় রে। পুলিসের কাছে গেলেই জানা যায়।
—তাই যাও না।
গগনের ইচ্ছে হয় এগিয়ে গিয়ে কালুর গলাটা টিপে ধরে। সুরেন যে ওকে মেরেছে সে কথা মনে করে গগন খুশিই হল। বল—টাকা অত সস্তা নয়।
—অনেকের কাছে সস্তা।
গগন মাথা নেড়ে বলে—তা বটে। কিন্তু আমার টাকা দামি।
কালু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—দিও না।
গগন একটু ভেবে বলে—কিন্তু যদি পুলিসকে বলে দিই?
—কি বলবে?
—বলব, খুনটা তুই নিজের চোখে দেখেছিস।
—বলো গে না, কে আটকাচ্ছে!
—পুলিস নিয়ে গিয়ে তোকে বাঁশডলা দেবে।
—দিক। কালু নির্বিকার ভাবে বলে—অত ভয় দেখাচ্ছ কেন? যে মরেছে আর যে মেরেছে তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? যে যার নিজের ধান্দায় কেটে পড় তো। কেবল তখন থেকে খবর বের করার চেষ্টা করছে, তোমাদের এত খতেনে দরকার কি?

গগনচাঁদ ভেবে দেখল, সত্যিই তো। তার তো কিছু যায়-আসে না, কে কাকে খুন করেছে তাতে তার কি! সুরেন খাঁড়া এই ভরসন্ধ্যাবেলা তাকে ভুড়ুং-ভাজুং দিয়ে না আনলে সে মড়া দেখতে আসতও না, তবে ছেলেটা কে খুন করল যে বিষয়ে একটা কৌতূহল ভিতরে ভিতরে রয়ে গেছে বিশেষত যখন শুনেছে যে মরা ছেলেটার শরীরটা কসরৎ করা। ভালো শরীরওলা একটা ছেলে মরে গেছে শুনে মনটা খারাপ লাগে। কত করে একটা শরীর বানাতে হয়। সেই আদরের শরীর কাটা-ছেঁড়া হয়ে পুড়বে, ছাই হয়ে যাবে! ভাবতে কেমন লাগে।

বৃষ্টির তোড়টা কিছু কমেছে। কিন্তু এখনো অবিরল পড়ছে। আধখ্যাঁচড়া বাড়িটার জানলা-দরজার পাল্লা বসেনি, ফাঁকা ফোকরগুলি দিয়ে জলকনা উড়ে আসছে। বাতাস বেজায়। শীত ধরিয়ে দিল। এধার ওধার বিস্তর বালি, নুড়িপাথর স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কিছু লোহার শিকও। একটা লোক ছাতা মাথায়, টর্চ হাতে উঠে এল রাস্তা থেকে। ছাতা বন্ধ করে টর্চটা একবার ঘুরিয়ে ফেলল গগনচাঁদের দিকে, অন্যবার কালুর দিকে। এক হাতে বাজারের থলি। গলাখাঁকারি দিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে ঘরের দরজার টিনের অস্থায়ী ঝাঁপ লাগানো, লোকটা ঝাঁপের তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। চৌকিদার হবে।

কালু উঠে বলল—দেখি লোকটার কাছে একটা বিড়ি পাই কিনা। বড্ড শীত ধরিয়ে দিচ্ছে।

কালু গিয়ে একটু বাদেই ফিরে এল। মুখে জ্বলন্ত বিড়ি। বলল—সুরেন শালা জোর মেরেছে, জানলে গগনদা। চোয়ালের হাড় নড়ে গেছে বিড়ি টানতে গিয়ে টের পেলাম। বসে বসে খায় তো সুরেন, তাই গা-গতরে খাসী, আমাদের মতো রিকশা টানলে গতরে তেল জমতে পারত না।

গগন গম্ভীর ভাবে বলল—হুঁ।

হঠাৎ উবু হয়ে বসে বসে বিড়ি টানতে টানতেই বোধহয় কালুর মেজাজটা ভালো হয়ে গেল। বলল—যে ছেলেটা খুন হয়েছে তাকে তুমি চেনো গগনদা।

গগন বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ভাব-সাব বুঝবার চেষ্টা করছিল। স্টেশনে সুরেন অপেক্ষা করছে। যাওয়া দরকার। কালুর কথা শুনে বলল—চিনি?

—হুঁ।

—কে রে?

—এক বাণ্ডিল বিড়ি কেনার পয়সা দেবে তো? আর একটা ম্যাচিস!

গগন হেসে বলে—খবরটার জন্য দেব না।

—দিও মাইরি। কালু মিনতি করে—আজকের রোজগারটা এমনিতেই গেছে। বিড়ি আর ম্যাচিসও গচ্চা গেল।

গগন দিল।

কালু বলে—ছেলেটা বেগমের ছেলে।

—বেগম কে?

—তোমার বাড়িওয়ালা নরেশ মজুমদারের শালী। নষ্ট মেয়েছেলে, বাপুজী নগরে থাকে।

—ও। বলে খানিকটা চমকে ওঠে গগন।

—ছেলেটা তোমার আখড়ায় ব্যায়াম করত। সবাই ফলি বলে ডাকে। লোকে বলে ও নাকি নরেশ মজুমদারেরই ছেলে।

—জানি। এসব কথা চাপা দেওয়ার জন্যই গগন তাড়াতাড়ি বলে—আর কি জানিস?

—তেমন কিছু না। ছেলেটা বহুকাল হল পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। খুব পাজী বদমাশ ছেলে। ইদানীং ট্যাবলেট বেচতে আসত।

—ট্যাবলেট! অবাক মানে গগন।

—ট্যাবলেট, যা খেলে নেশা হয়। প্রথম প্রথম বিনা পয়সায় খাওয়াত ছেলে-ছোকরাদের। তারপর নেশা জমে উঠলে পয়সা নিত। অনেকের নেশা ধরিয়েছে।

—ড্রাগ নাকি? গগন জিগ্যেস করে।

—কি জানি কি! শুনেছি খুব সাঙ্ঘাতিক নেশা হয়।

গগন বলল—এ পাড়ায় যাতায়াত ছিল তো ওকে কেউ চিনতে পারল না কেন?

কালু হেসে বলল—দিনমানে আসত না। রাতে আসত। তাছাড়া অনেকদিন পাড়া ছেড়ে গেছে, কে আর মনে রাখে! আর চিনলেই বা চিনতে চায় ক'জন বল? সবাই চিনি না চিনি না বলে এগিয়ে যায়। ঝঞ্ঝাট তো!

—নরেশ মজুমদার খবর করেনি?

—কে জানে? জানলে আসত ঠিকই, নিজের সন্তান তো! বোধহয় খুব ভাল করে খবর পায় নি।

বৃষ্টি ধরে এল! এখনো টিপটিপিয়ে পড়ছে। এই টিপটিপানিটা সহজে থামবে না, লাগাতার চলবে। রাতের দিকে ফের ঝেঁপে আসবে হয়তো গগন গলা নামিয়ে বলল—সত্যিই খুন হতে দেখেছিস? নাকি গুল ঝাড়ছিস?

কালু হাতের একটা ঝাপটা মেরে বলে—শুধু শুধু গল্প ফেঁদে লাভ কি। আমার মাথায় অত গল্প খেলে না।

—ছেলেটাকে তুই চিনলি কি করে? গগন জিগ্যেস করে।

—কোন ছেলেটকে?

—যে খুন হয়েছে, ফলি।

—প্রথমটায় চিনতে পারি নি। এক কেৎরে উপুড় হয়ে পড়েছিল, একটু চেনা-চেনা লাগছিল বটে। পুলিস যখন ধাঙড় এনে বডি চিৎ করল তখন চিনতে পারলাম। নামটা অবশ্য ধরতে পারি নি তখনো। পুলিশের একটা লোকই তখন বলল—এ তো ফলি, অ্যাবসকন্ডার। তখন ঝড়াক করে সব মনে পড়ে গেল। ইদানীং নেশা ভাং করে মাথাটাও গেছে আমার, সব মনে রাখতে পারি না।

গগন খুব ভেবে বলল—খুনের ব্যাপারটাও মনে না রাখলে ভালো করতিস। যে খুন করেছে সে যদি টের পায় যে তুই সাক্ষী আছিস তাহলে তোকে ধরবে।

—ধরুক না। তাই তো চাইছি। পাঁচ কানে কথাটা তুলেছি কেন জানো? যাতে খুনির কাছে খবর পৌঁছয়।

—পৌঁছলে কি হবে?

—পাঁচশো টাকা পাব, আর খবরটা চেপে যাব।

—ব্ল্যাকমেল করবি কালু?

কালু হাই তুলে বলে—আমি অত ইংরিজি জানি না।

গগন একটা শ্বাস ফেলে বলে—সাবধানে থাকিস।

কালু বলল—ফলিকে তুমি চিনতে পারলে?

গগন মাথা নেড়ে বলে—চিনেছি। আমার কাছে কিছুদিন ব্যায়াম শিখেছিল। লেগে থাকলে ভাল শরীর হত।

—শরীর! বলে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে কালু। বলে—শরীর দিয়ে কি হয় গগনদা! অতবড় চেহারা নিয়েও তো কিছু করতে পারল না। এক ঘা ডাণ্ডা খেয়ে ঢলে পড়ল। তারপর গলা টিপে...ফুঃ!

গগন টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল। তার মাথার মধ্যে বেগম শব্দটা ঘুরছিল। শোভারাণীর বোন বেগম। খুব সুন্দর না হলেও বেগমের চেহারায় কি যেন একটা আছে যা পুরুষকে টানে। এখন বেগমের বয়স বোধহয় চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু চেহারা এখনো চমৎকার যুবতীর মতো, শোনা যায়, তার স্বামী আছে। কিন্তু সেই স্বামী বড় হাবাগোবা মানুষ। কোন একটা কলেজে ডেমনস্ট্রেটরের চাকরি করে। বেগম তাকে ট্যাঁকে গুজে রাখে। আসলে বেগমের যে একজন স্বামী আছে এ খোঁজই অনেকে পায় না। তার বাইরের ঘরে অনেক ছোকরা ভদ্রলোক এসে সন্ধ্যেবেলায় আড্ডা বসায়, তাস-টাস খেলে, নেশার জিনিসও থাকে। লোকে

বলে, ঐটেই বেগমের আসল ব্যবসা। আড্ডার নলচে আড়াল করে সে ফূর্তির ব্যবসা করে। তা বেগম থাকেও ভালো। দামি জামাকাপড়, মূল্যবান গৃহসজ্জা, চাকর-বাকর দাসদাসী তো আছেই, ইদানীং একটা সেকেন্ড হ্যান্ড বিলিতি গাড়ি হয়েছে।

কয়েকবছর আগে নিঃসন্তান নরেশ আর শোভা বেগমের ছেলেকে পালবে পুষবে বলে নিয়ে আসে। বেগমও আপত্তি করেনি। তার যা ব্যবসা তাতে ছেলেপুলে কাছে থাকলে বড় ব্যাঘাত হয়। তাই ছোট্ট ফলিকে এনে তুলল নরেশ মজুমদার। লোকে বলাবলি করল যে, নরেশ আসলে নিজের ছেলেকেই জায়গা মতো নিয়ে এসেছে। হতেও পারে। বেগমের স্বামীর পৌরুষ সম্পর্কে কারোরই খুব একটা উচ্চধারণা নেই।

ফলিকে এনে নরেশ ভালো ইস্কুলে ভর্তি করে দেয়। ছেলেটার খেলাধুলোর প্রতি টান ছিল, তাই একদিন নরেশ তাকে গগনচাঁদের আখড়াতেও ভর্তি করে দিল। কিছু ছেলে থাকে যাদের শরীরের গঠনটাই চমৎকার। এসব ছেলে অল্প কসরৎ করলেই শরীরের গুপ্ত এবং অপুষ্ট পেশিগুলি বেরিয়ে আসে। নিখুঁত শরীরের খুব অভাব দেশে। গগনচাঁদ তার ব্যায়ামের শিক্ষকতার জীবনে বলতে গেলে এই প্রথম মজবুত হাড় আর সুষম কাঠামোর শরীর পেল। একনজর দেখেই গগনচাঁদ বলে দিয়েছিল—যদি খাটো তো তুমি একদিন মিস্টার ইউনিভার্স হবে।

তা হতও বোধহয় ফলি। কিছুকাল গগনচাঁদ তাকে যোগব্যায়াম আর ফ্রি হ্যান্ড করায়। খুব ভোরে উঠে সে নিজে কেডস আর হাফপ্যান্ট পরে ফলিকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়োত। পুরো চত্বরটা ঘুরে ঘুরে গায়ের ঘাম ঝরাত। তারপর ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর আসন করাত। বিকেলে ফের ফ্রি-হ্যান্ড। ফলি খানিকটা তৈরি হয়ে উঠতেই তাকে অল্প-স্বল্প যন্ত্রপাতি ধরিয়ে দিয়েছিল গগন। খুব কড়া নজর রাখত, যাতে ফলির শরীরের কোন পেশী শক্ত না হয়ে যায়। যাতে বাড় না বন্ধ হয়। ফলি নিজেও খাটত। আশ্চর্যের বিষয়, কসরৎ করা ছেলেদের মাথা মোটা হয়, প্রায়ই বুদ্ধি বা লেখাপড়ার দিকে খাঁকতি থাকে। মনটা হয় শরীরমুখী। ফলির সেরকম ছিল না। সে লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিল। খর বুদ্ধি ছিল তার।

শোভারাণী অবশ্য খুব সন্তুষ্ট ছিল না। প্রায়ই ওপরতলা থেকে তার গলা পাওয়া যেত, নরেশকে বকাবকি করছে—ওই গুণ্ডাটার সঙ্গে থেকে ফলিটা গুণ্ডা তৈরি হবে। কেন তুমি ওকে ওই গুণ্ডার কাছে দিয়েছ?

ফলির শরীর সদ্য তৈরি হয়ে আসছিল। কত আর বয়স হবে তখন, বড়জোর ষোল। বিশাল সুন্দর দেখনসৈ চেহারা নিয়ে পাড়ায় যখন ঘুরে বেড়াত তখন পাঁচজনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখত। আর সেইটেই ফলির কাল হল। সেই বয়সে সে পড়ল মেয়েছেলের পাল্লায়। প্রথমে গার্লস স্কুলের পথে একটি মেয়ে তাকে দেখে প্রেমে পড়ে। সেটার গর্দিশ কাটবার আগেই মুন্সীবাড়ির বড়মেয়ে, যাকে স্বামী নেয় না, বয়সেও যে ফলির চেয়ে অন্তত চৌদ্দ বছরের বড়, সেই মেয়েটা ফলিকে পটিয়ে নিল। সেখানেই শেষ নয়। এ বাড়ির দুটো বউ সে বাড়ির ধুমসী মেয়ে, এ রকম ডজনখানেক মেয়েছেলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ফলি, মাত্র ষোলো-সতেরো বছর বয়সেই। সম্পর্কটা শারীরিক ছিল, কারণ অত মেয়েছেলের সঙ্গে মিশলে মন বলে বস্তু থাকে না, প্রেম ইত্যাদি ভাবপ্রবণতার ব্যাপারকে ফক্কিবাজ বলে মনে হয়।

গগনচাঁদ মেয়েছেলের ব্যাপারে কিছু বিরক্ত ছিল। সে নিজে মেয়েছেলে সঙ্গ পছন্দ করত না। মেয়েছেলে বড় নির্বোধ আর ঝগড়াটে জাত, এ ছিল গগনের ধারণা। এমন নয় যে তার কামবোধ বা মেয়েদের প্রতি লোভ নেই। সে সবই ঠিক আছে, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে সারাদিন ধরে মেলামেশা এবং মেয়ে-শরীরের অতিরিক্ত সংস্পর্শ তার পছন্দ নয়। উপরন্তু তার কিছু নীতিবোধ এবং ধর্মভয়ও কাজ করে। প্রথমটায় যদিও ফলিকে এ নিয়ে কিছু বলেনি গগন। কিন্তু অবশেষে সেন্ট্রাল রোডের একটি কিশোরী মেয়ে গর্ভবতী হওয়ার পর গগন আর থাকতে পারে নি। মেয়েটার দাদা আর এক প্রেমিক এ নিয়ে খুব তড়পায়। কিন্তু ফলিকে সরাসরি কিছু করার সাধ্য ছিল না। কারণ, ফলির তখন একটা দল হয়েছে, উপরন্তু তার মাসি আর মেসোর টাকার জোর আছে। তাই সেই দাদা আর প্রেমিক দুজনে এসে একদিন গগনকে ধরল। দাদার ইচ্ছে ফলি

মেয়েটিকে বিয়ে করে ঝামেলা মিটিয়ে দিক। আর প্রেমিকটির ইচ্ছে ফলিকে আড়ংধোলাই দেওয়া হোক বা খুন করা হোক বা পুলিসের হাতে দেওয়া হোক।

কিন্তু গগন ফলির অভিভাবক নয়। সে ফলিকে শাসন করার ক্ষমতা রাখে না। সে মাত্র ব্যায়াম-শিক্ষক। তবু ফলিকে ডেকে গগন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। ফলির গগনের প্রতি কিছু আনুগত্য ও ভালবাসা ছিল তখনো কারণ, গগন বাস্তবিক ফলিকে ভালবাসত। আর ভালবাসা জিনিসটা কে না টের পায়? কিন্তু ফলিরও কিছু করার ছিল না। মেয়েছেলেরা তার জন্য পাগল হলে সে কী-ই বা করতে পারে। যত মেয়ে তার সংস্পর্শে আসে সবাইকে তো একার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মাত্র ষোলো-সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করাও কি ঠিক? এসব কথা ফলি খোলসা করেই গগনকে বলেছিল।

গগন বুঝল। এবং সে রাতারাতি ফলিকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

ফলি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যায়। তার ফলে শোভারাণী গগনের শ্রাদ্ধ করল কিছুদিন। তার ধারণা, গগনই ফলিকে গুম করেছে। সেটা সত্যি না হলেও ফলির পালানোর পিছনে গগনের যে হাত ছিল তা মিথ্যে নয়। ফলি চলে যাওয়ায় পাড়া শান্ত হল। সেই কিশোরীটির পেটের বাচ্চা নষ্ট করে দিয়ে লোকলজ্জার ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হল। যে সব মেয়ে বা মহিলা ফলির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তারা কিছু মুষড়ে পড়ল। তবে অনেক স্বামী এবং অভিভাবকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

ফলি কোথায় গিয়েছিল তা কেউ জানে না। তবে সে বেগম অর্থাৎ মায়ের আশ্রয়ে আর যায়নি। কেননা সেখানে গেলেও তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে লোকে বলে যে বেগমের সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখে চলত।

কিন্তু গগন আজ এই ভেবেই খুব বিস্ময় বোধ করছিল যে, ফলির মত বিখ্যাত ছেলের মৃতদেহ দেখেও কেন কেউ সনাক্ত করতে পারল না। ঠিক কথা যে, ফলি বহুদিন হল এ এলাকা ছেড়ে গেছে, তবু তাকে না চিনবার কথা নয়। বিশেষ করে সুরেন খাঁড়ার তো নয়ই।

রেল লাইন ধরে হেঁটে এসে গগনচাঁদ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠল। প্ল্যাটফর্মটা এখন প্রায় ফাঁকা। বুকিং অফিসের সামনে ফলওলারা ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে সুরেন সিগারেট টানছে। গগন কিছু অবাক হল। সুরেন খাঁড়া বড় একটা ধুমপান করে না।

তাকে দেখেই সুরেন এগিয়ে এসে বলল—কী হল?

গগন কিছু বিস্মিত ভাবেই বলে—তুমি ফলিকে চিনতে পারনি?

—ফলি? কোন ফলি? কার কথা বলছ?

—যে ছেলেটা মারা গেছে। আমাদের নরেশ মজুমদারের শালীর ছেলে।

সুরেন একটু চুপ করে থেকে বলে—বেগমের সেই লুচ্চা ছেলেটা?

—সে-ই। তোমার তো চেনা উচিত ছিল। তাছাড়া তুমি যে বয়স বলেছিলে ফলির বয়স তা নয়। কম করেও উনিশ-কুড়ি বা কিছু বেশিই হতে পারে।

সুরেন গম্ভীর ভাবে বলল—চেনা কি সোজা? এই লম্বা চুল, মস্ত গোঁফ, মস্ত জুলপি। তা ছাড়া বহুকাল আগে দেখেছি, মনে ছিল না। তবে চেনা-চেনা ঠেকেছিল বটে, তাই তো তোমাকে ধরে আনলাম। ও যে ফলি তা জানলে কি করে?

কালুর কাছ থেকে বের করলাম। বিড়ি-দেশলাইয়ের পয়সা দিতে হয়েছে। সুরেন একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বলল—বেটা বেঁচে আছে এখনো? থাপ্পড়টা তাহলে তেমন লাগেনি।

—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। অত জোরে মারা তোমার উচিত হয়নি সুরেন। ওরা সব ম্যালিনিউট্রিশনে ভোগে, জীবনশক্তি কম, বেমক্কা লাগলে হার্টফেল করতে পারে।

রাখো রাখো। বোতল বোতল বাংলা মদ সাফ করে, গাঁজা টেনে, রিকশা চালিয়ে বেঁচে আছে, আমার থাপ্পড়ে মরবে? এত সোজা নাকি। ওদের বেরালের জান।

গগনচাঁদ হেসে বলে—তুমি নিজের থাপ্পড়ের ওজনটা জানো না। সে যাকগে, কালু মরেনি। এখন দিব্যি উঠে বসেছে।

—ভালো, মরলেও ক্ষতি ছিল না।

গগন শুনে হাসল।

দুজনে টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে ফিরতে লাগল। কেউ কোন কথা বলছে না।

চার

সন্তু একবার উঁকি মেরে তার বাবার ঘর দেখল। তার বাবা নানক চৌধুরী ইদানীং দাড়ি রাখছে। বড় পাগল লোক, কখন কি করে ঠিক নেই। এই হয়তো দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল হয়ে গেল। ফের একদিন গিয়ে দাড়ি কামিয়ে, মাথা ন্যাড়া করে চলে এল। তবু নানক চৌধুরীকে নিয়ে কেউ বড় একটা হাসাহাসি করে না। সবাই সমঝে চলে। একে মহা পণ্ডিত লোক। তার ওপর রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

ব্রজ দত্ত নামে মারকুট্টা ছেলেকেও একবার লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল নানক চৌধুরী। কারণ ব্রজ দত্ত পাড়ার একটা পাগলা ল্যাংড়া লোককে ধরে মেরেছিল। সেই পাগলা আর ল্যাংড়া রমণী বোস নাকি বলে বেড়িয়েছিল যে ব্রজ দত্ত আর সাঙাৎরা একরকম নেশা করে, তা মদের নয় কিন্তু মদের চেয়েও ঢের বেশি সাঙ্ঘাতিক।

সন্তু পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে সাবধানে বাবাকে দেখে নেয়। ঘরটা অন্ধকার, কেবল টেবিল-ল্যাম্পের ছোট্ট একটু আলো জ্বলছে, আর নানক চৌধুরীর বড় সড় অন্ধকার ছায়ার শরীরটা ঝুঁকে আছে বইয়ের ওপর। পাড়ায় বোমা ফাটলেও নানক চৌধুরী এসময়ে টের পায় না।

কালু আজ সন্তুর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। কাল রাতে লাশ দেখে ফেরার পথে কালু বলেছিল—জানলি সন্তু, খুনটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু ভয় খাই যদি শালা খুনেটা জানতে পারে যে আমি দেখেছি তো আমাকেও ফুটিয়ে দেবে। তাই তোকে সব বলব, কাল সিংহিদের বাগানে রাত আটটায় থাকবি।

সন্তু বলল—কাল কেন? আজই বল না।

কালু মাথা নেড়ে বলে—আজ নয়। আমি আগে ভেবে টেবে ঠিক করি, মাথাটা ঠান্ডা হোক। আজ মাথাটা গোলমাল লাগছে।

সন্তু বলল—কত টাকা পাবি বললি?

—পাঁচশো। তাতে ক'দিন ফূর্তি করা যাবে। রিক্সা টানতে টানতে গতর ব্যথা। পাঁচশো টাকা পেলে পালবাজারে সব্জীর দোকানও দিতে পারি।

সন্তু ব্ল্যাকমেল ব্যাপারটা বোঝে। সে তাই পরামর্শ দিল—পাঁচশো কেন? তুই একহাজারও চাইতে পারিস।

—দেবে না।

—দেবে। খুনের কেস হলে আরো বেশি চাওয়া যায়।

—দুর! কালু ঠোঁট উলটে বলে—বেশি লোভ করলেই বিপদ। আজকাল আকছার খুন হয়। ক'জনকে ধরছে পুলিস! আমাদের আশেপাশে অনেক খুনি ঘুরে বেড়াচ্ছে ভদ্রলোকের মতো। খুনের কেসকে লোকে ভয় পায় না।

সন্তু কাল রাতে ভালো ঘুমোয়নি। বলতে কি সে কাল থেকে একটু অন্যরকম বোধ করছে। খুন সে কখনো দেখেনি বটে, কিন্তু বইতে খুনের ঘটনা পড়ে আর সিনেমায় খুন দেখে সে ইদানীং খুনের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ বোধ করে। তার ওপর যদি সেই খুনের ঘটনার গোপন তথ্যের সঙ্গে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ে তবে তো কথাই নেই।

রাত আটটা বাজতে চলল। দেয়ালঘড়িতে এখন পৌনে আটটা। এ সময়ে বাড়ির বাইরে বেরোনো খুবই বিপজ্জনক। নানক চৌধুরী, তার বাবা, যাকে সে আড়ালে নানকু বলে উল্লেখ করে, সে যদি টের পায় তো একতরফা হাত চালাবে। নানক চৌধুরী ব্যায়ামবীর বা গুণ্ডা-ষণ্ডাকে ভয় পায় না, তা ছেলের গায়ে হাত তুলতে তার আটকাবে কেন?

তবু যেতেই হবে। সেই ভয়ঙ্কর গুপ্ত খবরটা কালু তাকে দিয়ে যাবে আজ।

সন্তু রবারসোলের জুতো পরে আর একটা দুই সেল-এর টর্চবাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সিংহিদের বাড়ির বাগান ভাল জায়গা নয়। পোড়োবাড়ির মতো পড়ে আছে। সেখানে প্রচুর সাপখোপের আড্ডা।

মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। আজ মাস্টারমশাইয়ের আসার দিন নয়। কাজেই সন্তু পড়ার ঘরের বাতিটা জ্বেলে একটা বই খুলে রেখে বেরিয়ে পড়ল। মা যদি আসে তো ভাববে ছেলে পড়তে পড়তে উঠে বাথরুম বা ছাদে গেছে।

খুব তাড়াতাড়ি সন্তু রাস্তা পার হয়ে খানিক দূর চলে আসে। সিংহিদের পাঁচিলটা কোথাও কোথাও ভাঙা। একটা ভাঙা জায়গা পেয়ে সন্তু অনায়াসে পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোয়। কালু এসে গেছে। কিনা দেখবার জন্য এধার-ওধার টর্চের আলো ফেলে। কোথাও কাউকে দেখা যায় না।

শিরীষগাছের তলায় এসে সন্তু দাঁড়ায়। দুবার মুখে আঙুল পুরে সিটি বাজিয়ে অপেক্ষা করে। না, কালু এখানো আসে নি। বরং খবর পেয়ে মশারা আসতে শুরু করেছে ঝাঁক বেঁধে। হাঁটু, হাত, ঘাড় সব চুলকোনিতে জ্বালা ধরে যায়। সন্তু দুচারটে চড়চাপড় মেরে বসে গা চুলকোয়। কালু এখনো আসছে না।

চারদিক ভয়ঙ্কর নির্জন আর নিস্তব্ধ। ওই প্রকাণ্ড পুরোনো আর ভাঙা বাড়িটায় সন্তু গুণ্ডাকে ফাঁসি দিয়েছিল। এই বাড়িতেই মরেছে সিংহবুড়ো। তার ওপর গতকাল দেখা লাশটার কথাও মনে পড়ে তার। ছেলেটার বয়স বেশি নয়, একটা বেশ ভাল জামা ছিল গায়ে, আর একটা ভালো প্যান্ট। ছেলেটার চুল লম্বা ছিল, বড় জুলপি আর গোঁফ ছিল। ওইরকম বড় চুল আর জুলপি রাখার সাধ সন্তুর খুব হয়। কিন্তু তার বাবা নানক চৌধুরী সন্তুকে মাসান্তে একবার পপুলার সেলুনে ঘুরিয়ে আনে। সেখানকার চেনা নাপিত মাথা ক্রু-কাট করে দেয়।

সন্তুর যে ভয় করছিল তা নয়। তবে একটু ছমছমে ভাব। কি যেন একটা ঘটবে, কি যেন একটা হবে। ঠিক বুঝতে পারছে না সন্তু, তবে মনে হচ্ছে অলক্ষ্যে কে যেন একটা দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি আস্তে করে দো-বোমার পলতেয় ধরিয়ে দিচ্ছে। এক্ষুনি জোর শব্দে একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হবে।

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা শব্দ ওঠে। সন্তু শিউরে উঠল। অবিকল নীলমাধবের সেই সড়ালে কুকুরটা যেমন জাঙ্গল ভেঙে ধেয়ে আসত ঠিক তেমন শব্দ। সন্তুর হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল। আকাশে মেঘ চেপে আছে। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্তু কেবল প্যান্টের পকেট থেকে তার ছোট্ট ছুরিটা বের করে হাতে ধরে রইল। যেদিক থেকে শব্দ আসছে সেদিকে মুখ করে মাটিতে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল সে। হাত-পা ঠান্ডা মেরে আসছে, বুক কাঁপছে, তবু খুব ভয় সন্তু পায় না। পালানোর চিন্তাও সে করে না।

একটু বাদেই সে ছোট্ট কেরোসিনের ল্যাম্পের আলো দেখতে পায়। রিক্সার বাতি হাতে কালু আসছে। কিন্তু আসছে ঠিক বলা যায় না। কালু বাতিটা হাতে করে ভয়ঙ্কর টলতে টলতে এদিক-ওদিক পা ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ মাতাল।

সন্তু টর্চটা জ্বেলে বলে—কালু, এদিকে।

—কোন শালা রে! কালু চেঁচাল।

—আমি সন্তু।

—কোন সন্তু? বলে খুব খারাপ একটা খিস্তি দিল কালু।

সন্তু এগিয়ে গিয়ে কালুর হাত ধরে বলে—আস্তে। চেঁচালে লোক জেনে যাবে।

কালু বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলে—ওঃ, সন্তু!

—হ্যাঁ।

—আয়। বলে কালু তার হাত ধরে টানতে টানতে পোড়োবাড়ির বারান্দায় গিয়ে ওঠে। তারপর সটান মেঝেতে পড়ে গিয়ে বলে—আজ বেদম খেয়েছি মাইরি! নেশায় চোখ ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সন্তু পাশে বসে বলে—কি বলবি বলেছিলি?

—কি বলব? কালু ধমকে উঠে।

—বলেছিলি বলবি। সেই খুনের ব্যাপারটা।

—কোন খুন? ফলির?

—হ্যাঁ।

কালু হা-হা করে হেসে বলে—আমি পাঁচশো টাকা পেয়ে গেছি সন্তু, আর বলা যাবে না।

—কে দিল?

—যে খুনি সে।

—লোকটা কে?

কালু ঝড়াক করে উঠে বসে বলে—তোকে বলব কেন?

—বলবি না?

—না। পাঁচশো টাকা কি ইয়ার্কি মারতে নিয়েছি?

সন্তু খুব হতাশ হয়ে বলল—তুই বলেছিলি বলবি।

কালু মাথা নেড়ে বলে—পাঁচশো নগদ টাকা পেয়ে আজ অ্যাতো মাল খেয়েছি। আরো অনেক আছে, পালবাজারে সব্জীর দোকান দেব, নয়তো লন্ড্রি খুলব। দেখবি?

বলে কালু তার জামার পকেট থেকে এক তাড়া দশটাকার নোট বের করে দেখায়। বলে—গোন তো, কত আছে। আমি বেহেড আছি এখন।

সন্তু গুণল। বাস্তবিক এখনো চারশো পঁচাশি টাকা আছে।

বলল—খুনি তোকে কিছু বলল না?

—না। কী বলবে। বলল—কাউকে বলবি না তাহলে তোকেও শেষ করে ফেলব।

—পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল?

কালু মাছি তাড়ানোর ভঙ্গী করে বলে—দুর পাঁচশো। দরকার মতো ফের ঝেঁকে নেব। সবে তো শুরু।

সন্তু খুব উত্তেজিত হয়ে বলে—ব্ল্যাকমেল?

কালু চোখ ছোট করে বলে—আমি শালা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, আর তোমরা সব ভদ্রলোক, না?

—ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার নয় রে। ব্ল্যাকমেল।

—আমি ইংরিজি জানি না ভেবেছিস? রামগঙ্গা স্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিলাম, ভুলে যাস না।

সন্তু এতক্ষণে হাসল। বলল—ব্ল্যাকমেল হল...

—চুপ শালা! ফের কথা বলেছিস কি....বলে কালু লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

সন্তু কালুর হঠাৎ রাগ কেন বুঝতে না পেরে এক পা পেছিয়ে তেজি ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে বলল—এর আগে খিস্তি করেছিস, কিছু বলিনি। ফের গরম খাবি তো মুশকিল হবে।

কালু তার বাতিটা তুলে সন্তুর মুখের ওপর ফেলার চেষ্টা করে বলল—আহা চাঁদু! গরম কে খাচ্ছে শুনি! বলে ফের একটা নোংরা নর্দমার খিস্তি দেয়।

সন্তুর হাত-পা নিস-পিস করে। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে ছুরিটা টেনে বের করে আনে সে। বেশি বড় না হলেও, বোতাম টিপলে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি একটা ধারালো ফলা বেরিয়ে আসে। সন্তুর এখনো পর্যন্ত এটা কোন কাজে লাগেনি।

ফলাটা কেরোসিনের বাতিতেও লক-লক করে উঠল।

সন্তু বলল—দেব শালা ভরে?

—দিবি! কালু উঠে দাঁড়িয়ে পেটের ওপর থেকে জামাটা তুলে বলল—দে না। বলে জিব ভেঙিয়ে দু-হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অশ্রাব্য গালাগাল দিতে থাকে।

সন্তুর মাথাটা গোলমেলে লাগছিল। গতবার সে একটা গুণ্ডা বেরালকে ফাঁসি দিয়েছিল। শরীরের ভিতরটা আনচান করে ওঠে। সে একটা ঝটকায় কালুকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর উঠে বসে। তারপর সম্পূর্ণ অজান্তে ছুরিটা তোলে খুব উঁচুতে। তারপর বিদ্যুৎবেগে হাতটা নেমে আসতে থাকে।

কালু কি কৌশল করল কে জানে। এক লহমায় সে শরীরের একটা মোচড় দিয়ে পাশ ফিরল। তারপর দুষ্টু ঘোড়া যেমন ঝাঁকি মেরে সওয়ারী ফেলে দেয় তেমনি সন্তুকে ঝেড়ে ফেলে দিল মেঝের ওপর। পাঁচ ইঞ্চি ফলাটা শানে লেগে ঠকাৎ করে পড়ে গেল।

কালু একটু দূরে গিয়ে ফের পড়ল। তারপর সব ভুলে ওয়াক তুলে বমি করল বারান্দা থেকে গলা বার করে।

বিস্মিত সন্তু বসে রইল হাঁ করে। সর্বনাশ! আর একটু হলেই সে কালুকে খুন করত। ভেবেই ভয়ঙ্কর ভয় হল সন্তুর।

কালু বমি করে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসল বারান্দার থামে হেলান দিয়ে। মাথা লট-পট করছে। অনেকক্ষণ দম নিয়ে পরে বলল—ছুরি চমকেছিস শালা! তুই মারবি?

সন্তু আস্তে করে বলে—তুই খিস্তি দিলি কেন?

কালুর কেরোসিনের বাতিটা এখনো মেঝের ওপর জ্বলছে। সেই আলোতে দেখা গেল, কালু হাসছে। একটা হাই তুলে বলে—ওসব আমার মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে যায়। কিন্তু গাল দিলে কি গায়ে কারো ফোস্কা পড়ে? আমাকেও তো কত লোকে রোজ দু'বেলা গাল দেয়। তা বলে গগনদার মতো খুন করতে হবে নাকি!

সন্তু বিদ্যুৎ-স্পর্শে চমকে উঠল। গগনদা!

তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—তোকে টাকাটা কে দিয়েছে কালু?

—বলব কেন?

—আমি জানি। গগনদা।

—দুর বে।

—গগনদা খুন করেছে?

কালু মুখটা বেঁকিয়ে বলে—কোন শালা বলেছে?

—তুইই তো বললি।

—কখন? নাঃ, আমি বলিনি।

সন্তু হেসে বলে—দাঁড়া, সবাইকে বলে দেব।

—কি বলবি?

—গগনদা তোকে টাকা দিয়েছে। গগনদা খুনি।

কালু প্রকাণ্ড একটা ঢেঁকুর তুলে বুকটা চেপে ধরে বলে—টাকা। হ্যাঁ টাকা গগনদা দিয়েছে। তবে গগনদা খুন করে নি।

সন্তু হেসে টর্চটা নিয়ে পিছু ফিরল। ধীরে-সুস্থে পাঁচিলটা ডিঙিয়ে এল সে।

পাঁচ

অন্ধকার জিমনাসিয়ামে গগনচাঁদ বসে আছে। একা। অথর্বের মতো।

কিছুক্ষণ সে মেঘচাপা আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। আকাশের রং রক্তবর্ণ।

কলকাতার আকাশে মেঘ থাকলে এরকমই দেখায় রাত্রিবেলা।

এখন রাত অনেক। বোধহয় এগারোটা। কাল রাতে বৃষ্টির পর গ্যারাজঘরটা জলে থৈ-থৈ করছে। অন্তত ছয়-সাত ইঞ্চি জলে ডুবে আছে মেঝে। জলের ওপর ঘুরঘুরে পোকা ঘুরছে। কেঁচো আর শামুক বাইছে দেওয়ালে। ওরকম ঘরে থাকতে আজ ইচ্ছে করছে না। মনটাও ভালো নেই।

অন্ধকার জিমনাসিয়ামের চারধারে একবার তাকাল গগন। একটা মস্ত টিনের ঘর, চারধারে বেড়া। হাতের টর্চটা একবার জ্বালল। সিলিং থেকে রিং ঝুলছে, অদূরে প্যারালাল বার, টানবার স্প্রিং, রোমান রিং, স্ল্যান্টিং বোর্ড, কত কি! একজন দারোয়ান পাহারা দেয় দামি যন্ত্রপাতি। একটু আগে দারোয়ান এসে ঘুরে দেখে গেছে। মাস্টারজি মাঝে মাঝে এরকম রাতে এসে বসে থাকে, দারোয়ান তা জানে। তাই গগনকে দেখে অবাক হয় নি। জিমনাসিয়ামের ছোট্ট উঠোনটার শেষে দারোয়ানের খুপরিতে একটু আগেও আলো জ্বলছিল। এখন সব অন্ধকার হয়ে গেছে। গগনের কাছে চাবি আছে, যাওয়ার সময়ে বন্ধ করে যাবে। কিন্তু ঘরে যেতে ইচ্ছে করে না গগনের। পচা জল, নর্দমার গন্ধ, পোকামাকড়। তবু থাকতে হয়। গ্যারাজঘরটার ভাড়া মোটে ত্রিশ টাকা, ইলেকট্রিকের জন্য আলাদা দিতে হয় না, তবে একটা মাত্র পয়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু নেই। গগনের রোজগার এমন কিছু বেশি নয় যে লাটসাহেবি করবে। এ অঞ্চলে বাড়ি-ভাড়া এখন আগুন। একটা মাত্র ঘর ভাড়া করতে কতবার চেষ্টা করেছে গগন, একশোর নীচে কেউ কথা বলে না। অবশ্য একথাও ঠিক, গগন একটু স্থিতু মানুষ, বেশি নড়াচড়া পছন্দ করে না। গ্যারাজঘরটায় তার মন বসে গেছে। অন্য জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করলে তার মন খারাপ হয়ে যায়। গ্যারাজঘরটায় বেশ আছে সে। শোভারাণী বকাবকি করে, ভাড়াটেদের ক্যাচ ক্যাচ আছে, জলের অসুবিধে আছে, তবু খুব খারাপ লাগে না। কেবল বর্ষাকালটা বড্ড জ্বালায় এসে। তবু বর্ষাবৃষ্টি হোক, নইলে মুরাগাছার জমি বুক ফাটিয়ে ফসল বের করে দেবে না। মানুষের এই এক বিপদ, বর্ষা বৃষ্টি গরম শীত সবই তাকে নিতে হয়, সবকিছুই তার কোন না কোন ভাবে প্রয়োজন। কাউকেই ফেলা যায় না। এই যে এ অঞ্চলে এত মশা, গগন জানে এবং বিশ্বাসও করে যে, এই সব মশার উৎপত্তি এমনি এমনি হয় নি। হয়তো এদেরও প্রকৃতির প্রয়োজন আছে। এই যে সাপখোপ, বোলতা-বিছে, বাঘ-ভালুক—ভালো করে দেখলে বুঝি দেখা যাবে যে এদের কেউ ফেলনা নয়। সকলেই যে যার মতো এই জগতের কাজে লাগে।

গগন উঠে জিমনাসিয়ামের ভিতরে এল। মস্ত মস্ত গোটাকয় আয়না টাঙানো দেয়ালে। অন্ধকারেও সেগুলো একটু চকচক করে ওঠে। গগন টর্চ জ্বেলে আয়না দেখে। গত চার-পাঁচ বছরে এসব আয়না তার কত চেলার প্রতিবিম্ব দেখিয়েছে। কোথায় চলে গেছে সব। আয়না কারো প্রতিচ্ছবি ধরে রাখে না। এই পৃথিবীর মতোই তা নির্মম এবং নিরপেক্ষ। টর্চ জ্বেলে গগন চারদিক দেখে। ওই রিং ধরে একদা ঝুল খেয়ে গ্রেট সার্কেল তৈরি করেছে ফলি। বুকে মস্ত চাঁই পাথর তুলেছে। বীম ব্যালান্স আর প্যারালাল বার-এ চমৎকার কাজ করত ছেলেটা। শরীর তৈরি করে সাজানো শরীরের প্রদর্শনী গগনের তেমন ভাল লাগে না। বরং সে চায় ভালো জিমন্যাস্ট তৈরি করতে, কি মুষ্টিযোদ্ধা, কি যুডো খেলোয়াড়। সে সব দিকে ফলি ছিল অসাধারণ। যেমন শরীর সাজানো ছিল থরে বিথরে মাংসপেশীতে, তেমনি জিমন্যাস্টিকসেও সে ছিল পাকা। ফলিকে কিছুকাল যুডো আর বক্সিংও শিখিয়েছিল গগন। টপাটপ শিখে ফেলত। সেই ফলি কোথায় চলে গেল। ভূতের মতো একা একা গগন জিমন্যাসিয়ামে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে এধার-ওধার দেখে। মেঝেয় বারবেলের চাকা পড়ে আছে কয়েকটা। পায়ের ভাগ দিয়ে একটা চাকা ঠং করে উল্টে ফেলল সে। এক হাতে রিং ধরে একটু ঝুল খেল। প্যারালাল বার-এ উঠে বসে রইল কিছুক্ষণ। ভালো লাগছে না। মনটা আজ ভালো নেই। ফলিকে কে মারল? কেন ফলি ওসব নেশার ব্যবসা করতে গেল?

আজ সন্ধেবেলা ফিরে এসে গ্যারাজঘরে বসে সে অনেকক্ষণ উৎকণ্ঠ থেকেছে। না, শোভারাণীদের ঘর থেকে তেমন কোন সন্দেহজনক শব্দ হয় নি। রাত ন'টায় নরেশও ফিরে এল। স্বাভাবিক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল ওপর থেকে। তার মানে ওরা এখনো ফলির মৃত্যুসংবাদ পায় নি। বড় আশ্বর্য কথা। ফলিকে এখানে সবাই একসময়ে চিনত। তবু তার মৃতদেহ কেন কেউ সনাক্ত করতে পারে নি? কেবলমাত্র পুলিস আর কালু ছাড়া? তাও পুলিশ বলেছে—ফলি অ্যাবসকন্ডার। ফলি ফেরারই বা ছিল কেন?

মাথাটা বড্ড গরম হয়ে ওঠে।

গগনচাঁদের বুদ্ধি খুব তৎপর নয়। খুব দ্রুত ভাবনা-চিন্তা করা তার আসে না। সব সময়ে সে ধীরে চিন্তা করে। কিন্তু যা সে ভাবে তা সবসময়ে একটা নির্দিষ্ট যুক্তি-তর্ক এবং গ্রহণ-বর্জনের পথ ধরে চলে। হুটহাট কিছু ভাবা তার আসে না। গগন বহুকাল ধরে নিরামিষ খায়। সম্ভবত নিরামিষ খেলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কিছু ধীর হয়ে যায়। নিরামিষ খাওয়ার পিছনে আবার গগনের একটা ভাবপ্রবণতাও আছে। ছটফটে জ্যান্ত জীব, জালে বদ্ধ বাঁচার আকুলতা নিয়ে মরে যাওয়া মাছ, কিংবা ডিমের মধ্যে অসহায় ভ্রূণ, এদের খেতে তার বড় মায়া হয়। আরো একটা কারণ হল, আমিষ খেলে মানুষের শরীরের স্বয়ং-উৎপন্ন বিষ টকসিন খুব বেড়ে যায়। টকসিন বাড়লে শরীরে কোন রোগ হলে তা বড় বেশি জখম করে দিয়ে যায় শরীরকে। কেউ কেউ গগনকে বলেছে—নিরামিষ ভোজীরা খুব ধীরগতি-সম্পন্ন, পেটমোটা। গগন তার উত্তরে তৃণভোজী হরিণ বা ঘোড়ার উল্লেখ করেছে, যারা ভীষণ জোরে ছোটে। তাদের পেটও মোটা নয়। নিরামিষ খেয়ে গগনের তাগদ কারো চেয়ে কম নয়। গতিবেগ এখনো বিদ্যুতের মতো। যুডো বা বক্সিং শিখতে যারা আসে তারা জানে গগন কতবড় শিক্ষক। তাও গগন খায় কী? প্রায়দিনই আধসেরটাক ডাল আর সব্জী-সেদ্ধ, কিছু কাঁচা সব্জী, দুচারটে পেয়ারা বা সময়কালে কমলালেবু বা আম, আধ সর দুধ, সয়াবীন, কয়েকদানা ছোলা, বাদাম। তাও বড় বেশি নয়। শরীর আন্দাজে গগনের খাওয়া খুবই কম। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কোনদিনই সে বেশি মাথা ঘামায় না। এই সব মিলিয়ে গগন। ধীরবুদ্ধি, শান্ত, অনুত্তেজিত, কোন নেশাই তার নাই মেয়েমানুষের দোষ নেই, তবে আকর্ষণ থাকতে পারে।

যেমন বেগম। ফলি যখন গগনের কাছে কসরৎ করা শিখত, তখন বহুবার বেগম এসেছে জিমনাসিয়ামে। সে বেড়াতে আসত বোনের বাড়ি, সেই তক্কে জিমনাসিয়ামে ছেলেকে দেখে যেত। তখন ব্যায়ামাগারটাই ছিল বলতে গেলে ফলির বাসস্থান।

গগনের আজও সন্দেহ হয়, শুধু ছেলেকে দেখতেই আসত কিনা বেগম। বরং ছেলেকে দেখার চেয়ে ঢের বেশি চেয়ে দেখত গগনকে। তার তাকানো ছিল কি ভয়ঙ্কর মাদকতায় মাখানো। বড় বড় চোখ, পটে-আঁকা চেহারা, গায়ের রঙ সত্যিকারের রাঙা। রোগা নয়, আবার কোথাও বাড়তি মাংস নেই। কি চমৎকার ফিগার। প্রথমটায় গগনের সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু গগন বিভিন্ন ব্যায়ামকারীদের কাছে ঘুরে ঘুরে নানা জিনিস শেখাচ্ছে, স্যান্ডো গেঞ্জি আর চাপা প্যান্ট পরা তার বিশাল দেহখানা নানা বিভাগে বেঁকেছে, দুলছে, বা ওজন তুলবার সময় থামের মতো দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে—এ সবই বেগম অপলক চোখে দেখছে। বেগমের বয়স বোঝে কার সাধ্য। তাকে ফলির মা বলে মনে হত না, বরং বছর দুতিনের বড় বোন বলে মনে হত। ফলি একদিন বলেছিল—মা চমৎকার সব ব্যায়াম জানে, জানেন গগনদা! এখানো রোজ আসন করে।

বেগম প্রথমে ভাববাচ্যে কথা বলত। সরাসরি নয়, অথচ যেন বাতাসের সঙ্গে কথা বলার মতো করে বলত —কতদিন এখানে চাকরি করা হচ্ছে? কিংবা জিগ্যেস করত—জামাইবাবুর সঙ্গে কারো বুঝি খুব খটাখটি হচ্ছে আজকাল? পরের দিকে বেগম সরাসরি কথা বলত। যেমন একদিন বলল—আপনার বয়স কত বলুন তো?

বিনীত ভাবে গগন জবাব দিল—উনতিরিশ।

—একদম বোঝা যায় না। বিয়ে করেছেন?

—না।

—কেন?

গগন হেসে বলে—খাওয়াব কি? আমারই পেট চলে না।

—অত যার গুণ তার খাওয়ার অভাব!

—তাই তো দেখছি।

—আপনি ম্যাসাজ করতে জানেন?

—জানি।

—তাহলে আপনাকে কাজ দিতে পারি। করবেন?

গগন উদাসভাবে বলল—করতে পারি।

—একটা অ্যাথলেটিক ক্লাব আছে, ফুটবল ক্লাব, খেলোয়াড়দের ম্যাসাজ করতে হবে। ওরা ভাল মাইনে দেয়।

গগন তখন বলল—আমার সময় কোথায়?

খুব হেসে বেগম বলল—তাহলে করবেন বললেন কেন? ওই ক্লাবে গেলে সব ছেড়ে যেতে হবে। হোলটাইম জব। সময়ের অভাব হবে না। আর যদি ছুটকো ছাটকা ম্যাসাজ করতে চান, পক্ষাঘাতের রুগি-টুগী, তাও দিতে পারি।

গগন বলল—ভেবে দেখব।

আসলে গগন ওসব করতে চায় না, সে চায় ছাত্র তৈরি করতে। ভালো শরীরবিদ, জিমন্যাস্ট, বক্সার, যুডো-বিশেষজ্ঞ। সে খেলোয়াড়দের পা বা রুগির গা ম্যাসাজ করতে যাবে কেন?

কিন্তু ওই যে সে ম্যাসাজ জানে ওটাই তার কাল হয়েছিল। কারণ একবার বেগম নাকি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকায়। খবর এল, ম্যাসাজ দরকার। প্রথমে গগন যায়নি। সে কিছু আন্দাজ করেছিল। কিন্তু বেগম ছাড়বে কেন? খবরের পর খবর পাঠাত। বিরক্ত হয়ে একদিন বাপুজি কলোনির বাড়িতে যেতে হয়েছিল গগনকে।

বেগমের পা ধরেই সে বুঝতে পেরেছিল, কিছু হয়নি। বেগমও হেসে বলেছিল—খুব ব্যথা, বুঝলেন!

গগন পা-খানা নেড়ে চেড়ে বলল—কোথায়?

বেগম বলল—সব ব্যথা কি শরীরে? মন বলে কিছু নেই?

তারপর কি হয়েছিল তা আর গগন মনে করতে চায় না। তবে এটুকু বলা যায়, গগনের মেয়েমানুষে আকর্ষণ আছে, লোভ না থাক। বেগমের বেলা সেটুকু বোঝা গিয়েছিল। বলতে গেলে, তার জীবনের প্রথম মেয়েমানুষ ওই বেগম। কিছুকাল খুব ভালো বেসেছিল বেগম তাকে। তারপর যা হয়। ওসব মেয়েদের একজনকে নিয়ে থাকলে চলে না। গগন তো তার ব্যবসার কাজে আসত না। বেগম তাই অন্য সব মানুষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর বেগমের দেহের সুন্দর ও ভয়ঙ্কর স্মৃতি নিয়ে গগন সরে এল একদিন।

আয়নায় কোন প্রতিচ্ছবি থাকে না। পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে, সব মুছে যায়। অবিকল আয়নার মতো।

ফলির কথাই ভাবছিল গগন। ফলি বেঁচে নেই। তার খুব প্রিয় ছাত্র ছিল ফলি। মানুষ হিসেবে ফলি হয়তো ভালো ছিল না, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ছাত্র হিসেবে ফলি ছিল উৎকৃষ্ট। ও-রকম চেলা গগন আর পায়নি।

অন্ধকার জিমনাসিয়ামে প্যারালাল বার-এর ওপর বসে গগনের দু-চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল নেমে এল। বিড়-বিড় করে কি একটু বলল গগন। বোধহয় বলল—দুর শালা জীবনটাই অদ্ভুত।

অনেক রাতে গগন যখন গ্যারাজঘরে ফিরল তখন সে খুব অন্যমনস্ক ছিল নইলে সে লক্ষ্য করত, এত রাতেও পাড়ার রাস্তায় কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে কি যেন আলোচনা করছে। আশপাশের বাড়িগুলোয় আলোও জ্বলছে।

গগন যখন তালা খুলছে তখন একবার টের পেল এ-বাড়ি সে-বাড়ির জানালায় কারা উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখল তাকে। নরেশ মজুমদারের ঘরে স্টিক-লাইট জ্বলছে। এত রাতে ওরকম হওয়ার কথা নয়। রাত প্রায়

বারোটা বাজে। এ-সময় সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোয়। কেবল অদূরে একটা বাড়ির দোতলায় নানক চৌধুরীর ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে।

গগন ঘরে এসে প্রায় কিছুই খেল না। ঠান্ডা দুধটা চুমুক দিয়ে শুয়ে রইল। বাতি নেভাল না। ঘরে জল খেলছে, কোন পোকা-মাকড় রাতবিরেতে বিছানায় উঠে আসে। বর্ষাকালে প্রায় সময়েই সে বাতি জ্বেলে ঘুমোয়। নরেশ মজুমদারের মিটার উঠুক, তার কি?

ঘুম না এলে গগনচাঁদ চেয়ে থাকে। চোখ বুজে মটকা মারা তার স্বভাব নয়। আজও ঘুম এল না, তাই চেয়ে থেকে কত কথা ভাবছিল গগন। ভিতরদিকে গ্যারাজঘরের ছাদের সঙ্গে লাগানো, উঁচুতে একটা চারফুট দরজা আছে ওই দরজাটা সে আসবার পর থেকে বরাবর বন্ধ দেখেছে। সম্ভবত কোনদিন ওই দরজা দিয়ে সহজে গ্যারাজে ঢোকা যাবে বলে ওটা করা হয়েছিল। বৃষ্টি বাদলার দিনে ঘর থেকে নরেশ তার বউ নিয়ে সরাসরি গ্যারাজে আসতে পারত। এখন গ্যারাজে গাড়ি নেই, গগন আছে। তাই দরজাটা কড়াক্কড় করে বন্ধ। প্রায় সময়েই গগন দরজাটা দেখে। হয়তো কখনো ওই দরজা থেকে নেমে আসবার কাঠের সিঁড়ি ছিল। আজ তা নেই। গুপ্ত সুড়ঙ্গের মতো দরজাটাই আছে কেবল। রহস্যময়।

আশ্চর্য এই, আজ দরজাটার দিকে তাকিয়ে গগন দরজাটার কথাই ভাবছিল ঠিক ওই সময়ে হঠাৎ খুব পুরোনো একটা ছিটকিনি খোলার কষ্টকর শব্দ হল। তারপরই কে যেন হুড়কো খুলছে বলে মনে হল। সিলিংয়ের দরজাটা বার দুই কেঁপে উঠল।

ভয়ঙ্কর চমকে গেল গগনচাঁদ। বহুকাল এমন চমকায়নি। সে শোয়া অবস্থা থেকে ঝট করে উঠে বসল। প্রবল বিস্ময়ে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

তাকে আরো ভয়ঙ্কর চমকে দিয়ে দরজার পাল্লাটা আস্তে খুলে গেল। আর চারফুট সেই দরজার ফ্রেমে দেখা গেল, শোভারাণী একটা পাঁচ ব্যাটারির মস্ত টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

গগন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। অবাক চোখে চেয়ে ছিল। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। চোখ বড়।

শোভারাণী সামান্য হাঁফাচ্ছিল। বেগমের বোন বলে ওকে একদম মনে হয় না। শোভা কালো, মোটা, বেঁটে। মুখশ্রী হয়তো কোনদিন কমনীয় ছিল, এখন পুরু চর্বিতে সব গোল হয়ে গেছে।

শোভারাণী ঝুঁকে বলল—এই এলেন?

—হুঁ। বলে বটে গগন, কিন্তু সে ধাতস্থ হয়নি।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

—বাইরে। ঘোরের মধ্যে উত্তর দেয় গগন। ওরা কি তবে ফলির খবরটা পেয়েছে! তাই হবে। নইলে এত রাতে গুপ্ত দরজা দিয়ে শোভা আসত না। শোভারাণীর মুখে অবশ্য কোন শোকের চিহ্ন নেই। বরং একটা উদ্বেগ ও আকুলতার ভাব আছে।

শোভা বলল—লাইনের ধারে যে মারা গেছে কাল সে কে জানেন?

—জানি। একটু ইতস্তত করে গগন বলে।

—সবাই বলছে ফলি। সত্যি নাকি?

লুকিয়ে লাভ নেই। বার্তা পৌঁছে গেছে। গগন তাই মাথা নাড়ল। তারপর কপালে হাত দিল একটু।

—ফলিকে কে দেখেছে?

গগন বলল—পুলিস দেখেছে। আর রিকশাওলা কালু।

—ঠিক দেখেছে? তীব্র চোখে চেয়ে শোভা জিগ্যেস করে।

—তাই তো বলছে। গগন ফের কপালে হাত দেয়।

শোভারাণী ঠোঁট উলটে বলল—আপদ গেছে।

বলেই ঘরে আলো থাকা সত্ত্বেও টর্চটা জ্বেলে আলো ফেলল মেঝেয়। বলল—ঘরে জল ঢোকে দেখছি।

—বর্ষাকালে ঢোকে রোজ। গগন যান্ত্রিক উত্তর দেয়।

—বলেননি তো কখনো!
গগন আস্তে করে বলে—বলার কি! সবাই জানে।
শোভা মাথা নেড়ে বলে—আমি জানতাম না।
গগন উত্তর দেয় না। শোভার কাছে এত ভদ্র ব্যবহার পেয়ে সে ভীষণ ভালোমানুষ হয়ে যাচ্ছিল।
শোভা টর্চটা নিভিয়ে বলল—শুনুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।
গগন উঠে বসে ঊর্ধ্বমুখে যেন কোন স্বর্গীয় দেবীর কথা শুনছে এমন ভাবে উৎকর্ণ হয়ে ভক্তিভরে বসে থাকে। বলে—বলুন।
—কালু একটা গুজব ছড়িয়েছে।
—কি?
—ফলিকে যে খুন করেছে তাকে নাকি ও দেখেছে।
গগন মাথা নেড়ে বলল—জানি।
—কি জানেন?
—কালু ওকথা আমাকেও বলেছে।
—কে খুন করেছে তা বলেনি? শোভা ঝুঁকে খুব আগ্রহভরে জিগ্যেস করে।
গগন মাথা নাড়ে—না। ও পাঁচশো টাকা দাবি করবে খুনির কাছে তাই বলবে না।
শোভা হেসে বলে—সেই পাঁচশো টাকা কালু পেয়ে গেছে।
শোভারাণীর হাসি এবং শোকের অভাব দেখে গগন খুব অবাক হয়। ফলির মৃত্যুতে কি শোভার কিছু যায়-আসেনি! বোনপোটা মরে গেল, তবু কীরকম যেন স্বাভাবিক।
গগন ঠান্ডা গলায় জিগ্যেস করল—কার কাছে পেয়েছে?
শোভা অদ্ভুত একটু হেসে বলল—ও বলছে, টাকা নাকি ওকে আপনি দিয়েছেন!
—আমি? আমি টাকা দিয়েছি? খুব আস্তে গগনের বুদ্ধি কাজ করে। প্রথমটায় সে বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা কি। ভেবে ভেবে জোড়া দিতে লাগল। তাতে সময় গেল খানিক।
শোভা বলল—একটু আগে কালুকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে।
গগন তেমনি দেবী-দর্শনের মতো ঊর্ধ্বমুখ হয়ে নীরব থাকে। বুঝতে সময় লাগে তার। তারপর হঠাৎ বলে—আমি ওকে টাকা দিইনি।
শোভা ঠোঁট ওল্টাল। বলল—ও তো বলছে।
—আর কি বলছে?
শোভা হেসে বলে—খুনির নামটাও বলেছে।
—কে? বলেই গগন বুঝতে পারে তার গলার স্বর তার নিজের ফাঁকা মাথার মধ্যে একটা প্রতিধ্বনি তুলল—কে!
শোভা তীব্র চোখে চেয়ে থেকে বলল—ও আপনার নাম বলছে।
—আমি! আমার নাম! বলে গগন মাথায় হাত দিয়ে বলে—না তো! ও মিথ্যে কথা বলছে।
শোভা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বলল—কালু মদ-গাঁজা খায়। ওর কথা কে বিশ্বাস করে, আহাম্মক ছাড়া! তবে ফলিকে কেউ খুন করে থাকলেও অন্যায় করেনি। আমি তো সেজন্য জোড়াপাঁঠা মানসিক করে রেখেছি।
গগন উত্তর দিতে পারে না। মাথাটা ফাঁকা লাগছে। সে শুধু শোভার দিকে চেয়ে থাকে।
শোভা বলে—শুনুন। যদি ফলিকে কেউ মেরে থাকে তো আমার দুঃখের কিছু নেই। আমার স্বামী কাঁদছেন। তাঁর বোধহয় কাঁদবারই কথা। তিনি ঠিক করেছিলেন আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সব ফলির নামে লিখে দেবেন। উইল নাকি করেও ছিলেন। আমি সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারিনি। ফলির জন্ম ভালো নয়।

গগন উত্তর দিতে পারছিল না। তবু মাথা নাড়ল।

শোভা বলল—আপনি বা যে কেউ ওকে খুন করে থাকলে ভালো কাজই হয়েছে।

পেস্তা নামে যে বাচ্চা মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল সে এখনো আমার কাছে আসে। তার বোধহয় আর বিয়ে হবে না। ফলির গুণকীর্তির কথা কে না জানে! তবু আমার স্বামীকে কিছু বোঝানো যাবে না। তিনি সম্ভবত পুলিস ডেকে আজ রাতেই আপনাকে গ্রেফতার করাবেন।

—আমাকে?

শোভা সামান্য উষ্মার সঙ্গে বলে—ওরকম ভ্যাবলার মতো করছেন কেন? এ সময়ে বুদ্ধি ঠিক না রাখলে ঝামেলায় পড়বেন।

গগন হঠাৎ বলল—কি করব?

শোভারাণী বলল—কি আবার করবেন! পালাবেন।

গগন দিশাহারার মতো বলল—পালাব কেন?

—সেটা বুঝতে আপনার সময় লাগবে। শরীরটাই বড়, বুদ্ধি ভীষণ কম। পুলিসে ধরলে আটক রাখবে, মামলা হবে, সে অনেক ব্যাপার। বরং পালিয়ে গেলে ভাববার সময় পাবেন।

—কোথায় পালাব?

—সেটা যেতে যেতে ভাববেন। এখন খুব বেশি সময় নেই। এইখান দিয়ে উঠে আসতে পারবেন?

গগন হাসল এবার। সে শরীরের কসরতে ওস্তাদ লোক। গ্যারাজঘরের ছাদের দরজায় ওঠা তার কাছে কোন ব্যাপার নয়। মাথা নেড়ে বলল—খুব পারব।

—তাহলে বাতিটা নিভিয়ে উঠে আসুন। এখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় ভালো রাস্তা আছে। কেউ দেখবে না। দেয়াল টপকে ওদিকে ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টের মাঠ দিয়ে গিয়ে বড়রাস্তায় উঠবেন। দেরি করবেন না। উঠে আসুন।

গগন বাতি নিভিয়ে দেয়। শোভা টর্চ জ্বেলে রাখে। গগন পোশাক পরে নেয়। দুটো একটা টুকিটাকি দরকারি জিনিস ভরে নেয় ঝোলা ব্যাগে। তারপর হাতের ভর দিয়ে দরজায় উঠে পড়ে।

শোভা টর্চ জ্বেলে আগে আগে পথ দেখিয়ে দেয়। মেথরের আসবার রাস্তায় এলে শোভারাণী তাকে বলে—এই রাস্তা দিয়ে চলে যান। টাকা লাগবে?

গগন মাথা নাড়ে—না।

শোভা হেসে বলে—লাগবে। সদ্য-সদ্য পাঁচশো টাকা বেরিয়ে গেছে, এখন তো হাত খালি।

গগন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে তাকায়।

আর শোভারাণী সেই মুহূর্তে তাকে প্রথম স্পর্শ করে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার প্যান্টের পকেটে বোধহয় কিছু টাকাই গুঁজে দেয়। খুব নরম স্বরে বলে—বেগম খারাপ। আমি খারাপ নই। আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি খুন করেছেন। এখন যান। গ্যারেজঘরের ভিতটা আমি উঁচু করে দেব। সময়মত ফিরে এসে দেখবেন ঘরটা অনেক ভাল হয়ে গেছে। আর জিনিসপত্র যা রইল তা আমি দেখে রাখব। এখন আসুন তো।

গগন মাথা নাড়ে। তারপর আস্তে করে গিয়ে ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টের পাঁচিল টপকায়। মাঠ পেরোয়।

কয়েকটা টর্চবাতি ইতস্তত কাকে যেন খুঁজছে। গগন মাথা নীচু করে এগোয়। একটা বড় গাড়ি এসে থামল কাছেই কোথাও। গগন বাদবাকি পথটুকু দৌড়ে পার হয়ে যায়। ফের পাঁচিল টপকে বড়রাস্তায় পড়ে।

রাতের ফাঁকা রাস্তা। কোথাও কোন যানবাহন নেই। কেবল একটা ট্যাক্সি সওয়ারী খালাস করে ধীরে ফিরে যাচ্ছে। গগন হাত তুলে সেটাকে থামায়। সচরাচর সে ট্যাক্সিতে চড়ে না। পয়সার জন্যও বটে, তাছাড়া বাবুয়ানি তার সয় না। আজ উঠে বসল। কারণ, অবস্থাটা আজ গুরুতর। তাছাড়া শোভারাণীর দেওয়া বেশ কিছু টাকাও আছে পকেটে।

পৃথিবীটাকে ঠিক বুঝতে পারে না গগনচাঁদ। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মেঘলা করে আসে। গ্যারাজঘরে জল ওঠে আধ-হাঁটু। জীবনটা এরকমই। মাঝে মাঝে বিনা কারণে এরকম পালাতে হয়।

অবস্থাটা এখনো ঠিক বুঝতে পারে না গগন। তবু সেজন্য তার চিন্তা হয় না। এখন সে শোভারাণীর কথা ভাবে। ভাবতে বেশ ভালো লাগছে তার।

চরিত্র

লিফট অনেকক্ষণ ধরে নীচে নামছে। নামছেই। অন্তহীন নীচে গড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে থামে, ঘটাং করে দরজা খোলে, কিছু লোক নামে, কিছু ওঠে। ঘটাং করে দরজা বন্ধ হয়। তারপর আবার ঝম করে নীচে পড়ে যেতে থাকে। যতবার এরকম হয় ততবার গানুর মাথাটা ঝিম ঝিম করে, শরীরের ওজনটা যেন হঠাৎ হালকা হয়ে যায়, গা গুলিয়ে ওঠে।

একটা কিছু ধরে দাঁড়াতে পারলে বেশ হত। মাথাটা ঘুরছে। চারদিকে গম্ভীরমুখো সব সম্ভ্রান্ত মানুষ দাঁড়িয়ে। লিফটম্যানটার মুখখানা পর্যন্ত থমথমে। মেঘ-করা মুখ নিয়ে দাঁড়ানো এইসব মানুষের মধ্যে গানু অস্বস্তি বোধ করে। হাত বাড়িয়ে লিফটের দেয়ালে ভর রাখে সে।

লিফট আবার নামতে থাকে। গানু প্রতিবারই ভাবে, এবার বোধহয় গ্রাউন্ড ফ্লোর। কিন্তু না, গ্রাউন্ড ফ্লোর হলে সবাই নেমে যেত। নামল মাত্র দুজন, আরো চারজন উঠল। গানু দাঁড়িয়ে থাকে। ধৈর্য থাকছে না।

মেজদা হরিণকুমারকে অফিসেও পাওয়া গেল না। শীতের বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। ভোর রাতে বুড়োকর্তা মারা গেছেন, এ খবরটা কিছুতেই হরিণকুমারকে পৌঁছে দেওয়া গেল না এখন অবধি। আর একটা রাত কেটে যাওয়ার আগেই বুড়োকর্তার মুখাগ্নিটা হওয়া দরকার।

সেই ভোর থেকে এতক্ষণ অবধি গানু কিছু খায় নি। হরিণকুমার সকাল সাড়ে আটটায় অফিসে বেরিয়ে যায়। বালিগঞ্জ স্টেশনে যখন ট্রেন থেকে নামল গানু, তখনই আটটা চল্লিশ। স্টেশনের কাছেই এক দোকান থেকে মেজদার বাড়িতে ফোন করল।

ফোন ধরেছিল মেজদার ছোট মেয়ে গয়না। বছর তেরো বয়স হবে, বেশ ফিগারটি হয়েছে এখন তার। পড়াশুনোয়, নাচে গানে, ইংরিজি বলায় চৌখস মেয়ে। মেজদার তিনটে মেয়েই এরকম।

গয়না বলল—কে?

—আমি গানু। গড়িয়ার গানু।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। কি চাই?

—বুড়োকর্তা ভোর রাতে মারা গেছেন, মেজদাকে খবরটা দেওয়া দরকার।

—ওঃ! বলে গয়না বুঝি একটু থমকাল, তারপর বলল—বাপি তো বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা দাঁড়ান, মাকে ডাকছি—

এই বলে ফোন রেখে গয়না একটু দূরে গিয়ে তার মাকে ডাকল। ফোনে ক্ষীণ হলেও স্পষ্টই গানু শুনতে পেল, গয়না বলছে—মা, গানুকাকা ফোন করছে। দাদু মারা গেছে, বাবাকে খবর দিতে হবে। গয়নার মা বুঝি ঘরে এল। একটু বিরক্ত গলায় বলল—গানুকাকা আবার কি! কাকা-টাকা ডাকবে না কখনো। শুধু গানু বললেই তো হয়। কি বলছে, শ্বশুরঠাকুর মারা গেছেন? কখন?

—তুমিই জিগ্যেস কর না।

একটু বাদে মেজবউদি ফোন ধরল—কি হয়েছে?

—বুড়োকর্তা নেই। গানু বলল।

—উনি অফিসে গেছেন। মেজবৌদি যেন একটু বিরক্ত গলায় বলে—

গানু অবাক হয় না। বুড়োকর্তার মৃত্যুতে এদের কারো খুব দুঃখ হওয়ার কথা নয়। বরং কেউ কেউ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

মেজবউদি জিগ্যেস করে—কখন মারা গেলেন?

—ভোর রাতে। এই ধরুন, সাড়ে চারটে কি পাঁচটা হবে তখন।

—তাহলে তো আরো সকালে খবর দিতে পারতে তোমরা। এত দেরি হল কেন?

—আমি বাসায় ছিলাম না। মাঝ রাতে বুড়োকর্তার বুকে ব্যথা ওঠে। মাসিমা মালিশ টালিশ করে দেন। আমি বারুইপুর থেকে আজ সকালে ফিরে এসে খবর শুনেই চলে এলাম।

—আমরা আর কি করব? বরং ওঁকে খবর দাও তোমরা।

গানু বলল—মেজবউদি, আপনি যদি মেজদার অফিসে একটা ফোন করেন তাহলে ভাল হয়। আমি তো নম্বর জানি না।

ফোনের কাছাকাছি দুচারজন জুটে গেছে বোধহয়। মেজবউদি কথা বলার আগেই দু'একটা গলা জিগ্যেস করল—কি হয়েছে, দাদু মারা গেছে নাকি? মেজবউদি বলল—শুনছি তো তাই। এখন আবার অশৌচ-টশৌচের ঝামেলা।

এই বলে মেজবউদি ফের গানুকে বলল—শোন গানু, উনি তো অফিসে বেশিক্ষণ থাকেন না, সাইটে বেরিয়ে যান। তাছাড়া আজই উনি পাটনা যাচ্ছেন অফিসের কাজে। স্যুটকেস গুছিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। অফিস থেকেই সোজা গিয়ে গাড়ি ধরবেন। আমি একবার রিং করে দেখব। তোমার যদি সময় হয় তো তুমিও একবার বরং অফিসে গিয়ে দেখা কর। না হলে আর খবর দেওয়া যাবে না।

গানু উদ্বেগের গলায় বলে ওঠে—তাই কি হয় বউদি? খবর দিতেই হবে, নইলে মুখাগ্নি করবে কে? বামুনের মড়া তো পড়ে থাকতে পারে না এমনি!

মেজবউদি আরো একটু বিরক্ত হয়ে বলে—এসব ঝামেলায় আবার ওঁকে টানা কেন? ওঁর শরীরও তেমন ভালো না। গত সপ্তাহেই হার্ট ট্রাবলের কথা বলছিলেন। তোমরা নিজেরাই একটা ব্যবস্থা করে নিলে তো পার।

গানু বলল—তা হয় না। ছেলে থাকতে অন্যে কেন মুখাগ্নি করবে? মেজদাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। গাড়ি করে সোজা চলে যাবেন।

মেজবউদি বলে—গাড়ি করে কোথায় যাবে? স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে আর তো বাড়ির রাস্তা নেই। তারপর মাইল তিনেক হাঁটা।

গানু মিইয়ে গিয়ে বলে—এক মাইল।

মেজবউদি বলল—যাবেন কি যাবেন না সে উনি বুঝবেন। খবরটা দেওয়ার ভার দিচ্ছি। পারলে তুমিও যাও ওঁর অফিসে।

এই বলে ফোন কেটে দিল বউদি।

বারুইপুরের বিক্রম হাজরা শেষতক বাগানের দরটা বাড়িয়ে দিল। তিন মাস আগে বায়না নিয়ে রেখেছে তিন হাজার টাকার। কথা ছিল হাজার পনেরো পেলে বাগানটা ছাড়বে। সুপুরি, নারকোল, আম, কাঁঠাল, মিলে বছরে হেসে খেলে হাজার চারেক টাকা মুনাফা হবে, গানুর আন্দাজ ছিল। পুরো টাকাটার জোগাড় হচ্ছিল না কিছুতেই। এই ফাঁকে অন্য পার্টি এসে আরো দশ হাজার কবুল করেছে। বিক্রম এখন আড় হয়ে বসে আছে—না ভাই, পঁচিশ হাজারের কমে তো নয়ই, বরং আরো কিছুদিন চেপে বসে থাকলে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার দর উঠে যাবে।

এই নিয়ে কাল বিক্রম হাজরার সঙ্গে প্রথমে বচসা তারপর হাতাহাতির উপক্রম। হাতাহাতি হলে অবশ্য বিক্রমকে জমি ধরে নিতে হত, কারণ কে না জানে গানুর মতো গুণ্ডা লোক বিস্তর জল ঘোলা করতে পারে। কিন্তু তাতে বিপদ ছিল, বাগানটার আশা গানুকে ছাড়তে হত। তাই গানু রাগ টাগ চেপে রেখে বিক্রমের সঙ্গে ফের ভাব করে ফেলল। সেই ভাব করতে গিয়ে রাত নিশুতি হয়ে আবার ফর্সা হতে চলল। কাল রাতে গানুর ফেরাই হলনা। আজ সকালের প্রথম ট্রেন ধরে ফিরেছে। মাঝ রাত থেকে খিদে পেয়েছিল, এখন সেই খিদে মাথায় চক্কর মারছে।

কিন্তু কিছু খেয়ে নিতে রুচি হচ্ছিল না গানুর। তাছাড়া, সময়ও নেই। হরিণকুমার পাটনায় কেটে পড়লে বড় বিপদ। এক ভাঁড় চা একটা দোকানের মুখে দাঁড়িয়ে সপাসপ চুমুকে খেয়ে নিয়েই গানু চৌরঙ্গীর ট্রাম ধরেছে। যেদিন তাড়া থাকে সেদিনই যত রকমের দেরি হয়।

আজও হল। ট্রামটা ল্যান্সডাউনের মোড়ে থেমে গিয়ে আর নড়ল না। কলকব্জা খারাপ হয়েছে কিছু। যাবে না। সেখানে আধঘণ্টা সময় নষ্ট। ফের বাস ধরে আসতে আসতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল। হরিণকুমারের মস্ত উঁচু অফিসবাড়ির তলায় লিফটে লাইন পড়েছে। সেই লাইনে দাঁড়াতে হল আরো পনেরো মিনিট। লিফট সব তলায় থামতে থামতে তেরোতলায় যখন উঠল তখন গানু ধৈর্যের শেষ সীমায়।

রিসেপশনিস্ট-কাম-অপারেটর মেয়েটি বেশ দেখতে। গায়ের ব্লাউজ ফেটে পড়ার জোগাড়, এত স্বাস্থ্য। গোল মুখখানায় একটু বেড়াল-বেড়াল ভাব।

মুখ তুলে বলল—মিস্টার চৌধুরী সাইটে বেরিয়ে গেছেন।

—কোন সাইট?

—কি করে বলব? আমাদের অনেকগুলো সাইটে কাজ হচ্ছে।

হতাশ গানু রিসেপশন ডেস্কে হাতে ভর রেখে বলল—কাইন্ডলি, উনি এলে একটা খবর দেবেন? ওঁর বাবা আজ ভোরে মারা গেছেন। উনি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যান।

মরার কথা শুনে মেয়েটি একবার চোখ তুলে গানুকে দেখে বলল—আপনি কি কেউ হন?

গানু সে কথার উত্তর দিল না। হাসল শুধু।

মেয়েটি আর একটু মন দিয়ে গানুর মস্ত পেশিবহুল চেহারাটা দেখল। গানুর সাজগোজটা খারাপ ছিল না আজ। ফুল হাতা সাদা পুলওভার ভেলভেট কর্ডের খয়েরি রঙা প্যান্ট।

মেয়েটি খবরটা ছোট্ট একটু চিরকুটে নোট করে নিয়ে বেয়ারাকে ঘন্টি মেরে ডেকে বলল—এই স্লিপটা মিস্টার চৌধুরীর স্টেনোকে দিয়ে দাও। খবরটা জরুরি।

ফের গানুর দিকে তাকিয়ে বলল—উনি অফিসে এলে খবর পাবেন। কিন্তু আমার আমার গেস, উনি অফিসে আজ আর আসবেন না।

—কোথায় গেলে ওঁকে পাবো এখন? আজ ওঁর পাটনা যাওয়ার কথা শুনেছি।

—পাটনা! মেয়েটি অবাক হল একটু। তারপর একটু মিষ্টি হাসল ও। মাথা নেড়ে বলল—সরি, আমি ঠিক জানি না। ওঁর স্টেনোর সঙ্গে কথা বলুন না। চলে যান ভিতরে, বাঁ-দিকে থার্ড রুম, দরজায় নেমপ্লেট আছে।

স্টোনো একজন মাঝবয়সি রোগা, ভীতু লোক। গলায় টাই আছে, পরনে স্যুটও। কিন্তু তবু এ লোকটাকে দেখেই মনে হয়, পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে লোকটা খুবই সন্দিহান।

জিগ্যেস করতেই তাড়াতাড়ি বলে ফেলল—আমি তো কিছু জানি না। এইমাত্র ওঁর বাবার মৃত্যুর খবর দিয়ে গেল বেয়ারা। কিন্তু উনি তো কিছু বলে যান নি। কোথায় এখন আমি খবর দিই?

—উনি পাটনা যাচ্ছেন কোন ট্রেনে?

—পাটনা? শুনে যেন লোকটা ভয় পেয়েছে এমন ভাব করল। কণ্ঠমণি বার কয়েক ওঠানামা করল। বলল—সে কথাও আমি জানি না। পাটনা যাওয়ার কথা আমাকে কিছু বলেননি।

—তাহলে?

একজন চমৎকার চেহারার, লম্বা, রোগা মাদ্রাজি অফিসার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়ালেন। হরিণকুমারের চেম্বারের দরজায় দাঁড়িয়ে গানু আর স্টেনোকে কথা বলতে দেখে নিজেই এক পা সরে এসে বলল—হেয়ার ইজ এ গ্রেভ নিউজ ফর চৌধুরী, ইজনট ইট?

—ইয়েস স্যার, স্টেনোর কাঁধ বিনয়ে গলে পড়ল।

গানুর বরাবরই ভয় ডর কম। সাহেবসুবোর সঙ্গে হুট করে কথা বলতে যেমন সবাই ভয় খায়, তার সেরকম নয়। সে ফিরে লোকটার দিকে চেয়ে বলল—স্যার, ক্যান ইউ হেলপ মি টু ফাইন্ড আউট মিস্টার চৌধুরী?

ইংরিজিটা খামোখা বলল গানু। সাহেব দিব্যি বাংলা জানে। মৃদু হেসে বলে—কোথাও গেছে, একটু ওয়েট করুন।

গানু বলল—রিসেপশন থেকে বলল, উনি হয়তো আজ ফিরবেন না। বাড়ির লোক বলছে, আজ উনি পাটনা যাবেন।

—পাটনা?

পাটনার কথায় সবাই অবাক হচ্ছে দেখে গানুর কেমন একটু সন্দেহ হচ্ছে। মেজবউদি তাকে এড়ানোর জন্য বানিয়ে পাটনার কথা বলল না তো!

সাহেব মাথা নেড়ে বলল—আমি ঠিক বলতে পারছি না। তবে পাটনা যাওয়ার কোন প্রোগ্রাম তো ছিল না। এনিওয়ে, আপনি একবার থিয়েটার রোডে গোলমোহর বার-এ খোঁজ করুন। ও ওই বার-এ রোজ যায়! মে বি, দে উইল হেলপ ইউ।

—গেরো। কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল গানুর।

দুই

গয়নার সাতটা বেড়াল আছে। একটার রঙ নিকষ্যি কালো। যখন অন্ধকার ঘরে সেটা চেয়ে থাকে তখন দুটো সবুজ ভূতের চোখ দেখে গা ছমছম করবেই।

সেই কালোটাই গয়নার প্রিয় বেশি। নিখুঁতি কালো এমন বেড়াল খুব কম চোখে পড়ে। আর কারো বাড়িতে এরকমটা দেখেনি গয়না। বেশি যত্নে বেড়ালটার গা তেল চুকচুকে হয়েছে, মোলায়েন লোম, আদুরি আদুরি ভাব। আজকাল 'ম্যাও' করে খুব নরম স্বরে। গলার বকলশটা তার পছন্দ নয়। কিন্তু বেড়ালটাকে কেউ চুরি করতে পারে ভয়ে গয়না তাকে মাঝে মাঝে বেঁধে রাখে, তাই বকলশ খোলে না।

আজ সকাল থেকে কালো বেড়াল টপ বড় বদমাইশি করছে। আধবাটি বরাদ্দের দুধ মেঝেয় ঢেলে ফেলল, দু-একবার জিভ ঠেকিয়ে আর দুধটুকু খেল না। টপ খায়নি বলে আজ গয়নার মন ভালো নেই। তার ওপর সকালে খবর এসেছে, দাদু মারা গেছে গড়িয়ার গ্রামের বাড়িতে।

দাদুর জন্য মন বেশি খারাপ হয়নি। আসলে দাদুকে তেমন ভালো চিনতও না সে। গড়িয়ার বাড়িতে একবার দুর্গাপুজোর সময়ে গিয়েছিল, তখন বাড়িটা বড় ভালো লেগেছিল। সেই একবার। দাদুর বাড়িতে একজন সুন্দর মতো বুড়ি থাকে, সে নাকি গয়নার ঠাকুমা নয়, কিন্তু দাদুর বউ। সেই বুড়ি ভীষণ তেজি, হকে নকে কথা শুনিয়ে দেয় এমন মুখরা। কেউ তাকে দেখতে পারে না। কিন্তু সেই দাদুর বউ বুড়িটাকে খুব খারাপ লাগেনি গয়নার। যখন পুকুরে স্নানে নেমেছিল সে তখন বুড়িটা কোত্থেকে হঠাৎ এসে বলল—এই মেয়েটা পৈঠেয় উঠে আয় তো। তোর গোড়ালিতে বড্ড ময়লা।

ভয় পেয়ে গয়না উঠে এলে বুড়ি একটা ছোবড়া দিয়ে সাবান ঘষে খুব যত্নে তার গোড়ালির ময়লা তুলে দিয়েছিল। দুপুরে উকুনও বেছে দিয়েছিল মাথার। ইস্কুলের বন্ধুদের মাথা থেকে গয়নার চুলে সেবার উকুন

চালান হয়েছিল খুব।

দাদুকে ভালোই মনে আছে। রোগা, লম্বা, খুব সুন্দর দেখতে, ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুল, ঢুলু ঢুলু চোখ, গায়ের রঙে যেন দুধ ফেটে আলতা বেরোবে এমনি ফর্সা। অত বয়সেও নায়ক নায়ক চেহারা। কথা বলেন কম, যখন বলেন তখন সরোদির মতো গম্ভীর সুরের আওয়াজ বেরোয়।

সকালের রান্না করা মাছ মা বললেন ফেলে দিতে। রাঁধুনী মদন অত বোকা নয়, চীনে মাটির ডিনার সেট-এর বাউল ভর্তি মাছ নিয়ে গিয়ে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে ঢেকে রেখেছিল সিঁড়ির নীচে। বাটির ঢাকনার ওপর আস্ত ইট চাপানো।

কে জানবে মাছের কথা! কিন্তু জেনে গেল টপ। দুধ খায়নি সকালে, কিন্তু মাছের গন্ধে কখন গিয়ে সিঁড়ির নীচে ইট সরিয়ে বাটি ভর্তি ভেটকি মাছের মস্ত পিস গাউ-গাউ করে খাচ্ছিল। মদন টের পেয়েছে কিংবা সন্দেহ করেছে। হঠাৎ গিয়ে পড়ে সে একটা লোহার রড দিয়ে দমাস করে এক ঘা বসাল পিঠে।

টপ-এর চিৎকারে গয়না গিয়ে দেখে কী কাণ্ড!

মা মদনকে ডেকে পাঠিয়েছে ড্রয়িং রুমে। কি হচ্ছে সেখানে কে জানে। টপকে কোলে নিয়ে উদাস গয়না বসে আছে জানালার ধারে। চোখে জল। ইস্কুল কলেজে আজ কেউ যায়নি, যাবেও না। দাদু মারা গেছে। কিন্তু দাদুর জন্য নয় এক ফোঁটাও, টপ-এর জন্যই বড্ড বার বার কান্না পায় গয়নার। টপ এখন কোলে ঘুমোচ্ছে।

গয়নার দিদি আয়নার আজ মার্কেটিংয়ে যাওয়ার কথা। আয়না অনেক হাতখরচ পায়। এক তরফা বাবা তো দিচ্ছেই, আর এক তরফা আদায় করে শমীকদার কাছ থেকে। শমীকের সঙ্গে আয়নার প্রেম। শমীকের গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। বছরে না হোক একবার আমেরিকা যাবেই। শোনা যাচ্ছে, বিয়ের পর পাকাপাকিভাবে চলে যাবে।

আয়না ভীষণ চঞ্চল পায়ে ঘরে এসেই বলে—বাঁ-কানের দুলটা দেখেছিস?

রোজ ওর এই এক সমস্যা। বাঁ-কাৎ হয়ে রাতের বেলা শোয় বলে দুল খুলে রাখে। দুল কানে থাকলে বড্ড ফোটে। কিন্তু সকালে ওঠার সময়ে আর দুলটা পরতে মনে থাকে না। যখন খেয়াল হয় তখন বিছানা ঝাড়া তোলা হয়ে গেছে। তাই রোজ খুঁজতে হয়। বিছানা ঝাড়ার শলার ঝাঁটায় লেগে ঘরের কোন কোণে গিয়ে দুলটা পড়ে থাকে, কিংবা বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে থাকে, কিংবা খাটের গদির খাঁজে গিয়ে ঢোকে। রোজই পাওয়া যায়, তবে অনেক খুঁজবার পর।

গয়না বলল—না।

—কোথায় যে গেল।

—রোজই তো হারাচ্ছে। খুঁজে দেখ না।

—ও বাবা, এখন খুঁজতে দেরি হয়ে যাবে। তোর কানের রিং দুটো খুলে দে তো। ও দুটো পরে ঘুরে আসি, ততক্ষণে তুই একটু খুঁজিস।

—কি দিবি তাহলে? রিং কান থেকে খুলতে খুলতেই গয়না প্রশ্ন করে।

—উলি শাড়িটা দিয়ে দেব।

—বেগুনিটা?

—হুঁ।

—দূর। বেগুনিটা না।

—তবে?

—রাণী কালারের জর্জেটটা।

—নিস। আয়না অবহেলাভরে বলে।

গয়না নিজে বেশ সুন্দর, কিন্তু আয়না তার চেয়ে তিন ডবল। দাদু যদি অল্পবয়সে মেয়ে সাজত তাহলে ঠিক এরকম দেখতে হত বোধহয়। একবার সত্যজিৎ রায়ের একটা ছবিতে ওর নামার কথা হয়েছিল। সত্যজিৎবাবু ওর ছবি দেখে ডেকেও পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আয়না ওরকম একজন বিখ্যাত লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে বলে নার্ভাস হয়ে যেতেই পারল না। গয়নার ওসব নার্ভাসনেস নেই। ফিল্মে ডাকে পেলেই এক লাফে চলে যাবে।

—তুই আজ কি কিনবি? গয়না জিগ্যেস করে।

—টুকটাক।

—তোমার টুকটাক জানা আছে।

গয়নার রিং নিয়ে নিজের কানে পরতে পরতে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার ভিতর দিয়ে আয়না গয়নাকে দেখল একটু। বলল—বেশি টাকা নেই। থাকলে আজ একটা একসক্লুসিভ সেট কিনতাম। হালকা গোলাপি শাড়ি, ব্লাউজ, টেপ, ঝুটো গয়না, নেল পালিশ, জুতো। সব এক কালার।

—কোথায় দিচ্ছে রে?

—সে আছে। সব দোকান কি তুই চিনিস? বলে আয়না হাসল।

গয়না বলল—কত?

—বেশি না। হাজার দেড়েকে হয়ে যাবে। কিন্তু আজ অত নেই।

—শমীকদাকে টেলিফোন কর, এক্ষুনি বেয়ারার চেক কেটে দেবে। ভাঙিয়ে নিয়ে যা।

—যাঃ! গত সপ্তাহে পাক্কা দু-হাজার টাকার মার্কেটিং করেছে আমার জন্য।

—কি কিনলি?

—সে অনেক।

—কিনতে ভীষণ ভালো লাগে, না রে।

আয়না রিং পরে আয়নায় মুখখানা দেখল, বলল—ভারী দুল পরতে পরতে কানের লতিতে ব্যথা হয়ে গেছে। এবার একজোড়া হালকা রিং গড়িয়ে নেব তোর মতো।

গয়না বলল—তোর তো গয়নার দিন আসছেই বাবা।

—আঃ হাঃ, এক্ষুনি বিয়ে করতে বয়ে গেছে। বিয়ে হলেই তো চার্ম চলে গেল।

—আজ দুপুরে বাসায় থাকবি না?

আয়না লিপস্টিক লাগাবার জন্য ঠোঁট ফাঁক করে ছিল, প্রথমে উত্তর দিল না। রং লাগানো হলে ঠোঁটে ঠোঁটে ঘষে ঠিকঠাক করে নিয়ে বলল—আজ তো আবার বাড়িতে নিরামিষ। বাইরেই কোথাও খেয়ে নেব। নিরামিষ দু-চোখে দেখতে পারি না।

গয়না চোখ বড় বড় করে বলল—খাবি মাছ-মাংস? দাদু মারা গেছে না?

—বেঁচে ছিল না কি? বেঁচে থাকতেই পাত্তা দিইনি কেউ, মরার পর অত ঘটা করার কি?

—দাদু খুব খারাপ ছিল, না?

—অত শত জানি না বাপু, খারাপ-খারাপ সবাই বলত। সম্পর্কও তো ছিল না। যেই মরেছে অমনি সম্পর্ক ধরে নিরামিষ খাও, শ্রাদ্ধ কর।

—তোকে নাকি খুব ভালোবাসত!

—সে ছেলেবেলায়, তখন আমার জ্ঞানই হয়নি। বড় হয়ে দাদুর সঙ্গে দেখাই হত না, ভালোবাসা-টাসা বুঝব কি করে?

গয়না হঠাৎ বলল—যদি এমন হয় যে, দাদু তোকে অনেক টাকা উইল করে দিয়ে গেছে!

আয়না তার চমৎকার মুখে একটু ঠোঁট ওল্টানো অবহেলার ভঙ্গী করে বলল—দেবে কোত্থেকে, কিছু ছিল নাকি? লোকে গুজব ছড়ায়, দাদুর অনেক টাকা। আমার তো বিশ্বাস হয় না। মা বলে, দাদু সারাজীবন কেবল

টাকা উড়িয়েছে।

—তাহলেও অনেক আছে এখনো।

—থাকুক, তাতে আমাদের কি! যা আছে তা ওই ডাইনিবুড়িটা পাবে।

গয়না বলল—পাবে কেন? সেইদিন হরেণকাকা বলছিল, বুড়ি তো আর দাদুর লিগ্যাল ওয়াইফ নয়, তাই কোন দাবি-দাওয়া করতে পারবে না। বুড়ির আগের স্বামী নাকি বেঁচে আছে।

আয়না বলল—যাঃ, স্বামী বেঁচে নেই। দাদু যখন তার বন্ধুর বউকে নিয়ে পালিয়ে আসে তার অল্প ক'দিন পরই সেই বন্ধু ট্রেনে গলা দিয়ে মরে যায়। তবে ছেলেমেয়েরা আছে।

—দেখতে দারুণ ছিল, না?

—হুঁ।

বলে আয়না তার সাজ শেষ করে শেষ ঝলক নিজেকে আয়নায় দেখে নিচ্ছিল। সেই অবস্থায় বলল—গানু নাকি ফোন করেছিল।

—হ্যাঁ।

—একটা স্কাউন্ড্রেল ওই গানুটা। দেখা হলে এমন হাঁ করে তাকায়!

গয়না হেসে ফেলল। ভীষণ হাসে গয়না, একবার হাসি উঠলে সহজে সামলাতে পারে না! বলল—আর এমন বুক চিতিয়ে হাটে যেন দেশের জন্য সে খুব গর্বিত।

একথায় আয়নাও হাসল। গালে টোল পড়ল, আর অসম্ভব সুন্দর দেখাল তাকে। বলল—যা গুলি বের করা চেহারা। এক নম্বরের খুনি। ক'টা যে মার্ডার করেছে!

গানুকে এ বাড়ির কেউ দেখতে পারে না। সকলের ধারণা, গানু হল বুড়োকর্তার পোষা গুণ্ডা। খুব ছেলেবেলা থেকেই গানু বুড়োকর্তার কাছে মানুষ। তার মা ছিল গড়িয়ার বাড়ির রাঁধুনী বামনী। অল্পবয়সি বিধবা সেই বামনী আর বুড়োকর্তাকে নিয়েও অনেক রসাল গল্প আছে।

গয়না বলল—তোকে ঠিক দাদুর মত দেখতে।

আয়না মাথার চুলে উল্টো চিরুনি চালিয়ে চুল ফাঁপাচ্ছিল, বলল—দাদুর চেহারাটুকুই যা ভালো—বাবা। চেহারা ছাড়া আর কিছু যদি পেতাম তো মুশকিল ছিল।

আয়না বেরিয়ে গেলে গয়না টপকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে ড্রয়িং রুমে এল। মা খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছে, মদন মেঝেয় উবু হয়ে বসে হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। মদন যখন তখন কেঁদে ফেলে।

গয়না ঢুকেই বলল—ঢং!

মা মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে বলল—ওর সতেরো দিনের মাইনের হিসেবটা করে দেখ দেখি। টাকা নিয়ে বিদেয় হয়ে যাক। বড় বাড় বেড়েছে।

মদন তেমনি কাঁদতে লাগল।

গয়না বলল—ওসব ঢংয়ের কান্না কেঁদো না তো মদন। চুরি ধরা পড়লেই কান্না! তা ছাড়া টপের গায়ে তুমি কোন সাহসে হাত তোল শুনি!

তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ময়না। তার বয়স ছ'বছর। দেখতে সে বেশ নাদুস নুদুস, গোলগাল হাত-পা-মুখখানা ঢলঢলে। সে তিন দিন হল জ্বরে ভুগছে। আজ সকালে জ্বর নেই। মুখে একটু খড়ি-ওঠা শুকনো ভাব, মাস খানেক আগে মাথা ন্যাড়া করেছিল, এখন ছেলেদের মতো চুল হয়েছে মাথায়। ফ্রকের ওপর সে একটা বড় শাড়ি গুছিয়ে পরেছে গিন্নিদের মতো। বাঁ-কোলে একটা পুতুল নিয়ে ডান হাতে একটা মগে করে দোতলার ব্যালকনির টবের গাছে জল দিচ্ছে। তার পায়ে পায়ে তিন তিনটে বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে স্লথ পায়ে। রাণী নামের দুষ্টু হলুদ বেড়ালটা তার কাপড় কামড়ে ধরে টান দিচ্ছে মাঝে মাঝে। ময়না বলেছে —আঃ।

ব্যালকনি থেকে অনেক কিছু দেখা যায়! যেমন, আকাশের নীল, দূর দূর বাড়ির ছাদ, গাছের ডগা। উল্টোদিকের বাড়ির জানালা দিয়ে ইন্দ্রাণী তাকে ডাকল—এই ময়না, তোর দাদু নাকি মারা গেছে!

ময়না রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ।

—তোরা যাবি?

—না তো!

ইন্দ্রাণীর দাদু আছে। রোজ ইন্দ্রাণী দাদুর সঙ্গে বেড়াতে যায়। দাদু তাকে পড়ায়, গল্প বলে।

ইন্দ্রাণী বলল—মরলে একটা ওষুধ খাওয়ালেই আবার বেঁচে যায়, দাদু বলেছে জানিস!

—কি ওষুধ রে?

স্বর্ণসিন্দুর। আমার দাদু খায়, তাই তো দাদু মরবে না কোন দিনও। তুই দাদুর জন্য কেঁদেছিস?

—না তো!

—এ মা, কাঁদিস নি?

—কাঁদবো একটু পরে। খুব বুদ্ধি খাটিয়ে ময়না বলল—আমার তো জ্বর হয়েছিল, জ্বর গায়ে কাঁদতে নেই। মা বলেছে।

—তুই আজ ইস্কুলে যাবি?

—না।

—বনানী মিস বকবে দেখিস।

—আমাকে কখনো বকে না।

বেলা বাড়তে থাকে। বাসাটা শান্ত হয়ে আসে। হরিণকুমারের স্ত্রী মধুমালা কয়েকবার ফোন করলেন অফিসে। না, হরিণকুমার অফিসে এসেই বেরিয়ে গেছেন, আর ফেরেন নি। সম্ভাব্য আরো কয়েকটা জায়গায় ফোন করলেন মধুমালা, পেলেন না। তবে সব জায়গাতেই বুড়োকর্তার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দিলেন, হরিণকুমার যেখানেই যাক খবর পাবে।

আয়না বেরিয়ে গেছে, গয়না বাথরুমে ঢুকেছে, ময়না এক বাটি ওটমিল নিয়ে খাওয়ার টেবিলে বসে ঝিয়ের সঙ্গে বক বক করছে, বলছে—জানো, দাদুকে স্বর্ণসিন্দুর খাওয়ালেই আবার বেঁচে যাবে।

আর বেঁচে কাজ নেই। মনে মনে মধুমালা বললেন। এতদিন বাদে একটা স্থায়ী কলঙ্ক গেল। শ্বশুরের জন্য তাঁর মুখ দেখানোর জো ছিল না।

মদন হাতে পায়ে ধরে আবার রান্নার কাজে লেগেছে। মাছ মাংস আজ আর কিছু হবে না। মধুমালা খাওয়ার ঘরে এসে ফ্রিজ খুলে ডীপ ফ্রিজারের ভিতরে স্টিলের ঢাকা বাটি দুটোর দিকে ভ্রু কুঁচকে চেয়ে রইলেন। একটা বাটিতে দু-কেজির ওপরে গলদা চিংড়ি, অন্যটায় কেজি দুয়েক গ্রামফেড ভেড়ার মাংস রাখা আছে। আগামীকাল ময়নার জন্মদিন বলে এসব জোগাড় করে রেখেছেন তিনি। কাল ময়নার প্রায় দশ বারোজন ক্ষুদে বন্ধু আসবে, কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকেও বলা হয়েছে। এখন কি করা উচিত তা বুঝতে পারছেন না। এক হয়, নেমন্তন্ন খারিজ করে সবাইকে টেলিফোনে জানিয়ে দেওয়া, নয়তো শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ চেপে রেখে পার্টিটা হতে দেওয়া। কিন্তু মৃত্যু সংবাদটা চাপা যাবে বলে মনে হয় না। ময়নার মোটে ছ'বছর পূর্ণ হল, পাকা বুদ্ধি নয়, ঠিক বলে দেবে। তখন লজ্জা।

গয়না বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল—মা, পেঁয়াজ খাওয়া যাবে?

মধুমালা বললেন—কি জানি বাবা, অত শত জানি না। নিয়ম তো নয়।

ইস, তাহলে আজ কি দিয়ে যে খাব!

—কেন, ফুলকপি কড়াইশুঁটির স্টু হয়েছে, বাঁধাকপি দিয়ে সর্ষেবাটা দিয়ে ভালো একটা তরকারি হয়েছে, ভেজিটেবল চপ ভেজে দেবে গরম গরম। ছোট আলুর দম আছে, আরো কিছু চাস তো মদনকে বলে করিয়ে নে।

—পেঁয়াজ ভাজা হলে আর কিছু চাই না। পেঁয়াজ তো ভেজিটেবল!

মধুমালা দোনোমোনো করে বলেন—না বাবা, কি দরকার। শেষ-মেষ যদি কোন অমঙ্গল হয়।

—আহা দিদি তো দিব্যি রেস্টুরেন্টে বসে মাছ মাংস খেয়ে আসবে, তার বেলা?

—সে বাইরে খেলে কার কি করার আছে। বাসার মধ্যে কোন অনাচার করা ঠিক হবে না। উনি এসে শুনলে বকবেন।

—আচ্ছা, তবে আচার দিয়ে খাই!

—টনসিলটা বুঝে খেও। ডাক্তার বলেছে সেপটিক টনসিল, অপারেশন ছাড়া ভাল হবে না।

—একদিনে আর কি হবে। বলে গয়না চলে যায়।

মধুমালা ডিপ ফ্রিজারটা আবার খুলে বাটি দুটোর দিকে চেয়ে থাকেন। শীতকাল, ফ্রিজের মধ্যে রয়েছে, তবু এগারো দিন রাখা মুশকিল। অতদিনে হয় পচে যাবে, নয়তো শুকিয়ে যাবে। তার চেয়ে কারো বাসায় পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো।

আবার ভাবলেন, নাকি জন্মদিনটা করব শেষ পর্যন্ত?

তিন

হাসনুহানা দেবী সেই ভোর রাত থেকে কেমন নিস্তব্ধ আছেন। ভোর রাতেই মারা গেলেন শ্যামকুমার রায়চৌধুরী, যাঁর সঙ্গে হাসনুহানা দেবী জীবনের অর্ধেকটা কাটালেন। বিধবা হলেন কিনা তা বুঝতে পারছেন না। জীবনটা বড় বেশি রহস্যময়।

মাঝ রাতে ডাক শুনে জাগলেন। দেখেন, পাশের মানুষটা বুকে একটা বালিশ চেপে ধরে ঝুঁকে বসে আছে। বলল—বড় ব্যথা হাসনু।

ব্যথা একটা ছিলই। হার্টের ব্যামো। হাসনুহানা তাকে আধশোয়া করবেন বলে পিঠের কাছে গোটা চারেক বালিশ উঁচু করে দিলেন। ডাকাডাকি করতে গানুর মা উঠে এল, পুরোনো চাকর রঘুবীর এল। রঘুবীর মালিশের ওস্তাদ লোক। কিন্তু মালিশ শুরু করতে না করতেই শ্যামকুমার কেমনধারা কাৎ হয়ে হয়ে পড়ে যেতে লাগলেন বার বার! যতবার বসানো হয় ততবার ঢলে ঢলে পড়েন।

সে অবস্থা বেশিক্ষণ গেল না। জপ বন্ধ হয়ে বুকে ঘড় ঘড় উঠে গেল। জিভ নেতিয়ে পড়ল বার বার। বামনী দুধেগঙ্গাজলে ফোঁটা ফোঁটা ফেলছিল মুখে। আচমকা তখন হাসনুহানা বুঝতে পারলেন, শ্যামকুমার তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছেন।

হাসনুহানা দেবীর কোলের ওপরেই মাথা রেখে সামান্য একটু কষ্ট ভোগ করে শ্যামকুমার মারা গেলেন। শেষটায় যেন খুব অস্পষ্ট স্বরে এক আধবার বললেন—আমাকে একটু বসাও! দেখি। একটু বসাও, দেখব।

কি দেখতে চেয়েছিলেন তা কে জানে! শরীরটা শক্ত টান হয়ে গেল একসময়ে। তখন রঘুবীর আর বামনী মিলে শ্যামকুমারকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। বিছানায় একা খানিকক্ষণ শূন্যমনে বসে রইলেন হাসনুহানা। বুকের মধ্যে একটা মস্ত পোড়ো বাড়ি খাঁ খাঁ করছে যেন। রেলগাড়ির শব্দ হল একটা। চারিদিকে লোকজন জাগবার আওয়াজ। লণ্ঠনের আলোয় ঘরে নানা ভূতুড়ে ছায়া নাচল।

হাসনুহানার বয়স এখন পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে। ঠিক বয়সের হিসেব জানা নেই। ঠিক তেইশ বছর আগে আর এক সংসার ভাসিয়ে হাসনুহানা শ্যামকুমারের সঙ্গে চলে এসেছিলেন রাঁচী থেকে। তখন হাসনুহানা দুই ছেলেমেয়ের মা, ভালোমানুষ এক ভদ্রলোকের স্ত্রী।

শ্যামকুমার নিজে কোনদিন বাঁধা জীবন পছন্দ করতেন না। দুটো বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরোতেন। শিকারি হিসেবে খুব যে নাম ছিল তা নয়। বরং গজল-ঠুংরি গান গেয়ে আসর মাৎ করার ওস্তাদ ছিলেন। লম্বা

মজবুত চেহারা, গায়ের রঙে দুধ ফেটে আলতা বেরোতো। অমন সুন্দর পুরুষ চোখে দেখা একটা ভাগ্যের কথা। দুটো টানা কবি-চোখ যেন কেবল ভালোবাসতে জন্মেছিল। আর কি হাসির তুফান তুলতেন। সরোদের মতো গভীর সুরের গলায় যখন কথা বলতেন তখন বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করত।

হাসনুহানাও ছিলেন ডাকের সুন্দরী। এই বুড়োবয়সের চেহারাতেও যে বাঁধন রয়েছে, গায়ে যে রঙ, যে মুখশ্রী তা আরও বিশগুণ করলে যা হয়। স্বামী, ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার ছিল ঠিকই, কিন্তু নিজের রূপের কথা ভুলতে পারতেন না কখনো। স্বামী সুন্দর ছিলেন না, তাঁর পৌরুষেরও তেজ ছিল না, ম্যাড়ম্যাড়ে গৃহস্থের ভালোবাসা ছিল মাত্র। শ্যামকুমারকে না দেখলে তাই নিয়ে সুখে দুঃখে জীবন কাটিয়ে দিতেন হাসনুহানা। কিন্তু যেই শ্যামকুমারকে দেখলেন, অমনি মনে হল, জীবনটা কি ভয়ংকর ছোট, কত অল্পের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন তিনি।

শ্যামকুমারের ছেলেমেয়েরা তখনই বেশ বড়সড়। দেখতে কচিটি হলেও শ্যামকুমারের তখনই বেশ বয়স হয়েছে। খুব পান খেতেন, মাংস ভালোবাসতেন, সন্ধের পর একটু মদের নেশা করার অভ্যাস ছিল।

আড়ে-ঠাড়ে তাকাতাকি হত। একটু-আধটু চোরা হাসি। চোখে পাপের ভাব এল। শরীর চনমন করে উঠল। তারপর দুজনেই দড়ি ছিঁড়লেন, খোঁটা ওপড়ালেন।

সোজা আগ্রা। তারপর এলাহাবাদ। শ্যামকুমার কলকাতার ব্যাংক থেকে চেক কেটে টাকা আনতেন। অনেক রকম ব্যবসা ফাঁদলেন বিভিন্ন জায়গায়। এলাহাবাদে বছর পাঁচেক কাটিয়ে রায়পুরে গিয়ে হাজির হলেন। রায়পুরে দু-আড়াই বছর থাকার পর এক চেনা মানুষের মুখে খবর পেলেন, মাস ছয়েক আগে শ্যামকুমারের স্ত্রী গত হয়েছেন।

হাসনুহানা কলকাতার দিকের লোক নন, বিলাসপুরে জন্ম হয়েছিল, চিরকাল বাইরে বাইরে থেকেছেন। কলকাতায় আসার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বউ মরার খবর পেয়ে শ্যামকুমারের কলকাতার ওপর বড় টান গজাল। সেই হাসনুহানা পোড়ামুখ নিয়ে শ্যামকুমারের গড়িয়ার বাড়িতে এসে উঠলেন রাজ্যের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে।

অবশ্য এক দু-মাসের মধ্যেই আত্মীয়-স্বজনরা পার হল। ছেলেমেয়েরাও লজ্জায় ঘেন্নায় চলে গেল। ফাঁকা বাড়িতে তাঁরা দুজন পড়ে থাকেন।

শ্যামকুমারের সঙ্গে জীবন আরম্ভ করার পর থেকেই বাস্তবিক নিজেকে নষ্ট মেয়েমানুষ বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন হাসনুহানা। প্রায়ই ভাবতেন—আমি তো বেশ্যা। এই ধারণাটা খুব পাকা-পোক্ত হয়ে বসল মনের মধ্যে। সন্ধ্যেবেলা দুজনেই মদ খাওয়া শুরু করেছিলেন সেই এলাহাবাদে থাকতে। সেখানেই উড়ো খবর পেলেন, স্বামী মারা গেছেন। ছেলেমেয়েরা এক নিঃসন্তান কাকার হেফাজতে আছে পাটনায়।

স্বামী মরলে হিন্দু মেয়েদের যা যা করতে হয় তার কিছুই হাসনুহানা করতে পারলেন না। তবে মাসখানেক ধরে দেদার মদ খেয়ে অসম্ভব মাতলামী করেছিলেন। শ্যামকুমার বাধা দিতেন না। কেবল বলতেন—দুনিয়ায় কেউ কাউকে কিনে রাখেনি হাসনু। কেবলমাত্র ভালোবাসা দিয়ে কেনা যায়, নইলে কেউ কারো স্বামী-টামী হয় না।

ওই এক জীবনদর্শন ছিল শ্যামকুমারের। কোনো পারিবারিক বন্ধন মানেননি, কোনকালে। কর্তব্যও করেননি তেমন। মেয়েমানুষ দেখলেই ক্ষেপে যেতেন কার্তিক মাসের কুকুরের মতো। একটা মজা ছিল, ঘোর লাল রঙের শাড়ি পরে কোন মেয়েমানুষ সামনে এলেই শ্যামকুমারের মাথা গোলমাল হয়ে যেত। অনেকবার হাসনুহানাকে বলেছেন—আমার সামনে লাল শাড়ি পরে যেন কেউ না আসে। এলে কিন্তু আমার ধর্ম থাকে না।

হাসনুহানার নিজেরও তাই হয়েছিল। শিকারের নাম করে যখন প্রায়ই শ্যামকুমার তাদের রাঁচীর বাসায় গেছেন তখন হাসনুহানার অনেক কটা লাল শাড়ি ছিল। খুব প্রিয় ছিল লাল রং। প্রায়ই পরতেন।

এলাহাবাদ, রায়পুরে শ্যামকুমার কেবল হাসনুহানাকে নিয়েই মজে থাকেননি। অনেককে মজিয়েছেন। প্রায়ই বাইজিবাড়ি যেতেন, ভাড়াটে মেয়েমানুষের কাছে যেতেন। রায়পুরে ঢুলিকামিনও বাদ দেননি। কিন্তু সে-সব নিয়ে হাসনুহানা মাথা ঘামাতেন না। তখন শ্যামকুমারের চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মন নয়। অসম্ভব পাপের কষ্ট পেতেন নিজে।

গড়িয়ার এ-বাড়িতেও শ্যামকুমার কিছু কম আহ্লাদে থাকেননি। পয়সা ছিল, চেহারা ছিল, আর ছিল সমুদ্রের মতো কাম। দু-হাতে লুট করতেন মেয়েমানুষের যৌবন। হিতাহিত জ্ঞান থাকত না।

শোনা যায়, শ্যামকুমার তাঁর বড় ভাই রামকুমারের স্ত্রীকেও নষ্ট করেছিলেন। পরে রামকুমারের স্ত্রী আত্মহত্যা করেন, রামকুমার পাগলের মত হয়ে যান। এমনকী লোকে এও বলে, রাঁধুনি বামনীর ছেলে গানুর বাবাও নাকি আসলে শ্যামকুমার।

সে যা হোক, হাসনুহানা এসব নিয়ে ভাবনা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। মদের নেশা ধরিয়েছিলেন শ্যামকুমার, আসল স্বামী মারা যাওয়ার পর সেই নেশাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এতকাল। ক'বছর আগে হঠাৎ ধর্মে মতি গেল। গুরু ধরলেন। যদিও শ্যামকুমারদের কুলগুরুর কাছেই দীক্ষা নিয়ে জপতপে মজে গিয়েছিলেন কিন্তু আসলে কুলগুরু লোকটার নিজেরই তেমন সাধন ভজনের জোর ছিল না, হাসনুহানার নিষ্ঠা আর ভক্তি দেখে কুলগুরু অধরচন্দ্র ভট্টাচার্য খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে একদিন বলেছিলেন—মা, তুমি কোন সদগুরু ধরো। আমার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা কি আর অতটা আছে। হাসনুহানা সে কথায় কান দেননি। ভট্টাচার্য মশাইকেই বিগ্রহ বানিয়ে নতুন একরকম জপতপের নেশায় মজলেন। তবু কখনোই ঐ একটা বোধ তাঁকে ছাড়েনি—আমি বেশ্যা।

শ্যামকুমারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তিনি তাঁর মতো ছিলেন, হাসনুহানা অন্যরকম হতে পারতেন তো!

সেই শ্যামকুমার নিশুতরাতে বিনা নোটিশে চলে গেলেন।

ভোরবেলা কত লোকজন আসছে যাচ্ছে। বারান্দায় বিছানা পেতে শোয়ানো শ্যামকুমার মৃত্যুর পরও যেন মিয়োনো ফুলের মতো পড়ে আছেন। মুখখানা অল্প হাঁ করা, চোখ দুটো আধখোলা। শেষ যাত্রার আয়োজন চলছে। গানু গেছে শ্যামকুমারের ছেলেকে খবর দিতে, ছেলে এলে মুখাগ্নি হবে।

বেলা পড়ছে। বোকা বামনীটা এলে বলল—মা, এবার একটু সরবৎ টরবৎ কিছু খাও। নয়তো চা করে দিই।

হাসনুহানা অবাক হয়ে বললেন—বলো কি?

গানুর মা তখন মিনমিন করে বলল—বুড়োকর্তার মরণে তোমার কি আর অশৌচ হবে মা? তুমি তো তার তেমন ছিলেনা।

কথাটা কানে লাগল। তবে বোকা বামনী এরকম সব কথা প্রায়ই বলে ফেলে।

হাসনুহানা তাঁর চারদিকে কেবল বার বার চেয়ে দেখেন। কেমন যেন ভয়-ভয় করে। যতদিন শ্যামকুমার ছিলেন ততদিন এই সব বাড়ি ঘর, জমিজমা, টাকা পয়সা সবই হাসনুহানা নিজের মতো ভোগ করেছেন। শ্যামকুমার অভাব রাখতেন না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে এখন সংসারের চেহারা পাল্টে যাবে একেবারে। হাসনুহানা যে শ্যামকুমারের আইনসঙ্গত বউ নয় এ কথা বিশ্বসংসার জানে। সুতরাং, এই সব বিষয় সম্পত্তির কানাকড়ির ওপরেও তাঁর কোন দাবি নেই। ছেলেরা এসে সব দখল নেবে, দূর-দূর করে তাড়াবে হাসনুহানাকে। কুড়ি হাজার টাকার একটা জীবনবীমা আছে শ্যামকুমারের, তার নমিনি হাসনুহানা, হাজার দুই টাকার ডাকঘরের সেভিংস সার্টিফিকেট আছে, সামান্য কিছু নগদ আর গয়নাও আছে। সব মিলিয়ে যা হবে তাতে কি আয়ুর বাকি কটা দিন কাটানো যাবে? শোকের দিনেও হাসনুহানাকে এই নির্মম হিসেবটা করতে হয় মনে মনে। বাকি ক'টা দিন একা একা কাটাতে হবে। এ বাড়ি ছাড়বার নোটিশ এল বলে।

বেঁচে থাকতে শ্যামকুমার বলতেন, আমি যদি আগে মরি তবে তুমি বড় মুশকিলে পড়বে। তার চেয়ে তোমার নামে আলাদা একটা ছোট বাড়ি করে দিই।

হাসনু বলতেন—থাকগে।

তখন গা করতেন না, করলে ভাল হত।

গানু আসেনি, কোন খবরও পাঠায়নি। বুড়োকর্তার লাস পড়ে আছে বারান্দায়।

বেভুল মাথায় হাসনুহানা কয়েকবার ঘর বার করলেন। বিধবা হলেন কিনা তা ঠিক বুঝতে পারছেন না বটে, তবে নিরাশ্রয় যে হলেন সেটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু এখন কোথায় যাবেন, কার আশ্রয়ে থাকবেন সেইটেই সমস্যা। শ্যামকুমারের জন্য একরকমের শোক হচ্ছে বটে কিন্তু তা খুব গভীর নয়। শোকের চেয়েও অনেক বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে সমস্যা।

হাসনুহানার চেহারায় এবং আচার ব্যবহারে কিছু তেজ আছে। সেই কারণে সবাই তাঁকে খানিকটা ভয় খায়। কলঙ্কিত জীবন সত্ত্বেও তাই হাসনুহানা প্রায় সকলের কাছ থেকেই সমীহ আদায় করে এসেছেন এতকাল। কিন্তু চিরদিন তো সমান যায়না।

শ্যামকুমারের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু বরকত আলি আর গুণেন্দ্রনাথ এসেছেন। দুই বুড়োটে মানুষ বাইরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে। দীর্ঘকায়, সুপুরুষ বরকত আলির পরনে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি, গুণবাবু কোঁচাওলা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা। কারো মুখে কথা নেই, একটু তফাতে দাঁড়িয়ে শ্যামকুমারকে দেখলেন।

বারান্দায় এসে হাসনুহানা বামনীকে ডেকে বললেন ওঁদের বসবার জন্য কিছু দাও।

বরকত বললেন—না ভাবি, তার দরকার নেই। সকলকে খবর দেওয়া হয়েছে?

—লোক গেছে।

—কিছু দরকার থাকলে বলবেন।

গুণেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে বারান্দার ধারটিতে বসে একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে বললেন—পরশুও দেখা হল বাজারে। তখনো ছোকরাটির মতো লাগছিল।

গুণেন্দ্রনাথ বড় রোগা ভোগা লোক। গলায় একবার ক্যানসার সন্দেহ করেছিল ডাক্তার। তবু এখনো দিব্যি বেঁচে আছেন। শ্যামকুমারের চেয়ে বয়সে না হোক চার পাঁচ বছরের বড়, তার ওপর বুকের দোষ, হাঁপানি, ব্লাডপ্রেশার নিয়েও আরো কদিন রয়ে গেলেন। বরকত আলির অবশ্য বয়স কিছু কমই হবে। মাথার চুল তেমন পাকেনি, শরীরও মজবুত। বরকত খুবই সংযমী লোক, নিষ্ঠাবান মুসলমান বলে তিনি মদ বা অন্য কিছুর নেশা করেন না, পাঁচবার নামাজ পড়েন, শোনা যায় ইদানীং মাছ-মাংস পেঁয়াজ রসুন খাওয়া ছেড়ে কেবলমাত্র ফলমূল খেয়েই বেশিরভাগ দিন কাটান। এ নিয়ে শ্যামকুমারের সঙ্গে তাঁর তুমুল বচসা হত। বরকত বলতেন—তুমি বাপু, হিন্দু টিন্দু কিছুই নও। ঘোর তমোগুণী।

শ্যামকুমারের জবাব ছিল—ভায়া, সংযম-টংযমের কথা বোলনা, পোষায় না। যতদিন বেঁচে থাকা ততদিন ফূর্তি। তারপর সময় হলে পটাং করে মরে যাব।

বরকত মাথা নেড়ে বলতেন—যারা ওকথা বলে তারা মোটেই বেঁচে নেই। ফূর্তি করতে হলেও আয়ু, মেধা, স্বাস্থ্যের দরকার। বেসিক জিনিস না থাকলে ফূর্তিটা হবে কি নিয়ে?...

নেশা করে শ্যামকুমার প্রায়ই খানা খন্দে পড়তেন। হাত-পা ভেঙেছেন অনেকবার। চোট পেয়ে শয্যা নিলে বরকত এসে বলতেন—খুব ফূর্তি হচ্ছে এখন কি বলো কলির শ্যাম?

শ্যামকুমার মুখ বিকৃত করে জবাব দিতেন—ফূর্তির তত্ত্ব তোমার মাথায় ঢুকবে না। তুমি যাও গিয়ে খেজুর ভিজিয়ে দুধ খাও আর এক'শ বছর ধরে বেঁচে থাকো। ব্যাঙের মত বেঁচে থাকাটাই শিখলে কেবল!

গুণেন্দ্রনাথ অসম্ভব কৃপণ মানুষ। গামছা ছিঁড়লে তা পর্যন্ত সেলাই করে ব্যবহার করেন। কৃপণ গুনবাবুও শ্যামকুমারকে বলতেন—তোমার টাকা খরচের ধরন দেখলে আমার ভয় লাগে। কোন প্রাণে যে ঘরের লক্ষ্মী বিদেয় করেছ তুমিই জানো।

দুই বন্ধুই শ্যামকুমারের মঙ্গল চেয়ে এসেছেন নিজের নিজের মতো করে।

হাসনুহানা ঘরে এলেন। আর তক্ষুনি বোকা বামনীটা এসে পাশের খাওয়ার ঘরে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। সামনে এক কাপ গরম চা ধরে দিয়ে বলল, চুপটি করে খাও তো। যা ঠান্ডাটা পড়েছে আজ!

হাসনুহানা আপত্তি করতে গিয়েও করলেন না। চায়ে চুমুক দিলেন।

বামনী ওধারে মিটসেফ খুলে খুটুর মুটুর কি যেন করতে করতে বলল—মা একটা ভাল কথা বলি। বুড়োকর্তার ছেলেরা হাজির হওয়ার আগে ঘরদোর সব খুঁজে পেতে দেখ। যা পাও নিজের বলে সরিয়ে ফেল। ওরা এসেই তোমাকে তাড়াতে চাইবে। তখন শূন্য হাতে বিপদে না পড়ে যাও।

হাসনুহানা বিরক্ত হয়ে বললেন—ওসব কি কথা? তোমার মাথাটাই গেছে। বামনী একটা শ্বাস ছেড়ে বলল—দাসীর কথা বাসী হলে মিঠে হয়। শোকতাপ দাগা যা পেয়েছো তার জন্য কাঁদার সময় অনেক পাবে, কিন্তু এই সুযোগটা হাতছাড়া কোরো না। আমি বরং সদরে থাকবখন, পাহারা দেবো, তুমি তা করতে বুড়োকর্তার চাবির গোছাটা নিয়ে সব কিছু হাঁটকে মাটকে দেখ।

হাসনুহানা প্রথমটায় রেগে গেলেন। এত সাহস তো বামনীটা কোনকালে পায় নি! এসব আস্পদ্দার কথা ওর আসছে কোত্থেকে? তিনি ধমক দিয়ে বললেন—তুমি এখন বিদেয় হও তো, আমাকে আর বিরক্ত কোরো না।

বামনী সে কথায় কান না দিয়ে নিজের মনেই বলল—ক'দিন আমাকেও নষ্ট করেছিল। ঘেন্নার কথা কি বলব মা, তখন আমি কচি বয়সের বিধবা, এ বাড়িতে ভালো বলে কাজে ঢুকেছিলাম। তুমিও তো সে কথা না জানো এমন নয় মা। গানু হল সেই পাপের ফল। তবে আমি ছাড়িনি বুড়োকে, যা পাওনা গণ্ডা বুঝে আদায় করে নিয়েছি। জাতও দিলাম, পেটও ভরল না, সে বান্দা আমি নই।

হাসনুহানা উঠে চলে এলেন শোওয়ার ঘরে। বামনীর কথাগুলো ভেবে দেখতেও তাঁর ঘেন্না করছিল। তবু কেমন যেন এও মনে হচ্ছিল, দুনিয়া তো এরকমই।

ঠাকুরঘরের মেঝেয় বসে হাসনুহানা এই প্রথম ঢলাঢল কেঁদে ভাসাতে লাগলেন। আর কারো জন্য নয়, নিজের জন্যই।

চার

হরিণকুমার আজ অফিসের গাড়িতে করে অফিসে আসবার সময়ে খুব এক রকম মেজাজে ছিল। একটা উত্তেজক খুশি-খুশি ভাব।

এমন এক একটা দিন আসে যখন মনে হয়, পৃথিবীতে কোন দুঃখ, দৈন্য, বেদনা কিছু নেই। কেবল এক আনন্দের হাওয়ায়, সৌন্দর্যের আলোয় সবকিছু অপরূপ হয়ে ওঠে।

হরিণকুমার স্নান করে খুব সকালে। গীজারে গরম জল তৈরি করে একটু ঠান্ডা মিশিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান সারে। গায়ে একটু অডিকোলোন স্প্রে করে নেয়, তারপর অল্প সুগন্ধী পাউডার ছড়ায় গায়ে। নিখুঁত করে যত্নে কামানো গালে সামান্য ক্রিম ঘষে নেয়। স্যুট পরে যখন প্রমাণ মাপের আয়নার সামনে দাঁড়ায় তখনই নিজেকে নিয়ে এক ভরপুর তৃপ্তিতে তার ভিতরটা ভরে যায়। মাঝারি উচ্চতার স্বাস্থ্যবান চেহারা তার। ছেচল্লিশ বছর বয়সেও একদম যুবকের মতো চেহারা। দুঃখ শুধু মাথার চুল কিছু পাতলা। আর তার দাঁতগুলো ক্ষয়-রোগগ্রস্থ বলে হাসলে তেমন ভালো দেখায় না। সামনের দাঁতগুলো পাতলা হয়ে নীল রং ধরেছে। তুলে ফেলতে হবে।

নিজের সম্বন্ধে সেই তৃপ্ত ভাব নিয়েই হরিণকুমার ব্রেকফাস্ট সারে। খেতে খেতেও নিজের কথাই ভাবে সে। বলতে কি, যখনই অবসর পায় তখনই হরিণকুমার নিজের বিষয়ে ভাবতেই ভালোবাসে।

যে ফার্মে হরিণকুমার চাকরি করে তা খুবই বড়। তার চাকরিটাও বেশ বড়। ইস্টার্ন জোনে যে ক'জন বড় অফিসার আছে তার মধ্যে সে অন্যতম। চাকরিতে তার সুনাম প্রচণ্ড। কিন্তু হরিণকুমার কোথাও স্থির হতে

জানে না। এ পর্যন্ত সে তেরোটা চাকরি করেছে। এটাও বদলানোর ইচ্ছে। দিল্লির এক কোম্পানি আরো হাজার টাকা বেশি দিতে চাইছে, হরিণকুমার তাদের লিখেছে—আরো দু-হাজার বেশি চাই, আর জয়েন করার এক বছরের মধ্যে ডাইরেক্টার হওয়ার নিশ্চয়তা। সে জানে, ওরা এ প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যাবে।

চাকরি নিয়ে হরিণকুমারের কোন ভাবনাই নেই। প্রথমতঃ সে ফার্স্টক্লাস পাওয়া মেকানিক্যাল বি.ই। তার ওপর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, বিলেতের আর অ্যামেরিকার ট্রেনিং তাকে অনেক বেশি দক্ষ আর দামি করে তুলেছে। চাকরি ছাড়লে তার সবসময়েই কিছু না কিছু বাড়তি লাভ হয়।

কাল রাতেই মধুমালাকে পাটনা যাওয়ার নাম করে স্যুটকেস গুছিয়ে রাখতে বলেছিল। এসব বিষয়ে মধুমালা কোন প্রশ্ন করে না। সে জানে, তার স্বামী খুব ব্যস্ত ও গুরুতর মানুষ।

আজ সকালে হালকা ফাইবারের স্যুটকেসটা যখন মদন গাড়িতে তার পাশে তুলে দিয়ে গেল তখন স্যুটকেসটার গায়ে হাত রেখে একটু হেসেছিল হরিণকুমার। জীবনে কত বৈচিত্র্য, কত সৌন্দর্য, কত আনন্দ! আলো আর হাওয়ায় যেন ভেসে যাচ্ছে এক রঙিন প্রজাপতির মতো জীবন।

সামান্য কুয়াশা মাখা সকলের কলকাতারও যেন সৌন্দর্যের শেষ নেই। হরিণকুমারের গা থেকে বিবিধ সুন্দর গন্ধের একটা আবহ বেরিয়ে যেন চারিদিককেই সৌরভে ভরে দিচ্ছিল।

অফিসে এসে সে কয়েকটা জরুরি কাগজে সই করে ভিতু পি-একে ডেকে বলল—নেক্সট দুদিন আমি অ্যাসাইনমেন্টে থাকব। লুক আফটায় এভরিথিং।

ডাইরেক্টারের ঘরে একটা টেলিফোন করল সে—মিস্টার মুর্তি, আই অ্যাম কলিং ইট এ ডে।

—নাউ, নাউ! মূর্তি ভরাট গলায় বলে—এগেইনি অন অ্যান এর‍্যাউণ্ড হারিণ?

—সর্ট অফ।

বলে হরিণকুমার দু-একটা হালকা রসিকতা করে ফোন রেখে দিল। বসে রইল একটু। চোখ বুজে নিজের কথা ভাবল। অ্যাশ ব্লু রঙের একটা কবোষ্ণ নরম স্যুট তার পরণে, সরু টাই ঝুলছে গলায়, দুধগরদের শার্ট আছে গায়ে! কেমন দেখাচ্ছে তাকে? নিশ্চয়ই চমৎকার!

বলতে কি, হরিণকুমার এতটা সুন্দর কোনকালেই ছিল না। একটু চোয়াড়ে, গালচাপা চেহারা ছিল এক সময়ে। ভালো থেকে, সুখে থেকে ক্রমে চেহারায় একধরনের মাখন-মাখন ভাব ভেসে উঠছে।

ন'টা বাজবার অনেক আগেই সে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি নিয়ে। বম্বে এক্সপ্রেস ছাড়বে বেলা প্রায় একটায়। দুটো ফার্স্ট ক্লাস টিকিট করা আছে। কাজেই তাড়া নেই। কিন্তু ভিতরে উত্তেজক আনন্দটাকে সহনশীল করে নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়া দরকার। হরিণকুমার খুব একটা মদ খায় না। আসলে করো কারো শরীরই এমন যে, মদ সহ্য হয় না। হরিণকুমার বিদেশে গিয়ে যখন প্রথম মদ খেতে শেখে তখনই লক্ষ্য করে, মদ খেলেই তার একটা দীর্ঘস্থায়ী মাথা ধরার সৃষ্টি হয়। এমন কি সেই মাথাধরা একটানা দু'দিন তিন দিন ধরেও চলে। তাই মদ্যপানের আনন্দ থেকে নিজেকে দুরেই রাখে সে। খুব তেমন দরকার বা ইচ্ছে না হলে খায় না।

আজ এই সাত সকালে তার মদ খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। অন্য কারণে নয়, কেবল নার্ভগুলোকে একটু শ্লথ করার জন্য। প্রায় ছ'মাস পর আজ সে একটি নতুন মেয়েকে নিয়েই—

এর আগের জন ছিল মঞ্জরী। খারাপ নয়। গোলমোহর রেস্টুরেন্টে স্ট্রিপ করত। অনেকদিন ধরেই গোলমোহরের মালিক জাভেরী তাকে বলে আসছে, হারিণসাহেব, আপনি তো একদম ওয়ান-লেডী ম্যান হয়ে যাচ্ছেন। আর ইউ ইন লাভ উইথ মঞ্জরী?

ঠিক কথাই! তার স্ট্যাটাসের লোকেরা একটা মেয়েকে নিয়ে এত বেশি নাচানাচি করে না। কিন্তু হরিণকুমারের ওই এক স্বভাব, যাকে পায় তাকে নিয়ে একটু বেশিদিন মজে থাকে। অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায় আর কি?

মঞ্জুরীও দু-একবার বলেছে—এবার ছাড়ো তো আমাকে। আমার এখন হাজার রকম এনগেজমেন্ট আসছে। এভাবে তো ঠিক হয় না আমাদের, বোঝো তো!

ঠিকই, দিনের পর দিন একজন পুরুষের দখলে থাকলে ওরও তো ক্ষতি। কয়েকদিন যাবৎ হরিণকুমার তাই নতুন মুখের জন্য চোখ কান খোলা রাখত।

তারপরই গত সপ্তাহে সন্ধেবেলা হানাকে দেখিয়ে দিল ক্লাবের বন্ধু সফিকুল। সুইমিং পুলের ধারে এই শীতে সন্ধেবেলা হানা বেদিং কস্টিউম পরে বসে আছে। হাতে হুইস্কির গেলাস, পাশে একটা বুনো চেহারার যুবক।

হরিণকুমার জিগ্যেস করল—ছোকরাটি কে?

সফিকুল ভ্রূ তুলে বলল—ডোন্ট বি জেলাস অ্যাট দি ফার্স্ট সাইট।

ছোকরাটি একজন স্ট্যান্ডবাই অলমোস্ট নন এনটিটি।

কোন মেয়েকে ভালো করে দেখার আগে তার সঙ্গীকে হরিণকুমার ভাল করে দেখে নেয়। এটা তার অনেক কালের স্বভাব।

দুটো চাপা শিস দিল সফিকুল। মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে দেখে পাশে রাখা একটা তোয়ালের রোব গায়ে জড়িয়ে হাসিমুখে উঠে এল।

মুখোমুখি হানাকে দেখেই হরিণের বুকের ভিতর বাঘ ডেকে ওঠে। ওফ! কুড়ির কিছু এদিক বা ওদিকে বয়সটা বাঁধা। হৃদয়হীন একখানা মুখ—কিন্তু বেড়ালের মতো কমনীয়। শরীরখানা রোবের তলায় সাবলীল মাছের মত সতেজ।

সফিকুল বলল—হানা, মিট হারিণ।

যেই দেখা-হওয়া যেন এক মিষ্টি বজ্রপাত। ভিত নড়ে গেল হরিণকুমারের।

একটা সন্ধ্যা তরতর করে কেটে গেল ক্লাবের নাচ ঘরে, বিলিয়ার্ডসে, ককটেলে, ডিনারে। হরিণের ভয় ছিল, হানা তাকে পছন্দ করবে কিনা।

পরদিন সফিফুল দেখা হতেই বলল—হানা গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে। ওর রেফারেন্স খুব ভাল। সেকেণ্ড গ্রেড লোক ওর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। ইউ আর লাকি।

—অ্যাম আই সেকেন্ড গ্রেড?

সফিকুল উচ্চ হাসি হেসে বলল—আই ডিডনট মিন দ্যাট। আমি হানার ফেবারে কথা বলছিলাম। শী ইজ ও. কে। টেক হার টু দীঘা নেকসট উইক। শি লাভস সুইমিং।

তার পরদিন থেকে ক্লাবে প্রায়ই হানার সঙ্গে দেখা হয়েছে। হানা খুব আপন হয়েছে বটে, কিন্তু কখনো শরীরের ব্যাপারে রাজি হয় নি। ওসব প্রস্তাবের ইংগিত শুনলেই বলে—আই শ্যাল সী ইউ অ্যালোন অন এ লোনলি বীচ।

সেই থেকে হরিণকুমারের ভিতরে ছটফটানী। টুরিস্ট ব্যুরোতে গিয়ে দীঘায় কটেজ বুক করা হয়েছে গত সপ্তাহেই, টিকিট হয়ে আছে। হরিণকুমার এর মধ্যে একটা কলাম ইরেকশনের দারুণ শক্ত কাজ করে ফেলল ধার্য তারিখের আগেই। কোম্পানি খুশি। কাজেই ছুটি পাওয়া শক্ত হল না।

মূর্তি একবার জিগ্যেস করেছিল—গোয়িং উইথ হানা?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হরিণকুমার বলল,—ওঃ, আই অ্যাম কট!

মূর্তি হেসে বলল—আই হ্যাভ হার ওয়ানস অর টুআইস। শি ইজ পারফেক্ট। ওয়েল-ট্রেইন্ড।

শুনে খুশি হল হরিণকুমার। যে কোন ব্যাপারেই সে স্কিল পছন্দ করে। আনাড়িদের নিয়ে বড় সময় নষ্ট। বড্ড বেশি ধকল। বিদেশে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে শরীরের ব্যাপারে অসম্ভব পটু হয়। এই পটুত্বের বড় বেশি অভাব এদেশে। এদেশের মেয়েরা শরীর দেওয়ার সময়ে একদম পুতুল হয়ে থাকে।

কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারে না হরিণকুমার। আই শ্যাল সী ইউ অ্যালোন অন এ লোনলি বীচ। মনে পড়লেই সারা শরীরে রোমহর্ষ হয়, রক্ত নেচে ওঠে, উদভ্রান্ত আনন্দে ভরে যায় জগৎ। গত সপ্তাহ থেকে সে আজকের দিনটার অপেক্ষা করছে। শামুকের গতিতে, বুকে হেঁটে হেঁটে অবশেষে দিনটা এল।

গোলমোহর রেস্টুরেন্টে পৌঁছে হরিণকুমার দেখল, লোকজন নেই। কোণের দিকে কে একটা লোক স্টেটসম্যানে মুখ ঢেকে কফির কাপ নিয়ে বসে আছে। আর দুজন পুরুষ হিপি ডিমের পোচ দিয়ে মেখে টোস্ট খাচ্ছে, তাদের সামনে কালো কফির কাপ। জাভেরী নেই, তার জায়গায় ক্যাশ-এ গুরুবক্স বসে আছে। সে ডাকল—চৌধুরী সাব, মঞ্জরী একটা চিঠি রেখে গেছে।

কাউন্টারে যেতে গুরুবক্স একটা মুখ আঁটা খাম বের করে দিল।

হরিণকুমার এক ছোট পট চায়ের কথা বলে একটা চেয়ারে এসে বসে খামটা অন্যমনস্কভাবে ছিঁড়ল। ভিতরে দুটো পোশাকের বিল, প্রায় পাঁচশো টাকার। সঙ্গে খুব ছোট্ট একটা চিঠি—হরিণ, খিদিরপুরের খুদাবক্স-এর কাছে পোশাকদুটো করিয়েছিলাম। টাকাটা জাভেরীর কাছে রেখে যেও।

হরিণকুমার খুব ধীরে ধীরে এক কাপ চা শেষ করে। হানাকে টেলিফোনে ডেকে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু হানার বাড়ির ঠিকানা বা ফোন নম্বর কিছুই সে জানে না। হানা নিজেকে রহস্যময়ী করে রাখতে বড় ভালবাসে। ঠিকানা বা ফোন নম্বর চাইলেই বলেছে—মিট মি অ্যাট হাওড়া স্টেশন, ফ্রম দেয়ার আওয়ার অ্যাড্রেসেস উইল বি সেম।

এমন কি হানা কোন প্রদেশের মেয়ে তাও বুঝতে পারেনি হরিণকুমার। মাজা গায়ের রঙ, চতুর চটুল হাস্যময় মুখ, বব চুল, সাদা মজবুত সুন্দর দাঁত, রসাল ঠোঁট—সব মিলিয়ে যে কোন রাজ্যেরই হতে পারে। বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, উর্দু বলতে পারে, সবচেয়ে বেশি বলে ইংরেজি। অন্য সব ভাষা ভাঙা ভাঙা—যেন কোনটাই তার মাতৃভাষা নয়।

দ্বিতীয় কাপ চা ঠান্ডা হয়ে আসছে। খেতে ইচ্ছে করছে না হরিণকুমারের। তবু দু-একটা চুমুক দিয়ে সে হানাকে ছেড়ে নিজের কথা ভাবতে লাগল। তার চেহারা, তার স্মার্টনেস, তার প্রেম করার পদ্ধতি, তার চাকরিতে দক্ষতা।

মৃদু ফোনের রিং হল। গুরুবক্স ফোনটা তুলে কানে লাগিয়ে একটু বাদে ডাকল—ফোন, চৌধুরী সাব।

একটু বিরক্ত হয়ে হরিণ গিয়ে ফোন ধরে।

—হ্যালো।

—হানা বলছি।

—হানা?

হানার হাসি শোনা গেল। মৃদু, নরম, কালচার্ড।

হানা বলল—অল সেট?

—অল সেট।

—কটা বাজছে এখন?

—জাস্ট নাইন ও ফাইভ।

—গাড়ি ক'টায়?

—টুয়েলভ ফিফটি।

—দেখা হবে।

—শোনো হানা।

—কি?

—আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আমি তোমাকে পিক আপ করতে পারি।

—নো, আই শ্যাল গো বাই মিসেলফ।

—হোয়াই?
—ডোন্ট আসক।
—সিক্রেটটা কি বলবে?
—দেয়ার ইজ নান।
—ইউ অ্যারোগেন্ট লিটল সুইট! হরিণকুমার পুরো গলা ছেড়ে হাসল। বলল—ও. কে।
হানা গলাটা নামিয়ে বলল—গোলমোহরের প্রোপ্রাইটার অর ম্যানেজার হোয়াটএভার হি মে বি—তাকে বলবেন যে, ওখানে হুইস্কিতে ভীষণ অ্যাডাল্টারেশন থাকে।
—তাই নাকি?
—কাল আমি গিয়েছিলাম।
—বলব।
—বাই দি বাই, আমাদের সঙ্গে ড্রিঙ্কস কি কি যাচ্ছে?
—নাথিং। শুধু জার্নির জন্য একটা বড় বোতল হুইস্কি। দীঘা হ্যাজ অ্যাম্পল সাপ্লাই। চিন্তা কোর না।
—ওখানে কি এখন খুব শীত? আমি বেশি গরম জামা নিলাম না।
—খুব নয়। টেক সামথিং টু প্রোটেক্ট ইওর থ্রোট। দ্যাটস এ মাস্ট।
—আচ্ছা।
—প্যাকিং হয়ে গেছে তো?
—ক-খন! আপনার?
—আমি তো বেরিয়ে পড়েছি।
—ইউ আর হারিয়িং র‍্যাদার। লাঞ্চ, কোথায় করবেন?
—লাঞ্চ! ও লাঞ্চ! হরিণকুমার একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। আসলে সে দুপুরের খাওয়ার ভাবনা ভাবেইনি। এখন ভেবে নিয়ে বলল—আই হ্যাভ এ ভেরী গুড ব্রেকফাস্ট। দুপুরের কোথাও একটা কিছু ছোট করে খেয়ে নিলেই হবে।
—আমি বাড়িতে লাঞ্চ করে বেরোব। যদি চান তো আপনার জন্য কিছু করে নিতে পারি।
—দ্যাট উইল বি ফাইন। গ্রেসাস।

পাঁচ

অনেকখানি হাঁটতে হল গানুকে। থিয়েটার রোড দিয়ে বাস-ফাস চলে না। হাতে সময়ও বড় অল্প। আগুরি না গেলে হরিণকুমার ঠিক সোনার হরিণের মতোই পালাত। সেই ভেবে গানু খুব চোটে হেঁটেছে। খানিক রাস্তা প্রায় দৌড়ে পার হয়েছে। থিয়েটার রোড দিয়ে অনেকটা ভিতরবাগে গিয়ে তবে গোলমোহর রেস্টুরেন্টটা পেল।
এইসব সাহেবী কেতার জায়গায় বড় একটা আসেনি গানু। ভয়-ভয় করে। কিন্তু ভাববার, ভয় পাওয়ার ও সময় নেই।
কাচের দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গানু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ্যা-হ্যা করে হাঁফায়। এক ধারে দুটো উলি-ঝুলি পোশাক পরা সাহেব বসে আছে, একটা লোক খবরের কাগজ পড়ছে। আর কেউ নেই।
পুলওভারটা খুলে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে হাতা দুটো গলায় ফাঁস দিয়ে আটকে রেখেছে গানু। সেই ঝুলন্ত হাতার একটা তুলে মুখের ঘাম মুছল। কাউন্টারে এক পাঞ্জাবি বসে।
গানু এগিয়ে গিয়ে হ্যাদানো স্বরে তাকে জিগ্যেস করল—হোয়্যার ইজ হরিণকুমার চৌধুরী?

লোকটা বোধহয় কোন বই-টই পড়ছিল হাত আড়ালে রেখে, মুখ তুলে—হু?
—হরিণকুমার চৌধুরী?
লোকটা পরিষ্কার বাংলায় বলল—একটু আগেই তো ছিলেন এখানে।
—আমার ভীষণ জরুরি দরকার।
—ওঃ হোঃ! বলে লোকটা জিভ দিয়ে একটু দুঃখের চুক চুক শব্দও করল। তারপর বিজলী ঘণ্টা টিপে বেয়ারাকে ডেকে বলল—শামু, হারিণসাব কাঁহা গয়ে কুছ পাতা হ্যায়?
শামু মাঝবয়সি, কালো, চালাক মুখের বেয়ারা। প্রশ্ন শুনে সামান্য ভেবে গানুর দিকে চেয়ে বলল—মনে হচ্ছে, উনি ইসপ্লানেডে গিয়েছেন।
—এসপ্ল্যানেডে কোথায়?
—কুছু কেনার কথা বলছিলেন। মালুম কি, সাব নিউ মার্কিটে গেছেন।
পাঞ্জাবি লোকটা বলল—কি দরকার আপনার?
গানু বলল—হরিণকুমারের ফাদার ইজ ডেড।
ইংরেজি বাংলার জগাখিচুড়ি শুনেও পাঞ্জাবি লোকটা কিছু মনে করল না। বরং একটু ঝুঁকে বলল—ডেড?
—জি হাঁ। গানুর এবার হিন্দি বেরোল।
—ওঃ। চুক চুক। ফিফটিন মিনিটস এগো হি ওয়াজ হিয়ার।
—ওঁর কি আজ কোথাও যাওয়ার কথা?
—হাঁ জরুর।
—কোথায়?
পাঞ্জাবি লোকটা হাঁ করেও কথা চেপে গিয়ে বলল—দ্যাট আই ডোন্ট নো। কিন্তু গানু বুঝল, লোকটা জানে। তাই বলল—মিস্টার সিংজি, ওঁর ফাদার মারা গেছে, হি হ্যাজ টু ফায়ার হিজ মাউথ, মুখাগ্নি—ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?
বোঝার কথা নয় তবু লোকটা বুঝল। মাথা নেড়ে বলল—ইয়েস আই নো দি রিচুয়ালস। বাট—
গানু বুঝল, চেপে ধরলে লোকটা বলবে। বলল—নাউ, উই আর ইন ট্রাবল। দি ডেডবডি ইজ লায়িং অ্যাট দি ফ্রন্ট ডোর।
লোকটা মাথা নেড়ে বলল—আই ডোন্ট নো হোয়্যার হি ইজ গোয়িং। বাট মে বি, ইউ উইল ফাইন্ড হিম অ্যাট হাওড়া স্টেশন রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়ান পি এম। হি টোল্ড সামওয়ান অ্যাবাউট ক্যাচিং দি বম্বে এক্সপ্রেস। বেলা একটার বম্বে এক্সপ্রেস যে সাউথ ইস্টার্ন হয়ে ভায়া নাগপুর যায় তা গানু জানে। ও ট্রেনে কি করে পাটনা যাবে হরিণকুমার?
—বম্বে এক্সপ্রেস? গানু আপনমনে বলে।
—ইঁয়াপ। আর ইউ রিলেটেড টু চৌধুরী?
—এ ডিস্ট্যান্ট কাজিন। এনিথিং মোর? গানু আরো খবর চায়।
—নাথিং।
কিন্তু গানু গন্ধ পেয়েছে। হেয়ার ইজ সামথিং। বাড়িতে পাটনার কথা বলে এসেছে, অফিসে কিছুই বলেনি, এখানে আবার কাকে বম্বে এক্সপ্রেসের কথা বলেছে। গোটা ব্যাপারটায় একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছে গানু। দীর্ঘদিন ধরে হরিণকুমার এবং তার পরিবারের ওপর তার একটা রাগ চাপা আছে। ওরা বুড়োকর্তাকে ঘেন্না করে, কর্ত্রীকে তো ঘেন্না করেই, গানু আর তার মাকেও কখনো মানুষ বলে মনে করে না। এখন ওদেরও উল্টে ঘৃণা করার মতো কিছু তথ্য গানুর চাই। যদি কিছু পায় তো দান উল্টে যাবে।
কিন্তু গানু চাপাচাপি করল না। বম্বে এক্সপ্রেসের ঢের দেরি আছে।

সে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। বেয়ারা—সেই মুশকো চেহারার শামু বিনীত ভাবে বলল—কাপ সিস্টেম নেই স্যার, পট।

—তাই দাও।

বলে গানু জুৎ করে বসল। বড় রেস্টুরেন্টে বহুকাল ঢোকা হয়নি।

একটু বাদে শামু চায়ের পট নিয়ে এলে গানু তাকে চোখের সামান্য ইশারা করে কাছে ডাকল। শানু একটু ঝুঁকে দাঁড়াতে বলল—হরিণ চৌধুরী এখানে প্রায়ই আসে?

—জি হাঁ।

—সঙ্গে কোন আউরাৎ থাকে?

—কোই না।

—ড্রিঙ্ক করে?

—না। সাহেব ড্রাই মানুষ।

—কোন আউরাৎ থাকে না?

—নেহি।

হতাশ গানু চায়ে দুধ চিনি মেশাতে মেশাতে আকাশ-পাতাল ভাবে। শামু তার কাজে চলে যায়। হরিণকুমারের অফিসের সেই মাদ্রাজি সাহেব কিন্তু বলেছিল, গোলমোহরে হরিণকুমারের সব খবর পাওয়া যাবে। কথাটা নিশ্চয়ই সত্যি। কিন্তু খবর এরা সহজে দেবে না।

গানুর খুব খিদে পেয়েছিল। শামুকে ডেকে বলল—ভাই, চিপ ফুড কি পাওয়া যাবে?

—চিপ! তাহলে টোস্ট নিতে পারেন। আর ডিমের ফ্রাই হবে।

—দাও!

বলে ক্ষুধার্ত গানু হঠাৎ কি ভেবে শামুকে ডেকে বলল—না, ডিম দিও না।

বরং ভেজিটেবল কিছু দাও।

—ভেজিটেবল চপ হবে, টিকিয়া আছে।

—টিকিয়াই দাও।

ডিমটা খেতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকছিল গানুর। কাণাঘুষো শোনা যায়, সে নাকি বুড়োকর্তারই ছেলে। কথাটাকে বিশ্বাস করে না গানু। আবার অবিশ্বাসও করে না। তবে এটা ঠিকই, তার জন্মের রহস্যটা বেশ ঘোলাটে। আর, এই একটি ঘটনাই গানুকে খুব ল্যাং মেরেছে জীবনে। জন্ম ভালো হওয়া একটা মানুষের পক্ষে যে কত জরুরি এটা ভালো জন্মের মানুষ বুঝবে না। সে যদি বুড়োকর্তারই ছেলে হয়ে থাকে তো ডিম খাওয়াটা ঠিক হবে না।

শামু টিকিয়া আর টোস্ট নিয়ে আসতেই গানু প্লেটের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড গরম টিকিয়ার মস্ত একটা টুকরো কেটে মুখে ফেলেই সে গরমে হুসহাস করতে করতে টোস্টে মাখন মাথায়।

শামু টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল—আউর চা লাগবে?

—না। আর একটা টিকিয়া দাও। দারুণ হয়েছে।

শামু মাথা নাড়ল, ঝাড়নে একবার উল্টোদিকে চেয়ারটা ঝেড়ে নিল। হঠাৎ একটু নীচু স্বরে বলল—দরজার দিকে নজর করুন।

গানু কুট চোখে শামুকে ঠিক দু-সেকেন্ড দেখে নিয়েই টপ করে ঘাড় ঘোরাল। দরজার ঠিক ভিতরে একটি দুরন্ত চেহারার মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। গায়ে সাদা মলমলের ঢিলা পাঞ্জাবি, তাতে নানা রকম এমব্রয়ডার বর্ডার। পরনে একটা স্ট্রেচলনের কালো বেলবটম। ছোটো, ঘাড় পর্যন্ত চুল, ফর্সা রং, ক্ষীণ কটি, সাঙ্ঘাতিক বুকে একটা সাদা ব্রেসিয়ার মলমলের পাতলা পাঞ্জাবি ভেদ করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাতের ব্যাগটা দু-চক্কর ঘুরিয়ে মেয়েটা ধীর পায়ে কাউন্টারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—চৌধুরী এসেছিল?

পাঞ্জাবি লোকটা এক দৃষ্টে চেয়েছিল মেয়েটির দিকে। পরিষ্কার বাংলায় বলল—হ্যাঁ, একটু আগে।
—টাকা রেখে গেছে?
—চেক। ক্যাশ ছিল না।
—বদারেশন! চেক দিল কেন?
লোকটা খুব ইঙ্গিতপূর্ণ হেসে বলল—আজ বাইরে যাচ্ছে চৌধুরী, ক্যাশ দরকার।
—আজ যাচ্ছে?
—বম্বে এক্সপ্রেস।
—কার সঙ্গে? মেয়েটি প্রায় বিনা কৌতূহলে জিগ্যেস করে।
—হানা।
—কোন হানা?
—মালুম নেই কোন হানা। শামু দেখেছে, বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে আসে। অ্যান্ড দ্যাট বীচ কমপ্লেইন্ড অ্যাবাউট আওয়ার হুইস্কি।
—শামু! মেয়েটি ডাকে।
—জি। বলে শামু ছুটে যায়।
—হানা কৌন?
—জি, মালুম নেহি।
—দেখতে কেমন?
—কম উমর! পাতলি উতলি লেড়কি।
মেয়েটা ঘড়ি দেখে বলল—দশটা বাজতে এখনো কয়েক মিনট। চেকটা দাও গুরু।
লোকটা চেক বের করে দেয়। মেয়েটা ভ্রূ কুঁচকে চেক দেখে নিয়ে অবহেলায় ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়। বলে—হি উজ মি অ্যানাদার থাউজ্যান্ড। আই ওয়ান্ট দি পেমেন্ট।
পাঞ্জাবি লোকটা বলল—দিয়ে দেবে। ফিকর মাৎ করো মঞ্জরী। আজ দীঘা যাচ্ছে, ফিরে এসে দেবে।
মেয়েটা জবাব দিল না। মাথার চুলগুলো ডান হাতে হাটকে দিয়ে বলল—
—হি উইল ড্র এ ব্ল্যাঙ্ক উইথ হানা। গুরুবক্স, এ সানডে ক্লাবের হানা নয়?
—ক্যা মালুম।
—জাভেরীকে ডায়াল কর তো, জিগ্যেস করছি!
গুরুবক্স ডায়াল করে রিসিভার এগিয়ে দেয়।
—জাভেরী, দিল ইজ মঞ্জরী। হানা কে?...সানডে ক্লাবের?...ওঃ গড! হি ইজ আফটার এ বিগ ফিশ দেন!...হানা ইজ মাচ মাচ কস্টলি। হ্যাজ দ্যাট বাগার এনাফ মানি দু ফেচ হানা!...শোনো, ও ফিরলে বলে দিও, আই ওয়ান্ট অ্যানাদার টু থাউজ্যান্ড। ও. কে?
দ্বিতীয় টিকিয়াটা ঠান্ডা মেরে যাচ্ছিল গানুর। খাওয়া ভুলে সে শুনল। মেয়েটা ফোন রেখে একটু দুলে দুলে চলে গেল মেঝে পার হয়ে দরজার বাইরে।
শামুকে ডাকতে হল না। সে নিজেই এসে বলল—উহি থী চৌধুরী সাবকা গার্ল ফ্রেণ্ড। নাচ দিখলাতি হ্যায়।
—হানা কে?
—নয়া কোই ফ্রেণ্ড হোগা।

গোলমোহর থেকে বেরিয়ে গানু ঘড়ি দেখল। সোয়া দশটা। চারদিকে রোদের তেজ এখনো গরম। আকাশে অল্প একটু কুয়াশার আস্তরণ রয়েছে, তাই আলো ফুটছে না।

গানু খুঁজে পেতে একটা দোকানে টেলিফোন দেখতে পেয়ে গিয়ে সোজা হরিণকুমারের বাসায় রিং করল।

ফোন ধরল হরিণের বউ—হ্যালো।

—আমি গানু বলছি।

—কি হল আবার?

—ওঁকে অফিসে পেলাম না।

—আমি কি করব, বললাম তো উনি পাটনা যাবেন।

—না, পাটনা তো উনি যাচ্ছেন না?

—যাওয়া ক্যানসেল করেছেন!

—তাও নয়। অন্য জায়গায় যাচ্ছেন।

বউদি একটু চুপ করে থেকে বলে—হতে পারে। আমাকে তো পাটনার কথা বলেছিলেন, পরে হয়তো ভেনু চেঞ্জ হয়েছে।

গানু মৃদু হেসে বলল—ওঁর অফিসে কেউই জানে না যে, উনি পাটনা যাচ্ছেন। পাটনায় কোন কাজ নেই।

মধুমালা হঠাৎ একটু উঁচু রাগের স্বরে বলল—তা তোমার অত মাথাব্যথা কেন? উনি যেখানে ভালো বুঝেছেন গেছেন।

গানু বলল—তা তো ঠিকই। কিন্তু ওদিকে বুড়োকর্তার লাস পড়ে আছে, মুখাগ্নি করবে কে? ওঁকে না পেলে—

—যাদের ছেলে কাছে নেই, তাদের যে মুখাগ্নি করে সেই করবে। মুখাগ্নির জন্য তোমরা অত অস্থির কেন বল তো?

গানু আস্তে করে বলল—আপনাদের মধ্যে কাউকে না কাউকে তো যেতেই হবে কাজটা করতে।

মধুমালা হঠাৎ বলে—তুমিই মুখাগ্নি করো না! সেটা বোধহয় অন্যায়ও হবে না।

গানুর মাথা তখন খুব ঠান্ডা, বুকটা পাথরের মতো শক্ত। সে শান্তস্বরে বলল—অন্যায় হবে না কেন বউদি? বুড়োকর্তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

—অত-শত জানি না বাবু।

—তাহলে যে বললেন, আমি মুখাগ্নি করলে অন্যায় হবে না!

—তুমি ওঁর পেয়ারের লোক ছিলে, তাই বললাম।

—ও, তাই বলুন। গানু হাসল—আমি ভাবলাম বুঝি, আপনি অন্য কোন ইঙ্গিত করছেন। লোকে বল কিনা, আমি বড়কর্তার ছেলে।

মধুমালা বলে—কি আজে-বাজে বলছ গানু। ছাড়লাম।

—শুনুন বউদি, জরুরি কথা আছে।

—আবার কি?

—দাদা আজ দীঘা যাচ্ছে। বম্বে এক্সপ্রেসে।

—তার আমি কি করব?

—একবার স্টেশনে যাবেন নাকি?

—কেন, আমি যাব কেন?

—গেলে একটা উপকার হত।

—কি উপকার হবে? বাবা মারা গেছে খবর পেলে উনি ঠিকই যাওয়া ক্যানসেল করবেন, আমার যাওয়ার দরকার নেই।

—সে জন্য নয়।

—তবে?

—অন্য একটা ব্যাপার আছে।

—কি ব্যাপার বলবে তো।

—উনি একটি মেয়ের সঙ্গে দীঘা যাচ্ছেন। মেয়েটির নাম হানা।

বলে মহা আনন্দ পেল গানু।

—হানা? সে আবার কে?

—একটি মেয়ে। সানডে ক্লাবের প্রফেশনাল মেয়েদের একজন।

মধুমালা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ গলার স্বরটা অন্যরকম হয়ে যায়। একটু করুণ রকম করে বলে—কি বলছ গানু? তোমার বড্ড বাড় বেড়েছে।

—না বউদি, খবরটা পাকা। এর আগে দাদা আর একজন মেয়েকে নিয়ে অনেক জায়গায় গেছে। তার নাম মঞ্জরী।

—আমি এসব শুনতে চাই না।

একথা বলেও মধুমালা ফোন রেখে দিল না। ধরে রইল।

গানু বলল—একবার হাওড়া স্টেশনে যাবেন বউদি? একদম রেড হ্যাণ্ডেড ধরতে পারবেন।

মধুমালা হঠাৎ বলল—যদি ইনফর্মেশনটা কারেক্ট না হয়?

—কান ধরে পঞ্চাশবার ওঠ-বোস করব। কথা দিচ্ছি।

মধুমালা চুপ করে থাকে একটু। তারপর হঠাৎ বলে—আচ্ছা, তুমি বারোটা নাগাদ একটা ট্যাক্সি নিয়ে এস। আমি যাব।

—ঠিক আছে। ছাড়ছি।

ছাড়ার মুহূর্তে মধুমালা ফের ডাকল—শোন গানু।

—কি?

—বারোটা নয়। তুমি আগেই চলে এসো। এক্ষুনি। আমার কয়েকটা কথা জানবার আছে। আসতে পারবে?

—পারব।

গানু বাইরে এসে ট্যাক্সি নিল। দেদার পয়সা খরচ হয়ে যাচ্ছে আজ। কিন্তু মনে হচ্ছে, এটা বৃথা ব্যয় নয়। পয়সা খরচটা সার্থক হচ্ছে।

কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই গানুর বুড়োকর্তার লাসটার কথা মনে পড়ছে। লাসটা এখনো বারান্দা কি উঠোনে শোয়ানো পড়ে আছে। কিসের প্রত্যাশায় কে জানে।

শেষবার বুড়োকর্তার সঙ্গে গানুর কথা হয়েছিল দিন তিনেক আগে। বুড়োকর্তা সকালবেলা তার আদরের গরু হারমণিকে পুষ্টিকর পালংশাক খাওয়াচ্ছিলেন বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে, গানু কাঠের মিস্ত্রিকে ডাকতে যাচ্ছিল রান্নাঘরের জানলা সারানোর জন্য।

বুড়োকর্তা ডেকে বললেন—চিলেকোঠায় যে কাঠ আছে তাতেই হয়ে যাবে মনে হয়। মিস্ত্রিকে দেখাস তো।

—ও কাঠে হবে না। গানু বলল—পচা ভুসভুসে মেরে গেছে।

—কেন, চিলে কোঠার ছাদ দিয়ে জল পড়ে নাকি?

—কবে থেকে!

—সারাসনি কেন?

—আপনি বললে তো সারাব।

—বলতেই বা হবে কেন! নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে করবে সব।

বুড়োকর্তা এর বেশি কিছু বলেনি। গরুর মুখের লালা লাগা হাতছানা আলগা করে ধরে বলেছিলেন—গাড়ু থেকে একটু জল ঢেলে দে তো হাতে। গানু জল ঢেলে দিল। গামছাখানাও এনে দিল ঘর থেকে! সেই শেষ মুখোমুখী দেখা।

লোকটার দোষ ছিল অঢেল। তবু বেশ মাথা সোজা রেখে চলতে জানত, মেরুদণ্ডটাও খাড়া ছিল। ভয় ডর পেত না বড় একটা। এও দেখেছে গানু, বুড়োকর্তা মেয়েছেলের পিছনে যত না ঘুরেছে, তার চেয়ে মেয়েছেলেই ঘুরেছে বুড়োকর্তার পিছনে বেশি। লোকটার এ ব্যাপারে বাদবিচার ছিল না। তমোগুণের একশেষ।

গানুর প্রতি একটা বেশ মনের টান ছিল। প্রায় সময়েই ডাক খোঁজ করতেন। আবার নানা লোককে শায়েস্তা করতে কি হাল্লা-হিল্লা ফেলে দেওয়ার কাজে গানুই ছিল তাঁর বলভরসা। কর্তা নিজে এক কালে দাঙ্গাবাজি কম করেননি। বুড়োবয়সেও তাঁর রাজ ছিল একেবারে উন্মাদের মতো। নিজের তল্লাটে লোকজনের ওপর প্রভুত্ব করার জন্য, সমঝে দেওয়ার জন্য অনেক কিছু করেছেন। এসব ব্যাপারে গানু ছিল তাঁর ডান হাত। মাস গেলে গানু না হোক চার-পাঁচশো টাকা পেয়ে যেত হাতে। থোক টাকাও কয়েকবার পেয়েছে। খুব সম্প্রতি বুড়োকর্তার হাতের টাকা পয়সা কিছু কমে গিয়েছিল। অভাবের ভাবটা দেখা দিচ্ছিল মাত্র। গানুকে প্রায়ই বলতেন—একটা জমানা শেষ হয়ে গেল রে।

নিজের ভাগ্যের জন্য, কৃতকর্মের জন্য কাউকে দোষ দেওয়ার অভ্যাস ছিল না। নিজেই বলতেন—আমি বাবু নষ্ট লোক! তোমরা তা বলে নষ্ট হয়ো না। যে যার মতো হয়ো।

ট্যাক্সি হরিণকুমারের বাসার দোরগোড়ায় আসতেই গানু লাফিয়ে নামল। যা ভাড়া দিয়েছিল তার ফেরত চার আনাও নিল না।

ওপরে উঠতেই খোলা দরজার পর্দা সরিয়ে মধুমালা বিষণ্ণ মুখখানা বের করে বলে—এসে গেছ?

—হ্যাঁ বউদি।

—এসো।

ঘরে ঢুকতেই মধুমালা চেঁচিয়ে মদনকে ডেকে বলল—স্টাডি রুমে চা দিয়ে যেও মদন।

কোণের পড়ার ঘরটায় নিয়ে গিয়ে মধুমালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলে—শোন, আগে একটা কথা স্পষ্ট তোমাকে বলে নিই।

—কি, বলুন।

—তুমি যা জেনেছ তা কখনো আমার মেয়েদের জানিও না। তোমার গলা ফোনে শুনেই মনে হচ্ছিল, তুমি আয়নার বাবার দোষের খবর পেয়ে খুব খুশি হয়েছ। হয়তো বা সবাইকে বলে বেড়াবে। তাই অনুরোধ করছি, বোল না। উনি খারাপ চরিত্রের হোন বা না হোন, ওঁর বাচ্চাদের ইনফর্মেশনটা দেওয়া ঠিক হবে না।

বস্তুত গানুর প্রাণে এই ইচ্ছেটাই ছিল। হরিণকুমারের বড় দুই মেয়েকে সে একসময়ে ঠিক জানিয়ে দিত ঘটনাটা। অনুরোধ শুনে বলল—খুশি হয়েছি কে বলল?

—মনে হল।

—না, বউদি, খুশি হই নি। তবে আপনারা তো বুঝলেন, বুড়োকর্তাই একা দোষী নয়! তবে বুড়োকর্তার সাহস ছিল বলে অন্য মেয়ে ভাগিয়ে এনে বউ করেছিল, একালের লম্পটরা তা করে না।

—চুপ করো গানু, ওসব আমি শুনতে চাই না।

গানু একটু হাসল মাত্র।

মধুমালা জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়ে এসে মুখোমুখী বসে বলে—তুমি এত অল্প সময়ে ওঁর সম্পর্কে জানলে কি করে?

—বাই চান্স। সেকথা থাক। আপনি তৈরি হয়ে নিন, খুব বেশি সময় নেই।

—আমি তৈরিই আছি। চা করতে বলেছি, খেয়েই উঠব।

মধুমালার মুখটা দেখল গানু। ভীষণ থমথম করছে।

ছয়

শ্মশানযাত্রীরা এখনো ফেরেনি। ফিরবার কথাও নয়।

গানু হরিণকুমারকে নিয়ে ফিরেছে একদম শেষ বেলায়। তার আগে অবশ্য বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ডাক্তারখানায় ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল, হরিণকুমার আসছেন, বুড়োকর্তার শব যেন দাহ করা না হয়।

হা-ক্লান্ত হয়ে বিরক্ত হরিণকুমার এল বেলা আড়াইটে নাগাদ। মড়া উঠল সাড়ে তিনটেয়। রাজ্যের লোক ভিড় করেছিল বাড়িতে। সবাই দেখল, টাই-স্যুট পরা সাহেব হরিণকুমার খালি পায়ে, লালচে রাগের মুখে শবানুগমন করছে গেঁয়ো রাস্তায়।

হরিণকুমারের এক ঘণ্টা বাদে তিন মেয়ে নিয়ে মধুমালা এল বাড়িতে। বোকা বামনী দৌড়ে গিয়ে খবর দিল হাসনুহানাকে—মা, শুনলে না তো কথা! বলেছিলাম, যা পাও সরিয়ে ফেল। দেখগে, বুড়োকর্তা রওনা হতে না হতেই সব দখল নিতে জ্ঞাতিগুষ্টি হাজির।

হাসনুহানা মাটিতে একটা কম্বল পেতে শুয়েছিলেন। শুনে একবার তাকালেন বামনীর দিকে, বললেন—কে এসেছে?

—মেজবউ, তিন মেয়ে নিয়ে।

—আর কেউ এল না?

—আরো চাও? আসবে বাবা, সব আসবে। তারা সব দূর দূরান্তের মানুষ, খবর যাবে তারপর তো আসা। তুমি বুঝি সেই অপেক্ষায় আছ!

হাসনুহানার মাথা ঘুরছিল। শরীরটা আজ জুতের নেই। মনটা অন্ধকার। মাথাটা অন্ধকার। বুকের আলো নিভু নিভু। পাখা-মেলা একটা অন্ধকারে দুনিয়া ঢেকে আসছে ক্রমে।

বারান্দায় পায়ের শব্দ পেয়ে উঠে বসতে চাইলেন, পারলেন না প্রথমবারে। মাথা ঝিম করল। আর একবার চেষ্টা করতে গেলেন কনুইয়ের ভর দিয়ে, ঠিক সে সময়ে একটা কচি হাত এসে ড্যানাটা ধরে বলল—উঠবে?

—উঠব। কে গো তুমি? হাসনুহানা আদরে গলে গিয়ে বললেন।

—আমি গয়না। চিনতে পারছ না?

উঠে বসতে মাথাটা পরিষ্কার হল আস্তে আস্তে। সবাইকেই দেখলেন। ঘরে একটা শেষবেলার মৃদু আলোর আভা। আলো-আঁধারিতে ভালো চিনবার কথা নয়। খুব ভয় লাগছিল ওদের দেখে। ওরা কোনদিন তাঁর সঙ্গে কথা-টথা বলে না। চোখে চোখ রাখে না। কেমনধারা গম্ভীর আর কঠিন হয়ে যায় সামনে এলে।

বললেন—বউমা বোস এই কম্বলে। বড্ড মশা, আঁচলটা জড়িয়ে নাও।

মধুমালা বসে।

আয়না একটু অহঙ্কারী। সব কিছুকেই একটু নীচু নজরে দেখে। সে বসল না, বারান্দার দিকে চলে গেল মুখ ফিরিয়ে।

মধুমালা বসে বলল—উনি সময় মতো এসে পৌঁছেছিলেন তো।

—কে, হরিণ? হ্যাঁ, সে তো এই ঘণ্টাখানেক আগে তার বাপকে নিয়ে গেল। ময়নার মুখখানা অত শুকনো দেখছি কেন মা?

—ওর জ্বর হয়েছিল।

—তবে নিয়ে এলে কেন? অশৌচ লাগল তো।

—তাতে কি! মধুমালা বলল।

গয়না খুব কাছ ঘেঁষে বসেছে। এমনকী ওর কাঁধ তাঁর কাঁধে ঠেকছে একটু-আধটু। বড্ড মিষ্টি মেয়েটা। গয়না বলল—তোমার কি শরীর খারাপ?

—ভালো নয় ভাই।

—কিছু খাওনি সারাদিন, না?

—চা খেয়েছি, আর কিছু কি গলা দিয়ে নামে।

মধুমালার মুখে শোকতাপ না গাম্ভীর্য আছে, দুঃখের ভাবও আছে খানিকটা। মধুমালা বলল—আজ আর দেরি করব না। এক্ষুনি ফিরতে হবে। উনি কি আজ ফিরবেন কলকাতায়?

—হরিণের কথা বলছ? কি জানি মা, আমার সঙ্গে তো কথা হয়নি। কোনদিনই তো ও কথা বলে না।

মনে মনে হাসনুহানা বললেন—তোমরাও বল না।

বাস্তবিকই শ্যামকুমারের ছেলে মেয়ে বা ছেলের বউ নাতি-নাতনী কেউই খুব দায়ে না ঠেকলে কখনো হাসনুহানার সঙ্গে কথা বলেনি। বলবেই বা কেন? হাসনুহানা যে মহাপাপী!

—কর্তার মেয়েরা কেউ খবর পায় নি। হাসনু জিগ্যেস করেন।

—কি জানি, মধুমালা বলে।

—তারা তো কেউ এল না।

—হয়তো ঠিক সময়ে খবর পায়নি।

হাসনু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—তা নয় মা, আসলে বাপের কলঙ্ক বলে কেউ আসতে চায় না।

এই কথার কেউ উত্তর দিল না।

বামনী একটা হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেল ঘরে। বাইরের উঠোনে একটা হ্যাজাক বাতি জ্বালল কে যেন। তার চমক ধরানো আলোর দু'চারটে টুকরো ঘরে এসে পড়ল।

হাসনুহানা বললেন—চিন্তা কোর না, হরিণ যদি চায় তো গানু তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—তার দরকার নেই। আজ এখানে থাকতেও পারে।

হাসনু উঠে কর্তার চাবির গোছাটা তোষকের তলা থেকে এনে মধুমালার সামনে রেখে বললেন—এটা রেখো।

—কি এটা! চাবি? কিসের?

—সেফ-এর চাবি আছে, ব্যাংকের লকার, লোহার আলমারি, আরো নানান বাক্স প্যাঁটরার।

মধুমালা পাল্টা জিগ্যেস করে—কি আছে তাতে?

—খুব কিছু বোধহয় নেই। হাসনুহানা বলেন—ইদানীং অবস্থা খুব খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। তাহলেও যা আছে সে খুব ফ্যালনাও নয়।

মধুমালার গায়ে হ্যাজাকের আলোর একটা টুকরো পড়েছে। তাতে খুব স্পষ্ট তার মুখ দেখা গেল। ভীষণ বৈরাগ্যে মুখখানা ভরে গেছে। মধুমালা মুখটা একটু অন্ধকারের দিকে ফিরিয়ে নিল। বলল—ওসব দিয়ে কি হবে?

—কি হয়, কি জানি বাবা, তবু তো এই বিষয় সম্পত্তির জন্য মানুষ হেঁদিয়ে মরে!

মধুমালা বলল—ওসব আমাদের নয়। আমরা নেব না।

হাসনুহানা বললেন—আমারও তো নয়।

মধুমালা বলল—বরং ওঁকে দেবেন। উনি যদি কিছু করেন ব্যবস্থা তো করবেন।

মধুমালা উঠে পড়ে। আয়না বারান্দায় মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

মধুমালা বারান্দায় আসতেই বলল—আজকের বিকেলটা একদম নষ্ট। কি দরকার ছিল আসবার?

গয়না বলল—কেন, এটা তো আমাদের বাড়ি।

—বাড়ি না হাতি। চল মা।

হাসনুহানা দেয়াল ধরে ধরে বাইরে আসেন। যৌবনকালে তিনি খুব সুন্দর ছিলেন। বাইরের বারান্দায় এসে তিনি খুব বিভোর হয়ে গয়নার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বড় সুন্দর মেয়েটা। সুন্দরেরা বড় কষ্ট পায়। ওরা মা আর মেয়েতে মিলে চারজন উঠোন পেরিয়ে ফটকের ওধারে গেল।

সাত

বুড়োকর্তার দেহ ঘিরে ধু-ধু আগুন যখন জ্বলছে তখন চিতার কিছু দূরে হরিণকুমার ঘাসে বসে আছে। পাশ দিয়ে খালের জল বয়ে যাচ্ছে। ভিতরে একটা অপমানের, হতাশার, গনগনে আঁচ। হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির তলায় আজ কি কেলেঙ্কারিই না হল! হানা এসেছিল ঠিক সোয়া বারোটায়। ছিমছাম শাড়ি পরা চেহারা, মাথায় সিঁদুর ছোঁয়ানো। সিঁদুরটা ক্যামোফ্লেজ, একসঙ্গে থাকতে গেলে লোককে ধোঁকা দিতেই হয়। যখন হরিণকুমার সামনের দুটো উজ্জ্বল আনন্দের দিনের ঠিক দরজায় পৌঁছেছে ঠিক সে সময়ে দুটো মুর্তি দুদিক থেকে এসে তার পাশে দাঁড়াল। মধুমালা আর গানু। হানার হাত তখনো হরিণের হাতের মুঠোয় ধরা।

খালের ওপর নিবিড় শীতার্ত অন্ধকার থেকে হরিণকুমার চোখ ফেরাল। আগুনের ওপারে খালি গায়ে গানু দাঁড়িয়ে। হাতে লম্বা বাঁশ। চিতাটাকে খুঁচিয়ে তেজ বাড়াচ্ছে। ওপাশ থেকে একবার বাঘের মতো জ্বলন্ত চোখে হরিণের দিকে তাকাল।

হরিণকুমার চোখ ফিরিয়ে নেয়।

অন্তত কয়েকটা লোক জেনে যাবেই যে, সে তার বাবার চেয়ে মহৎ ছিল না।

বড় গল্প

মৌমাছি

সেদিন ভীষণ ভিড়ের বাসে অফিসে যাচ্ছি। টার্মিনাস থেকে উঠি বলে আমি বরাবর জায়গা পাই। জানালার ধারের জায়গাটাই আমার প্রিয়। কিন্তু রোজ সেটা জোটে না। সেদিনও জোটেনি। পাশের লোকটির স্বাস্থ্য ভালো, তার ওপর একটু ঠ্যাং ছড়িয়ে বসার প্রবণতা। স্বাস্থ্যবান বা রোগা কোন লোকের সঙ্গেই আমি রাস্তায় ঘাটে বির্তকে যাই না। কাউকে সরে বসতে বা ঠিক হয়ে বসতে বলার সাহস আমার নেই। কে কীরকম মানুষকে কে জানে! আজকাল সবাই তেরিয়া, মস্তান, হিংস্র। কারও কাছে অপমানিত হলে ঠিক তিনদিন আমার মন খারাপ থাকে, ভালো ঘুম হয় না, খাওয়া কমে যায়। পাশের লোকটা খুবই অন্যায়ভাবে, অভদ্রের মতো উরু ছড়িয়ে বসেছে, আমি তার পাশে একচিলতে জায়গা পেয়েছি। দাঁড়িয়ে থাকা, গা ঘেঁষা লোকেরা আমায় হাঁটুর চাপে, শরীরের ভারে চেপে রাখছে। তাদেরও কাউকে কিছু বলার নেই। টাইট হয়ে বসে ঘামছি।

মানুষ সহজেই শরীরের অসুবিধে ভুলতে পারে, যদি তার মন সক্রিয় থাকে। সৌভাগ্যের বিষয়, আমার মন খুবই সক্রিয়। যে-কোনও অবস্থাতেই আমি খুব সহজে বাস্তবতা ভুলে অন্য চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে যেতে পারি। সেদিন আমার চিন্তার বিষয় ছিল একটা হারানো দেশলাই। সেদিন সকালেই দেশলাইটা ঝি চেয়ে নিয়ে গেল উনুন ধরাবে বলে। আর ফেরত দেয় নি। বাথরুমে যাওয়ার সময়ে সিগারেট ধরাব, দেশলাইটা খুঁজে না পেয়ে জিগ্যেস করতেই ঝি জিব কেটে বলল—ও মা! উঠোনে ফেলে এসেছিলাম। এনে দিচ্ছি। বারোয়ারী উঠোন। দেশলাই পাওয়া গেল না। ঝি অবশ্য কাকের ওপর দোষ দিচ্ছিল। একথা ঠিকই দুষ্টু কাকেরা এ বাড়ির সাবান, চামচ, ছোট বাসন, কি রুমাল টুমালও নিয়ে গিয়ে ও-বাড়ি সে-বাড়িতে ফেলে আসে। দেশলাইও কি নিতে পারে না? পারে, তবু আমার মনে হচ্ছিল ও ব্যাপারে ঝি কিংবা অন্য কোন মানুষের হাত আছে। প্রায় ভরা দেশলাই, একটি দুটি কাঠি মাত্র খরচ হয়েছে। কিন্তু দেশলাই বলে নয়, কোন কিছু হারালে বা চুরি গেলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয়, ঠকে গেলাম, হেরে গেলাম, বোকা বানাল আমাকে। দেশলাই থেকে পিছলে চিন্তাটা কি করে যেন দাবাড়ু ববি ফিশারের ওপর চলে গেল। তারপর ক্যাসিয়াস ক্লে এবং তারপর আর সব হিজিবিজি। আমার একজন প্রেমিকা আছে, তার নাম মনু। খুবই সাদামাটা আটপৌরে মেয়ে, বয়সও হয়েছে। সে এতই সাধারণ এবং আমাদের সম্পর্কটাও এত পুরনো যে অবসর সময়ে তার কথা আমার মনেই পড়ে না। যদিও তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে, শুভদৃষ্টি এবং ফুলশয্যাও। কিন্তু সে সব ভাবতে কোন রোমহর্ষ হয় না।

কেরানী থেকে সদ্য একটা প্রমোশন পেয়ে আমি সেকশনের হেড হয়েছি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, স্বাস্থ্য ভালো নয়। কষে সাতটা দাঁত নেই, পোকা লেগেছিল, তুলে ফেলেছি। গায়ের রং ফর্সা ছিল, এখন তাম্রাভ। গালা বসা। মাথার চুল পাতলা। আমার মধ্যে বৈশিষ্ট্য বলতে কিছু নেই। মনুর সঙ্গে আমার ভালোবাসার কথা-টথা কিছুই হয় না। মাঝে-মধ্যে দুজনে সিনেমা দেখি, রেস্টুরেন্টে খাই, বেড়াই ইত্যাদি। স্বামী-স্ত্রীর

মতোই পুরোনো। মনু এতই সাধারণ যে রাস্তায় ঘাটে ছেলেছোকরারা ওর দিকে ফিরেও তাকায় না, শিস-টিস বা আওয়াজ দেওয়া তো দূরের কথা। সেদিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান, এবং সেদিক দিয়েই বোধহয় আমি দুর্ভাগাও। কারণ, আমার কাউকে ঈর্ষা করার নেই। আবার আমার নিজের বেলাতেও একই কথা খাটে। আজ পর্যন্ত কোন মেয়েই আমার সম্পর্কে তেমন কৌতূহল দেখায় নি। আমি কলেজে ইউনিভার্সিটিতে কো-এডুকেশনে পড়েছি, অফিসের স্টাফেও অনেক কুমারী মেয়ে আছে। কেউ না। একমাত্র মনু। ইদানীং অবশ্য প্রমোশন হওয়ার পর কিছু মেয়ের বাপ-দাদা বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিল আমার সঙ্গে, যারা মনুর বিষয়ে জানে না। আমার বাড়ি থেকে সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ মনুরও দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। আমাদের নিয়তি নির্দিষ্ট।

সেদিন বাসের কথা, যা বলছিলাম। ববি ফিশার, ক্যাসিয়াল ক্লে প্রভৃতি বিখ্যাত ও সফল ব্যক্তিদের কথা ভাবতে আমার ভালই লাগে। খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ, অভিনেতা, গায়ক, লেখক—এঁদের সফলতার কথা ভাবলে আমার ঈর্ষা হয় না। বরং একরকমের আনন্দ বোধ করি। মানুষই তো সফল হয়। আমিও সেই মানুষের প্রজাতির একজন। এইভাবে আমি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করি। পাশের লোকটার ছড়ানো উরু, বা দাঁড়ানো মানুষের শরীরের চাপ ও তাপ এসব গায়ে লাগে না। সফল মানুষদের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল, মাঝখানে শীতকালটা বাদ দিয়ে আসছে ফাল্গুনে আমাদের বিয়ে। শীতকালটাই বিয়ের জন্য আমার পছন্দ ছিল। কিন্তু মনুর একটা অ্যাজমার টান ওঠে এসময়ে। পুরোনো রোগ। তাই শীতকালটা ওর পক্ষে ভালো নয়। বিয়ের কথা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। শুভদৃষ্টির সময়ে নতুন মুখ দেখব না। এ কথাটা মনে হতেই আবার একটু মায়া হল মনুর জন্য। যাই হোক, আমারই তো নিজস্ব মেয়েমানুষ।

এইসব চিন্তায় বাস্তবজ্ঞান ছিল না। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট ধরে বাস আস্তে আস্তে যাচ্ছে, সামনে গাদাবোটের মতো গোটা দুই ট্রাম যাচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে বাসটা ওদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। পারছে না। এক একবার ডান ধারে বেঁকে খানিকদূর এগিয়েও যায় ট্রামের গা ঘেঁষে, অমনি উল্টোদিক থেকে ট্রাম বাস ট্র্যাক্সি এসে পথ আটকায়। বাসটা রেগে গিয়ে বিচিত্র আক্রোশ প্রকাশ করে যান্ত্রিক শব্দে, আবার ট্রামের পিছু নেয়। কলকাতার রাস্তাঘাট এরকমই, যাত্রীদের অভ্যাস আছে। কাজেই যে যার দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায় ঝিমোচ্ছিল। ইদানীং আমাদের সকলকেই একটু ঝিমুনী রোগে পেয়েছে।

এ সময়ে ভিড়ের ভিতর থেকে কে একটা ছোকরা আমার পাশে বসা উরু-ছড়ানো লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলল—আরে সমরদা, আপনি বাস-এ? গাড়ি কই? আমার পাশে বসা স্বাস্থ্যবান লোকটি একবার মুখ ফেরাল, একটু অমায়িক হাসল, বলল—তেল কেনার পয়সা নেই। সপ্তাহে তিন দিন গাড়ি বের করি।

—তা 'মিনি'তে গেলেই তো হয়।

—লম্বা লাইন হয় 'মিনি'তে। তার চেয়ে বাস-ই ভাল। টার্মিনাল থেকে উঠি, জায়গা পেয়ে যাই।

এসব সংলাপ শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে পাশে-বসা লোকটার ওপর শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ি। গাড়িওলা লোক বাস-এ যাচ্ছে। আমি নিজে একটু নড়ে-চড়ে আরো জায়গা করে দিই লোকটার উরু ছড়ানোর জন্য। গাড়ি চড়ে অভ্যাস, বাস-এ নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। আমি সঙ্কুচিত ভাবে বসে থাকি যাতে লোকটার কোন অসুবিধে না হয়।

লোকটা ছেলেটার সঙ্গে আরো দু-একটা কথা বলল। ছেলেটা জিগ্যেস করে, বৌদি ভাল আছে কিনা, মন্টু দার্জিলিং থেকে ফিরেছে কিনা, অমুক কেন স্টেটসম্যানের চাকরি ছেড়ে দিল। লোকটা প্রশ্নগুলির যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে গেল, ভাল আছে, ফিরেছে, আরো বড় চাকরি পেয়েছে বম্বেতে।

এইসব সংলাপের মধ্যেই বাসটা একফাঁকে একটা ট্রামকে পেরোতে পেরেছে। চমৎকার একটা ঢেউ খেয়ে, হঠাৎ কাৎ হয়ে গোঁ গোঁ করে ট্রামের গা ঘেঁষে যখন পেরোচ্ছিল তখন আমি খুবই আনন্দ বোধ করছিলাম, উত্তেজনাও। শাবাশ, এবার আমাদের লক্ষ্য আরো একটা ট্রাম। তাহলে জয় সম্পূর্ণ হয় এবং রাস্তার বাধা প্রায় থাকে না। দ্বিতীয় ট্রামটার পিছু ধরে ফেলেছে ড্রাইভার, মাঝে মাঝে ডানধারে কাৎ হয়ে বাসটা চেষ্টা

করছে পেরোতে। পারছে না। উল্টোবাগের গাড়ির বাগড়া। বাস ও ট্রামের এই প্রতিযোগিতায় আমি এমনই মন দিলাম যে বুঝতে পারি নি আমার পাশে-বসা স্বাস্থ্যবান গাড়িওলা লোকটি আমাকে লক্ষ্য করছে।

ব্যাপারটা খুবই অভাবনীয়। আমার চেনা-জানার পরিধিতে গাড়িওলা লোক বড় একটা নেই। আমার এক কাকার গাড়ি আছে, শুনেছি। উনি অমৃতসরে থাকেন, আমাদের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কই নেই। আমার এক মাসির ভাসুরের গাড়ি আছে। না, আর কারো কথা মনে পড়ে না। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জনা দুইয়ের পৈতৃক গাড়ি আছে বটে, নিজের কারো নেই। গাড়িওলা লোক আমার পরিধিতে বড় একটা আসে না। আমার বৃত্তটি বড় মধ্যবিত্ত।

লোকটি মুখ ফিরিয়ে নিল। জানালার বাইরে বৌবাজারের মোড়। এবার বাস বাঁক নেবে। লোকটি সে সময়ে আবার আমার দিকে তাকায়। তার খুব কাছাকাছিই আমার মুখশ্রী, এত কাছাকাছি কাউকে দেখতে কিছু অসুবিধে হয়, উনি আমাকে দেখছেন বলেই আমি লাজুকভাবে মুখ নত করে নিলাম।

লোকটা ঈষৎ বিস্ময়ের গলায় বলে—হত্তুকী না!

বটেই তো, রোগা ছিলাম বলে ইস্কুলে আমায় খ্যাপানো নাম ছিল হত্তুকী। কোন জাম্বুবান দিয়েছিল নামটা তা আজ আর মনে নেই।

বললাম—আজ্ঞে!

—আজ্ঞে-ফাজ্ঞে কী বলছিস? আমি সমরেন্দ্র। রাণী ভবানীতে পড়তুম। মনে নেই?

সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাবোধটা খানিকটা ফিকে হয়ে হয়ে গেল। ব্যাটাকে চিনতে পেরেছি। লাফঝাঁপে আর দৌড়ে ওস্তাদ ছিল, ফুটবল ক্রিকেট আর মারপিটে বেশ নাম-ডাকওলা ছিল সে সময়ে।

বললাম—তুই?

এইভাবেই আলাপ। তখন শীত আসি-আসি করছে, শীতের পরই বিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, যৌবন যায়-যায়, দাঁত গেছে, চুলও গেল। সে সময়ে সমরেন্দ্র তার গাড়ি বাড়ি সফলতা সমেত ডবলডেকারের মত সেঁধিয়ে গেল আমার জীবনে। বলল—একদিন আসিস বাড়িতে, মাল খাওয়াব, খাস তো?

—খাই। কৃতার্থ হয়ে বললাম।

ছেলেবেলার বন্ধুদের সঙ্গে বড় হয়ে দেখা হলে পর আমরা খুশি হই কিনা বলা কঠিন। খবরবার্তা নিই, পুরোনো দিনের কিছু কথা বলি। কিন্তু সম্পর্কটা আর বাড়াই না। কারণ ছেলেবেলায় আমরা একরকম থাকি, বড় হলে যে যার নিজের মত হই। কালক্রমে নিজেদের মনের মত বন্ধুও হয়। পুরোনো বন্ধুত্বটা স্রেফ স্মৃতিগন্ধময় হয়ে থাকে। ছেলেবেলার বন্ধুরা বড় হয়ে আর বড় একটা বন্ধু হয় না। কিন্তু সমরেন্দ্র গাড়ি-বাড়িওলা লোক, তার ওপর সে আমার অফিসের ফোনে মাঝে-মধ্যে ডেকে বলতে লাগল—কবে আসছিস?

একদিন গেলাম।

সন্ধ্যের পর দিব্যি ফটফটে আলো জ্বলছে বাড়িতে। বড়লোকী সব ব্যাপার। একটা শিকলে বাঁধা কুকুর ঘ্যাও করে ধমকাল। আমার বাসা থেকে বেশি দূরও নয়। সমরেন্দ্র বরাবর গাড়ি করে দোকানে গেলে আমার সঙ্গে কোনদিনই দেখা হত না। প্রায় এক পাড়াতে থেকেও আমাদের দুজনের দুরকম চলাফেরার দরুন কেউ কারো পথে পড়তাম না। ভাগ্যিস সমরেন্দ্র মাঝে সাঝে বাস-এ চড়ে।

ডাকলাম—সমরেন্দ্র।

কুকুরটা ধমকাল—ঘ্যাও।

সহজেই ভয় খাওয়া আমার স্বভাব। তবু এসেছি যখন, জানান দিতেই হয়। কলিংবেল টিপলাম। পর্দা সরিয়ে চমৎকার চেহারার এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। মুখখানা কিন্তু গম্ভীর।

খুব বিনয়ের সঙ্গে বললাম—সমরেন্দ্র?

উনি বললেন—আপনি?

—আমি সাত্যকী বোস। আজ আমার আসার কথা ছিল।

তাঁর মুখটা সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল। উনি হাসলেন এবং কী সুন্দর যে দেখাল মহিলাকে। ভারী দুষ্টু হাসিটি, বললেন—ওঃ হত্তুকী বোস...মানে, দেখুন তো, ও যা দুষ্টু না, আপনার নাম যে সাত্যকী তা বলেনি আমাকে। বলে গেছে হত্তুকী বোস আসবে, বসিয়ে রেখো।

আমি লজ্জা পেলেও খুশীই হলাম। ওঁর হাসিটির মধ্যে একটু উষ্ণতার প্রশ্রয় আছে। আমার ওপর যে দৃষ্টিটি দিয়েছেন সেটিও স্নিগ্ধ। আমি বললাম—সমরেন্দ্ররও একটা খ্যাপানো নাম ছিল।

উনি দরজা ছেড়ে দিয়ে বললেন—জানি, মুর্গীচোর। আপনি ভিতরে আসুন। ও এখুনি আসবে। একটু আগেই ফোন করেছিল, হত্তুকী এলে বসিয়ে রেখো।

ঘরে পা দিয়েই বুঝলাম, বাড়িতে লোকজন প্রায় নেই-ই। খুব নিস্তব্ধ। বড়লোকের বাড়ির মতই সাজানো গোছানো।

আমি ঘরে ঢুকতেই ফোন বাজল। উনি গিয়ে ধরলেন, বললেন—উনি এসে গেছেন। তোমার আর কত দেরী?...দেরী হবে? বলে মহিলাটি ফোনটা কান থেকে আলগা করে আমার দিকে চেয়ে বললেন—আপনাকে ডাকছে।

আমি গিয়ে ফোনটা ধরার সময়ে মহিলার হাত আমার হাতের সঙ্গে সামান্য ছুঁয়ে গেল। উনি রিসিভার ছাড়ছেন, আমি ধরছি, সে সময়ে।

সমরেন্দ্র ফোনে বলল—আমার বৌটা ভাল তো হত্তুকী? পছন্দ হয়েছে? আমি লজ্জা পেয়ে বললাম—যাঃ।

—বসে বসে গল্প কর। আমি একটু ফেঁসে গেছি, জাইস-ইকনের একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছে, বিজনেস টক চলছে। একটু দেরী হবে। আমার বৌকে বল স্কচ বের করে দেবে। বসে বসে খা। আসছি।

ফোন ছেড়ে এসে বসলাম। মুখোমুখি সমরেন্দ্রর বৌ।

একটু হেসে বললেন—আমার জীবনটাই এরকম। বাচ্চা-কাচ্চা নেই, ও বাসায় থাকে কমই। চাকর ঝি আর কুকুর নিয়ে থাকা।

খুবই সমবেদনার সঙ্গে চুপ করে রইলাম।

—দাঁড়ান, চা-টা হল কিনা দেখে আসি। এই বলে উনি উঠে গেলেন। আমি ওঁকে স্কচের কথা বললাম না। সমরেন্দ্রটা ছিটিয়াল, আমি তো তা নই।

বিস্তর চা খাবার নিয়ে চাকর এল, সঙ্গে উনি। এবার উনি মুখোমুখি বসলেন না, লম্বা সোফায় আমার পাশেই বসলেন। বললেন—তেমন কিছু নয়। ওটুকু পারবেন। সব বাড়ির তৈরী। সময় কাটে না তো, সারাদিন এইসব খাবার-টাবার বানাই, সেলাই-ফোঁড়াই করি। খান।

আপত্তি করতেও আমার মায়া হয়। যদিও আমার সাধ্যের চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশি তবু আমি ফ্রিশফ্রাই, মাংসের বড়া, চপ, পুডিং, পায়েস, মিষ্টি যন্ত্রের মত খেতে থাকি। উনি আর একটু পাশ ঘেঁষে বসেন। বলেন—কেমন হয়েছে?

আমি ওঁর গায়ের সুগন্ধটুকু পাচ্ছিলাম। সন্ধ্যেবেলা গা ধুয়েছেন বোধহয়, এলোচুল থেকে জলগন্ধ আসছে। গায়ে পাউডার, মুখে কোন মহার্ঘ্য ক্রীম। এইসব গন্ধের সঙ্গে সেন্টার টেবিলে রাখা একগোছা রক্তগোলাপের গন্ধ, তার সঙ্গে খাবারের গন্ধ। সব মিলেমিশে একটা তীব্র গন্ধের অনুভব। ভারী ভাল বৌ হয়েছে সমরেন্দ্রর।

আমি বললাম—চমৎকার। সবই চমৎকার। অতি চমৎকার।

উনি মিষ্টি এবং দুষ্টু হাসি হেসে বললেন—আসলে আপনিই চমৎকার মানুষ। আপনার বন্ধু তো বাড়িতে খায়ই না। সকালে ডিম-রুটি খেয়ে বেরোয়, দুপুরে রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ সারে, রাতে ফিরেই ড্রিংক্স করতে বসে। খাবারগুলো বিলিয়ে দিই রোজ।

—ভারী অন্যায়। আমি বলি—ভারী অন্যায় সমরেন্দ্রর।

এই সময়ে আবার ফোন বাজল, এবং উনি গিয়ে ধরলেন। ভ্রু কুঁচকে বললেন—আরো দেরী?...হ্যাঁ খাবার দিয়েছি...না না, উনি ওসব খেতে চাননি, সে তুমি এলে....বলে আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনাকে ডাকছে।

ফোন ধরতেই সমরেন্দ্র বলল—ভারী অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে রে! তুই চালিয়ে যা! আমার বৌটাকে ভাল লাগছে তো?

আমি বললাম—যাঃ!

ও বলে—শী ইজ এ গুড কম্প্যানী। আমি তো সময় পাই না, নইলে ওর সঙ্গে বসে থাকতে ভালই লাগে। আমি এসে স্কচ খুলব। একটু দেরী হচ্ছে, কিছু মনে করিস না। রাত হলে আমি গাড়ি করে পৌঁছে দেব।

সমরেন্দ্র কিন্তু এল না। খাবার টাবারের পর একবার চা খেলাম। তার দুঘণ্টা পর একবার কফি। ন'টা পর্যন্ত সমরেন্দ্রর বৌয়ের সঙ্গে একা ঘরে বসে রইলাম। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। বোঝানো যায় না।

সমরেন্দ্র শেষবার ফোন করল ন'টা বাজার কিছু আগে। উনি গিয়ে ধরলেন, ভ্রু কুঁচকে বললেন—বুঝেছি....আচ্ছা। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—ডাকছে।

ফোন ধরে শুনলাম, সমরেন্দ্রর শ্বাসের শব্দ আসছে। আমি কয়েকবার 'হ্যালো' বলার পর সে অতি কষ্টে উত্তর দিল—হত্তুকী?

বললাম—হুঁ।

সম্পূর্ণ মাতাল গলায় সমরেন্দ্র বলল—যাস না। আজ রাতটা থেকে যা। আমি ফিরতে পারছি না। সেই লোকটাকে এন্টারটেন করতে হচ্ছে। আজ রাতে ফিরব না। তুই থেকে যা।

আমি বললাম—যাঃ!

—তোর পায়ে ধরি হত্তুকী, বৌটা নাহলে একা থাকবে....থেকে যা।

আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। পাপচিন্তা। সেটাকে প্রশ্রয় দিলাম না অবশ্য। ন'টা নাগাত চলে এলাম। আসার সময়ে সমরেন্দ্রর বৌ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন—এক পাড়াতেই যখন থাকেন, মাঝে মাঝে আসবেন। খুব ভাল লাগবে।

সমরেন্দ্র ফেরেনি বটে কিন্তু সে রাতে তার বৌ আমাকে এত আপন করে নিয়েছিল, এমন মিষ্টি আর দুষ্টু হেসেছিল, এত খাবার-দাবার আর সুন্দর গন্ধ ছিল চারদিকে, এবং সেই সুন্দর মুখশ্রী, যে, ওখান থেকে বেরিয়ে এসেই পৃথিবীটাকে আমার খুবই বিশ্রী লেগেছিল। মনুর সঙ্গে আমি তিন দিন দেখাই করলাম না।

দিন তিনেক পর সমরেন্দ্র এসে আমার হাতে-পায়ে ধরে অনেক ক্ষমা-টমা চাইল। পরদিন নিজের গাড়িতে লিফট দিল অফিস পর্যন্ত। বলল রোববার আয়। রাতে নেমন্তন্ন রইল।

আপত্তি কী! গেলাম।

কুকুরটা সেরকমই শিকল নেড়ে ধমক দিল—ঘ্যাও। কলিংবেল টিপতেই উনি পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলেন। মুখ কিছুটা গম্ভীরও। কিন্তু আমাকে দেখেই হাসলেন—আসুন।

লক্ষ্য করি, ওঁর সাজগোজ আজ বেশ পরিপাটি। ফর্সা রঙে পাড়হীন একটা গাঢ় হলুদ শাড়ি, কপালে হলুদ টিপ। খোঁপা রজনীগন্ধা গোঁজা। প্রতিমার মত মুখশ্রীতে একটা মসৃণ কমনীয়তা।

সোফায় বসতে বসতে বললেন—সারাক্ষণ কান পেতে আছি, কখন আসবেন। একা একা সময় কাটছিল না। ডিমের একটা কারী করেছি, নতুন রেসিপি....

অবাক হয়ে বলি—সমরেন্দ্র?

উনি হাসলেন—নেই। আসেনি এখনো।

টেবিলের ওপর আজ রজনীগন্ধার একগোছা স্টিক। চমৎকার গন্ধ ছড়াচ্ছে। বসতে না বসতেই সমরেন্দ্রর ফোন এল আবার। আগের দিনের মতই হুবহু। প্রথমে উনি ধরলেন, তারপর আমি। সমরেন্দ্র মাপ চাইল।

বলল—আজ একটা মস্ত অর্ডার আছে রে, হোলসেল অর্ডার। মাল এখনো তৈরী হয়নি। তবে হচ্ছে। মোটে তো সাতটা বাজে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে যাব।

বসে রইলাম দুজন। দুবার চা খাওয়া হয়ে গেল। মাঝে মাঝে সমরেন্দ্রর ফোন এল। এই আসছে। এসে পড়ল বলে। আর দেরী নেই। রাত ন'টা নাগাত ঘড়ি দেখে সমরেন্দ্রর বৌ উঠে বলল—আপনার খিদে পেয়েছে। খাবার দিতে বলি।

একটু আপত্তি করলাম। উনি শুনলেন না। খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেলেন।

আবার প্রচুর খাবার এল। উনি পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন হয়েছে? ফ্রায়েড রাইস, মাংস, মাছ, ডিম, দৈ, মিষ্টি সাধ্যের অতীত খেয়ে যেতে যেতে বললাম—অপূর্ব! এরকম খাইনি।

ন'টার কিছু আগে সমরেন্দ্রর সেই মাতাল ফোন এল—থেকে যা হতুকী, বৌটা একা থাকবে। আমার মাল এখনো তৈরী হচ্ছে। লটটা প্যাক করতে রাত কাবার হয়ে যাবে। খুব জরুরী অর্ডার।

বুঝলাম। সেই বিদ্যুৎতরঙ্গ আজও খেলে গেল শরীরে। ফোনটা রেখে তকিয়ে দেখি সমরেন্দ্রর বৌ নিবিড় বড় বড় চোখ মেলে স্থির তাকিয়ে আছে, আমার দিকে। চোখে নীরব একটা প্রশ্ন।

যখন চলে আসছি তখন দরজার কাছ বরাবর আমার হাত ধরে থামাল—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নীচু স্বরে বলল—ও আপনাকে কী বলছিল?

একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। হেসে বললাম, মাতালের কথা!

বলা কি যায় ও সব কথা?

প্রায় দিন সাতেক মনুকে এড়িয়ে চললাম।

শীতকাল এসে গেল। টেনে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। মনুর অ্যাজমা বেড়েছে। আজকাল ঘরের বার হয় না, কম্ফর্টার জড়িয়ে থাকে, গায়ে ঢাকা গরম চাদর।

সমরেন্দ্র এসে মাঝে মাঝে তার গাড়িতে অফিস পর্যন্ত লিফট দেয়। খুব খাতির করে। একদিন বলল, রবিবারে চল পিকনিক করতে যাই। বৌ, আমি, তুই। ব্যাণ্ডেলে আমার একটা বাগানবাড়ি আছে। আমরা আগে চলে যাচ্ছি। তুই রবিবারে যাস।

গেলাম। ব্যাণ্ডেলের গঙ্গার ধারেই বেশ বড় বাগানওলা বাড়িটি, প্রচুর গাছগাছালি, নির্জনতা। চাকর আর সমরেন্দ্রর বৌ রান্না নিয়ে ব্যস্ত। বাগানের রোদ্দুরে সমরেন্দ্র শতরঞ্চী পেতে বোতল আর গেলাস নিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখে খুশী হয়ে বলল—আয়।

আমার অভ্যাস নেই। সমরেন্দ্র মাছের মত খায়। আমি দু আঙুল পরিমাণ স্কচ সোডা মিশিয়ে প্রায় সাদা করে ফেলে ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করে অর্ধেক খেলাম। ততক্ষণে সমরেন্দ্র বোতল প্রায় শেষ করে ফেলেছে। শেষ করে গাছতলায় শুয়ে পড়ল সে। পৃথিবীর বার হয়ে গেল। কেবল যাওয়ার আগে একবার অস্ফুট স্বরে বলল—বৌটাকে দেখিস। বড় একা।

রান্না করতে করতেই সমরেন্দ্রর বৌ এসে দৃশ্যটা দেখল খানিক। তারপর বড় বড় চোখ দুটো আমার চোখে স্থাপন করে বলল—কতখানি গেলা হয়েছে?

আমি ভাবলাম বোধহয় সমরেন্দ্রর কথা জানতে চাইছে। বললাম—ও অনেক খেয়েছে।

সমরেন্দ্রর বৌ ভ্রু কুঁচকে বলল—সেটা জানি। নিজে কতটা খাওয়া হয়েছে?

ভাববাচ্যে কথা! শরীরের ভিতরের একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ আবার। সমরেন্দ্রর জন্য ওর দুশ্চিন্তা নেই, আমার জন্য আছে! ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

সমরেন্দ্রর খাওয়ার কথা ওঠে না, গাছতলায় তখনো রোদে আর ছায়ায় শুয়ে আছে গুলি খাওয়া মানুষের মত। সমরেন্দ্রর বৌ আর আমি মুখোমুখি বসে দুপুরের খাওয়া খেলাম। তারপর সমরেন্দ্রর বৌ বলে—চলুন বেড়িয়ে আসি।

যখন বেরোচ্ছি, তখনও সমরেন্দ্র একইভাবে শুয়ে আছে। মাথার চুলে কুটোকাটা পড়েছে। মুখে রোদ, ঘাম হচ্ছে। তার পাশ দিয়েই যাচ্ছি। আমাদের দুজনের ছায়া ওর নিস্তব্ধ, নির্বিকার মুখের ওপর ক্ষণেকের জন্য পড়ল। সরে গেল।

গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে টেড়িয়ে আমরা ফেরার পথে একটা মৌমাছি পালনকেন্দ্র দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। ছোট কুঁড়েঘর, চারধারে মৌমাছির শব্দ। একটা অল্পবয়সী ছেলেকে দেখতে পেয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করল সমরেন্দ্রর বৌ—ভাই, একটু দেখা যায়?

—আসুন। বলে, সে ডেকে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। ঝুপড়ি মত অন্ধকার ঘর। ভন ভন করছে মৌমাছি। বসছে, উড়ছে, আবার বসছে। আমার মাথায় আর হাতে দুবার ছুঁয়ে গেল দুটো। সমরেন্দ্রর বৌয়ের চুলে একটা কাঠচাঁপা ফুল, সেটাতে সেঁধিয়ে গেল একটা, ভারী ভয় পাচ্ছিলাম।

ছেলেটা আমাদের মৌমাছির কৃত্রিম চাক দেখাল। ছোট ছোট কাঠের বাক্স, ভিতরে চাক, মৌমাছি গিজ গিজ করছে। সেই ভীড় থেকে একটা বড়সড় মৌমাছিকে সাবধানে তুলে আনে ছেলেটা, দেখিয়ে বলে—এ হচ্ছে রাণী। যখন এ চাকটা মধু ভরে যাবে তখন রাণীকে সরিয়ে নিই। রাণী সরে গেলে সব মৌমাছি সরে যায়।

দেখতে দেখতে অন্যমনে সমরেন্দ্রর বৌ বেখেয়ালে খোঁপা ঠিক করতে হাত বাড়িয়েছিল, হঠাৎ বলল—উঃ!

ফুলের ভিতরকার মৌমাছিটা কামড়েছে। আঙুলটা মুহূর্তে লাল হয়ে গেল। নরম আঙুল তো। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে একটু মধু লাগিয়ে দিয়ে বলল—কিছু না দিদি, সেরে যাবে। আমাদের কত কামড়ায়।

ফেরার পথে দুজনেই চুপচাপ ফিরছিলাম। বাড়ির গেটের কাছে এসে সমরেন্দ্রর বৌ বলল—বড্ড জ্বালা করছে।

আমি সমবেদনার সঙ্গে বললাম—একটু করবেই। দেখি।

ও হাতটা তুলে দেখাল। আমি দেখলাম, ডান হাতের কনিষ্ঠাটি ফোলা লাল। কী, সুন্দর আঙুল। কী নরম স্পর্শ। হাতটা ছাড়লাম না, বারংবার বুকের মধ্যে বজ্রপাত হচ্ছে।

গাছতলাটা পেরিয়ে যাচ্ছি। সমরেন্দ্রর কথা মনেই ছিল না। ওর বৌয়ের হাতটা তখনো আমার হাতে ধরা।

কিন্তু লক্ষ্য না করলেও সমরেন্দ্র ছিল। মহাকালের মত উঠে বসে আছে, গাছের গুঁড়িতে ঠেস, সামনে পা দুটো ছড়ানো, ঠোঁটে সিগারেট। চমকে উঠে হাত ছেড়ে দিলাম। সমরেন্দ্র শুধু অবহেলায় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল। এবার আমার বুকের মধ্যে অন্যরকম বজ্রপাত হচ্ছিল। অন্যরকম বিদ্যুৎস্পর্শ। সমরেন্দ্র কিছু মনে করেছে বলে মনে হয় না। উঠে প্যান্ট-ট্যান্ট ঝেড়ে একটু হেসে বলল—আউট হয়ে গিয়েছিলাম রে হত্তুকী। বড্ড খিদে পেয়েছে।

বলে বৌয়ের দিকে চেয়ে বলল—কিছু খাওয়াবে নাকি?

ওর বৌ কিন্তু মোটেই আমার মত ঘাবড়ায়নি। বরং ঠোঁট ফুলিয়ে একটু অভিমানের মত ভঙ্গী করল। তারপর একছুটে চলে গেল সমরেন্দ্রর বুকের কাছটিতে, ব্যথার আঙুলটা তুলে দেখিয়ে বলল—দেখ, মৌমাছি কামড়েছে।

সমরেন্দ্র একহাতে ওর কোমর ধরে কাছে টেনে অন্য হাতে আঙুলটা দেখল একটু। তারপর মুখের মধ্যে আঙুলটা পুরে দিয়ে লালা আর তাপ লাগিয়ে দিতে দিতে বলল—খুব মিষ্টি আঙুল তো।

ওর বৌ অপার্থিব একরকম চোখে ওর দিকে চেয়ে ছিল মুখ তুলে। তখন গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। একটা মাকড়সার জালে আলো লেগে সোনার তারের মত দেখাচ্ছে। বাতাসে বনগন্ধ, ফুলে ফুলে পোকাদের শব্দ। আকাশে সোনার সিঁড়ির মত মেঘের স্তরের পর স্তর। কী সুন্দর বিকেলটি। কিন্তু ঐ মেয়েটির কাছে কিছুরই অস্তিত্ব নেই, সমরেন্দ্র ছাড়া। আমাকে ডাকল না, ফিরেও দেখল না, সমরেন্দ্রকে ধরে ধরে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে। খাওয়াবে।

সমরেন্দ্র এখনো গাড়িতে মাঝে মাঝে লিফট দেয়। নেমন্তন্ন করে। নানা অজুহাত দেখিয়ে আমি সমরেন্দ্রর বাড়িতে আর যাই না। শীত শেষ হয়ে গেল। চৌঠা ফাল্গুনের আর দেরী নেই। মনুর অ্যাজমার টানটা কমেছে। বিয়ের চিঠি ছাপাতে দিয়েছি।

সমরেন্দ্রর বাড়িতে আর একবার যাব। নেমন্তন্ন করতে।

দূরত্ব পৌনে এক সেকেন্ড

বিশ্বে কাপুরুষরাই সংখ্যাধিক। তাদের নিয়েই গণতন্ত্র, রাষ্ট্র, জনসমাবেশ। তাদের ভোটেই নির্বাচিত হয় এম এল এ, এম পি বা রাষ্ট্রনেতারা। তারাই জনগণেশ। তারা খুন করতে পারে না, আত্মহত্যা করতে ভয় পায়, ইচ্ছে থাকলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না। তারা সুন্দরী মেয়েদের সামনে, মাইকের সামনে বা ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে নার্ভাস হয়ে পড়ে।

স্বাস্থ্যবান বা মারকুট্টা লোক দেখলে তারা এড়িয়ে যায়। অল্পবিস্তর অপমান তারা সর্বদাই গায়ে না মাখবার চেষ্টা করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তারা পৃথিবীর কোনও ঘটনাকেই তেমন প্রভাবিত করতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, স্ত্রীকে তারা এতই ভয় পায় যে তার প্রেমিক সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই তোলে না। এমন কি কোনও কোনও কাপুরুষ, অসময়ে বাড়ি ফিরে এসে যদি টের পায় যে, তার স্ত্রীর ঘরে প্রেমিক রয়েছে তাহলে সে নিঃশব্দে বাইরে অপেক্ষা করে, পায়চারি করে এবং গুনগুন করে গান গায়।

তারানাথের গলায় অবশ্য সুর আছে। বাথরুমে সে মন্দ গায় না। কিন্তু প্রায় সোয়া দুই ঘণ্টা প্লেন জার্নির পর এয়ারপোর্ট থেকে এতটা পথ এসে বাইরে অপেক্ষা করতে তার খুবই খারাপ লাগছে। ফলে গলায় সুর খেলছে না। তার বেশ খিদে পেয়েছে এবং শীতও করছে। সে অতিশয় ছোটখাটো, রোগা ও দুর্বল মানুষ। সহজেই তার ঠাণ্ডা লেগে যায়। তারানাথের শরীরটা খুবই তুচ্ছ ধরনের হলেও, মস্তিষ্কে সে অতিশয় শক্তিশালী। সে একটি মস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার টেকনিক্যাল রিসার্চ অফিসার। তাকে প্রায়ই দেশের নানা জায়গায় যেতে হয়। সে মোটা মাইনে পায়। কিন্তু এসব সফলতা তাকে গর্বিত বা আত্মবিশ্বাসী করে তোলে না। তার কেবলই মনে হয়, পুরুষ হয়েও পৌরুষের অভাব, বীরত্ব বা সাহসের অভাব থাকাটাই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

পায়চারি করতে করতে সে গাছের গাঢ় ছায়ার নিচে দাঁড় করানো মোটরবাইকটার কাছে এসে দাঁড়াল। জাঁদরেল চেহারার মস্ত বুলেট। শক্তিমান মানুষেরাই অকুতোভয়ে এই মারাত্মক যানটিতে সওয়ার হয়। মোটরবাইকটিকে বিলক্ষণ চেনে তারানাথ। এটি তার স্ত্রীর প্রেমিক প্রসেনজিতের।

শরীর দুর্বল হলেও তারানাথের পর্যবেক্ষণ শক্তি খুবই তীক্ষ্ন। বস্তুত এই পর্যবেক্ষণ শক্তির জোরেই সে এখনও নিরাপদে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। ট্যাক্সি থেকে নেমেই সে চারদিকটা সতর্কতার সঙ্গে দেখে নিয়েছিল, যেমনটা সে সবসময়েই নেয়। তখনই রাতের আবছায়াতেও গাছের ঘুপসি ছায়ার নিচে বাইকটা তার নজরে পড়ে। বাড়িতে ঢুকবার আগে সে একটু এগিয়ে বাইকের নম্বর প্লেটটা মিলিয়ে নিল এবং দুইয়ে দুইয়ে চার করতেও দেরি হল না। বাইকটা প্রসেনজিতের।

প্রসেনজিৎকে সে প্রথম আবিষ্কার করে বিয়ের বছরখানেক বাদে, এরকমই এক অসময়ে হঠাৎ বাড়ি ফিরে এসে। স্ত্রী মালা দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখছিল তাকে।

মালার পিছনে প্রসেনজিৎ—বড়সড় চেহারার সুপুরুষ একটি যুবক।

খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল তারানাথ। নিজেকে হঠকারী বলে মনে হয়েছিল তার।

মালা খুবই মিষ্টি একটু হেসে বলেছিল, এ হল আমার মাসতুতো ভাই প্রসেনজিৎ। বিয়ের সময় পিঁড়ি ধরেছিল মনে নেই?

এই মিথ্যে কথাটা বলেই মারাত্মক ভুল করেছিল মালা। কারণ সে জানে না, তারানাথের পর্যবেক্ষণ ও স্মৃতি কতটা ক্ষুরধার ও সূক্ষ্ম। বিয়েতে যে মোট পাঁচজন পিঁড়ি ধরে সাতপাকে মালাকে তারানাথের চারদিকে ঘুরিয়েছিল তাদের প্রত্যেকের চেহারা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তারানাথের মনে আছে। বিয়েবাড়িতে আমন্ত্রিত অতিথিদের কাউকেই তারানাথ বিন্দুমাত্র ভোলেনি। না, এই প্রসেনজিৎ বিয়েবাড়িতে ছিল না।

এসো, এসো, আলাপ করিয়ে দিই।

দুজনেই অতিশয় চতুর এবং অভিনয়পটু। প্রসেনজিৎ মালার ভাই সেজে দিব্যি আলাপ করল তার সঙ্গে। হাসিঠাট্টাও করল। কিন্তু সংকোচবশে তারানাথ কিছুতেই জিজ্ঞেস করতে পারল না যে, রাত সওয়া এগারোটার সময়ে মাসতুতো বোন বা দিদির খোঁজ নিতে আসার কী এমন দরকার পড়েছিল তার? তারানাথ এও জানে, মালার কোনও আপন মাসি নেই এবং দূর সম্পর্কেরও কেউ আছে কিনা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়।

সে যে যথেষ্ট পুরুষ নয় এবং তাকে দিয়ে যে মালার কিছু হচ্ছে না এটা মালা এর পর থেকেই তাকে বুঝিয়ে দিতে থাকে। এবং প্রায় সময়েই প্রসেনজিতের মোটরবাইক তারানাথের অনুপস্থিতিতে এসে থামে তার বাড়ির সামনে। এবং যা হওয়ার তা হয়। তারানাথ মোটরবাইকের নম্বরটা নিজের নিরাপত্তার কারণেই মনে রেখেছে। ক্রৌঞ্চমিথুনকে বাধা দেওয়ার ফলে কার ভাগ্যে যেন কার অভিশাপ জুটেছিল! তারানাথ কাপুরুষ মানুষ, সে ওসব ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চাইল না। বিপদে কারা যেন অর্ধেক ত্যাগ করেন! সে সেরকমই পন্থা নিল। প্রকৃতি নাকি সর্বদাই শূন্যস্থান ভরে দেন। তারানাথের শূন্যস্থান সুতরাং যদি আর কেউ পূর্ণ করে থাকে তবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তারানাথ তাতে আপত্তি করতে পারে না।

কাপুরুষেরা নিজের কাপুরুষতা ঢাকতে নানারকম যুক্তি ও অজুহাত খাড়া করে নেয় নিজের কাপুরুষোচিত আচরণের সমর্থনে। তবে একথা ঠিক, প্রসেনজিৎ বা মালাকে প্রহার বা সম্ভবস্থলে খুন করারও ইচ্ছে তারানাথের হয়। আত্মহত্যার কথাও সে ভাবে। আবার এও ভাবে যে, কে জানে বাবা ওরা হয়তো সত্যিই মাসতুতো ভাইবোন এবং বন্ধ ঘরে বসে হয়তো নিতান্তই গল্পটল্প করে।

রাত বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। দরজার পাশে সুটকেস রেখে অপেক্ষা করছে তারানাথ। প্রসেনজিতের যদি আজ এখানেই রাত্রিবাস করার ইচ্ছে থাকে তবে তার পক্ষে একটা সমস্যা দেখা দেবে। হোটেলে চলে গেলে হত, কিন্তু এত রাতে সে ট্যাক্সি পাবে না। সল্ট লেক-এর এই অঞ্চল থেকে বড় রাস্তা অনেক দূর।

তবে সে যে বাইরে অপেক্ষা করছে এটা জানতে পারলে প্রসেনজিৎ লজ্জিত হয়ে বেরিয়ে যেতেও পারে। কিন্তু জানান দেওয়ার কোনও পন্থা সে খুঁজে পাচ্ছে না। ডোরবেলটা একবার ছোট্ট করে বাজিয়ে আড়ালে লুকিয়ে থাকলে কেমন হয়? কিন্তু এতটা করতে তার সাহস হল না। কিন্তু এদিকে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তার দুর্বল পা ব্যথা করছে, মাজা টনটন করছে, খিদে ও তেষ্টা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। তার চেয়েও বেশি হচ্ছে আত্মধিক্কার।

সে মোটরবাইকটার দিকে খুবই লোভাতুর চোখে চেয়েছিল। এইসব ভয়ংকর পুরুষোচিত, বীরোচিত যানবাহন সে ইহজীবনেও চালনা করতে পারবে না। খুব সাবধানে, ঈর্ষার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে সে একবার শীতল যন্ত্রটির একটি হ্যান্ডেল একটু স্পর্শ করল।

হঠাৎ তার মনে হল, সে তো এই মোটরবাইকটার সিটে উঠেই খানিকক্ষণ বসে জিরিয়ে নিতে পারে। থেমে-থাকা মোটরবাইক তো আর বিপজ্জনক নয়। দরজা খোলার আভাস পেলেই সে বরং টক করে নেমে একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে!

জীবনে কখনও মোটরবাইকে ওঠেনি তারানাথ। আজ উঠল। কী বিশাল আকৃতির জিনিস! কী করে এটা লোকে চালায় তা ভেবে পায় না তারানাথ। মানুষের ক্ষমতার কি কোনও শেষ নেই?

তারানাথ মোটরবাইকে বসবার পর বেশ একটা আরাম অনুভব করল। আরামে একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, আঃ!

তার ঘুম পাচ্ছে, হাই উঠছে। সে একটা হাই তুলল এবং চোখটা একটু বন্ধ করে রইল।

মোটরবাইকটা কি একটু দুলে উঠল হঠাৎ? চমকে চোখ চাইল তারানাথ। না, কিছু নয়। আবার চোখ বুজে ফেলল সে।

খট করে একটা শব্দ হল এবার এবং মোটরবাইকটা হঠাৎ স্ট্যান্ড থেকে একটা দোল দিয়ে নেমে পড়ল। আতঙ্কিত তারানাথ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ার চেষ্টা করতে গেল। মোটরবাইকের স্ট্যান্ড জিনিসটা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। সে নিশ্চয়ই বেকায়দায় বসেছে, ফলে স্ট্যান্ড হয়েছে স্থানচ্যুত। এখনই বিকট শব্দে ভারী বাইকটা পড়বে। তাতে দুটি ঘটনা ঘটবে। প্রসেনজিৎ টের পাবে এবং ভারী বাইকটা নিয়ে পড়ে তারানাথের হবে চোট।

স্ট্যান্ড থেকে পড়ে বাইকটা খানিকদূর গড়িয়ে গেল টলমল করতে করতে। আতঙ্কিত তারানাথ লাফিয়ে পড়ার জন্য হাঁচোড় পাঁচোড় করতে লাগল। কিন্তু এই বিপুল যন্ত্রপাতি সমন্বিত এবং মোটকা চেহারার বাইক থেকে কিছুতেই নামতে পারল না।

কিন্তু বাইকটা গড়িয়েই যেতে লাগল। পড়ল না। টলমল করছিল ঠিকই, কিন্তু পড়ছিল না। গড়িয়ে গড়িয়ে তাকে নিয়ে—যেন পেরাম্বুলেটরে শিশুর মতো—চলতেই লাগল। তারানাথ ঝুঁকে বাইকটার হ্যান্ডেল ধরে রইল শক্ত করে। এভাবে কতদূর যাওয়া যাবে? বিজ্ঞানী হিসেবে সে জানে, গড়ানো জিনিসের গতি বেশিক্ষণ অব্যাহত থাকে না। বাতাস, ফ্রিকশন নানারকম বাধায় সে গতি হারাবেই এবং ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে যাবেই।

বাইকটা তার অনুমান ও আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে কিন্তু চলতেই লাগল। চলতেই লাগল। তারানাথ কাঠ হয়ে বসে আছে সিটে এবং তীক্ষ্ন বুদ্ধি দিয়ে ভেদ করার চেষ্টা করছে রহস্যটাকে।

আচমকাই বাইকটা বাঁই করে একপাক ঘুরে গেল। তারানাথের মাথাটাও একটা পাক খেল। চোখে অন্ধকার দেখল সে। এক ঝাঁক ঘণ্টার শব্দ হল কোথাও। তারপর একটা জলতরঙ্গের শব্দ। বাতাসে একটা বিচিত্র কম্পন বয়ে যেতে লাগল। মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল তারানাথের।

বাইকটা কি থেমেছে? চোখ খুলতে তারানাথের খুব কষ্ট হচ্ছিল। মাথাটা বেশ ঘুরছে। কেমন একটা বমি-বমি ভাব। বেশ কয়েক মিনিট চোখ বুজে থাকতে হল তারানাথকে। সে চোখ না খুলেও টের পাচ্ছিল, চারদিকে একটা কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। খুব সাংঘাতিক পরিবর্তন। রোগা মানুষ বলেই তার অনুভূতি খুব প্রখর।

সে ভয়ে-ভয়ে চোখ খুলল। এবং খুবই অবাক হয়ে গেল। তার চারদিকে এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। বাড়িঘর কিছুই নেই। তার বদলে চারদিকে একটা বেশ ঝোপঝাড়ে ভরা জঙ্গল। মাঝখানে গোলপানা একটা বাঁধানো চাতালে বাইকটা দাঁড়িয়ে আছে।

বিস্ময়টা তারানাথকে ধাক্কা দিল বটে, কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক তারানাথের বুঝতে অসুবিধে হল না যে, সে আসলে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নে তো কত অদ্ভুত কাণ্ডই হয়। নিজেকে জাগ্রত করার জন্যই তারানাথ নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে গোটা কয়েক চড় দিল। হাতে পেল্লায় চিমটি কাটল। বিড়বিড় করে বলল, ঘুমিয়ে পড়লে যে কেলেঙ্কারি! প্রসেনজিৎ বেরিয়ে এলে আমাকে দেখে ফেলবে যে! কী লজ্জার কথা!

কিন্তু ঘুম ভাঙল না। অর্থাৎ তারানাথ তার চারদিকে সল্টলেক-এর পরিচিত পরিবেশটা ফিরিয়ে আনতে পারল না। খুবই মুশকিলে পড়ে গেল সে। বাইক থেকে নেমে দাঁড়াতে তার, বিশেষ অসুবিধে হল না এখন।

নেমে সে অনুভব করল, বাঁধানো চাতালটা কিছু অদ্ভুত। ভিতর থেকে যেন খুব মৃদু একটা আভা বেরিয়ে আসছে। আলোর মতো।

বিজ্ঞানী তারানাথের কৌতূহল অতএব অন্যদিকে ধাবিত হল। সে হাঁটু গেড়ে বসে জায়গাটা হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বলল, এটা কী জিনিস? পি ভি সি নাকি?

খুব কাছ থেকেই কে যেন বলল, না, পি ভি সি নয়।

লোকটা প্রসেনজিৎ নাকি? তারানাথ তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠল, না, আমি প্রসেনজিৎ নই।

তারানাথ ভয় এবং উদ্বেগের সঙ্গে বলল, আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছি?

না। আপনি সম্পূর্ণ জাগ্রত।

তাহলে চারদিকে এসব কী?

পৃথিবী। তবে ভিন্ন সময়-তরঙ্গের পৃথিবী।

তার মানে?

আপনি তো বিজ্ঞানী মানুষ! তরঙ্গ কাকে বলে তা তো জানেন।

জানি।

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝবেন যে, তরঙ্গ পাল্টে গেলে সব কিছুই অন্য রকম হয়ে যেতে পারে?

খুব স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। আপনি কে বলুন তো! দেখতে পাচ্ছি না কেন?

দেখা দিচ্ছি না বলে। একটু অপেক্ষা করুন। এই সময়-তরঙ্গের পৃথিবীর আবহাওয়া মানিয়ে নিতে আপনার আর কয়েক মিনিট সময় লাগবে। আপনি অসুস্থ বোধ করছেন না তো!

শরীরটা একটু কেমন যেন লাগছিল। এখন ঠিক আছি।

বড় করে শ্বাস নিন। এই তরঙ্গের পৃথিবীর আবহাওয়া খুবই ভালো। দূষণ নেই, জীবাণু নেই, অক্সিজেন বেশি।

তারানাথ বড় করে শ্বাস নিল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ সুস্থ ও চনমনে বোধ করতে লাগল।

এখন কেমন লাগছে?

চমৎকার। কিন্তু খুব বোকা-বোকা লাগছে নিজেকে।

একটু হাসির শব্দ হল। কণ্ঠস্বর বলল, আপনি মোটেই বোকা নন।

তাহলে আমি এই তরঙ্গ পরিবর্তনের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না কেন?

বুঝতে পারবেন। আপনি ছাড়া আর কে বুঝবে? আপনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। আপনার পায়ের তলায় একটা লিফট আছে। সেটা চালু করছি।

তারানাথ শক্ত হয়ে দাঁড়াল। তার পায়ের নিচের অংশটা নিখুঁত একটা চতুষ্কোণ হয়ে চাতাল থেকে মৃদু মসৃণ গতিতে তাকে নামিয়ে নিতে লাগল। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে একটি উজ্জ্বল আলোকিত ঘরে এসে পড়ল। পায়ের নিচের লিফটটা মেঝের সঙ্গে এত নিখুঁতভাবে মিশে গিয়ে থামল যে, জোড়ের চিহ্নও রইল না।

সামনেই একজন মানুষ দু'হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, আসুন, আসুন।

লোকটিকে তার তীক্ষ্ন চোখে দেখে নিল তারানাথ। বিবর্তনের হিসেবে লোকটি কিছু এগিয়ে আছে, সন্দেহ নেই। দীর্ঘকায়, ছিপছিপে, মেদহীন, লাবণ্যময় চেহারা। সবচেয়ে বড় কথা, চেহারা ছাড়িয়ে আর এক ধরনের লাবণ্য লোকটাকে বর্মের মতো ঘিরে রেখেছে। সেটা যে কী তা ধরতে পারল না তারানাথ। তবে সেটা এমন কিছু যা দেখলে মনটা খুশি হয়ে উঠতে চায়। প্রসন্নতা কাকে বলে তা এতকাল তারানাথ জানতই না। কোনও লোককে দেখেই সে এতকাল এত প্রসন্ন বোধ করেনি।

ঘরটাও চমৎকার। তেমন কোনও আসবাব নেই। ঘরটি আলোকিত কিন্তু আলোর কোনও উৎস নেই। সবকিছুই যেন আভা বিকিরণ করছে। তারানাথ তার বিজ্ঞানীর চোখ দিয়েই সব দেখে নিল। এটা যে চূড়ান্ত টেকনোলজি তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবত এ ঘরের যাবতীয় পরমাণুই এই আলোটি বিচ্ছুরিত করছে, কিন্তু কোনও সংঘর্ষ বা বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে না। কোনও তাপও নেই।

বসুন।

ঘরে মাত্র দুটি আরাম কেদারার মতো জিনিস। তারানাথ সামনের কেদারাটিতে বসতেই কেদারাটি যেন তৎপর সক্রিয়তায় তার দেহের সব খোঁজখবর নিয়ে ঠিক যেভাবে বসলে তার যথেষ্ট আরাম হয়, অথচ শরীর এলিয়ে পড়ে না ঠিক সেইভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল। আশ্চর্য আসন।

আপনি আরাম বোধ করছেন তো?

তারানাথ মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ। এবার বলুন আমি ঠিক কোথায়।

বলেছি তো আপনি পৃথিবীতেই আছেন, তবে সময়-তরঙ্গের সামান্য তফাতে। এক সেকেন্ডের কয়েক ভগ্নাংশ মাত্র তফাত।

আপনারা কি ভবিষ্যৎ কালের পৃথিবীতে বাস করেন?

না। আমরা আপনার প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের দূরত্বে অবস্থান করি। ধরুন, আপনার পকেটের কলমটিকে যদি সময়ের পাল্লায় মাত্র এক পলক এগিয়ে দিই তাহলে কলমটি অদৃশ্য হবে বটে, কিন্তু তখনও সে ওইখানেই থাকবে। কিন্তু আপনি তাকে দেখতে বা ছুঁতে পারবেন না।

এ ব্যাপারটা আমার অজানা নয়। এ নিয়ে সায়েন্সফিকশন লেখা হয়।

তবে আমরা ফিকশন নই। বাস্তব। আমরা আপনাদের মতোই পৃথিবীতে বাস করি, চাষবাস হয়, বিয়ে হয়, সন্তান হয়। আমাদেরও চন্দ্র সূর্য আছে। তবে আলাদা মাত্রার, ভিন্ন সময়-তরঙ্গের। তাই একই পৃথিবীতে বসবাস করলেও আপনাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় না, আপনাদের বাতাসে আমরা শ্বাস নিই না, আপনাদের সূর্য আমাদের আলো দেয় না।

প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

লোকটি মৃদু হেসে বলল, আপনি এখন যেখানে রয়েছেন সেখানে আপনাদের সল্ট লেক টাউনশিপ। অথচ এখানে রয়েছে একটা জঙ্গল। কিন্তু সহাবস্থান এটা নয়। আপনাকে মাত্র এক সেকেন্ডের তিন চতুর্থাংশ এগিয়ে আনা হয়েছে। সেই সঙ্গে বদলে গেছে আপনার অস্তিত্বের স্পন্দন ও বিকিরণ। এখান থেকে মাত্র দুশো গজ দূরে আপনার চমৎকার বাড়িটি। বাড়িতে আপনার স্ত্রী এবং...

বলে লোকটি সতর্কভাবে চুপ করে গেল।

এবং?

লোকটি মৃদু স্বরে বলল, আমি সবই জানি।

তারানাথ লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল। তারপর ক্লিষ্ট মুখখানা তুলে বলল, আমি জানতে চাই না।

লোকটি তার দিকে করুণ চোখে চেয়ে বলল, এ ঘরে একটিও দরজা নেই। সবটাই দেয়াল। আবার সবটাই দরজা। একটিও দেয়াল নেই। আপনি কয়েক পা হেঁটে যান। তাহলে বুঝতে পারবেন।

বিজ্ঞানমনস্ক তারানাথ কৌতূহলী হল। উঠে সামনের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে গিয়ে দেখল, বাস্তবিকই যা দেয়াল বলে ভ্রম হয়েছিল আসলে তা একটি বিকিরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করা অস্বচ্ছ ঘেরাটোপ। তার হাত কোথাও বাধা পেল না। দেয়াল ভেদ করে সে একটি বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়াল। এমন অদ্ভুত সবুজ ও ঘন গাছপালা সে কখনও দেখেনি। অচেনা ফুল ও ফলের ঐশ্বর্যে গাছগুলো নুয়ে পড়ছে যেন। কী সুন্দর গন্ধ! পাখির কী মধুর ডাক!

কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল। এক সেকেন্ডের তিন চতুর্থাংশ তফাতে এত কিছু?

লোকটি নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, ওই দেয়ালটি যেমন আছে, তেমনি আবার নেইও। এই বাগানটিও তেমনি। আছে আবার নেইও।

সে কেমন?

মাত্র আধ সেকেন্ড সরে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন, বাগান নেই, কিছু নেই।

তা বটে।

এই যে আছে এবং নেই, এই থাকা এবং না-থাকা, পজিটিভ আর নেগেটিভ—আপনাদের বিজ্ঞান এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

বিনীতভাবে তারানাথ বলল, আপনাদের বিজ্ঞান আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত।

লোকটি উদাস গলায় বলে, বিজ্ঞানের চেয়েও বেশি প্রয়োজন দার্শনিক বিজ্ঞানের। আমাদের বিজ্ঞান আমাদের চিন্তাভাবনারই অনুসরণ করে। অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বহীনতা আমাদের বিজ্ঞানের মূল কথা। আপনি কি এই পৃথিবীর একটি ফল খাবেন? খান না! হাতের নাগালেই তো রয়েছে।

সামান্য উদ্বেগের সঙ্গে তারানাথ বলে, খেলে কিছু হবে না তো?

লোকটি মৃদু হেসে বলে, এ তো জ্ঞানবৃক্ষের ফল নয়, বিষাক্ত ফলও নয়। আপনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই বলছি।

তারানাথ হাত বাড়িয়ে সামনের ঝুপসি ছোট্টো গাছে ফলে-থাকা সবুজ গোলাকার একটি ফল তুলে নিতে গেল। তার মনে হল, ফলটাও যেন তার হাতের দিকে সাগ্রহে এগিয়ে এল একটু। এবং ছিঁড়তেও হল না, ফলটি আপনা থেকেই যেন লাফ দিয়ে তার মুঠোর মধ্যে চলে এল। তারপর সবিস্ময়ে তারানাথ লক্ষ করল, যে-বোঁটা থেকে ফলটা খসে এল সেই জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে একটি কুঁড়ি ফুটে উঠল, কয়েক পলকে হয়ে গেল ফুল, তারপর ফুল থেকে অবিকল তার হাতের ফলটির মতো আর একটি ফল ঝুলতে লাগল সেখানে।

আশ্চর্য! অলৌকিক!

লোকটি বলল, না, অলৌকিক নয়। শুধু প্রসেসটিকে দ্রুততর করে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের পৃথিবীতে যেটা ঘটতে এক মাস সময় লাগে আমাদের এখানে তা ঘটে এক সেকেন্ডে।

তারানাথ লোকটির দিকে চেয়ে বলল, ফলটা যেন নিজেই আমার হাতে চলে এল!

আমাদের উদ্ভিদ, পশুপাখি এমন কি জড় বস্তুগুলিও কিছু উন্নত।

কিন্তু গাছ বা জড় বস্তুর তো মস্তিষ্ক নেই!

মস্তিষ্ক সম্পর্কে আপনাদের ধারণা এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। মস্তিষ্ক নিজেই তো একটি জড় বস্তু। বিশেষ ধরনের কোষ, তন্তু, রাসায়নিক পদার্থের সমাহার।

তা বটে।

জড় বস্তুর মধ্যে যে চৈতন্য নিহিত থাকে তার সন্ধান আপনাদের বিজ্ঞান এখনও পায়নি। সন্ধান করেওনি। এখানে যা-কিছু হয় তার মূলে আছে ওই চৈতন্য। ফল বা গাছের মস্তিষ্ক না থাক, ক্রিয়াশীল চৈতন্য আছে।

আমাদের বিজ্ঞান এটা মানবে না।

মানা তখনই আসে যখন জানা যায়। মানা তো জানাকেই অনুসরণ করে।

এই গাছপালা, ফুলফল এরা কি চৈতন্যময়?

অবশ্যই! আমরা শুধু তাদের নিষ্ক্রিয় চৈতন্যকে ক্রিয়াশীল করেছি। এমনকি দেখতে পাবেন, আমাদের প্রত্যেকটি জড়বস্তু এবং অণু-পরমাণুও ক্রিয়াশীল।

সে কেমন?

আপনি আমাদের এই যে বাগানটা দেখতে পাচ্ছেন তা কী করে পাচ্ছেন? কোনও আলোর উৎস আছে কি?

না তো! সবই যেন আভাময়। আলোর উৎস নেই, অথচ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য!

কিছুই আশ্চর্য নয়। আমাদের চারদিকে বাতাস ও ইথারের পরমাণুগুলি অনবরত এক ধরনের বিকিরণ ঘটিয়ে যাচ্ছে। বিকিরণ ঘটছে প্রত্যেকটি জিনিসে, তাই আমাদের চারদিক সবসময়ে আভাময়। এই যে আমি আর আপনি কথা বলছি তা ওই গাছপালা শুনতে পাচ্ছে, বুঝতেও পারছে—এ কি আপনি জানেন?

বিস্মিত তারানাথ বলে, কিন্তু গাছের তো কান নেই, ভাষাজ্ঞান নেই।

ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের মনের তরঙ্গ, আমাদের ক্রোধ বা প্রসন্নতা, আমাদের বিদ্বেষ বা শোক সবই তারা টের পায়। আপনাদের অ্যান্টেনা যেমন বেতার তরঙ্গকে টের পায়—অনেকটা তেমনই। তবে আরও উন্নত। আমাদের যানবাহন কি ভাবে চলে জানেন?

না। আমি শুনতে চাই।

আমাদের যানবাহনে কোনও মোটর বা ইঞ্জিন নেই। কিন্তু আমাদের ইচ্ছার শক্তিকে তারা নিজের ভিতরে সঞ্চার করে নিতে পারে। যেখানে যেতে চাই সেখানেই নিরাপদে নিয়ে যায়।

অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!

উন্নত, বিনায়িত এবং একমুখী ইচ্ছার যে প্রচণ্ড শক্তি আছে তা আপনাদের বিজ্ঞানও অস্বীকার করে না।

অসম্ভব। ইচ্ছার শক্তিকে জড় বস্তু কি ভাবে টের পাবে?

একটা ভুল হচ্ছে। প্রকৃত বিচারে আপনিও তো জড়। কিছু জড় বস্তুর সমাহার ছাড়া আপনি কি আর কিছু? আপনার বিজ্ঞান তো তাই বলে!

তারানাথ কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। সে যুক্তি হারিয়ে ফেলছে না। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল সে তার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত এক মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। সে এঁটে উঠবে না।

লোকটি মৃদু হেসে বলে, আমাদের বিজ্ঞান ঠিক উল্টো কথা বলে। আমাদের বিজ্ঞানে জড় বলে কিছু নেই। সবই চৈতন্যময়, অনুভূতিময়, দ্যুতিময়, প্রাণময়।

হঠাৎ উত্তেজিত তারানাথ বলে, আর মৃত্যু। এখানে মৃত্যু নেই?

লোকটি সামান্য একটু হাসে। তারপর গাঢ় স্বরে বলে, আপনাদের মতো নয়। মৃত্যু মানে সব শেষ হয়ে যাওয়া, থেমে যাওয়া, নেই হয়ে যাওয়া। এই তো! এখানে সেরকম কিছুই ঘটে না। প্রাণ থেকে প্রাণে সবসময়েই চলেছে এক দেওয়া-নেওয়া, চলাচল। এখানে তাই কিছু ফুরোয় না, থামে না, শেষ হয় না, নেই হয়ে যায় না।

উত্তেজিত তারানাথ বলে, আর রোগ ভোগ? মারদাঙ্গা? ঈর্ষা-দ্বেষ-ঘৃণা? চুরি ডাকাতি? ঘুষ? জনসংখ্যা? দলাদলি?

লোকটি এসব প্রশ্নের জবাব দিল না। শুধু প্রসন্ন হাস্যে তার দিকে চেয়ে বলল, আপনি মেধাবী, অবশ্যই বুঝে নেবেন।

তারানাথের মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। সে কিছুক্ষণ চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে নিজেকে শান্ত করল। তারপর বলল, একটা কথা বলুন। আপনি আমাকে এ জগতে আনলেন কেন?

লোকটি মৃদু মন্থর গলায় স্বগতোক্তির মতো বলল, আপনার মেধাকে খেয়ে ফেলছিল আপনার ঈর্ষা। মন যে মানুষের কত বড় শত্রু তা আপনাদের পৃথিবীর মানুষকে দেখলেই আমরা বুঝতে পারি। আর এখানে মনই আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু।

তারানাথ হঠাৎ কাতর স্বরে বলল, আমাকে আপনাদের পৃথিবীতে থাকতে দেবেন? আমি ফিরে যেতে চাই না।

লোকটি গাঢ় স্বরে বলল, তাতে লাভ কী? এ জগতে আপনার মেধা আমাদের কোনও কাজেই লাগবে না। বরং আপনার জগতে তার কিছু মূল্য হবে।

আমাকে আবার ওই নোংরা জগতে ফিরিয়ে দেবেন?

ওটাই আপনার জগৎ।

তাহলে আনলেন কেন?

মৃদু হাস্যে লোকটি বলল, ঘটনাবলীর কিছু পরিবর্তন ঘটানোর জন্য।

সেটা কিরকম?

একটু আগে আপনি যখন বোম্বে থেকে এরোপ্লেনে ফিরে আসছিলেন তখন আপনার ডান পাশে একটি সুন্দরী তরুণী বসেছিল। মনে আছে?

তারানাথ একটু ভাবল। তারপর বলল, প্লেনে আমি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বসেছিলাম, তাই ভাল করে লক্ষ করিনি।

লোকটি হাসল, দুশ্চিন্তা কেন? ফিরে এসে আপনার স্ত্রীকে কোন অবস্থায় দেখবেন সেই চিন্তা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি তো অন্তর্যামী।

তা নয়। তবে মন জিনিসটাকে আমরা খুব ভাল জানি। আপনাকে আমরা কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে সেই ফ্লাইটে নিয়ে যাচ্ছি। এবার আর অন্যমনস্ক থাকবেন না। মেয়েটির দিকে একটু মন দেবেন।

কেন বলুন তো!

আপনার স্ত্রীকে ফেরত পাওয়ার জন্য।

লজ্জায় তারানাথ ফের অধোবদন হল।

লোকটি খুব সুন্দর করে হেসে নম্র গলায় বলল, আপনাদের মন বড়ই বিচিত্র। আপনার স্ত্রী অন্য পুরুষে আসক্তা জেনেও আপনি তাঁকে সম্পূর্ণ ঘৃণা করতে পারছেন না, তাঁকে পরিত্যাগ করাও আপনার পক্ষে অসাধ্য। কারণটা খুবই অদ্ভুত। আপনি তাঁকে প্রগাঢ়ভাবে ভালবাসেন। তাঁকে পরিত্যাগ করলে আপনার মেধা বোবা এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। সব দিক বিচার করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে এসেছি। আপনি বিমানে আপনার পাশের মেয়েটির সঙ্গে একটু গায়ে পড়ে আলাপ করবেন। কিংবা সে আপনার সঙ্গে ভাব করতে চাইলে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না।

তারানাথের মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলল, আপনার প্ল্যানটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার চেহারা নেই, আমি শক্তিমান বা আকর্ষণীয় নই। কোনও মেয়েকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা আমার কোথায়?

আপনি চিন্তা করবেন না। মেয়েটি আমাদের এজেন্ট।

তারানাথ স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর স্খলিত গলায় বলল, তারপর কী হবে?

ঘটনাবলীর পরিবর্তন ঘটবে। আমরা চাই আপনার মেধা ক্রিয়াশীল থাকুক। সামান্য প্রেম প্রণয় ঈর্ষা ইত্যাদি যেন তার ক্ষতি না করতে পারে।

এই বলে লোকটি তার মুখের সামনে একবার তার করতলটি তুলে ধরল। তারানাথ ঘুমিয়ে পড়ল।

পরমুহূর্তেই উড়ন্ত এয়ারবাসের চাপা শব্দে সচকিত হয়ে নড়েচড়ে বসল সে। এবং ডান দিকে চেয়েই অতিশয় সুন্দরী মেয়েটিকে দেখতে পেল। বর করা, একটু লালচে এক ঝাঁপি চুলের চালচিত্রে আঁটা কী সুন্দর মুখখানা। ফর্সা টকটকে রং। পুরন্ত ঠোঁটে একটু হাসি।

আপনি সায়েন্টিস্ট তারানাথ ঘোষ না?

তারানাথ মাথা নেড়ে বলল, আপনি তো পৌনে এক সেকেন্ড দূরের পৃথিবীর মেয়ে, তাই না?

চুপ। ও ভাবে বলতে নেই। আমি আপনার সঙ্গে ভাব করতে চাই।

তাই হোক।

প্লেন কলকাতায় নামল। টারম্যাকে নেমে তারানাথের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটি চাপা স্বরে বলল, পুরো ঘটনাটা ঘটবে মাত্র আঠাশ সেকেন্ডে। কিন্তু আপনি তা বুঝতে পারবেন না। ঘটনার কোনও কোনও অংশ আমি একটু ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে দেব।

সেটা কিরকম?

এই যে আমরা হাঁটছি, তার তিন সেকেন্ড পরই আমরা চলে যাব তিন দিন পরের এক বিকেলে, সল্ট লেক-এর এক পার্কে।

কী হল কিছু বুঝতে পারল না তারানাথ। শুধু চারদিকে একটা হু-হু বাতাসের মতো কিছু বয়ে গেল। তারপরই সে দেখল, বাস্তবিকই সে আর মেয়েটি সল্ট লেক-এর একটি মনোরম পার্কে ঘাসের ওপর বসে আছে। মেয়েটির হাত তার হাতের মধ্যে।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, আপনি অত কাঠ হয়ে থাকবেন না। একটু কাছে সরে এসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকুন। আর কথা বলুন। যা খুশি বলুন, কিন্তু কথা বলে যান।

বিস্মিত তারানাথ বলল, কিন্তু কেন?

আপনার স্ত্রী দেখছেন। উনি একটু বাদেই আমাদের পিছন দিয়ে হেঁটে যাবেন।

ওঃ! কিন্তু আমার যে বুক ধড়ফড় করছে!

মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। লড়াইটা হেরে গেলে তো চলবে না।

কাঠ হয়েই মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে তারানাথ ষোলোর ঘরের নামতা মুখস্থ বলে যেতে লাগল। কেননা তার আর কিছুই মনে পড়ছিল না।

মেয়েটি হঠাৎ বলল, থামুন। উনি চলে গেছেন।

তারানাথের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সে বলল, এবার?

আপনাকে আজ রাতের বেডরুমে নিয়ে যাচ্ছি।

আবার হুহু বাতাসের মতো কী যেন বয়ে গেল। তারানাথ দেখল সে নিজের শোওয়ার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে মালা। মালা রাগে আক্রোশে ফুঁসছে, কে ওই মেয়েটা? কার সঙ্গে ঢং করছিলে তুমি পার্কে বসে?

তারানাথ সম্পূর্ণ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ওঃ, ও আসলে পৌনে এক সেকেন্ড...

আবার হুহু করে বাতাসের মতো একটা ঘূর্ণি উঠল। তারানাথ দেখল সে আর মেয়েটি একটা মস্ত রেস্তরাঁয় মুখোমুখি বসে আছে।

তারানাথ হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, ঘটনা বড্ড দ্রুত ঘটছে দেখছি। কী হচ্ছে বলুন তো!

আপনি হাঁদারামের মতো আমার পরিচয় ফাঁস করে দিচ্ছিলেন কেন?

তাহলে কী করা উচিত ছিল?

গম্ভীর থাকতে পারেন না? গম্ভীর আর বিষণ্ণ থাকবেন। স্ত্রীর দিকে একদম মনোযোগ দেবেন না। কিন্তু এখন আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলুন।

তারানাথ শঙ্কিত হয়ে বলল, কেন, এখানেও মালা হাজির আছে নাকি?

আছে। আমাদের ফলো করে এসেছে।

একা?

হ্যাঁ।

ওর প্রেমিকের কী খবর?

বেশি পাত্তা দিচ্ছেন না। কারণ একজন বাঘা সুন্দরী ওঁর স্বামীর প্রেমে এরকম হাবুডুবু খাচ্ছে কেন সেটা নিয়েই উনি এখন ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

মাই গড!

আপনি হাসুন। ওদিকে তাকাবেন না। কথা বলুন। আর কিছু ভেবে না পেলে ষোলোর ঘরের নামতাই বলুন।

তারানাথ তাই করল। তবে ষোলোর ঘরের নামতা নয়, সে শুকনো মুখে দেবতার গ্রাস মুখস্থ বলে যেতে লাগল।

তার পরই আবার হু-হু হাওয়ার মতো কী যেন ঘটল চারপাশে। তারানাথ দেখতে পেল, শোওয়ার ঘরে সে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে, মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে মালা কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে, আমাকে তুমি আর ভালবাসো না তো! ঠিক আছে, আমি মরব...মরব...

তারানাথ শশব্যস্তে বলে উঠল, আরে, ওটা তো আসল ব্যাপার নয়...

আবার হাওয়া উঠল। তারানাথ দৃশ্যান্তরে চলে গেল। সময়ান্তরে।

পার্কে সে আর মেয়েটি। মেয়েটি বলল, উঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারি না। আবার সব ফাঁস করে দিতে যাচ্ছিলেন তো?

কাঁদছিল যে! ওর কান্না আমি সইতে পারি না।

ওটা বোগাস কান্না। আপনি শক্ত হোন।

তারানাথ শঙ্কিত গলায় বলল, কাছেপিঠে মালা আছে নাকি?

আছে। নইলে আমি এখানে আনলাম কেন আপনাকে?

কোথায়?

উনি একজন গুণ্ডা ভাড়া করে এনেছেন। আমাকে চিনিয়ে দিচ্ছেন।

ও বাবা! খুন করতে চায় নাকি?

নিশ্চয়ই।

তোমাকে মারবে?

মেয়েটি হাসল, চেষ্টা করবে।

এটা মালার খুব অন্যায়। দাঁড়াও, আমি দেখছি...

গুণ্ডার সঙ্গে আপনি পারবেন কেন?

না পারি, বাধা তো দেব।

মেয়েটা খুব হাসল, ঠিক আছে, যান। ওই যে ঝোপটার আড়ালে ওরা।

তারানাথের গায়ে কোনও দিনই কোনও জোরটোর নেই। তবু সে রোখ করে উঠে দৌড়ে গেল ঝোপটার দিকে। এবং একটি মুশকো চেহারার লোককে মালার পাশে দাঁড়ানো দেখতে পেল।

এ কী মালা, এসব কী হচ্ছে? এ লোকটা কে?

মালা অঝোরে কাঁদছিল। বলল, ওই রাক্ষসীকে আমি শেষ করব। ও কেন আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নেবে? কেন নেবে? তোমাকে ছাড়া যে আমি বাঁচব না!

গুণ্ডাটা একটা ঝটকা মেরে তারানাথকে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, সরুন, কাজটা মিটিয়ে ফেলি।

তারানাথ লক্ষ করল গুণ্ডার হাতটা তার শরীর ভেদ করে চলে গেল, তার কিছুই হল না। কিন্তু সে যে ঘুঁষিটা মারল তা গুণ্ডাটির ডান চোখে লাগতেই গুণ্ডাটা চোখ চেপে বসে পড়ল। তারানাথ তাকে একটা লাথিও কষিয়ে দিল।

তারপর মালার দিকে চেয়ে র্ভৎসনার গলায় বলল, তুমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ।

মালা আর থাকতে পারল না। হঠাৎ যেন পাখির মতো উড়ে এসে তার বুকের ওপর পড়ে দু-হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে চোখের জলে তার গাল ভিজিয়ে দিয়ে বলল, ওগো, আমি যে তোমাকে ভীষণ ভীষণ ভালবাসি। বলো, আমাকে ছেড়ে যাবে না। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না, কিছুতেই বাঁচব না।

তারানাথ ভরা বুকে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

কানের কাছে মেয়েটির ফিসফিস গলা শোনা গেল, ইস, বাজে কাজে আপনারা যে কত সময় নষ্ট করেন!

প্রেমপত্র

তখন স্কুলব্যাগের রেওয়াজ ছিল না। বোধহয় আবিষ্কার হয়নি তখনও। বইখাতা পাঁজা করে ডান হাতে ধরে ডানকাঁধে ফেলে নিয়ে স্কুলে যেতে হত। পেন্সিল আর রাবার থাকত পকেটে। ইউনিফর্ম ছিল না বলে পরতে হত হাফপ্যান্ট এবং শার্ট, জুতো একজোড়া থাকত বটে, তবে স্কুলে যেতাম খালি পায়েই। পায়ে কাঁটা ফুটত, পাথরকুচি লাগত, কিন্তু ওটাই ছিল অভ্যাস। বোধহয় তখন আমার এগারো বছর বয়স। রোগা প্যাংলা চেহারা। মাথায় চিরুনি দেওয়ার কথা মনেই হত না কখনও। ছাত্র মাঝারিমানের, বরং একটু নীচের দিকেই। লেখাপড়া বা খেলাধুলোয় কখনও প্রাইজ-টাইজ পাইনি। খুব বুঝতে পারতাম যে, আমি একটা বাজে ছেলে। তেমন কর্মের নয়। একটু বোকাও ছিলাম। কথা বুঝতে সময় লাগত। সহজে ঘাবড়েও যেতাম। ক্লাসে এক আধদিন পড়া পারতাম, বেশিরভাগ দিনই পারতাম না। অঙ্কে বেশি কাঁচা। পরীক্ষায় ত্রিশ বত্রিশের বেশি বড় একটা নম্বর পাইনি।

অঙ্ক শিখতেই কৃপাসিন্ধুবাবুর বাড়িতে সন্ধেবেলা যেতে হত। আরও গুটি তিনচার ছেলেও যেত। মাদুরে বসে আমরা অঙ্ক করতাম, কৃপাসিন্ধুবাবু একটা কাঠের চেয়ারে বসে খাতা-টাতা দেখতেন। আর সেই সময়ে একদিন তাঁর মেয়ে ইতু বাসন্তীরঙের একটা শাড়ি পরে ঘরে ঢুকতেই ঘরটা যেন আলো হয়ে গেল। সেই এগারো বছর বয়সে আমার হৃদয়ে প্রথম আন্দোলন, এবং দহন। ফর্সা, রোগা, নাকের পাশে একটা কালো তিল। ইতু যেন এই জগতের মেয়ে নয়। ওরকম সুন্দর সেই বয়সে আমি আর কাউকেই দেখিনি। তখন তার বছর পনেরো বয়স। ইতুর কথা ভাবতে ভাবতেই আমার দিন চলে যেত। না, তখন বিয়ে-টিয়ে করার কথা মনে হয়নি কখনও, বা প্রেম করে বেড়ানোও নয়। শুধু মনে হত, ইতু যদি আমার দিকে মাঝে মাঝে একটু তাকায়, একটু কথা-টথা বলে, বা আমার একটা রাইট হওয়া অঙ্ক দেখে বলে বাঃ, তুমি তো অঙ্কে বেশ ভাল। ব্যস, এটুকুই। এটুকু হলেই আমি ভেসে যাই। আর তাই একদিন টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে যখন পড়তে গেছি, ইতু তার মায়ের সঙ্গে কোথায় যাবে বলে সাজগোজ করে বারান্দায় দাঁড়াল, আমাকে দেখেই বলল, এই ছেলে, মোড় থেকে একটা রিকশা ডেকে নিয়ে এসো তো! সেই শুনেই আমি হতাশ হয়ে হাইপাঁই করে ছুটে গিয়ে রিকশা নিয়ে আসি। আমার জীবনে সেই প্রথম একটা কাজের মতো কাজ। একটা রিকশা ডেকে আনার মধ্যে যে এত আনন্দ থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না।

মাঝে মাঝে এক-আধটা শব্দ কীভাবে যেন শিখে যেতাম। সেই বয়সে দু'টো ইংরিজি শব্দ আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলত। একটা হল বিউটিফুল, আর একটা ইনসিগনিফিক্যান্ট। বি ই এ ইউ টি আই এফ ইউ এল— বানানটা জীবনে কখনও ভুল হবে না। আর ইনসিগনিফিক্যান্টের মানেটা। তুচ্ছ, সামান্য, গুরুত্বহীন। ইনসিগনিফিক্যান্ট শব্দটা যে আমার প্রতি খুব খাটে তা বুঝতে পারার পর থেকে আমি নানা ফন্দিফিকির

ভাবতে থাকি। কেউই তো ইনসিগনিফিক্যান্ট থাকতে চায় না। তুচ্ছতা বা সামান্যতাকে ছাড়িয়ে উঠতে চায়। কিন্তু আমি কীভাবে তা করতে পারি তা বুঝে উঠতে পারলাম না। প্রথম কথা, আমার চেহারা মোটেই সুন্দর নয়, গাল ভাঙা, ক্ষয়াটে চেহারা, কোনও শ্রী নেই। আমাদের ক্লাসের কুণ্ডু কী সুন্দর দেখতে। মাথায় কোঁকড়া চুল, ভরাট মুখ, ফর্সা, রাজা-রাজা চেহারা। সুকুমার আর একজন। দারুণ স্পোর্টসম্যান, বেদম সাইকেল চালায়। গায়ে ভীষণ জোর। লম্বা, চওড়া, পুরুষালি চেহারা। পেন্সিল নিয়ে সামান্য ঝগড়া হওয়ায় সে আমাকে একদিন ঘুঁষি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। নাক ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। সেই থেকে আমি তাকে খুব ভয় খেয়ে চলতাম।

সুন্দর নই, স্বাস্থ্যবান নই, বীর নই, খেলোয়াড় নই, তাহলে আমার কী হবে?

লোককে দেখাব কী? যাদুকুমার আমার খুব বন্ধু ছিল। কী সুন্দর গানের গলা ছিল তার। স্কুলের ফাংশনে নিয়মিত গান গাইত। আমি চেষ্টা করে দেখেছি, বেদম বেসুর আমার গলা। কী যে মুশকিলে পড়া গেল নিজেকে নিয়ে। অথচ তখন ইতুর জন্য আমার প্রাণ দিতেও ইচ্ছে করে। প্রাণের বদলে অবশ্য বাঁ-হাতটা দিতে পেরেছিলাম। সে এক কাণ্ড। ইতু রোববার সকালে গান শিখতে যেত পশুপতিবাবুর বাড়িতে। যে রাস্তা দিয়ে যেত আর আসত এক রবিবার সেই পথের ধারে একটা আমগাছে উঠে বসে রইলাম ঘাপটি মেরে। যখন ইতু এই রাস্তা ধারে ফিরবে তখন উঁচু ডাল থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে আসব তার চোখের সামনে। ইতু নিশ্চয়ই ভারী অবাক হবে! ভাববে, বাপরে! ছেলেটা অত উঁচু থেকে লাফ দিল! এ তো সাঙ্ঘাতিক ছেলে!

কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। তারপর ইতুকে দূর থেকে দেখেই বুকের কী ধুকপুকুনি! কাছাকাছি আসতেই শহিদের মতো লাফ দিয়ে পড়লাম। পড়াটা ইতুর সামনেই ঘটল বটে, কিন্তু যেমন ভেবেছিলাম তেমনভাবে হল না। পতন সামাল দিতে বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম নীচের দিকে। সেই হাতের ওপরেই শরীরটা পড়ল। আর মচাৎ করে ভেঙে গেল আমার রোগা হাতের পাঁকাটির মতো হাড়। চোখে অন্ধকার দেখছি তখন, কানে ঝিঁঝির ডাক। তার মধ্যেই ইতুর চিৎকার খুব ক্ষীণ হয়ে কানে ঢুকল, ওমা গো! ছেলেটা যে পড়ে গেল!

সেটা বীরের বন্দনা ছিল না। নিতান্তই আতঙ্ক আর একটা ছেলের পতনজনিত করুণ অবস্থা দেখে করুণার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

ঘটনাটা ঘটবার পর নিজেকে যে কতবার গাধা বলে গাল দিয়েছি তার হিসেব নেই। প্লাস্টারে বাঁধা ফুলো-বাঁ-হাতটার দিকে তাকালেই রাগ হত। আমি বুদ্ধিমান নই সেটা তো ঠিকই, কিন্তু এরকম নিরেট গাধাও তো হওয়ার কথা ছিল না আমার! হাত ভাঙার পর আমার ইতু-জ্বরও সেরে গেল। কিন্তু ইতু বলেই তো কথা নয়। ইতুতেই কিছু মেয়েদের শেষ নয়। মেয়েদের কথা থাক। তার আগে আমার একটা কৃতিত্বের কথা বলে নিই। আমার সেই বয়সে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। 'পঞ্চনদের তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে...' আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হবে স্কুলের ফাংশনে। আবৃত্তির প্রতিযোগী খুব বেশি ছিল না, সাত-আটজন। তার মধ্যে আমিও। কবিতা মুখস্থ বলা ছাড়া আর কোনও এলেমের দরকার হয় না বলে নাম দিয়েছিলাম। আমার আগে ছিল দু'জন। তিন নম্বরে আবৃত্তি করতে উঠে জীবনে প্রথম মঞ্চারোহন করে আমি দেখলাম, সামনে সার বেঁধে হেডস্যার থেকে শুরু করে শহরের অনেক মান্যগণ্য লোক বসে আছেন! পিছনের দিকে আমার কেরানি বাবা আর রোগা মাও নিশ্চয়ই হাজির। আমার হাঁটুতে হাঁটুতে কত্তাল বাজতে লাগল, বুকে সে কী কাঁপুনি! এদিক ওদিক চেয়ে বারকয়েক ঢোঁক গিলে, উইংসের পাশ থেকে বাংলা টিচারের তাড়া খেয়ে চোখ বুজে টানা মুখস্থ বলে গেলাম। তাতে না ছিল কণ্ঠের...ওঠা-পড়া, না কোনও নাটকীয়তা, না কোনও আবেগ। কিন্তু আমার কপাল ভাল যে, অন্য সবাই একবার দু'বার ঠেকে গেছে, ভুল করে ফেলেছে। শুধু মুখস্থ বলে যাওয়ার জন্যই আমি কষ্টে প্রাইজ জিতে গেলাম। বোধহয় একটা জ্যামিতির বাক্স বা ওইরকমই কিছু। প্রাইজ পাওয়ার দরুন আমার গরিব বাড়িতে কিছু বাহবা পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু শহরের আর কারও মুখে কোনও

প্রশংসাবাক্য শুনিনি। শোনার কথাও নয়। সিরাজউদ্দৌলা সাজতেন সত্যেনবাবু, লুৎফা বিপ্রদাস মাস্টারমশাই, মহম্মদী বেগ দীনেশ দত্ত। আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখতাম। কেরানিদের মুখে রাজরাজড়াদের অলৌকিক আলো এসে পড়ত। টিপু সুলতান নাটকে কার্ভালো হতেন ফর্সা চেহারার রমেন পাল। ইচ্ছে হত গিয়ে একটু ছুঁয়ে আসি। সেই কার্ভালো যখন পরদিন রেল অফিসের মলিন একটা ঘরে পারসেলে সিল মারতেন তখন তাঁকে আর চেনা যেত না।

রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে প্রোজেক্টর চালিয়ে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখানো হত।

আমাদের শহরে কোনও সিনেমা হল ছিল না তখন। ইনস্টিটিউটে বাঘী সিপাহী সিনেমা দেখে আমি এত মুগ্ধ যে হতে হলে জীবনে ওই বাঘী সিপাই-ই হতে হবে।

আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল না। লোহার পাত দিয়ে তলোয়ার বাঁখারি দিয়ে ধনুক। পাটকাঠির মুখে পেরেক ঢুকিয়ে তীর, গুলতি এসব তো ছিলই, পেন্সিলকাটা ছুরিও একটা পকেটে থাকত সবসময়।

যখন আমার পনেরো বছর বয়স তখন এক মেঘলা দিনে করুণ একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হল আমার। শীলা। তার বাবা শ্যামাপদ সান্যাল। গরিব কেরানি। শীলা আমার বয়সিই হবে, শাড়ি পরত। সুন্দরী কি না তা জানি না। তবে সেই মেঘলা দিনে তার দু'খানা আশ্চর্য চোখ আমাকে পেড়ে ফেলেছিল। টানা লজ্জাভারনত দু'খানা গভীর চোখ। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মুখোমুখি দেখা। একবার মাত্র চোখাচোখি।

আমার পছন্দের বিশুদ্ধ নারীরা কখনও বড় বাইরে ছোটো বাইরে করে না। ঢেঁকুর তোলে না, বায়ুত্যাগ করে না, খ্যাক করে থুথু ফেলে না। তাদের দাঁতে পোকা, মাথায় উকুন হয় না এবং তারা বাঙাল ভাষায় কথা কয় না।

শীলার সঙ্গে আমার বাক্যহীন দ্বিতীয় সাক্ষাৎ এক বিয়েবাড়িতে। তখন মন দিয়ে লুচি-মাংস সাঁটাচ্ছি। খুব পেটুক ছিলাম এবং সুখাদ্য কালেভদ্রে জুটত। নেমন্তন্ন বাড়িতে গেলে তাই গলা পর্যন্ত গিলে উঠতাম।

উল্টোদিকের একটা ব্যাচ উঠে যাওয়ায় সেখানে একদঙ্গল মেয়ে এসে বসে পড়ল। কী খিকখিক হাসি, আর বিরতিহীন কথা! তার মধ্যেই সেই মেঘলা মেয়েটা, শীলা। অপরূপ এক মেজেন্টা রঙের শাড়ি, উঁচু খোঁপা, কপালে বিন্দি। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সেই গভীর দু'খানা পুকুরের মতো চোখ।

ময়ূর নই যে পেখম ধরব, কোকিল নই যে কুহু কুহু ডেকে উঠব, সিংহ নই যে থাবার জোরে দখল করব নিজস্ব নারীকে। দুর্বল তবু তো নিজেকে জাহির করতে চায়। এটা আমার দ্বিতীয় গাধামির গল্প।

শুধু শীলাকে চমকে বিস্মিত করে দেওয়ার জন্য ভরা পেটেও আমি আরও চার ডাব্বা হাতা মাংস নিয়ে ফেললাম। সে অনেকটা মাংস। শীলা বড় বড় চোখ করে আমার রাক্ষুসে খাওয়া দেখে আমার গলায় অদৃশ্য মালাটি পরিয়ে দেবে বলে যে আশাটা ছিল তা জলে গেল। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কলকল করে এত কথা বলছিল আর এত হাসছিল যে, কেউই আমার মাংস খাওয়াটা লক্ষই করল না। আর আমি সেই পেল্লায় মাংস গিলে দই মিষ্টি ফেলেই পালাতে পারলে বাঁচি। মনে আছে সেই মরণ-বাঁচন খাওয়ার পর বাড়ি এসে ঘণ্টা চারেক গড়াগড়ি খেতে হয়েছিল।

বেলাদিকে এক রাতে গলা টিপে মেরে ফেলল ভানুদা। বেলাদির বর। বেলাদি ভারী আমুদে হাসিখুশি মহিলা। মাত্র নাকি দু'বছর হল বিয়ে হয়েছে। বয়স আঠেরো উনিশের বেশি নয়। কী জানি কেন ভানুদা অফিসে যাওয়ার সময় বেলাদিকে ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে যেত। বেলাদি তাই সারাদিন জানালায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের লোকের সঙ্গে কথা বলত। কথা বলতে বড় ভালবাসত বেলাদি। কিন্তু বাইরে বেরোতে পারত না, কারও বাড়িতে যাওয়ারও উপায় ছিল না। আমার মা গজগজ করত, ভানুদার নাকি সন্দেহবাতিক। সন্দেহবাতিক কাকে বলে সেটা তখন বুঝতে পারতাম না। বেলাদি আমাকেও ডেকে কত গল্প করেছে। মা-বাবার গল্প, ভাইবোনের গল্প, তার বাপেরবাড়ির দেশ মালদহের গল্প। ভানুদার নামে কখনও কিছু বলত না কিন্তু বিকেলের দিকে দেখতাম, ভানুদা বেলাদির জন্য অফিস থেকে ফেরার পথে গরম বেগুনি, শিঙাড়া বা

নলেনগুড়ের সন্দেশ নিয়ে আসছে। একটু রাতের দিকে অবশ্য তাদের খুব ঝগড়া হত, আমরা পড়তে বসে শুনতে পেতাম।

একদিন বেলাদি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে পয়সা দিয়ে বলল, যা তো, বাণীব্রতর দোকান থেকে দু'টো খাম নিয়ে আয়। চিঠি লিখব।

বাণীব্রত মানে বাণীদা একজন এম এ পাশ সুপুরুষ যুবক। শখ করে একটা মনোহারি দোকান দিয়েছে বাজারের কাছে। সেই দোকানে সারাদিন অল্পবয়সি মেয়েদের ভিড়। শোনা যায়, দোকান থেকে নাকি প্রচুর আয় হয় বাণীদার। কিন্তু শিগগিরই...চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে যাবে বলে অনেকের মন খারাপ।

আমি গিয়ে পয়সা দিয়ে বললাম, বেলাদি খাম চেয়েছে বাণীদা, এই যে পয়সা। বাণীদা গম্ভীর মুখে একটা মুখ আঁটা খাম আমার হাতে দিয়ে বলল, নিয়ে যা, নিজের হাতে দিস।

বেলাদির হাতে খামটা পৌঁছে দিতেই তার মুখটা যেন আলো হয়ে গেল।

ভানুদা একজন রোগাভোগা নিরীহ গোছের মানুষ। কারও সাতেপাঁচে নেই। চাকরি আর টিউশনি করত। পোশাকের ছিরিছাঁদ ছিল না, দাড়িও কাটত না নিয়মিত। একা একা বিড় বিড় করার স্বভাব ছিল। শুনেছি, বেশ লেখাপড়া জানা লোক। কিন্তু একটুও ভয় পাওয়ার মতো লোক নয়। বেলাদি ছাড়া আর কারও সঙ্গে কখনও তাকে ঝগড়া করতে শুনিনি।

একদিন সকালে উঠে শুনি হই হই কাণ্ড। পাড়ায় পুলিশ এসেছে। চিৎকার চেঁচামেচি চলছে বাইরে। বিস্তর লোক ভিড় করেছে এসে। গিয়ে দেখি ভানুদাকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। তার মধ্যেই দু একজন আশপাশ থেকে ভানুদার গালে মাথায় চড় থাপ্পড় কষিয়ে দিচ্ছে। গালাগাল দিচ্ছে খুব। শুয়োরের বাচ্চা, বেজম্মা...ঘরে বেলাদি পড়েছিল মেঝেয়। ঘরে কাত হয়ে আছে। চুল খোলা, কপালে সিঁদুর ল্যাপটানো, শাড়ি খসে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে। চণ্ডী ডাক্তার উবু হয়ে বসে কী সব পরীক্ষা করছে যেন।

খুন ব্যাপারটা বুঝে উঠতে একটু সময় লেগেছিল ঠিকই। কিন্তু বোঝা গেল। বেলাদির ভূতকে সেদিনই সন্ধেবেলায় আমি দেখতে পেলাম, ফুটবলের মাঠের এক কোণে কামিনী ঝোপের পাশে দাঁড়ানো। মায়ের ফরমাশে দোকান থেকে গরম মশলা আনতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে দেখা। তখন মনেই পড়েনি যে, বেলাদি খুন হয়ে গেছে। বরং অবাক হয়ে বললাম, এ কী বেলাদি, বেরিয়েছ যে বড়?

বেলাদি হেসে বলল, বাব্বা, ঘরে যা গরম! খোলা হাওয়ায় এসে বাঁচলুম। তোদের বাড়িতে বুঝি আজ মাংস হচ্ছে? না তো? মোচার ঘন্ট।

ম্যাগো! মোচা দুচোখে দেখতে পারি না। তবে ও খুব ভালোবাসে।

কে বেলাদি?

তোদের ভানুদা। হ্যাঁরে, ওকে সবাই খুব মারল বুঝি?

হ্যাঁগো। খুব গালাগালও দিচ্ছিল।

বেচারা!

তুমি নাকি মরে গেছ বেলাদি?

দূর! মরব কেন? এই তো দিব্যি রয়েছি। সবাই বলছে ভানুদা গলা টিপে তোমাকে মেরে ফেলেছে।

দূর! মারবে কেন? কত ভালবাসে আমাকে! হ্যাঁরে চুনু, আমাকে জোনাকি পোকা ধরে দিতে পারিস?

কী করবে?

আঁচলে অনেকগুলো জোনাকি পোকা পুঁটুলি করে নিয়ে ঘুরে বেড়াব। দিব্যি লণ্ঠনের মতো দেখাবে। না রে?

হ্যাঁ। দাঁড়াও। আমি আমার জামা খুলে জোনাকি ধরে দিচ্ছি।

অনেক জোনাকি ধরে নিয়ে এসে দেখি, বেলাদি নেই। কেউ নেই।

বেলাদি যে সেই থেকে কোথায় চলে গেল কে জানে। তবে অনেকেই শুনেছে ওদের বন্ধ ঘর থেকে রাতবিরেতে বেলাদির কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। তবে তা বেশিদিন নয়। দু মাসের মাথায় সেই ঘরে নতুন লোক এল। স্বামী-স্ত্রী আর তিনটে বাচ্চা।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করে আমি নিজেই অবাক। অঙ্ক ইতিহাস ভাল হয়নি। তবু কী করে যেন পাশ মার্ক পেয়ে গেছি। ভর্তি হতে হল দূরের শহর কুচবিহারের কলেজে। সাত সকালে ট্রেন ধরে যাওয়া, সন্ধের ট্রেন ধরে ফেরা। কো-এডুকেশন। তবে সায়েন্সে বেশি মেয়ে পড়ত না তখন। মাত্র গুটি পাঁচেক।

পড়াশুনোয় ভাল নই। অঙ্কে কাঁচা। তবু একটু একটু বুঝতে পারতাম ফিজিক্স। কেমিষ্ট্রি খারাপ লাগত না। দেখলাম, চেষ্টা করলে অঙ্কটাও পারা যায়।

পাঁচটা মেয়ের মধ্যে একজন ছিল গৌরী। গালে ব্রনর দাগ ছিল। পুরু ঠোঁট আর বড় দাঁত। কুচ্ছিত বলা যায় না, সুন্দরী তো নয়ই। সেই সময় হুটহাট ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে বা মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে কথাটথা বলত না, তাকাতেও যেন নিষেধাজ্ঞা ছিল।

ওই গৌরীই একদিন আমাকে বলল, কেমিস্ট্রি ক্লাসটা করতে পারিনি। আপনার নোটটা একটু দেবেন?

আমি তটস্থ। আমার কাছে নোট চায় কেন? আমি ফেলুমার্কা ছেলে, ব্যাকবেঞ্চার। আমতা আমতা করে বললাম, হ্যাঁ নিতে পারেন। তবে আমি তেমন ভাল নোট নিতে পারি না। সে বলল, ওতেই হবে।

হয়তো হল। পরদিন খাতা ফেরত দিয়ে বলল, আপনি তো খুব সুন্দর নোট নিয়েছেন!

আমি কী বলব ভেবেই পেলাম না। ওই গৌরীই মাঝে মধ্যে কথাটথা বলত। খুবই কচ্চিৎ কদাচিৎ অবশ্য। কিন্তু বলত। দাড়িগোঁফ মুখে সমাচ্ছন্ন। ভাবলাম, আমার অসুন্দর মুখটা এইভাবেই বরং একটু ঢাকাচাপা দেওয়া থাক। দাড়িগোঁফ অনেকটাই ছদ্মবেশের কাজ করে। মাথায় খুব ঘন চুল ছিল আমার। সেগুলোও যথেষ্ট বেড়ে ঘাড় ছুঁয়ে ফেলল। আমার মায়ের মতোই আমারও কোঁকড়া চুল বলে তা অবশ্য বাবরির পর্যায়ে গেল না। মাথায় আঙুরের থোকার মতো ফলিত হয়ে রইল।

অ্যানুয়েল ডিঙোতে তেমন কষ্ট হল না। সেকেন্ড ইয়ার। কোনওদিনই আমার তেমন বন্ধুবান্ধব ছিল না। কথাটথা কইতে পারি না এবং সর্বদা নিজের নানা দুর্বলতা নিয়ে চিন্তা করে আত্মবিশ্বাস খুইয়ে বসেছি বলে বন্ধুও জোটাইনি। কিন্তু ইদানীং কয়েকজন জুটেছে। সহপাঠী এবং তার বাইরেরও।

কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস করছিলাম, অচিন্ত্য আমার পাশেই ছিল। হঠাৎ বলল, এটা দেখেছিস?

আমি দেখলাম, ওর হাতে একটা ইলেকট্রিক বালব আর তাতে খানিকটা তরল। বললাম, কী ওটা?

ও বলল, অ্যাসিড বালব।

অ্যাসিড বালব! কী হয় ওটা দিয়ে?

একজনের মুখে ছুঁড়ে মারব।

অবাক হয়ে বললাম, সে কী রে? কাকে মারবি?

সে আছে একজন। আমাকে রিফিউজ করেছে, ইনসাল্ট করেছে, দাদাকে দিয়ে মার খাওয়াবে বলে শাসিয়েছে।

সর্বনাশ! তা বলে....

অচিন্ত্য কিছুতেই বাগ মানবে না। টগবগ করে ফুটছে রাগে। ক্লাসের পর আমি তার সঙ্গ ধরে বোঝানোর চেষ্টা করলাম অনেক। শেষে হাল ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু শুনলাম পাটাকুড়ার কৃষ্ণা নামে একটি মেয়েই তার গণ্ডগোলের মূলে। কৃষ্ণাকে তো চিনি না।

কিন্তু দু'একজনকে জিজ্ঞেস করে বাড়িটার হদিশ জেনে বিকেলের দিকে সোজা গিয়ে হাজির হলাম সেই বাড়িতে। দরজা খুললেন এক বয়স্কা মহিলা।

কাকে চাই?

কৃষ্ণা আছে?

তাকে কী দরকার? তুমি কে?

বিশেষ দরকার।

না বাপু, হুটহাট যার তার সঙ্গে আমাদের মেয়ে দেখা করে না। তুমি এসো গিয়ে। তোমার মতলব ভাল নয়।

হতাশ হয়ে ফিরে আসছিলাম। মোড়ের কাছাকাছি একটা মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, আপনি আমাকে খুঁজছিলেন? আমি কৃষ্ণা।

ভারী সুন্দর দেখতে মেয়েটি। দেখলেই মায়া হয়।

বললাম, আমি অচিন্ত্যর বন্ধু।

জানি, আপনার কথা ও আমাকে বলেছে।

আপনি ওকে রিফিউজ করায় ও পাগলের মতো হয়ে গেছে।

জানি। কী করব বলুন।

সাবধানে থাকবেন।

ও কি আমাকে খুন করতে চায়?

প্রেমে পড়লে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে।

গাড়ির আড়াল থেকে একটা চিঠি বের করে আমার হাতে দিয়ে মেয়েটা বলল, এটা ওকে দেবেন। পাছে অন্য কারও হাতে পড়ে সেই ভয়ে তাকে দিতে পারিনি। বিশ্বাস করে আপনাকে দিলাম।

চিঠি পেয়ে অচিন্ত্য অবাক, তুই কৃষ্ণার কাছে গিয়েছিলি? কেন?

ওকে তোর অ্যাসিড বালব থেকে বাঁচাতে। অ্যাসিড বালবের কথা অবশ্য বলিনি। তোকে বাঁচাতে।

চিঠিটা পড়ে অচিন্ত্য শান্ত হল। ছলছলে চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, তুই যে আমার কত উপকার করলি তা জানিস না।

অ্যাসিড বালবটা আমাকে দিয়ে দে।

অচিন্ত্য দিয়ে দিল। জিনিসটা অনেকদিন আমার কাছে আছে। আমি মাঝে মাঝেই ওটার দিকে চেয়ে প্রেম ভালোবাসার কথা ভাবতাম। একই সঙ্গে কত সুন্দর ও ভয়ঙ্কর ওই ভালোবাসা শব্দটা!

যখন এমএসসি পড়ি কলকাতায়, তখন হঠাৎ একদিন আমার সহপাঠি একটি মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কতটা লম্বা বলুন তো!

মাপিনি কখনও। তবে লোকে আমায় ঢ্যাঙাই বলে।

মাস্ট বি সিক্স থ্রি।

হতে পারে।

সেই মেয়েটাই একদিন আমার হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়ে চলে গেল। চিরকুটটা আমি খুলেও দেখিনি। পকেটে ছিল। দিনান্তে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখতে দেখতে চিরকুটটা বের করে পাকিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আমি, রণজিৎ লাহিড়ি, লোভী ও কাঙাল, কোনও প্রেমপত্রই পাওয়ার কথা ছিল না আমার।

ভালবাসা

মোবাইল হয়ে ইস্তক ছুঁড়িগুলো বড্ড বেহাত হয়ে যাচ্ছে। লেখাপড়া চুলোয় গেছে, তা সে যাক, কিন্তু কাজেকর্মেও মন নেই। ওই যে অর্ধেক ডালবাটাসুদ্ধু শিলখানা ফেলে রেখে ঝটপট উঠে গেছে ছুঁড়ি, এখন যদি একটা কাক উড়ে এসে মুখ দেয় তাহলে অতখানি ডাল নষ্ট। আর ডালের যা দাম আজকাল।

কোন কেষ্টর বাঁশি বাজল রে, ও মাধী!

বনবালার চেঁচানি মাধীর কানে যাওয়ার কথা নয়। কুয়োতলা পেরিয়ে হরিণীর পায়ে, ঝুমকো ফুলের ঝেপের পাশে। মুখে হাসি ধরছে না। পরশুই সিনেমা দেখতে গিয়ে আলাপ। বিল্টু দাস।

বনবালা এই জন্যই মোবাইল ফোন দেখতে পারেন না। তবে বনবালার এমন অনেক কিছুই অপছন্দ। প্যাকেটের দুধ, গ্যাসের উনুন, নাইটি, কালো চশমা, ঘুমের ওষুধ, চাউমিন, বলতে গেলে মহাভারত।

ছুঁড়ির প্রেমালাপ কখন শেষ হবে কে জানে। বকাঝকা যে করবেন তারই কি উপায় আছে? দুম করে কাজ ছেড়ে দিলেই তো বনবালা চিত। এখন আর সেই দাপও নেই সেই খাপও নেই। সুতরাং লাঠি হাতে এসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে হল, কাক তাড়াতে।

এই চালকুমড়ো নিয়েই বখেড়া। মেয়েমানুষের চালকুমড়ো কাটতে নেই, এ সবাই জানে। কিন্তু এ বাড়িতে এসব কথা তুললেই সবাই তেড়ে আসে। 'কাটলে কী হয়', 'যত সব কুসংস্কার', 'ওই করে করেই তো আয়ু শেষ করলে', কত কথা বাবা। ছোট নাতি পল্টুকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে অতি কষ্টে বাঁটিতে প্রথম ফালাটা দেওয়াতে পেরেছেন। চাপড়ঘণ্ট হবে। কিন্তু এই যে কষ্ট করে রাঁধবেন, কেউ সোনাহেন মুখ করে খাবে কি? সুভদ্র বলবে, এ আর খেতে এমনকী, খামোখা এত কষ্ট করে রান্নার কোনও মানেই হয় না। বীরু বেশি কথা কয় না, মতামত দেয় না, তার মুখ দেখে বুঝতে হয় রান্না উতরেছে কিনা। বড় নাতনির তো খাবারের সঙ্গে আড়িই। তার মুখে কিছুই রোচে না, খায় কাকের মতো ঠুকরে আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। একমাত্র ছোট নাতনি মনোবীণা এদের মতো নয়। সে এইসব ঘণ্ট-টণ্ট বেশ ভালবাসে, চেটেপুটে খায়।

পাঁচ-সাত মিনিট বাদে মুখে টেপা হাসি নিয়ে ফিরে এল মাধী।

ওরে ও মুখপুড়ি ও কার ফোন এয়েছিল?

সে তুমি চিনবে না। আমার এক মেসো।

বাব্বাঃ, কারও মেসোর সঙ্গে এত কথা থাকে বলে শুনিনি। যাক, আজকাল মেসোরাও জাতে উঠছে তাহলে।

মাধী রাগ করে বলে, কেন বলো তো, দুটো কথা বললে বুঝি দোষ হয়?

দোষের কথা বললুম বুঝি! রক্ষে কর বাপু।

ছোটলোকের ঘরের মেয়ে বটে, কিন্তু মাধী দেখতে মোটেই খারাপ নয়। রং ফরসার ধার ঘেঁষে, মুখের একটা মিষ্টি ঢৌল আছে। বিপদ সেখানেই। বনবালা শুনেছেন ওকে নিয়ে নাকি ছোঁড়াদের মধ্যে কাড়াকাড়ি।

তাই মাধীর বদলি লোক খুঁজতে লেগেছেন বনবালা। এ কবে কাজ ছেড়ে কার সঙ্গে পালিয়ে যায় তার ঠিক কি! বাপটা বাসের ড্রাইভার, রোজগার মন্দ নয়। কিন্তু তার আবার উলুবেড়েতে রাখা মেয়েমানুষ আছে।

রাগের চোটে মাধী ডালগুলোকে যেন পিষে ফেলতে জোরে জোরে বাটছে। রাগ না লক্ষ্মী। এ ডাল যত মিহি হয় তত চাপড়ের স্বাদ। কিন্তু সে আর বোঝে কয়জন?

ছোট বউমা মন্দাকিনী চিনে রান্না জানে। একদিন চিংড়ি মাছ দিয়ে কী একটা যেন ফ্যাকফ্যাকে জিনিস রেঁধেছিল। বনবালা তার স্বাদসোয়াদ কিছু বুঝতে পারেননি। খানিকটা টকচা টকচা লেগেছিল, আর কেমন একটু আঁশটে গন্ধও। কিন্তু মহীপতি থেকে শুরু করে বাড়ির সবাই খুব বাহা বাহা করেছিল বটে খেয়ে। বনবালার সঙ্গে সঙ্গেই ওই চাপড়ঘণ্ট, শাপলার শুক্তো, কচুবাটা, পাবদার ঝাল, বাটিচচ্চড়ি, ডাল ফালানি বিদেয় নেবে। এসে ঢুকবে চিনেম্যান চ্যাংচুং। আজকাল আর রান্নাঘরমুখো হয় না মন্দাকিনী। সে তার শাড়ির ব্যবসা নিয়ে আছে। তাই থাক।

দেখ দিদিমা, হয়েছে কিনা।

বনবালা আঙুলে ঘষে দেখে বললেন, হয়েছে বাছা, এবার দে দিদি নারকোলটা কুরিয়ে। ওই যে দু'আধখানা করে রেখেছি।

মাথা ঠান্ডা থাকলে মাধীকে দিয়ে কাজ হয়।

কলকাতা শহর এখান থেকে সাতাত্তর মাইল দূর বলে শুনে আসছেন বনবালা। তা সে অনেকটা দূরই বটে। দূর হওয়াই ভাল। বনবালার যত অপছন্দের ব্যাপার সব ওই কলকাতা থেকেই জীবাণুর মতো উড়ে আসে। তাই দূর বলে এতকাল একটু নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু দেখ-না-দেখ দূরত্বটা যেন বড্ড কমে আসছে। এতটাই কাছে মনে হয় কলকাতাকে যে, বনবালা তার পচা গন্ধ আর প্রসব-যন্ত্রণার চিৎকারের মতো শব্দ শুনতে পান।

মহীপতি অবাক হয়ে একদিন বলেছিলেন, সে কী! কলকাতা জায়গাটা খারাপ হবে কেন? দায়ে দফায় কলকাতাই তো আমাদের মুশকিল আসান। জটিল রোগ হলে চিকিৎসা, বিয়ে বা উৎসবে কেনাকাটা, ভাল থিয়েটার-সিনেমা, ভীম নাগ বা নকুড়ের সন্দেশ যাই বলো কলকাতা ছাড়া কি চলে?

ভাল নেই তা বলছি না। কিন্তু দুষ্টু জিনিসগুলোও তো ওখান থেকেই আসে! যত নষ্টামির নরককুণ্ডও তো ওটিই।

মহীপতি খুব হাসলেন, বললেন, ও তোমার ফোবিয়া। সব জিনিসেরই ভাল মন্দ দুটো দিকই থাকে। মন্দটা বেশি করে দেখতে যাবে কেন? কলকাতার দোষ কিছু নয়, যুগের হাওয়া আসে, তাইতেই সব উল্টেপাল্টে যায়। তুমিই বা সেকেলে হয়ে থাকবে কেন?

হাওয়ামোরাগ পেয়েছ বুঝি? আমি সেরকম বান্দা নই।

সেবার যে পিত্ত পাথুরিতে মরতে বসেছিলে, সময়মতো কলকাতায় নিয়ে না গেলে বাঁচতে? তোমার ধন্বন্তরী হোমিওপ্যাথ বসন্ত ঘোষ তো হালে পানি পেল না। আর কলকাতায় কেমন অস্ত্র হল বলো, যেন ম্যাজিক। কাটাকুটি করল না, রক্তপাত হল না, স্রেফ পেটে তিনটে ফুটো করে পাথর বের করে আনল।

বনবালার মুখে কুলুপ। কিন্তু মনটা আড় হয়ে থাকে। সাতাত্তর মাইলকে আগে অনেক দূর বলে মনে হত, আজকাল মনে হয়, এই যেন পাশের বাড়ি। কলকাতার মাছি মশাও যেন এক উড়ানে পীরতলায় চলে আসছে!

মহীপতির যে কলকাতার ওপর টান আছে তা এমনিতে নয়। একে তো কলকাতায় পড়াশুনো করেছেন, তার ওপর আবার বিজয়গড়ের উদ্বাস্তু কলোনির মেয়ে দেবারতির সঙ্গে ভাব ছিল। বিয়ে পর্যন্ত গড়ালে হয়তো মহীপতি পীরতলার বাস তুলে দিয়ে কলকাতাবাসী হতেন। জাতপাত নিয়ে তুমুল হাঙ্গামা হওয়ায় বিয়ে হতে পারেনি। মহীপতি মুখ চুন করে একদা বনবালাকে বিয়ে করে আনেন। তাতে তাদের ভাব-ভালবাসা কিছু কম হয়েছে বলে মনে হয় না বনবালার। তবু মাঝে মাঝে এই বুড়ো বয়সেও সন্দেহ হয়,

মহীপতির বুকের ভিতরে এখনও কোথাও দেবারতির ছবি ঝুলে নেই তো! ওই সন্দেহের কাঁটা বুকে নিয়েই মরতে হবে বনবালাকে। মানুষের হাঁড়ির খবর তবু বের করা যায়, কিন্তু মনের খবর শতেক মাখামাখি করেও বের করা যায় না। মহীপতিই কি বনবালার মনের খবর জানেন? ষাটের ওপর বয়স হল বনবালার, সেই তেরো বছর বয়সে দাদার বন্ধু সজল তাকে আমবাগানে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে কী কাণ্ড করেছিল, আজও মনে করলে গায়ে কাঁটা দেয়। কম বয়সে যখন একঘেয়ে লাগত তখন সজলের কথা ভাবলে গোপনে মদ খাওয়ার মতো একটু নেশা হত বনবালার। হয়তো দোষের কিছু নয়। তবে একটু-আধটু গোপন বিষ না থাকলেও বোধহয় মানুষের চলে না।

ও দিদিমা, নারকোল কুরে দিয়েছি। চললুম।

মাধীর পায়ে এখন হরিণের দৌড়। দৌড় তো দৌড়।

দৌড়টা বারান্দায় বসে দেখলেন বনবালা। বিড়বিড় করে বললেন, যা বাছা যা। বয়োধর্ম, কী আর করবি।

পীরতলায় আগে ফি মঙ্গলবারে হাট বসত। কিন্তু পাকা বাজার হয়ে অবধি হাট ঘুচেছে। আগে পাকা কাঁঠালে মাছির মতো হাটে ভনভন করত লোক। এখন অগুন্তি দোকান, অন্তহীন বিকিকিনি।

কিন্তু হাটখোলার মাঠটা এখনও পড়ে আছে। পীরতলায় সড়ক-ঘেঁষা ফাঁকা জমি একটুও নেই। গায়ে গায়ে পাকা বাড়িঘর দোকানপাট উঠে গেছে। কিন্তু জমিদার বংশগোপাল চৌধুরীর বংশের শরিকি ঝগড়া আর মোকদ্দমায় হাটখোলার ওপর ইনজাংশন জারি রয়েছে। তাই ওখানে এখন খেলাধুলো হয়। বাকি সময়ে মস্ত শিরীষ, শিশু ও সেগুনের ছায়ায় আর রোদে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকে চিত হয়ে। গত বর্ষায় ভাল জল হয়েছিল বলে মাঠে এখন নিবিড় সবুজ ঘাসের বান ডেকেছে।

এই সকালবেলাটা পেয়ার-মহব্বত বা আশনাইয়ের সময় নয় মোটেই। সেদিক দিয়ে বরং দুপুরটা ভাল। মাধীর এখনও আর এক বাড়ির কাজ বাকি। তাড়া আছে।

বিল্টু দাসের চোখধাঁধানো মোটরবাইকটা কোথাও দেখতে পাচ্ছিল না মাধী। বিল্টু দাসকেও নয়। মাঠের ধারেই থাকার কথা। এদিক-ওদিক চেয়ে ফোন করতে যাচ্ছিল মাধী, সেই সময়ে শিসটা শুনতে পেল। মাঠের ওধার থেকে আসছে। ওধারটায় লোকের চলাচল তেমন নেই। খুব ঝোপঝাড়।

চালাক ছেলে। শুঁড়িপথ ধরে ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে উল্টো বাগে এসে কদমগাছটার তলায় সেই মোটরবাইক আর বিল্টু দাসকে পাওয়া গেল।

এ সময়ে ডেকেছ কেন? আমার যে আরও এক বাড়িতে কাজ আছে।

বিল্টুর চেহারাখানা বেশ লম্বা আছে, হাড়ে-মাসে শরীর। ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর ব্যবসা আছে বাগনানে।

এদিকটায় কাজ ছিল ভাবলাম একটু হ্যালো দিয়ে যাই।

খুশিই লাগছে মাধীর। একটু আধটু অনিয়ম না হলে কি মহব্বত হয়! হেলে থাকা মোটরবাইকটার সিটে হেলান দিয়ে বসল, কী বলো!

এ সময়ে ছেলে-ছোকরারা যা করে, একটু ঘেঁষে আসে গায়ে হাত-টাত দেয়, চুমু খায় মাধীর অভ্যাস আছে।

বিল্টু দাস কি অন্য রকম। মোটেই ঘেঁষাঘেঁষির চেষ্টা করল না। হঠাৎ একটা অবাক-করা প্রশ্ন করল, মোবাইলটা তোমাকে কে দিয়েছে?

মাধী অবাক হয়ে বলে, কে আবার দেবে!

বিল্টু একটু হেসে বলে, নিজে কিনেছ?

মাধী একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, দিয়েছে একজন। তা জেনে কী হবে?

এমনি, জানতে ইচ্ছে হল, তাই। মেসেজ করতে পারো?

মাথা নেড়ে মাধী বলল, না।

ফোন-বুক সার্চ করতে পারো?

মাধী হেসে ফেলল, পরীক্ষায় বসেছি নাকি?

বলোই না পারো কিনা।

মাত্র পাঁচটা নাম আছে, সেগুলো চিনি।

তার মানে নিজে সেভ করতে পারো না তো!

না। মাত্র তো ফোনটা পেয়েছি, শিখতে সময় লাগবে না বুঝি?

যে দিয়েছে সে শেখায়নি?

ও তো গোপাল, লেখাপড়া জানে নাকি?

তুমি কত দূর জানো?

আমিও তাই। ক্লাস টু থেকে থ্রি'তে উঠেই অক্কা।

শেখালে শিখবে?

শিখে কী হবে শুনি?

বিল্টু একটু গাঢ় স্বরে বলে, তোমার কী হবে জানি না, তবে হয়তো আমার কাজ হবে।

কী কাজ?

স্পষ্ট করে বলব?

বলোই না।

না থাক, এখনও স্পষ্ট করে বলার সময় আসেনি। আচ্ছা, একটা কথা বলবে?

বলোই না।

অন্য সব ছেলে হলে এ সময়ে তোমার সঙ্গে কী করত জানো?

কী?

ছেলেরা যা করে তাই করত। শরীরে হাত দেওয়ার বা চুমু খাওয়ার চেষ্টা করত।

যাঃ।

আমি সেসব করছি না। কেন জানো?

বলো।

কারণ তোমাকে নিয়ে আমি একটু ভাবছি। যাকে নিয়ে ভাবা যায় তাকে আর পাঁচজনের সঙ্গে এক করে দেখা যায় না। কিছু বুঝলে?

কিচ্ছু না। বড্ড ঘুরিয়ে কথা বলো তুমি।

তুমি না মহীপতিবাবুর বাড়িতে কাজ করো?

করি তো।

মহীপতিবাবু যে বিদ্যের জাহাজ তা জানো?

হ্যাঁ তো। কত ছেলেমেয়ে ব্যাচে পড়তে আসে রোজ।

তুমি যদি শিখতে চাও তোমাকেও পড়াবেন।

পাগল হয়েছ! ওখানে সব উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে।

পণ্ডিতের বাড়ির বেড়ালটারও পেটে কিছু বিদ্যে থাকে। জানো? মহীপতিবাবুর বাড়িতে একবার কথাটা পেড়েই দেখ না, কাজ হয়ে যাবে।

কেন গো! আমি এখন লেখাপড়া শিখতে বসব কেন? কী হবে তাতে বলো না।

পরে বুঝতে পারবে। একটু ইংরিজি না জানলেই নয়।

ও বাবা! বর্ণমালা ছাড়া আমি যে ইংরিজির কিচ্ছু জানি না। আমার মাথায় তো গোবর।

না জানলে, না শিখলে ওরকমই মনে হয়। শিখতে বসলে দেখবে জলের মতো সোজা।

আচ্ছা লোক বাপু তুমি। কাজ কামাই করে একটু আড্ডা মারতে এলুম, দিলে তো মাথায় একখানা গন্ধমাদন চাপিয়ে।

বিল্টু একটু হেসে বলল, নইলে যে শরীর ছাড়া তোমার আর কিছু দেওয়ার থাকবে না কাউকে। অত সহজে ফুরিয়ে যেতে চাও বুঝি?

ফের শক্ত শক্ত কথা?

শক্ত কথা নয়। বুঝতে পারলে সোজা।

তাহলে বুঝিয়ে বলো না কেন?

তোমাকে আমার খুব পছন্দ। বিয়ে করতে চাই।

মাধীর মুখটা কুঁচকে জুবুথুবু হয়ে গেল, ধ্যাত, এখনই বিয়ে কী?

বিল্টু ভারি অবাক। তার সঙ্গে দামি মোটরসাইকেল, কব্জিতে ঝিনচাক ঘড়ি, পকেটে দামি মোবাইল, পায়ে দামি জুতো, চোখে দামি রোদচশমা, দামি জিনস এবং শরৎকালেও গায়ে অনাবশ্যক চামড়ার জ্যাকেট, শাহরুখের মতো চুলের ছাঁট করতে আড়াইশো টাকা নিয়েছে পার্ক স্ট্রিটের পার্লার। সে কি ফ্যালনা পাত্র!

তার মানে! বিয়ে করতে চাও না?

তার এখনই কি? এখনই বিয়ে বসতে ভাল লাগে বলো। সব মজাই তো মাটি, বিয়ে মানেই তো সেই চ্যা ভ্যা ছেলেপুলে, কিলগুঁতো, মুখনাড়া, ঝগড়াঝাঁটি। ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। আগে একটু ফূর্তি করে নিতে হয় না বুঝি? ঘুরব, বেড়াব, সিনেমা-টিনেমা দেখব। গিফট পাব...এখনও তো আমার ষোলোও পোরেনি।

বিল্টুর মুখখানা থমথমে হয়ে গেল। খুব চোখা দৃষ্টিতে মাধীর মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, আমার দুনিয়ায় মেয়েমানুষের কোনও অভাব নেই, বুঝলে? কিন্তু এই প্রথম কাউকে বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছিল। ঠিক আছে, যাচ্ছি। বাই।

আর কিছু বলল না ছেলেটা। পট করে মোটরবাইকে উঠে বোঁ করে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। কী কিম্ভূত ছেলে রে বাবা! একটু খোসামোদ করতে পারত তো। অন্য ছেলেরা যেমন করে। বিয়ের পর সবাই কিলোয়। সে না হয় তুমিও কিলোবে। কিন্তু বিয়ের আগে সাধাসাধি করা, পায়ে ধরা এসব না করলে হয়? ওই বিয়ের আগেই তো মেয়েমানুষের যা কদর। হয়ে গেলেই তো পুরনো কাঁথা বা দোলাই।

গোসাঁই বাড়ির কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে। মাধী একবার ভাবল আজ কামাই দেবে! ফের ভাবল, না বাবা কাজেকর্মে থাকলে মনটা একটু আড় হবে।

বিয়ের কথা ভাবতে মাধীর ভাল লাগে না ঠিকই। শেষ অবধি অবিশ্যি বিয়ে বসতেই হবে। ওইটেই যে নিয়ম। আর বলতে কি বিল্টুকে তার বেশ পছন্দই ছিল। হা-ঘরে তো নয়। একটু ভদ্রলোক ভদ্রলোক ভাব আছে। গোপাল বা শিবেন বা চানুর মতো তো নয়। বিল্টু সেই তুলনায় ভাল ঠিকই, কিন্তু ভারি বিটকেলও। ভাল করে কথা হল না, জান পয়চান হল না, আশনাই হল না, সিনেমা-রেস্টুরেন্ট হল না, তার আগেই দুম করে বিয়ে করতে চায় বুঝি কেউ? তার ওপর বিদ্যেসাগর বানানোর মতলব। পাগল নাকি ছেলেটা?

ঘোষ বাড়ির কাজটা ছেড়েই দেবে মাধী। ওই যে বনবালা বুড়িটা দোতলার ছাদে উঠে এই দিকে শকুনের চোখে চেয়ে আছে। মাধী কোথায় গেল, কার সঙ্গে মিশল, কার সঙ্গে গা শোঁকাশুঁকি করল, কার ফোন এল সব খতেন নেবে। তারপর মাধীর মাকে ডেকে পুটপুট করে লাগাবে। এমনিতেই তাদের ঘরে শতেক ঝঞ্ঝাট। রোজ মায়ের সঙ্গে এসব নিয়ে তুমুল হয় তার।

দু'চোখে দেখতে পারে না সে বুড়িটাকে।

বাতাসে পোড়া পেট্রলের গন্ধটা এখনও আছে। মাধীর মনটা ভাল নেই।

বিয়ে হয়ে তেমন ঠাঁই-বদল হল না মন্দাকিনীর। বেশ দূরে কোথাও, নতুন রকমের একটা জায়গায় বিয়ে হয়ে গেলে মন্দ হত না। নিদেন কলকাতা হলেও কি আর তেমন খারাপ হত। কলকাতা খুব দূর নয় ঠিকই, তবু অন্য রকম তো। কিন্তু কপালের ফের খণ্ডাবে কে? পীরতলার সঙ্গে রাধাপুরের দেখাটাই হল কলকাতায়।

হোম সায়েন্স নিয়ে একটা সেমিনারে গিয়েছিল মন্দাকিনী। আইস স্কেটিং রিংকে একটা এগজিবিশনও ছিল। সেটা শীতকাল এবং ডিসেম্বর মাস। কিন্তু বিকেলের দিকে মেঘ করে এমন বাদলা শুরু হল যে কহতব্য নয়। তবে উদ্বেগের কিছু ছিল না, সঙ্গে ভাড়া করা একটা গাড়ি ছিল। চেনা ড্রাইভার। রাস্তাও এমন কিছু দূরের নয়। ছ'টায় রওনা হলে আটটা সাড়ে আটটায় পৌঁছে যেত। আর সেখানেই ঘটল বিপত্তি। গাড়ির গিয়ার বক্স ভেঙে সে গাড়িকে আর নড়ানো গেল না। নিয়ে যেতে হল গ্যারাজে। গ্যারাজ থেকে বলেই দিল রাতের মধ্যে হবে না। ট্যাক্সি যা টাকা চাইল তা অবিশ্বাস্য। তারা, রাধাপুরের তিন বান্ধবী তখন অগাধ জলে। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে ফেরা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু বাগনান বা উলুবেড়িয়া থেকে রাধাপুরের বাস রাতে পাওয়া যাবে কিনা সেইটেই চিন্তার কথা। তবু স্টেশনে যাওয়ার জন্য যখন বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সি ধরার বৃথা চেষ্টা করছে আর রাত এবং ভয় দুটোই বেড়ে যাচ্ছে, তখনই বৃষ্টিতে আটকে পড়া লোকজনের ভিতর থেকে একজন ভালমানুষ চেহারার যুবক এগিয়ে এসে মন্দাকিনীকে বলল, আপনি রাধাপুরের বাসববাবুর মেয়ে না? আপনাকে চিনি। আমি শ্যামপুর কলেজে পড়াই।

মন্দাকিনী যেন ডুবজলে খড়কুটো পেয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা বড় বিপদে পড়েছি। আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে।

ছেলেটা হাসল, হ্যাঁ, আজ যা অবস্থা তাতে সকলেই অল্পবিস্তর বিপন্ন। আপনাদের কি আজকেই রাধাপুর ফিরতে হবে?

হ্যাঁ তো।

আসলে একটা সান্ট্রো গাড়ি আছে, কিন্তু ড্রাইভারকে নিয়ে তাতে অলরেডি তিনজন সওয়ারি। আপনাদের বড্ড ঠাসাঠাসি হয়ে যাবে যে!

আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে তারা বলে ফেলল, ওতে কষ্ট হবে না। একজন আর একজনের কোলে বসে নিলেই হবে।

দাঁড়ান, দেখছি। ড্রাইভারটার বাড়ি তিলজলায়। তাকে ছেড়ে দিলে হয়। সেক্ষেত্রে গাড়ি আমাকেই চালাতে হবে। কিন্তু সঙ্গে লাইসেন্সটা নেই। ধরা পড়লে বিপদ।

শেষ অবধি তাই হল। শ্যামপুরের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক বীরভদ্র ওরফে বীরু সেই রাতে তিন অবলাকে উদ্ধার করে আনে।

উদ্ধারপর্বটা সেই রাত্রেই শেষ হল না। বরং শুরু হল।

একটা লোক সামনে বসে গাড়ি চালাচ্ছে, আর একজন যুবতী পিছনের সিটে বসে দেখছে—এটা নিশ্চয়ই খুব একটা রোমান্টিক ব্যাপার নয়। লোকটা কোনও এমন বীরত্বের কাজও করছে না যাতে যুবতীটির বুকে ঝড় ওঠে। তবু রসায়ন বলেও একটা ব্যাপার আছে। অনেক তুচ্ছ ঘটনার সঙ্গে আরও কিছু তুচ্ছ ঘটনার সংমিশ্রণ ঘটে গিয়ে অনেক সময়ে ঘটনাটা আর তেমন তুচ্ছ থাকে না, বিশেষ হয়ে ওঠে। যেমন সেই রাত্তিরে হয়েছিল।

সেই রাতে হুহুংকার ঝোড়ো হাওয়া ছিল, খরশান তেরছা বৃষ্টির হুল ছিল, আর ছিল উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ির হেডলাইটের সাইকেডেলিক প্রক্ষেপ। বীরুর চুলে ছিল মুক্তোদানার মতো কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটাও। বিপজ্জনক জল জমা আন্দুল রোড পেরিয়ে চওড়া বোম্বে রোড ধরার আগেই যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছিল মন্দাকিনীর। তখন সতেরো বছর কয়েক মাস বয়সি মন্দাকিনীর মনের সেলেটে দু'চারজন যুবকের

কথা অস্পষ্ট লেখা হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সেই সন্ধেবেলার বৃষ্টি সব ধুয়ে মুছে সেলেট পরিষ্কার করে তাতে স্পষ্ট করে বীরুর নাম লিখে ফেলল।

উদ্ধরপর্বের সেই শুরু। বছর দেড়েক বাদে এক আলোকিত, পুষ্পগন্ধময় ছাঁদনাতলায় গিয়ে তা সাঙ্গ হল।

মুখচোরা, লাজুক বীরুকে মন্দাকিনী অনেক তাড়না করেছে, আমি তো সেই রাত্তিরেই—। তুমি কবে থেকে?

বীরু জবাব দিত না। কেবল হাসত, এড়িয়ে যেত। কিন্তু নতুন বর-বউদের মধ্যে অনেক মিষ্টি ব্ল্যাকমেল চালু আছে। তারই একটার কাঁচিকলে পড়ে বীরু অবশেষে স্বীকার হল, আমি তারও অনেক আগে থেকে। বেলপুকুরের একটা ফাংশানে তুমি সেই যে গান গেয়েছিলে, আমার মল্লিকাবনে—?

তাহলে কাছে এলে না কেন?

তুমি কি পাত্তা দিতে?

তবু চেষ্টা করতে দোষ কী ছিল?

লজ্জা করেছিল।

আজ সকালে পুবের জানালার ধারে টেবিলে কাগজ পেতে একটা শাড়ির ডিজাইন আঁকতে আঁকতে মৃদু মৃদু হাসছিল মন্দাকিনী। সেই রাতের কথাটা কেন যে আজ সকালেই হঠাৎ মনে পড়ল কে জানে। আর মনে পড়ে বলেই তো বেঁচে থাকতে কখনও কখনও বেশ ভাল লাগে।

একা একা হাসছিস কেন রে মন্দা? বলে পানজর্দার গন্ধ ছড়িয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল তার বড়জা সোমা। ছোটখাটো, বেটে-বেগুনের মতো গোলগাল চেহারা। কিন্তু মুখখানার ডৌল ভারি মিষ্টি, লক্ষ্মী ঠাকরুনের মতো।

একটা কথা মনে পড়ল, তাই।

রসের কথা বুঝি?

রসের কথা ছাড়া আর বুঝি কথা নেই?

তা রসের কথাই বুঝি কিছু খারাপ? আমার তো বাপু রস-কষের কথা শুনতে ভাল লাগে।

তুমি একটু অসভ্য আছ দিদি।

আমি ভাই সোজাসাপটা লোক, কথা লুকোতে পারি না তোদের মতো।

সব কথা কি কইতে আছে বড়দি? ভ্যাড়-ভ্যাড় করে সব বলে ফেললেই হয় বুঝি?

আমার বরও আমাকে ওই কথা বলে বকে। কী করব বল, কথা যে আমার বুকের মধ্যে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে, বলে না ফেললে সোয়াস্তি নেই।

জামাইষষ্ঠীর দিন কী কাণ্ড করলে বলো তো! বড় নন্দাই সবে মাছের কালিয়া দিয়ে ভাত মেখেছে! তুমি অমনি তার বাইশ হাজার টাকা ঘুষ খাওয়ার কথাটা সক্কলের সামনে বলে ফেললে! কেমন রাগ করে ভাত ফেলে উঠে গেলেন বলো।

লোহার আলমারির গায়ে লম্বা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে শরীরে নানা বিভঙ্গে মোচড় দিয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে সোমা বলল, কতগুলো টাকা বল! অত টাকা পেলে তো আনন্দ হওয়ার কথা। আমি ভাবলাম লোকটা খুশিই হবে।

বড়ঠাকুর কি সাধে তোমার ওপর রাগ করে বোকা বলেই না!

ওলো, আর বলিসনি। মেয়েমানুষের বুদ্ধি ধুয়ে কি জল খাবে? যা খেলে খুশি হয় তা তো রোজ রাত্তিরে চেপেচুপে খাওয়াই।

উঃ, তোমার কেবল শরীর নিয়ে কথা। আর কিছু নেই!

আবার কী থাকবে লা? তুই কি বোষ্টম নাকি? রাত্তিরে বীরু তোকে ছেড়ে কথা কয় বুঝি, তুই বিএ পাস বলে?

তোমাকে নিয়ে আর পারি না বড়দি। বড়-বউ মানেই বুঝি শুধু ওই?

ওটাই আসল রে।

বলে নিজের বুকের আঁচল ফেলে আয়নায় নিজের ঠেলে-ওঠা বুক খুব মন দিয়ে মুগ্ধ চোখে দেখছিল সোমা। মন্দাকিনী বলল, দরজাটা বন্ধ করে নাও বড়দি। ছোটরা কে কখন এসে পড়বে।

আসুক না। অত ভাবিসনি তো! টিভিতে দেখিস না মেয়েরা আজকাল আধ-ন্যাংটো হয়ে ঘোরে। ওরা কি আর দেখছে না নাকি?

মন্দাকিনীর রাগও হয়, আবার এই বোকাসোকা, শরীরসর্বস্ব, সরল মহিলাটিকে তার ভালও লাগে খুব। শরীর-টরীর খারাপ হলে এসে হামলে পড়ে সেবাটেবা করে। তাকে ভালবাসেও খুব। একটা দোষও আছে। নার্সিসাস কমপ্লেক্স। কেবল নিজের মুখ আর শরীর দেখে সারাদিন আয়নায়। আর যাকে তাকে যখন তখন জিজ্ঞেস করবে, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বলো তো! এমনকী একদিন শ্বশুরমশাইকে অবধি জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল। বিয়েবাড়ি যাবে বলে খুব সেজেগুজে বেরতে যাচ্ছিল, সামনে মহীপতিকে দেখে বিনা দ্বিধায় বলে ফেলেছিল, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বাবা, বলুন তো! কী লজ্জা!

মহীপতি অবশ্য পড়াশোনা জগতের লোক, এবং ঘোর অন্যমনস্ক মানুষ। প্রশ্ন শুনে, কী জানতে চাওয়া হচ্ছে তা না বুঝেই বলেছিলেন, বাঃ বেশ। সাবধানে যেও মা, কাকে মুখ না দেয়।

কী ভেবে বলেছিলেন কে জানে। তবে সেই কথা নিয়ে আজও হাসাহাসি হয়। বড়ঠাকুর রাগ করে তিন দিন বউয়ের সঙ্গে কথা বলেননি।

বোকা আর শরীরমুখো বউ নিয়ে বড়ঠাকুরের যে কিছু অশান্তি আছে তা মন্দাকিনী টের পায়। কিন্তু সোমা নিজে পায় না। সে দিব্যি আছে হেসে-ঢলে, পান খেয়ে, রঙ্গরস করে।

হ্যাঁ রে, আজকাল ছেলেতে ছেলেতে আর মেয়েতে মেয়েতে যে বিয়ে হয় তা শুনেছিস?

শুনব না কেন? হয় তো!

কী করে হয় বল তো! কী করে ওসব হয়?

তার আমি কী জানি। আমার তো আর হয়নি।

আমি না মাঝে মাঝে ভাবি, বুঝলি। খুব ভাবি। ভাবতে চেষ্টা করি, ধর আমার সঙ্গে যদি একটা মেয়ের বিয়ে হত তাহলে কী করে ওইসব হতটত বল তো! ধর যদি এই তোর সঙ্গেই আমার বিয়ে হত, তাহলে?

উঃ, আজ তোমার কী হয়েছে বলো তো! একটা সুন্দর প্যাটার্ন আঁকছিলাম, দিলে সব ভণ্ডুল করে।

রাগ করিসনি। আমার ওপর বুঝি কেউ রাগ করে? বোকা বলে তা জানিসই। নে না ভাই, একটা পান খা। পান খেলে মাথা ঠান্ডা হয়।

রক্ষে করো বাপু, পানের নেশা করে মরব নাকি? দাঁতগুলোর বারোটা বাজবে।

দুর! আমি রোজ গুল দিয়ে দাঁত মাজি, রাতে ব্রাশ করে শুই। মুখে গন্ধ হলে তোর ভাসুর কি আর চুমু খেত রাত্তিরে?

প্যাটার্নটার দিকে খানিকক্ষণ হতাশ চোখে চেয়ে মন্দাকিনী বলে, বেশ আছ তুমি বড়দি।

তা আছি ভাই। বেশ আছি। পেটে বিদ্যে নেই, মাথায় বুদ্ধি নেই, থাকলে কি আর বেশ থাকতাম?

মন্দাকিনী হেসে বলল, বেশ বলেছ কিন্তু। আর এই জন্যই তোমাকে আমার ভালো লাগে।

নীচে একটা হুড়দৌড়ের শব্দ উঠল। বাইরের দরদালানে মহীপতির ক্লাস শেষ হল এইমাত্র। দশটা বাজে। ছেলেমেয়েরা যে যার বাড়ির দিকে ছুটছে। নেয়ে-খেয়ে এগারোটার স্কুল ধরবে। মহীপতি এসময়ে এক কাপ চা খান। তারপর বাগানে যান গাছের পরিচর্যা করতে।

সোমা জানালা দিয়ে নীচে কচুপাতার ওপর পানের পিক ফেলে বলল, ছেলেমেয়েগুলোকে দ্যাখ। কেমন ছুটছে!

ও আর দেখায় কী আছে?

আমার না আরও বাচ্চাকাচ্চার মা হতে ইচ্ছে করে।
ও বাবা, তিনটেতেও শখ মেটেনি?
বাচ্চাকাচ্চা কি আর ফ্যালনা হয় রে!
তুমি পারও বটে।

বেলা সাড়ে দশটায় একটা সাইকেল আনমনে শিমুলতলা পার হয়ে যায়। একটু ধীরে ধীরে। পুরনো বিষণ্ণ সাইকেল, ধুলোটে। তার তেমন যত্ন নেই। সাইকেলে যে-মানুষটা বসে থাকে তারও তাই। যত্ন নেই। রুখু দাড়ি থাকে গালে, গোঁফের কোনও ছাঁট নেই, মাথার আছাঁটা চুল মাঝে মাঝে বাবরি হয়ে ঘাড়ে নেমে আসে আবার কখনও কদমছাঁট। জামায় ইস্তিরি থাকে না, প্যান্টে থাকে না ক্রিজ, পায়ের নোংরা চটিতে জন্মে পালিশ লাগানোর বালাই নেই। ওই হল দিবাকর।

আর ওর জন্যই এই সকাল সাড়ে দশটায় পাঁচ মিনিটের জন্য দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে বন্দনা। এ বাড়ির মেজো বউ। দিবাকর আজ তার কেউ নয়। অথচ সর্বস্ব হতে পারত। হয়নি। তখন উড়ন্ত সাইকেল ছিল দিবাকরের, মাথায় কোঁকড়া চুল আঙুরের থোলোর মতো ঝুল খেয়ে থাকত, জোড়া ভ্রুর নীচে চোখ দু'খানা বন্দনার হৃৎপিণ্ড ভেদ করতে পারত অনায়াসে। গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরত, নীলাভ জিনস, কখনও বুক খোলা সাদা টি-শার্ট আর কালো গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট। বালিকাবয়স থেকেই বন্দনা ওকে ভাবী বর বলে ধরে নিয়েছিল। যেমন তাকে বউ বলে ধরে নিয়েছিল দিবাকরও। আর তাদের দু'জনকেই বর-বউ বলে স্থির করে রেখেছিল দু'পক্ষের পরিবারও। কোনও বাধা ছিল না।

কিন্তু কুসুমে কীট ছিল। তার বাপের বাড়ি ভীমপুর বেশি দূর নয় এই পীরতলা থেকে। ভীমপুরের সবাই জেনে গিয়েছিল বন্দনার সঙ্গে দিবাকরের বিয়ে হবে। কিন্তু তারা যখন বিয়ের যুগ্যি বয়সে পৌঁছল তখন বন্দনা বিএ পড়ছে, আর দিবাকর আর্মির চাকরিতে কাশ্মীরের কোন উপান্তে দেশ পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মিলিটারির পোশাক পরা দিবাকরের ফোটো আসত। পিছনে বরফ ঢাকা পাহাড়, কিংবা বিশাল সরোবর, অথবা চমৎকার আপেলের বাগান। করপোরাল না কি যেন একটা পোস্টে ছিল তখন দিবাকর। কামান-বন্দুক নিয়ে কারবার। মাঝে মাঝে সেনসর করা চিঠি আসত। লিখত, আর্মির চাকরিতে খুব মজা, কিন্তু শরীর ভাল যাচ্ছে না।

বিয়ের তাড়া ছিল না কিছু। ছুটি পেলে এসে বিয়ে করে যাবে, এরকমই কথা ছিল। সেই রোমান্টিক ছুটিটার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে ভালই লাগত বন্দনার।

ভীমপুরে সে বছর শীত পড়েছিল খুব। হাত পা যেন শরীরের মধ্যে সিঁটিয়ে যায়। আঙুলের ডগা নীল হয়ে থাকে শীতে। জলে হাত দিলে মনে হয়, হাতখানা নেই, শীতের কুমির কেটে নিয়ে গেছে। সেই সময় এক অজানা জায়গার মিলিটারি হাসপাতাল থেকে দিবাকর লিখল, তার একটা অসুখ হয়েছে, কিন্তু কী অসুখ তা ধরা যাচ্ছে না।

চিঠি পেয়ে ভীমপুরের শীতটা যেন দুনো হয়ে বন্দনাকে ঠুঁটো করে দিয়েছিল। কী হল তার দিবাকরের? এমন কী অসুখ এই বয়সে একজন মিলিটারির?

তারপর এল বসন্তকাল। গাঁয়ে-গঞ্জে বসন্ত একটু একটু টের পাওয়া যায় আজও। শীতের চোরা বাতাসও আছে। আবার উষ্ণতাও। ফুলটুল ফুটছে চারদিকে। আবহটা ভারি সুন্দর।

সন্ধেবেলা বন্দনা সেদিন এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে ফিরছিল একা। বটতলার কাছাকাছি হঠাৎ একজন লোক পথ আটকে দাঁড়াল। প্রথমটায় চিনতেই পারেনি সে। অন্ধকার ছিল, আর দিবাকর বড্ড রোগাও হয়ে গিয়েছিল তখন।

কে? বলে ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল বন্দনা।

আমি বন্দনা, আমি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।
ওমা! তুমি! খবর দাওনি তো!
ইচ্ছে করেই দিইনি।
দীর্ঘ বিরহের পর আনন্দে বুক ভেসে যাওয়ার কথা। কিন্তু দিবাকরের চেহারা দেখে আর গলার স্বর শুনে কেমন যেন ধকধক করছিল বুকের ভিতরটা। মানুষের মুখের মধ্যে যে কত সাপ লুকিয়ে থাকে।
বসন্তের সেই কবোষ্ণ সন্ধ্যায় মদির হাওয়া ছিল, গাছের ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে মৃদু জ্যোৎস্নার আলো ছিল, আরও সব কী কী ছিল যেন মায়াবী জিনিস, ঠিক মনে নেই বন্দনার। কিন্তু সব কিছুর ওপর যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিল দিবাকর। নিবে যাওয়া ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, একটা খারাপ কথা বলতে হচ্ছে। তুমি সইতে পারবে কি?
কী কথা গো?
বিয়েটা হবে না।
সে কী! কেন?
আমার একটা অসুখ ধরা পড়েছে। ভালো অসুখ নয়।
মা গো! কী অসুখ?
আমি এইচআইডি পজিটিভ। ব্যাপারটা কী বোঝো?
বোঝে, বন্দনা বোঝে। তোলপাড় হচ্ছিল বুকের মধ্যে চোখে জল, তবু বলল, বুঝি। কী করে হল?
সেটা শুনতে চেও না। যেমন করে হয় তেমনি করেই। প্লিজ, আর বলতে পারব না। আমি পাপী।
তিন চারটে দিন তারপর কেটে গিয়েছিল সন্তাপ আর দহনে। কীভাবে যে কেটেছিল রাত আর দিন কে জানে। সব একাকার হয়ে গিয়েছিল, আলো আর অন্ধকার। সুখ আর দুঃখ। কী কান্নাই কেঁদেছিল দিবাকর! এক সমুদ্দুর চোখের জল।
সেই সব চুকেবুকে গেছে এখন। যেন জন্মান্তরের কথা। এক্স সার্ভিসম্যান হিসেবে উলুবেড়ের জাতীয় সড়কের পাশে একটা এসটিডি বুথ আর জেরক্স মেশিনের দোকান পেয়ে গেল দিবাকর। আর নাকের বদলে নরুনের মতো বন্দনা পেল সুভদ্রকে। এখন তার পীরতলায় বাস।
শিমুলতলায় একবার তার বিষণ্ণ সাইকেলখানা একটুক্ষণের জন্য দাঁড় করায় দিবাকর। পায়ের ঠেকনা দিয়ে। তারপর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকায় দোতলার বারান্দায়, বন্দনার দিকে। কোনও কথা নেই, কেউ হাতটাতও নাড়ে না। শুধু কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থাকে দু'জনে দু'জনের দিকে। প্রেম মরে গেছে সেই কবে। বুকে আর মাদলের কোনও শব্দ নেই। শোক ও সন্তাপ প্রশমিত হয়ে এখন শুধু একটু মেদুর স্মৃতির সুগন্ধ হয়তো বা। হাহাকার নেই, শুধু একটু 'আহা রে' আছে বুঝি। আর আছে অভ্যাসের মতো একটু দাঁড়িয়ে থাকা। কয়েক সেকেন্ড পর ফের সাইকেলের পেডালে অনিচ্ছুক পায়ের পাতায় চাপ দেয় দিবাকর। চলে যায়।
ওই একই পথ দিয়ে দুপুরে সাতান্ন গেট-এর সার আর পেস্টিসাইডের দোকান থেকে বাড়িতে খেতে আসে সুভদ্র, আর মোপেড চালিয়ে। তখনও বন্দনা বারান্দায় থাকে তার স্বামীর অপেক্ষায়। মানুষের রদবদল হয়েছে, কিন্তু পৃথিবী তো রসাতলে যায়নি। বন্দনা তার স্বামীর বুক ঘেঁষেই তো শোয় রোজ, তারই ঔরসজাত দু'টি সন্তানকে বুকবুক করে লালনপালন করে, লেখাপড়া শেখায়। সূর্য পুব দিকেই ওঠে রোজ, পশ্চিমে অস্ত যায়। শুধু মাঝে মাঝে মনে হয়, কেমন করে হচ্ছে এসব? প্রলয় হল না তো! উল্টেপাল্টে গেল না তো জগৎসংসার?
আজও নিয়মমতো শিমুলতলার ছায়ায় ওই বিষণ্ণ সাইকেলখানা থামল। একখানা বিষণ্ণ ও মলিন মুখ ফিরল তার দিকে। জ্যোতিহীন দু'খানা মৃত চোখ চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর ধীর গতিতে চলে গেল সাইকেলখানা।

বুকে চাপা একখানা শ্বাস ছেড়ে ঘরে এল বন্দনা। কত কাজ বাকি। সংসার কি ছুটি দেয়? দিবাকর পাঁচ বছর বেঁচে আছে। হয়তো আরও বহু বছর বেঁচে থাকবে। তাই থাক। শুধু বেঁচে থাকাটাও তো কম নয়!

বেলা সাড়ে তিনটের সময় মহীপতি খবরের কাগজখানা দেখছিলেন। সবটুকুই পড়েন তিনি। কিছু বাকি রাখেন না।

দরজার কাছ থেকে একটা ক্ষীণ আর ভীরু গলা ডাকল, দাদু! ও দাদু!

কে রে?

আমি। আমি মাধী! তুমি কি ঘুমোচ্ছ?

মহীপতি ফিরে চেয়ে একটু অবাক। বললেন, কী রে মাধী! কিছু বলবি?

আমাকে একটু ইংরিজি শেখাবে?

মহীপতি ভ্রু তুলে বললেন, ইংরিজি শিখবি! হঠাৎ ইংরিজি শিখতে চাস কেন রে?

মাধী মুখ নীচু করে খুব হাসল। তারপর বলল, সে আছে একটা ব্যাপার। শেখাবে কিনা বলো।

কেউ কিছু শিখতে চাইলে, পড়াশুনোর ব্যাপার শুনলে মহীপতি বড্ড খুশি হন। বললেন, শিখতে চাস সে তো খুব ভাল কথা। তা এতদিন উড়নচণ্ডীপনা না করে শিখলে কতটা শিখে উঠতে পারতিস বল তো!

এতদিন শিখিনি বলেই তো রাগ করছে।

কে রাগ করছে?

সে আছে একজন। কবে থেকে শেখাবে বলো না!

কবে থেকে কী রে! শুভস্য শীঘ্রম। ওই মাদুরটা পেতে বোস এসে।

মাধী ভারি লজ্জা-লজ্জা মুখ করে এসে মাদুর পেতে বসল। বলল, বইপত্র আনিনি তো!

কত বই লাগবে তোর? আমার কাছে সব বই আছে। দয়া করে যদি শিখিস তাহলেই হবে। তোর শেখার বাই উঠেছে এতেই আমি খুশি। দু'দিন পর ছেড়ে পালাবি না তো!

না গো, সে উপায় নেই। না শিখলে রাগ করবে খুব।

বলে মাধী মুখ নিচু, হেসে বাঁচে না। হাসিতে মুখ উপচে পড়ছে। বিল্টুর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে একটু আগে। বলেছে, সাত দিনের মধ্যে নিজে নিজে মেসেজ করতে হবে, আই লাভ ইউ!

মরণ! গলায় দড়ি!

বনের মধ্যে

নতুন যে লোকটা আমাদের বাড়িতে কাজ করতে এল সে ভারী কাজের লোক। নাম হাজারী, ভাগলপুরে দেশ, আমগাছের ডালে সে আমাদের জন্য মোটা দড়ি দিয়ে দোলনা বেঁধে দিল। টায়ারের টিউব কেটে পেয়ারা গাছের ডাল দিয়ে তৈরি করে দিল চমৎকার গুলতি। মাঝে-মধ্যে সে মনিহারি ঘাটের শাটল ট্রেন ধরে ভাগলপুর থেকে কলসীভরা মোষের দুধ এনে দিত পায়েসের জন্য। বাগানের গাছপালার যত্ন করত। দেহাতি আর বাংলা ভাষায় সে বলতে পারত নানারকম গল্প। অড়হর ডাল বেশি খেলে নাকি রাতকানা হয়। হাজারী অড়হর ডাল খেত খুব। তাই বোধহয় সে ছিল রাতকানা আর ছিল ভারী ভূতের ভয়।

আমরা রেলের বাংলোবাড়িতে থাকতাম। মস্ত মস্ত গোটাচারেক ঘর, খাওয়ার হলঘর, সামনে কাঠের জাফরি লাগানো বারান্দা, চারধারে কম্পাউণ্ড ঘেরা বিশাল বাগান। তাতে কত যে ফুল লাগানো হয়েছিল! ছোট্ট ছোট্ট লাল রঙের বাটির মতো পপিফুল, ভেলভেটের মতো মোরগফুল, গোলাপ ছিল চার-পাঁচ জাতের, আর ডালিয়া সূর্যমূখী, এ সব তো ছিলই, দিনের বেলায় বাড়িটা ঝকমক করত। ঘরগুলো একটু সোঁদা-সোঁদা অন্ধকার। আমরা ছয় ভাইবোন সারাটা বাড়ি আর বাগান দাপিয়ে কাঁপিয়ে রাখতাম। বড় দুই দিদি তখন কিশোরী, সাহেবপাড়ার মেয়েরা পুতুল খেলা জানে না বলে কেরানীপাড়া থেকে শেলী বুলি সব খেলতে আসত। বাড়ির পশ্চিমকোণের একটা পরিষ্কার জায়গায় তাদের বেশ বড়-সড় খেলার আসর বসত। আমরা পিঠোপিঠি দুই ভাই, আমি আর দাদা শিমুল-গাছের কাছে ছোট্ট ফাঁকা জায়গায় ব্যাটবল খেলতাম, শেলী বুলিদের ভাই টবু বুধো আর নাসিরুদ্দিনের দুই ছেলে হাসান আর গফরা আসত। দাদার ইস্কুলের বন্ধুরাও আসত দু-চার জন। ছোট বোনটা দিদিদের আসরে গিয়ে বসে থাকত। ভাইটা হানা দেয় মাত্র। বাবা অফিসে গেলে আমাদের রাজত্ব। মা রান্নাঘর সামলায়, আর সামলায় ম্যালেরিয়া। হঠাৎ হঠাৎ জ্বর আসে তার। আর তখন বারান্দায় বেরিয়ে আমাদের নাম ধরে ডাক দিয়ে বলে—আমি লেপমুড়ি দিচ্ছি, তোরা আয়। আমরা দু ভাই দৌড়ে যেতাম। মা লেপমুড়ি দিয়ে শুলে আমরা দুজন ঠেসে ধরে থাকতাম মাকে।

ইস্কুল ছুটি না থাকলে বাড়িটা নিঃঝুম থাকত। দাদা আর দুই দিদি যেত ইস্কুলে। আমি প্রায় একা। ছোট বোনটা আপন মনে খেলত, ভাইটা হামা টানত। তখন আমার সঙ্গী হত হাজারী। আমার কাঁধে এয়ারগান, হাজারীর হাতে গুলতি, দুজনে বেরোতাম শিকারে। রেললাইন পেরিয়ে একটা নালা। নালার ওপারে চমৎকার একটা বন। সেখানে হাজারো পাখির আস্তানা। নালাটা পেরোতাম হাজারীর কাঁধে চড়ে। জঙ্গলের আশে-পাশে সাপের খোলশ পড়ে আছে। আছে পাখির পালক। শিমুলতুলোর উড়োউড়ি। ধানীলঙ্কা ফলে থাকত গাছে গাছে। হাজারী মাদার ফল পাড়ত। একটু টক-মিষ্টি ফলটা সে-ই আমায় খেতে শেখায় প্রথম। জঙ্গলে একটা গুপ্ত গোলাপজাম আর ফলসা গাছও ছিল। আমারা শেয়ালের গর্ত দেখতাম। মাঝে মাঝে গোখরো সাপ দেখা যেত, চলে যাচ্ছে, কত্তালের মতো পাখির শব্দ বাজত বনময়।

বনটা বড় ছিল। আমরা এক-আধদিন বনের খুব ভিতর দিকে চলে যেতাম। হাজারী তার তেলপাকা লাঠিটা সঙ্গে নিত কখনো কখনো। বনের ভিতরে কোথাও কোথাও ছিল বেশ অন্ধকার। ঝুপসী গাছগাছালীর

তলায় মাটিতে শ্যাওলা জমেছে কার্পেটের মতো। মরা পাতা পড়ে আছে। বুনো ফল, পাকা কুলের গন্ধে ম ম করছে বাতাস। একটু দূরে কোথা থেকে কাঠুরের কুড়ুলের শব্দ ভেসে আসছে খটাখট। দূর থেকে দেখতুম বনভূমি কাঁপিয়ে মস্ত উঁচু একটা গাছ হঠাৎ ভেঙে পড়ে গেল।

সরসতীয়াকে সেই বনের মধ্যে দেখতে পাই একদিন। সে তার বুড়ো বাপের সঙ্গে ভিক্ষে করতে আসত আমাদের বাড়িতে। মা তাকে আমার দিদির একটা লাল ফ্রক দিয়েছিল, পুরানো। সেই ফ্রক পরে সে দেখি, শুকনো ডালপালা কুড়োচ্ছে। ফ্রকটার বোতাম ছেঁড়া। তার পিঠ আদুড়। মাঘের শীত ওর গায়ে লাগে না। আমাদের দেখে মুখ তুলে অবাক চোখে দেখল একটু। তারপর ফিক করে হাসল। তার কাঁকালে ঝুড়ি, মগডাল থেকে শুকনো ডালপালা টেনে নামানোর জন্য একটা শুকনো হাল্কা বাঁশের আঁকশি। একমাথা তেলহীন, জটধরা লালচে চুল, মুখে ছোপ ছোপ ময়লা লেগে আছে। দেখলেই সরসতীয়াকে ভিখারি ছাড়া কিছু মনে হয় না। কিন্তু সেই কাঙাল মেয়েটার মুখে একরকমের লাবণ্য ছিল। ভিখিরিই যদি বলি, তবে বলতেই হয়, ভিখিরিদের মধ্যে সরসতীয়া ছিল সবচেয়ে সুন্দরী। বালিকা-বয়স থেকে সে তখন সদ্য কৈশোরে পা দিচ্ছে।

আমি কর্তামি ফলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এখানে কী করছিস?

আমার গলার স্বর জমিদারে ছেলের মতো। যেন বা জঙ্গলটা পাবলিকের নয়।

সরসতীয়ার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। সে ঠিক অধীন প্রজার মতো সরল ভীতু গলায় বনে—জরা সে শুখা কাঠ-উঠ লেবতান চুন চুনকে।

তার ভয় দেখে ভারী খুশী লাগল। বললাম—বেশি নিবি না। যা ভাগ।

সে আবার ফিক করে হাসল।

সেই হাসি দেখেই বোধহয় হাজারীর তাক লেগে গিয়ে থাকবে। আমরা আরো গভীর জঙ্গলে নতুন দেশ আবিস্কার করতে যখন ঢুকে যাচ্ছিলাম তখন হাজারী সর্তক গলায় জিজ্ঞেস করল—ও মেয়েটা কে?

বললাম—সরসতীয়া।

—জাতে কী? দোসাদ না কুর্মী?

—কে জানে!

—সাদী হয়েছে?

—জানি না তো!

হাজারী অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে বলল—খোকাবাবু, আমি ছেলেবেলা থেকেই পরের ঘরে মানুষ। আমার কেউ সাদী দেয়নি। এই উমরে সাদী না হলে আমাদের বড় একটা কনে জোটে না। ভারী মুশকিল।

কেন যে সে কথাটা বলেছিল তা বুঝবার বয়স তখনো আমার হয়নি।

নাসিরুদ্দিন ছিল ডি-টি-এস অফিসের পিওন, রোগা-ভোগা মানুষ। তার দুটো বৌ খালাসীটোলার বাড়িতে চিলু বিলু ঝগড়া করত। আমরা কখনো-সখনো ঈদ বা অন্য কোন পরবে গেলে খাওয়াত সিমাইয়ের পায়েস, বিহারী বিকিয়া। তাদের করতলে মেহেদীর নকসা, গায়ে রসুনের ঝাঁঝ, চোখে সুর্মা। নাসিরুদ্দিন ভাত খেত পড়ন্ত বেলায়, বিছানায় বসে, সবুজ সানকীতে। হাসান ছিল ছোটবৌয়ের ছেলে, গফরা বড়বৌয়ের। গফরা ছিল বোকা। হাসান চালাক, ইস্কুলে ক্লাস ওয়ানেই গফরা চারবার গাড্ডা দিয়ে পড়া ছেড়েছে। নাসিরুদ্দিনের সাইড বিজনেস ছিল ছাগলের দুধ বিক্রি করা। গফরা সেই দুধ বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিত। গফরাকেই আমার ভাল লাগত বেশি। বোকা বোকা, কথা-কম-বলা, ঠান্ডা মেজাজের ছেলেটি ছিল সে। ঝগড়া কাজিয়ায় থাকত না।

তখন হাজারীর কাছে সদ্য গুলতি শিখেছি। হাত তেমন সৈ হয়নি। যেখানে সেখানে তাক করে পাথর ছুঁড়ি। ফসকে যায়। সবচেয়ে বেশি তাক করতাম ল্যাম্পপোষ্টে। হাজারী কিন্তু শিমূলের মগডাল থেকে ঘুঘুর

মাথা ভেঙে নামিয়ে আনত, ডাসা পেয়ারা থেকে কাঁচা আম সবই পাড়ত গুলতিতে। সেটা দেখে ভারী লোভ হয় ওরকম সৈ হাত তৈরি করতে।

গফরা ছিল আমার দুপুরের সঙ্গী। একা, লম্বা, দুপুরে তখন কী করি। মা হয় ভাত-ঘুমে, নয়তো জ্বরে পড়ে আছে। দাদা দিদিরা বন্ধুরা সব স্কুলে। হাজারী দুপুরে বাবার অফিসঘরের দরজা দিয়ে টেবিলের তলায় শুয়ে ঘুমোয়। নয়তো বাসন-কোসন মাজে, কী অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই দুপুরে বোকা গফরা ছাড়া আর কোন সঙ্গী ছিল না আমার।

হাতে গুলতি, পকেটে সাইজমতো সব পাথরের টুকরো নিয়ে ঘুরে ঘুরে গফরাকে আমার হাতের টিপ দেখাতাম।

গফরা বলত—মার তো মিঠু, ঐ বাড়িটার দেয়ালে!

হেসে গড়িয়ে পড়তাম, দেয়ালটা যে লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না, অত বড় দেয়ালে যে বাচ্চা ছেলে গুলতি লাগাতে পারে, সেটা সে ভালো বুঝত না।

কখনো বা খুব ভেবেচিন্তে বলত—পারিস তো বুঝি তুই খুব রুস্তম, লাগা দেখি দূর থেকে ঐ রেলপুলের থাম্বায়।

রেলপুলের থাম প্রায় সিকি মাইল দূরে, ধু-ধূ দেখা যায়। স্বয়ং অর্জুনও পারবে না। ভারী বিরক্ত হতাম গফরার ওপর। কিন্তু বোকা হলেও বাধুক ছিল গফরা। যা করতে বলতাম সব করত। মাঝে মাঝে বলত হয়তো—তোরা তো বাঁউন না?

—তোদের ফৈতে হয়?

ফৈতে মানে পৈতে। বলতাম—পৈতে! হবে না কেন?

সে গম্ভীর হয়ে বলত—আমাদেরও হয় ছুন্নত। তোদের ফৈতেয় যেমন কান বিধিয়ে দেয়, তেমনি আমাদেরও কেটে দেয় একটা জিনিস।

—কী কাটে?

—সেই যে সেটা! লজ্জার জিনিসটা!

অল্প অল্প বুঝতাম। বলতাম—কাটে?

—বাঁশের চোঁচ দিয়ে। খুব ব্যথা লাগে। দেখবি, আমারটা গেল বছর কেটেছে! বলেই সে তার ব্যাপারটা দেখাতে চাইত। আমি ধমকে বলতাম—যা।

সেবার সার্কাস এল শীতকালে। রেসের সাহেবদের একদিন করে ফ্রি পাস দিল। গরীব সার্কাসের বাঘ-সিংহ তেমন ছিল না। রোগা রোগা কয়েকটা লোক কষ্টেসৃষ্টে ট্রাপিজের খেলা দেখাল। ছেঁড়া পাতলুনে তালি আঁটা একটা লোক জোকারী করল খুব। জাপানি ছাতা মাথায় দু'টো মেয়ে তারে হাঁটল, আর চোখবাঁধা এক বুড়ো ব্ল্যাকবোর্ডের মতো একটা বোর্ডের গায়ে একটা মেয়েকে দাঁড় করিয়ে বলল—এ আমার মেয়ে। তারপর বুড়ো বাপটা তার মেয়ের শরীরের চারধারে শরীর বাঁচিয়ে গোটা দশেক ছোরা দূর থেকে ছুঁড়ে গেঁথে দিল।

সেই দেখে হাজারীরও তাক লেগে গিয়েছিল। বলল, এটা একটা খেল বটে খোকাবাবু।

এর কয়েকদিন পরই আমি গফরাকে রাজী করালাম। দুপুরের নির্জনতায় বাগানের পিছনে কাঁচামিঠে আমগাছের তলায় একটা টেনিস বল তার হাতে দিয়ে দাঁড় করালাম। রফা হল, সে হাতের চেটোয় বলটা রেখে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি দূর থেকে গুলতি মেরে বলটা ওড়াব।

সবই ঠিকঠাক ছিল, গফরা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে আমার গুলতি মারা দেখছিল। আমি কান পর্যন্ত রবার টেনে পাথর ছাড়লাম, গফরা একবার আক করে শব্দ তুলেই গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

ব্যাপারটা ঝাঁৎ করে বুঝতে পারলাম, তবু কাছে গিয়ে অবিশ্বাসে গফরাকে নাড়া দিয়ে বললাম, এই গফরা কী হচ্ছে! এই...

দেখি গফরার বাঁ পাঁজরে বিঘৎখানেক জায়গা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। চোখ ওল্টানো, খিচ ধরেছে হাতে-পায়ে।

তক্ষণি দৌড়ে পালালাম, কলপাড়ে একটু আগে বাসন মাজছিল হাজারী। আধমাজা বাসন পড়ে আছে, হাজারী নেই। তাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে অসহায় হয়ে লুকোলাম গিয়ে ভুট্টার ক্ষেতে।

ভুট্টাগাছ তখন মাথা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে গেছে। সবুজ গাছগুলিতে ধরেছে পাক, সর সর করে বাতাসের শব্দ হয় তার ভিতরে। ঝিরঝিরে আলো-আঁধারের সেই রহস্যে ঢাকা ভুট্টাক্ষেতে ঢুকে পথ হারানো মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছি। বোকা গফরাটা কি মরে গেল? হায় ভগবান, আমার তো তবে ফাঁসি হবে!

দাঁড়িয়েছিলাম সেইখানে। সময়ের জ্ঞান ছিল না। তবে খুব বেশিক্ষণ নয় বোধহয়। হঠাৎ ভট্টাক্ষেতের অন্যধার থেকে চাপা কথাবার্তা শুনতে পাই। দু'পা এগোতেই দেখি, এক অদ্ভুত দৃশ্য, সেই আলোছায়ায় দুই মূর্তি। হাজারী সরসতীয়ার একখানা হাত ধরে আছে, সরসতীয়ার মুখে ভয়, চোখে কৌতূহল। সাড়া পেয়ে হাজারী ফিরে আমাকে দেখে। ভুরু কুঁচকে বলে—রোজ এ মেয়েটা ভুট্টা চুরি করে, আজ ধরেছি।

অপরাধ তেমন গুরুতর নয়। কারণ, আমাদের ভুট্টাক্ষেত থেকে যে কেউ পথ চলতি দু-চারটে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কেউ কিছু বলে না। অত ভুট্টা খাবে কে?

আমি দৌড়ে গিয়ে হাজারীর হাত চেপে ধরলাম—হাজারী, গফরা মরে গেছে। আমার ফাঁসী হবে।

সেটা স্বদেশী যুগ। ফাঁসির কথা আমরা সকলে জানতাম।

শুনে হাজারী হাঁ করল। তার স্খলিত হাত থেকে খসে গেল সরসতীয়ার হাত।

মেয়েটা পালাল না। দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখতে লাগল। তিনজন ভুট্টাক্ষেত থেকে বেরোতেই দেখি, গফরা আমতলায় ধুলোয় বসে আছে। গেনীর মা তার মাথায় এক বালতি জল ঢেলেছে। সপ সপ করছে জলে ভেজা জামা-প্যান্ট। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে গফরা আমার গুষ্টি উদ্ধার করছে।

কিন্তু তার গালাগাল শুনে আমার একটুও রাগ হলনা। ভারী খুশি হলাম বরং। আমার ফাঁসিটা এযাত্রা ফেঁসে গেল। হাজারীর চোর কিন্তু তখনো পালায়নি। হাজারী গিয়ে গফরাকে দাঁড় করাল, সঙ্গে সঙ্গে দেখি সরসতীয়াও গফরার গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছে। ছোট্ট হাতের চাপড় দিয়ে। হাজারী তাকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল—যা ভাগ। সে তবু গেল না। তখন কি ছাই জানি, চোর নয়, চোরের হাতে হাজারীই ধরা পড়ে গেল।

ভাল ভঁয়সা ঘি নিয়ে একটি লোক আসত মাঝে মাঝে। তার জামাকাপড় গেরিমাটির রঙে ছোপানো বলে একটা গেরুয়া গেরুয়া ভাবও ছিল। আসলে সাদা কাপড় নোংরা হয়ে যায় বলে ঐটা ছিল তার কৌশল। রঙীন কাপড়ে নোংরা বোঝা যায় না।

লোকটা তার ঘিয়ের পাত্র খুলে বাইরের ঘরে বসেছে। মা হাতের উল্টোপিঠে ঘি একটু লাগিয়ে গন্ধটা পরখ করছে। সেই সময়ে হাজারী ঘি রাখার বড় বয়মটা ধরে নিয়ে এল ঘরে।

ঘিওলা হাজারীর দিকে চেয়ে দেখল একটু। তারপর তার দেশী ভাষায় বলল—তুই দোসাদপাড়ায় থাকিস না?

হাজারী ফ্যাঁস করে বলল—তাতে তোমার কী?

লোকটা টপ করে আধহাত উঁচু হয়ে বলে—তুই এ বাড়িতে কী করছিস?

হাজারী তাকে মুখ ভেঙিয়ে বলল—যাই করি না কেন, তোমার কী বাপু?

মা ঘিওলাকে জিগ্যেস করে—ওকে তুমি চেনো?

ঘিওলা রাগের স্বরে বলে—চিনব না কেন? ও তো আমাদের গাঁয়ের মগনের ব্যাটা। জল-চল নয়।

হাজারী বলে—হ্যাঁ তোমায় বলেছে।

ঘিওলা মাকে বলে—তোমারা ব্রাহ্মণ মা, এ ছেলেটা তোমাদের কাজকর্ম করে। তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমি গাঁয়ে গিয়ে পঞ্চায়েতে সব বলব। এর বাপের জরিমানা হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণের ঘরে মিছে

কথা বলে ঢুকে জাত মেরেছে।

হাজারী ঘাবড়ে গেল একটু, বাস্তবিক সে ছত্রী বলে নিজের পরিচয় দিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছে। আমরা ব্রাহ্মণ হলেও জাতবিচার খুব একটা ছিল না, বাবুর্চির হাতের মুরগি আমরা তো খেতামই।

লোকটার সঙ্গে হাজারীর তুমুল বচসা লেগে গেল। হাজারী লোকটাকে বলে তুমি ফোঁটা কেটে ঘুরে বেড়ালে হবে কী! তোমরা তো আসলে হাজাম।

দুজনকে থামাতে বিস্তর বেগ পেতে হল। লোকটা সে যাত্রা ঘি না বেচেই চলে গেল। দেশে গিয়ে হাজারীর কীর্তি ফাঁস করবে।

দুপুরে হাজারী আমার কাছে স্বীকার করল যে তারা জল-চল নয়। এমনকী, তার বাপ বেঁচে আছে। ছেলেবেলায় তার বিয়েও হয়েছে, তবে 'গাওনা' হয়নি। আমার কাছে সে কিছু মিছে কথা বলেছিল।

ব্যাপারটা হয়তো মিটে যেত, কিন্তু মিটল না। ঘি-ওলাটা খুবই খোঁচড় ছিল। কিছুকাল পরে সে হাজারীর বাপ মগন আর একজন গাঁইয়া পঞ্চায়েতের লোক নিয়ে এসে সরেজমীনে হাজারীর কীর্তি দেখাল। কী ভাবে হাজারী ব্রাহ্মণের জাত মেরেছে। হাজারীর বাপ আমাদের কাছে মাফী মাঙল। হাজারীকে তিন জুতী লাগাবে বলে আশ্বাস দিল, তার পর হাজারীর প্রায় ঘাড় পাকড়ে নিয়ে গেল তারা। যাওয়ার সময়ে হাজারীর সে কী কান্না!

হাজারী চলে যাওয়ায় আমাদের মন খুব খারাপ। অমন চমৎকার সঙ্গী বড় একটা হয় না। অবশ্য হাজারীর জায়গায় ততদিনে তেওয়ারী এসে গেছে, ব্রাহ্মণ, সে বাসন মাজে না, কেবল রাঁধে আর ফাই-ফরমাশ খাটে। গেনীর মা বাসন মেজে দিয়ে যায়। তেওয়ারী লোক খারাপ নয়। ভাল ভাল গল্প জানে। রাম-সীতার বিস্তর কাহিনী সে শোনাত। আমাকে সে তীর-ধনুক বানিয়ে দেবে বলে আশাস দিল।

ভুট্টাক্ষেতে একদিন চোর ধরলাম। সরসতীয়া। কিন্তু তার কোঁচড়ে ভুট্টা ছিল না। চুপচাপ খুঁঝকো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের বল ভুট্টাক্ষেতে পড়েছে এসে। খুঁজতে খুঁজতে ভিতরবাগে গিয়ে তাকে দেখতে পাই। আমার পায়ের শব্দ শুনে সে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে দৌড়াতে থাকে। চোর ভেবে আমিও দৌড়ই। সে লুকোচুরি খেলতে থাকে আমার সঙ্গে। এই তাকে আবছা মতো দেখি, এই আবার হারিয়ে যায়। বহুক্ষণ ছোটাছুটি করে হাঁফিয়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ তাকে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। নিঃসাড়ে পিছন থেকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পাকা ভুট্টাগাছের জঙ্গলে আমার এগোনোর শব্দ হচ্ছিলই। সে পালাল না। দু-হাতে মুখ ঢেকে হাসতে লাগল।

হাত চেপে ধরে যেই বলেছি—আরে, কী করছিস? সে ভারী চমকে গেল। যেন বা আমাকে একদম আশা করেনি। অবাক চোখে চেয়ে রইল খানিক। তারপর হঠাৎ মুখ কুঁচকে, কপাল কুঁচকে বিরক্তিতে আমার হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য হুটোপুটি করতে লাগল। অবশেষে কামড় দেওয়ার উপক্রম করতেই তার হাত ছেড়ে দিলাম। কাঁদতে কাঁদতে সে দৌড়ে পালাল।

হাজারী যে চলে গেছে সেটা বোধহয় সরসতীয়া জানত না।

গল্প

হেমেন-মিনতি সংবাদ

আজ বড্ড অন্ধকার। মিনতি বললো। ঘরটা অন্ধকার ছিল। মশারীর পাতলা নেট পর্দার মতো দুলছিল। জানলার ওপাশে কোথায় কোনো ঘরের আলো অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

—ভারী মজার কথা শোনালে। লোকে বলে 'আজ বড্ডো বাতাস'। হেমেন বললো।

অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কথাগুলো যেন গ্রামোফোনের রেকর্ডে বাজছে। মুখ না দেখিয়ে কেউ কথা বললে মিনতির এমনি মনে হয়।

—কথাটাকে তুমি ব্যাখ্যা করতে পারো?

—কোন কথাটাকে? মিনতি আদুরে গলায় বললো। হেমেনের জুলপির ওপর সে তার বাঁ হাতের মধ্যমা ও তর্জনীকে ঘষছিল। আঙুল দুটো অন্ধকারেই হেমেনের হাড়-উঁচু গালের ওপর কড়া দাড়িতে কিরকির করে শব্দ করলো।

—এই যে তুমি বললে আজ বড্ড অন্ধকার! হেমেন কি যেন ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে এই কথাগুলো খুব আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো, যেন সে যা বলছে তার অর্থ নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। আজ শেষ বেলায় বোধহয় মাছ সাঁৎলাতে হয়েছে মিনতিকে। হলুদ আর মাছের মিশ্রিত আঁশটে একটা গন্ধ পাচ্ছিল হেমেন। গন্ধটা তার নাসারন্ধ্র স্ফীত করে। হেমেন ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানে। যে বিশ্বাস করে যে, গন্ধটা নিশ্চিত মিনতির হাত থেকেই আসছে। পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সে তার ডান হাত দিয়ে মিনতির কব্জিটা ধরে ফেলে। মিনতির রোগা রোগা হাতে ঢলঢলে চুড়ি আর শাঁখায় ঝনাৎ করে শব্দ হয়।

—সব কথাই কি ব্যাখ্যা করা যায়! গেলেই কি সবসময়ে ব্যাখ্যা করতে হয়! এখন ঘুমোও তো। হেমেনের হাত থেকে নিজের হাতটাকে ছাড়িয়ে আনতে চাইলো মিনতি। হেমেন ছেড়ে দেয়। জোর করে না।

হেমেনের কপাল, ভ্রু আর গালের সংযোগ যেখানে, মিনতির হাতটা এখন সেখানে। মিনতি হাতের তেলোটা চেপে ধরে। বালিশের সঙ্গে হেমেনের মাথাটাকে চেপে রাখে। তার হাতের নিচে হেমেনের কপাল, ভ্রু আর গালের সংযোগে জুলপির পাশের জায়গাটা একটা গভীর গর্তের মতো। অন্ধকারে হাত দিলে মনে হয় যেন কোনো গভীর ক্ষত হয়েছে ওখানে।

বড় রোগা হেমেন, মিনতি ভাবে। হাতটা আস্তে আস্তে হেমেনের কপালের ওপর বুলিয়ে দেয় মিনতি। অনেক বড় কপাল। সামনের দিকে হেমেনের চুল পাতলা। স্নানের সময় মাথায় যখন জল ঢালে হেমেন, তখন বোঝা যায় ওর চুল কতো কম।

হেমেনের ডান হাতটা এখন মিনতির কোমরে। পাতলা চামড়া। নরম তুলতুলে বালিশের মতো পেট। পাঁজরায় সরু একটা হাড়ের ওপর চাপ দিয়ে হেমেন ভাবে এক্ষুনি সরু হাড়টা শোলার মতো পট করে ভেঙে যাবে। হলুদ আর মাছের আঁশটে গন্ধ মাখানো হাতটা আলতোভাবে তার মুখটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরছে।

উঃ! হাতটা সরাও। মিনতি বলে।

বোকার মতো শব্দ করে হাসে হেমেন। মিনতিকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে। মিনতি সরে যেতে চাইছে।

—কই বললে না তো!

—কি?

—কেন বলছিলে যে, আজ বড্ড অন্ধকার!

অন্ধকারে হেমেনের একঘেয়ে গলা শুনে আবার গ্রামোফোনের কথা মনে পড়লো মিনতির। আমাদেরও একটা গ্রামোফোন ছিল—মিনতি ভাবলো। দম দিলে চলতো। মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যেতো। আবার চাবি ঘোরাও। রঙ চটে-যাওয়া একটা লাল রঙের চোঙ ছিল তার। গ্রামোফোন চললে ঝরঝর করে কাঁপতো চোঙটা।

ডান হাতটা সরিয়ে নেয় হেমেন। একগোছা চুলের মস্ত একটা খোঁপা মিনতির মাথায়। সেই নরম নিঃশ্বাসে বাতাসের মতো হালকা সূক্ষ্ম চুলে নিজের হাতকে অবশ হয়ে যেতে অনুভব করে হেমেন। সেই ঘন কৃষ্ণ সূক্ষ্ম চুলের গোছার ভিতরে গভীরতর অন্ধকার। এই অন্ধকারে আমার হাত ডুবে আছে,—আর প্রেম। আমার সত্বাকেও এই অন্ধকারে রেখেছিলাম। সে যেন কবেকার কথা। অন্ধকারে সেই স্মৃতি হেমেনের মনে কি নরম হয়ে লেগে লেগে মুছে যাচ্ছে।

—অন্ধকারকে আমার ভয় করে। তুমি দেখো, যেদিন আমার মনে হয় অন্ধকারটা খুব গভীর, খুব ঘন, সেদিন একটা কিছু ঘটবেই। ঘটেই। আমার দ্বিতীয় একটা মন আছে।

—হুঁ। একটা নিঃশ্বাস ফেলে হেমেন। এই নিঃশ্বাসের শব্দটা তার নিজের কাছেই কেমন অচেনা মনে হয়। মিনতির সব কথা হেমেন শোনে না। শুনলো না। শুধু একটা কথা সেতার থেমে যাওয়ার পর তার রণনের মতো তার কানে বাজতে লাগলো। আমার দ্বিতীয় একটা মন আছে।

—শোনো, এ বাড়িটা বদলাও। মিনতি মুখ চেপে বললো। কথাগুলো যেন তার মুখ থেকে বালিশটা শুষে নিলো। নিজের কথা সে স্পষ্টভাবে শুনতে পেলো না। তার মসৃণ ঘাড়ে হেমেনের বাহুর বড় বড় লোমগুলো কুটকুট করছিল। সুড়সুড়ি লাগছে মিনতির।

—কেন? হেমেন উদারভাবে জিজ্ঞেস করে।

—এত ঘুপসির ভেতর থাকতে তোমার ভালো লাগে? মাগো, দিনের বেলাও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে এ জন্যেই। সূর্যের মুখ দেখতে পাই না আমরা।

—আহা অসূর্যস্পশা, তোমার বড় কষ্ট। হেমেন হাসতে চাইলো। 'এককথায় প্রকাশ কর, যে নারী কখনো সূর্যের মুখ দেখিতে পায় না'—হেমেন ঘষ ঘষ করে দাড়ি চুলকোলো। তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। 'এক কথায় প্রকাশ কর, হে অসূর্যস্পর্শা, তোমার যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সাধ, আহ্লাদের কথা প্রকাশ কর' হেমেন মনে মনে বলে, 'এই অন্ধকারে বলো। আমি তোমার মুখ দেখতে পাবো না। বেশ হবে।'

—তুমি ইচ্ছে করলেই আমরা বেশ বড়সড় খোলামেলো একটা বাড়িতে চলে যেতে পারি। হ্যাঁ গো, যাবে? এই বারো ভূতের আড্ডায় থাকতে ভালো লাগে! জল পাই না, রোদ পাই না—

—ছাদে গেলেই পারো। হেমেন পাশ ফিরতে থাকে। মিনতির মুখের কাছ থেকে নিজের মুখ সরিয়ে নিয়ে চায়।

রাত এগারোটা বাজলো, কোথায় যেন ঢং ঢং করে। উঁচু মিষ্টি পর্দায় গীর্জার ঘণ্টার মতো শব্দ। কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল মিনতি। কিন্তু দেওয়া হলো না। সে চুপ করে ঘণ্টার শব্দ শুনলো। এক দুই করে গুণলো।

এই ঘণ্টার শব্দ মিনতিকে বিবশ করে। সে উত্তেজিত হয়। হেমেন নিস্তব্ধ। চুপ। যেন ঘুমোয়। মিনতি উৎকর্ণ। কড়ে আঙুল দিয়ে অনামিকার ঘর গুণে গুণে সে ঘণ্টার হিসেব শেষ করে! শব্দটা শেষ হয় আর মনের মধ্যে কোথায় যেন আর একটা ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। সে শব্দ দূরাগত, অস্পষ্ট। যেন বহুদূর বিস্তৃত নীল আকাশের নিচে খোলা উদোম মাঠের ভিতরে ছোট্ট একটা স্টেশন। চারদিকে ধানক্ষেত। বহুদূর থেকে কালো ধোঁয়া কালির মতো আকাশের গায়ে মাখিয়ে, লোহালক্কড়, স্প্রিং আর হুক-এর টংলিং শব্দ করতে করতে ক্লান্ত একটা মালগাড়ি বুড়োর মতো কাঁপতে কাঁপতে আসে। হাঁপায়। মুরগির ডাকের মতো কোঁ কোঁ করে শব্দ ওঠে ব্রেক কষার। ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং। আবার লোহালক্কড়, স্ক্রুর শব্দ ওঠে। সেই মস্ত উদোম খোলা ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে বুড়ো অলস মালগাড়িটা চলতে শুরু করে। শুধু ঘণ্টার শব্দটা কোনো মন্দিরের পবিত্র শুদ্ধ বাতাসের মতো হয়ে যায়। হিজল গাছের ছায়া সারাদিন পুকুরে কাঁপে। বাবলা গাছের ঝিরঝিরে পাতায় বাতাস লাগে। ধূপের, ফুলের, সবুজ জলের গন্ধের মতো সেই ঘণ্টার শব্দটা তখনো যেন ছড়িয়ে পড়ে।

হেমেন আবার পাশ ফেরে। মিনতির কোমরে আর খোঁপার নিচে গলায় হেমেনের দুটো লোমশ বাহু শক্ত হয়ে আসছে। হেমেনের নিঃশ্বাস মিনতির মুখে গাঢ় হয়ে পড়লো। সস্তা সিগারেটের কটু গন্ধ। মুখ কোঁচকায় মিনতি, অবশ হাত দিয়ে দূরন্ত হেমেনকে বাধা দিতে চায়।

ঘণ্টার শব্দেই হেমেন পাশ ফিরেছিল। নির্জন রাতে অন্ধকারে এই ঘণ্টার শব্দ তাকে হতাশ করে। যেন ওই শব্দ তাকে জানিয়ে দেয় যে এই অন্ধকার, এই পৃথিবী শূন্য। সব শূন্য, উদাস। এই শূন্যতাকে এড়াতে গিয়ে সে পাশ ফিরছিল। হাত ঠেকে মিনতির গায়ে। একটা তীব্র উল্লাসে সে মিনতিকে জড়িয়ে ধরলো। 'অসম্ভব'—সে ভাবে—'মিনতিকে চুমু খাওয়া অসম্ভব।'

অন্ধকারে মিনতির যেন মুখ নেই। হেমেন মিনতির মুখকে হাত দিয়ে অনুভব করে ভাবলো মিনতির যদি মাথাটা না থাকতো! হেমেন মুখ নামায়। নিঃশ্বাস গাঢ়। ঘন দাড়ি। মিনতির মুখে মুখ রাখে।

'অসম্ভব'—হেমেন ভাবে—'মিনতিকে চুমু খাওয়া অসম্ভব।' তারপর নিরুত্তাপ, নিরুত্তেজিত হেমেনের ভিতর থেকে কে যেন বলে—'মিনতি তোমার বিশ্বস্ত। ওকে ছাড়া তুমি আর কাউকে চুমু খেতে পারো না। তোমার সে সাহস কই!' একটা মুরগির উত্তপ্ত নরম শরীরের মতো নমনীয় মিনতির বুক পিঠ। মিনতির একটা হাত তার পিঠে। সে হাতটা তাকে আকর্ষণ করে। অন্য হাতটা দিয়ে সে তাকে বাধা দেয়।

একটা নিটোল চুম্বনের শব্দ। বোতল থেকে ছিপি খোলার মতো সেই শব্দটা হেমেনকে যেন ধাক্কা দেয়। পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে ডিমের যে ঝালটা আজ মিনতি রেঁধেছিল সেটা চমৎকার লেগেছিল হেমেনের। কিন্তু এখন মিনতির ঠোঁটে সে গন্ধটা তার ভালো লাগে না। নরম ভেজা পাতলা দুটো ঠোঁট, লালা আর রসুন, পেঁয়াজ ডিমের গন্ধ, মাছের আঁশটে গন্ধ হতে তার অদ্ভুত লাগলো। হেমেন নিজের ওপর জোর খাটায়। 'মিনতি'—হেমেনের গলা। 'উ'—মিনতির।

আবার চুম্বনের শব্দ।

নরম হাড়, মিনতির পাঁজরা, সরু দুটো হাত হেমেনের এই অন্ধকারে এখন এলোমেলো একটা অর্ধনারীশ্বর মূর্তি তৈরি করলো। যেন কারো মুখ কারো দেহে সংলগ্ন। 'এখন কে আমি, কে মিনতি—কে বলে দেবে?' নিজেকে এই প্রশ্ন করে হেমেন।

'কে আমাকে বলে দেবে যে কবে—কবে—কবে প্রথম আমি গ্রামোফোনে গান শুনেছিলুম, কবে প্রথম আমি ঘণ্টার শব্দ শুনেছিলুম, কবে প্রথম আমাকে কে ভালোবেসেছিল?' মিনতির ঠোঁট থিরথির করে কাঁপে। নগ্ন রোমশ একটা কালো কম্বলের মতো হেমেন তাকে জড়িয়ে আছে। কিন্তু মনে আছে, কে কবে আমাকে প্রথম চুমু খেয়েছিল!

—শোনো, বাতিটা জ্বালিয়ে দাও।

—কেন?

—এই অন্ধকার আমার ভালো লাগে না।

—কেন?

—জানি না। আমার ভয় করে।

হেমেন আবার হতাশ হয়। জানালার আলোটা আর নেই। ফুটফুটে দু'-একটা তারা চোখে পড়ে। হেমেন চোখ ফেরায়। নিবিড় নিকষ কালো। হেমেন ভাবতে চাইলো সে চেয়ে আছে, না চোখ বুজে আছে। ভেবে পেলো না।

মিনতি চুপ করে শুয়ে থাকে। গ্রামোফোনের চোঙের ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে আমি গান শুনতুম। 'আমি বাঁচিয়া মরি নিতি নিতি, আমারে দাও হে বাঁচিয়ে।' কে গাইতো! আমি জানি না। গায়ে শিরশিরে কাঁটা দেওয়া ভয়কে অনুভব করতে সেই চোঙের ভিতর অন্ধকারের দিকে চেয়ে আমি গান শুনতাম।...বিকু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতো। আমার বয়স তখন এগারো কি বারো। বিকু উঁচু ক্লাসে পড়তো। আমার তিন ক্লাস উঁচুতে। আমরা বিকুর সঙ্গে চোর-চোর খেলতুম।...পাটাতনের সিঁড়ির নিচে আমি আর বিকু লুকিয়েছিলুম।

আমরা দু'জন একসঙ্গে। একটা বেড়াল সেই সন্ধেবেলা সেই সিঁড়ির নিচে জড়ো করা চালের বস্তার মধ্যে শুয়েছিল। একটা ইঁদুর লাফিয়ে গেল আমার পায়ের ওপর দিয়ে। বেড়ালের লেজটা আমার কনুইতে লাগলো। সাপ—বলে আমি বিকুকে জড়িয়ে ধরেছিলুম।...সেই প্রথমবার (যদি জানতে পারে! আমার কিন্তু হাসি পাবে)।...তারপর আরো অনেকবার বিকু আমাকে...!...অসভ্য, লজ্জায় আমি বিকুকে ঠেলে দিতুম।...কি সুন্দর করে হাসতো বিকু। হাসলে মনে হতো ও যেন কাঁদছে। আরো কিছুদিন কাছাকাছি থাকলে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হতো। তারপর?...আমি সেই মস্ত খোলা উদোম মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই বুড়ো মাল-গাড়িটার জন্য কেঁদেছি। হাওয়ায় আমার চুল উড়ছে, শাড়ির আঁচল উড়ছে।...ঘণ্টার শব্দ শুনলেই আমার কান্না পায়। ঘণ্টা পড়লো। কোঁ কোঁ শব্দ হল গাড়ির। টংলিং...। 'আমি কোথায় এলাম।...হে ঈশ্বর, পৃথিবীর সব ঘণ্টাকে তুমি বন্ধ করে দাও, সব অন্ধকারকে তোমার জোব্বার পকেটে পুরে রাখো।'

ছোট ছোট মনে-পড়া কথা দিয়ে একটা গল্প তৈরি করতে চাইলো মিনতি। পারল না। সাজিয়ে গুছিয়ে কিছুই মনে এল না। আসে না। চুপ করে সে অন্ধকারের ওপর চোখ রাখলো। এতটুকু নড়লো না হেমেন। তাকে জড়িয়ে তেমনি করে শুয়ে রইলো। মিনতি পাশের ঘরের বৌটির কথা ভাবতে লাগলো। রোজ রাত্রে ও ওর মাতাল স্বামীর কাছে মার খায়। বৌটির নাম সূর্যমুখী।

'এই পাঁজরা, হাড়, নরম আঙুল, ঠোঁট'—হেমেন ভাবলো—'যদি আলো জ্বালতুম তবে মিনতিকে দেখা যেত।' হেমেনের শরীরের সঙ্গে মিনতির শরীর এখন এক হয়ে আছে।

মিনতির এই ঠোঁট জোড়া দিয়ে যদি এই এতটুকু ছোট্ট একটা কাটলেট তৈরি করা যেতো! কেমন হতো তার স্বাদ অদ্ভুত ভাবে হাসলো হেমেন। মাথা থেকে এই চিন্তাগুলোকে তাড়াতে চাইলো।

—হাসলে যে!

—ও-ও এমনিই। হা-আ-আ। হাই তোলে হেমেন।

হেমেনের বালিশের ওয়াড়ে একটা লাল প্রজাপতি এঁকেছিল মিনতি। এখন যেন সেই প্রজাপতিটাই উড়ছে। গালে চোখে ঠোঁটে মিহি গুঁড়োর মতো সেই প্রজাপতির পাখা থেকে রেণু লেগে যাচ্ছে।

'মিনতি'—হেমেন।

'উ'—মিনতি।

অন্ধকার, 'অনেক কাক উড়ছিল আকাশে। বহুদূরে শকুনেরা ঘুরছিল। মিনতি, আমার মৃতদেহকে ঘিরে এখন তারা ঘুরছে।' হেমেন আপন মনে ভেবে চলে—'আমি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখতুম। আমি মরে পড়ে আছি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজের মৃতদেহকে দেখতে পাচ্ছি আমি।...কোথায় কার কাছে যেন জমা রেখেছিলুম আমার ধন-সম্মান, আমার সর্বস্ব।...অন্ধকারে সে পালিয়েছে। তারপর বন-বাদাড় মাঠ ঘুরে

মরলুম। ফেরারীকে পেলুম না।...কে সে!...মিনতি!...চিনি না।...মিনতি আমাকে ধরে রাখো। ছেড়ো না, ছেড়ো না।'

—মিনতি।

—উঁ!

—মিনতি-ই।

—উঁ! উঁ!

অন্ধকারকে তাদের ভয়। সেই ভয় তাদের নৈকট্যকে নিবিড় করে। নগ্ন আদিম দুটি মানুষ মানুষীর মতো তারা দু'জনকে জড়িয়ে রইলো। তাদের দেহ থেকে ঘাম, কোরা কাপড় আর সংসারের বিবিধ সামগ্রীর গন্ধ আর তাদের নিঃশ্বাস অন্ধকারে তাদের প্রহরী হয়ে রইলো। হেমেন আর মিনতি স্পষ্টভাবে তাদের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনতে পেলো।

যেন সেই অন্ধকারটা তাদের কফিন। তাদের সব আশা, স্বপ্ন আর অতীতকে একই সঙ্গে সেই কফিনে পুরে কেউ তাদের হৃৎপিণ্ডের তালে তালে চিরদিনের মতো সেই কফিনের ঢাকনাতে পেরেক এঁটে দিচ্ছে।

নয়নিকা আর চয়নিকা

আচ্ছা, আমি কি এই বেঞ্চটার এই ধারে একটু বসতে পারি?

—বসুন না, অসুবিধে কী? বেঞ্চ তো ফাঁকাই রয়েছে।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। রাতের দিকটায় লেকটা ফাঁকা হয়ে যেতে থাকে। আর এবার কলকাতায় শীতটাও পড়েছে জেঁকে, কী বলেন?

—হুঁ, কথাটা ভাববার মতো।

—কিছু মনে করবেন না, আপনি একজন বেশ টাফ লুকিং ইয়ং ম্যান, রক্তের জোর আছে মানছি। তবু আজ যা শীত পড়েছে, তাতে আপনার আরও একটু প্রোটেকশন নিয়ে বেরনো উচিত ছিল। আপনার গায়ে তো গরমজামার নামগন্ধও দেখছি না মশাই। শুধু শার্ট-প্যান্টে এই দারুণ ঠাণ্ডা সহ্য করছেন কী করে?

—ওটা অভ্যাস বলতে পারেন। শীতের শীতভাবটা অনুভব করতে হলে বেশি গরমজামা পরলে হয় না।

—আমার তো মশাই গায়ে দু'দুটো সোয়েটার, বাঁদুরে টুপি এবং কম্ফর্টারেও শীত সামাল দেওয়া যাচ্ছে না।

—আপনি বেশ বয়স্ক মানুষ, আপনার কথা আলাদা। এই শীতে এত রাতে লেকের ধারে বসে থাকাটাও আপনার উচিত হচ্ছে না।

—ঠিক বলেছেন। যৌবনে শরীর বলে কিছু যে আছে, তা যেন টেরই পেতাম না। ব্যথাট্যথা পেলে বা অসুখ হলে অন্য কথা, নইলে নয়। কিন্তু বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সব ক'টা প্রত্যঙ্গই যেন জানান দিচ্ছে যে, তারা আছে এবং তারা খুব একটা সুখে নেই। হাঁটু বলুন, ঘাড় বলুন, চোখ বলুন, হার্ট বলুন, লাংস বলুন—কেউই নালিশ করতে ছাড়ছে না। সারা শরীরে যেন সারাক্ষণ কোলাহল।

—এত রাত অবধি আপনি বাইরে রয়েছেনই বা কেন? বাড়ির লোক নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন।

—না মশাই, সে উপায় নেই। রাস্তায় ঘাটে বা বাড়িতেও যদি হঠাৎ কিছু হয়, তাই ছেলে আমাকে এই বুড়ো বয়সে মোবাইল ধরিয়ে দিয়েছে। তাতে আবার ডিসট্রেস অ্যালার্ম সেট করা আছে। বিপদ বুঝলেই এই বোতামে চাপ দিলে আমার দুই ছেলে আর এক মেয়ের কাছে খবর চলে যাবে।

—হ্যাঁ, কিন্তু বিপদকে ডেকে আনার দরকার কী আপনার? শীতকালে বয়স্ক মানুষদের প্রেশারজনিত বিপদ বেশ বেড়ে যায়। ঘাম হয় না বলে শীতকালটা একটু বিপজ্জনক।

—আপনি ডাক্তার নাকি?

—আজ্ঞে না। আজকাল এ সব ছোটখাটো ইনফর্মেশন সকলেই রাখে। আমার বাড়িতেও বয়স্ক মানুষ আছেন। ডাক্তারদের আসা-যাওয়া আছে।

—তা তো ঠিকই। কিন্তু আমি সন্ধের পর লেকের ধারে মোটেই থাকি না। বাড়ি ফিরে গিয়ে টিভি দেখি বা বই পড়ি। আজ বিশেষ কারণে যাইনি।

—কোনো পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, নাকি কীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন?

—কোনোটাই নয়। আসলে আমি একটু ইনকুইজিটিভ টাইপের। ছেলেবেলা থেকেই আমার সব বিষয়ে একটা অনাবশ্যক কৌতূহল। সেটা অনেক সময়ে বিপদের কারণও হয়েছে।

—কৌতূহল! সে তো ভালো জিনিস। কৌতূহল থেকেই তো মানুষের সভ্যতা শুরু হয়েছিল।

—সেটা তো অনেক বড় কথা মশাই। তবে কৌতূহল কখনও কখনও বিপজ্জনক হলেও সেটা থাকাই ভালো। নেসেসিটি যদি ইনভেনশনের মা হয়, তা হলে ইনকুইজিটিভনেস ইজ দ্য মাদার অফ নলেজ, কী বলেন?

—কথাটা শুনতে মন্দ লাগল না। তা আপনার আজকের কৌতূহলটা কী নিয়ে?

—আপনার জানবার কথা নয়, আমি মোটেই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য লেক-এর চারপাশে রোজ ঘুরপাক খেতে আসি না। আমি আসি নানা রকম মানুষ দেখতে, আর তাদের মুখ ও ভাব-ভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে অনুমান করতে। এই যেমন লোকটা কেমন, তার আজ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়েছে কি না, বাতিকগ্রস্ত মানুষ কি না, বিড়বিড় করে কি না, পাগলাটে বা খ্যাপাটে কি না, মেয়েছেলে দেখলে ছুঁকছুঁক করে কি না, চোর-চোট্টা বা পকেটমার বা নেশাখোর বা গুণ্ডা-মাস্তান কি না—এইসব আর কী! মানুষের তো ভ্যারাইটির কোনো শেষ নেই। আর ওই অনুমান এবং ইনফারেন্স ড্র করা ওটাই আমার হবি।

—বাঃ, বেশ ভালো। মানুষকে অবজার্ভ করা তো আমাদের সকলেরই হবি হওয়া উচিত। আর অবজার্ভেশনের জন্যই না শার্লক হোমসের অত কদর।

—হেঃ হেঃ যা বলেছেন! আমি অবশ্য শার্লক হোমস জাতীয় লোক নই। কারণ, কোনান ডয়েল হোমসের মধ্যে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্থাপন করেছিলেন বলে আমার ধারণা। নইলে ও-রকম সূক্ষ্ম ডিডাকশন সম্ভব নয়। তবে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় শার্লক হোমস নন, আপনি।

—আমি! অবাক করলেন মশাই। আমি তো বসে থাকা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করিনি।

—তবেই বুঝুন। একজন শক্তপোক্ত চেহারার লম্বা-চওড়া লোক এবং বেশ অ্যাট্রাকটিভ ইয়ং ম্যান চুপচাপ দু'তিন ঘণ্টা লেক-এর ধারে বসে থাকাটা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়!

—আপনার কিন্তু এখন বাড়ি যাওয়া উচিত। টুপটাপ করে হিম পড়ছে এবং বেশ ঘন কুয়াশা জমছে চার দিকে।

—আজ আমাদের বাড়িতে ভোলা মাছ রান্না হয়েছে। ভোলা মাছ আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। রাতে ওই ভোলা মাছের ঝোল দিয়ে রুটি খেতে হবে ভেবে আর বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না।

—তার মানে কি ভোলা মাছের ভয়ে আপনি আজ বাড়ি ফিরবেন না?

—না মশাই, তা বলিনি। আসলে আজ বাড়ির দিকে টানটা এমনিতেই একটু কম। আর তার কারণ হল ভোলা মাছ।

—বুঝেছি, কিন্তু ভোলা মাছ যে খেতে এত খারাপ, তা আমার জানা ছিল না।

—খারাপ নয়। আমি পছন্দ করি না বলেই জিনিসটা খারাপ হবে কেন? আমার গিন্নি, দুই ছেলে, বউমারা এবং আমার জামাইও ভোলা মাছ তোলা-তোলা করে খায়। আপনি কি ভোলা মাছের ভক্ত?

—সেটা বলা শক্ত। বড় মাছের টুকরো আমার সবই এক রকম লাগে। কোনটা ভোলা, কোনটা রুই, তা বুঝবার মতো বিচক্ষণতা আমার নেই।

—বেঁচে গেছেন মশাই। যাদের খাওয়া নিয়ে বায়নাক্কা নেই, তারা লক্ষ্মীপুরুষ।

—তা হবে হয়তো। তবে 'লক্ষ্মীপুরুষ' কথাটা প্রথম শুনলাম।

—সব কথা ডিকশনারিতে পাবেন না মশাই, মানুষ নিত্য নানা রকম নতুন শব্দ সুবিধে মতো তৈরি করে নিচ্ছে তো! এ কথাটা আমার গিন্নি ব্যবহার করেন, তবে আমার প্রসঙ্গে নয়। আমার প্রসঙ্গে তাঁর ভালো কথা কমই আসে।

—মনে হচ্ছে আপনার বেশ হ্যাপি ফ্যামিলি!

—আনহ্যাপিও নয়। তবে আমার ফ্যামিলি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় কিন্তু। আপনি কথা ঘোরাচ্ছেন।

—আচ্ছা বেশ। এ বার বরং আপনার কথাই শোনা যাক।

—আপনার নামটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—অবশ্যই। আমার নাম গন্ধর্ব মহাপাত্র।

—আমার নাম শতদ্রু বসুঠাকুর। হ্যাঁ যা বলছিলাম, আমি রোজ লেক-এ মোট চার বার চক্কর দিই। প্রথম চক্করে আমি আপনাকে দেখতে পাইনি। দ্বিতীয় চক্কর থেকে আপনাকে আমি লক্ষ করতে শুরু করি। আমার মনে হল আপনি কারও জন্য অপেক্ষা করছেন। কোনো লেডি কি?

—আরে না। এর মধ্যে আবার লেডি আনার কী দরকার।

—আহা লজ্জা পাবেন না মশাই! ওতে লজ্জার কী আছে? আজকাল তো প্রেম-ভালোবাসা জলভাত। আর কত সুবিধেও হয়ে গেছে বলুন। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক, হোটেল-রেস্তোরাঁ, ডিস্কো, মেলামেশায় কোনো বাধাই নেই। আর আমাদের আমলে শুধু একবার চোখাচোখি ঘটাতেই কত কাঠখড় পোড়াতে হত। রেবার বাবা তো আমাকে এক বার ট্যাঁটা নিয়ে তাড়া করেছিলেন।

—রেবা কে?

—সে ছিল একদিন। পৃথিবীতে রেবা ওই এক পিসই এসেছিল। বাই দি বাই, ট্যাঁটা কাকে বলে জানেন?

—আজ্ঞে না।

—ডেঞ্জারাস জিনিস মশাই। বাঁশের ডগা চিরে সরু সরু একগুচ্ছ বল্লম বানানো হয়। তাই দিয়েই গেঁথে জল থেকে মাছ তোলে।

—ও বাবা!

—তবেই বুঝুন, আমাদের আমলে প্রেম করাটাও কত বিপজ্জনক ছিল!

—শেষ অবধি কি...?

—না, উনি পারেননি। ট্যাঁটাটা চালিয়েছিলেন ঠিকই, তবে আমি তরুণ দৌড়বাজ ছিলুম। চারশো আর আটশো মিটারে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন ও ন্যাশনাল মিটে অল্পের জন্য সেকেন্ড হই।

—সে কথা নয়, আমি রেবা দেবী সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম।

—না মশাই, শেষ অবধি রেবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। হল বরানগরের শ্রীমন্ত ঘোষের সঙ্গে। রেবা কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর ঘর করতে চলে গেল। আর আমি পুরনো সব কথা আগলে পড়ে রইলুম। তবে আমার মনে হয়, আপনাদের সময়টাই বেশ ভালো। বিরহে বেশি কষ্ট পেতে হয় না। একজন রেবা হড়কে গেলেও তার জায়গায় কেয়া কি শ্রেয়া, কি সুদেষ্ণা কি চৈতালী—কেউ না কেউ এসে জুটে যায়। মেয়েদের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখলে অন্তত তাই মনে হয়। আমি অকপটে স্বীকার করি যে, আমাদের সময়টা ছিল যাচ্ছেতাই। চালের মন আট টাকা, সর্ষের তেল আড়াই টাকা সের, টাকায় কুড়িখানা ল্যাংড়া আম হলে কী হয়, লাইফ ওয়াজ নট ওয়ার্থ লিভিং। আজকে? আমাদের আলোচ্য বিষয় অবশ্য এই সব স্মৃতিচারণও নয়। আসল কথা হল, আপনি আজ যার জন্য বসেছিলেন তিনি আজ নির্দিষ্ট সময়ে আসেননি, তাই তো!

—ব্যাপারটা ও-রকমই মনে হতে পারে বটে।

—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আপনাকে আমি একবারও মোবাইল ফোনে কথা বলতে দেখিনি। লেডিটির দেরি হচ্ছে কেন, কোথায় আটকে রইলেন, শরীর খারাপ হল কি না, এ সব জেনে নেওয়ার কোনো চেষ্টাই কেন করলেন না?

—তাঁর মোবাইলের নম্বর আমার জানা নেই।

—এঃ হেঃ, নতুন আলাপ বুঝি? আজকাল তো শুধু মোবাইল নম্বরটা হলেই হয়, আর কিছুর দরকার হয় না। একখানা খুদে মোবাইল থেকে কত কী হয়ে যাচ্ছে মশাই। লাখ লাখ টাকার ট্র্যানজ্যাকশন, রোমান্টিক প্রেম, রাস্তা হারালে পথের হদিশ, কত কী? আর আপনি সেই মোবাইল নম্বরটিই নিয়ে রাখেননি! তবে শেষ অবধি আমার মনে হল, মামলা এত সহজ নয়। লেডিটি আসেননি, এবং হয়তো আর আসবেনও না। তিনি হয়তো আমার রেবার মতোই আপনাকে বিরহ-সংসারে ভাসিয়ে গেছেন। এবং আপনার মনের অবস্থা স্টেবল নেই। এমনকী আমার এমন ভয়ও হল, লেক নির্জন হয়ে গেলে আপনি হয়তো আত্মহত্যাও করে বসতে পারেন। আর সেই জন্যই আমি আজকের ভয়ঙ্কর শীতকে গ্রাহ্য না করে আপনার ওপর নজর রাখছিলাম। আমার ডিডাকশনটা কি আপনার লজিক্যাল বলে মনে হচ্ছে না?

—হচ্ছে। শুধু লজিক্যালই নয়, নির্ভুলও। দু'একটা জায়গায় একটু মেরামত করে নিলেই হবে।

—যেমন?

—যেমন লেডিটি আসেননি, এ কথাটা ঠিক নয়। তিনি এসেছেন এবং হয়তো এখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

—সর্বনাশ! তিনি কোথায় বসে আছেন, সেটা কি খুঁজে দেখেছেন?

—খোঁজার প্রয়োজন নেই। তিনি কোথায় বসে আছেন তা আমি জানি।

—আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই! এক জন লেডি এসে আপনার জন্য এই ঠাণ্ডায় বসে আছেন আর আপনার মোটে গা নেই! না, না, মেয়েদের অমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা বা কষ্ট দেওয়াটা মোটেই পৌরুষের লক্ষণ নয় মশাই।

—ব্যাপারটার মধ্যে একটা ঘাপলা আছে।

—ঘাপলা? কী রকম ঘাপলা গন্ধর্ববাবু?

—ঘাপলাটার নাম নয়নিকা।

—একটু বুঝিয়ে বললে হয় না? আপনাদের ভোকাবুলারি—আমি বুড়ো মানুষ তো নাও বুঝে উঠতে পারি।

—নয়নিকার পিছনে আমি আট বছর ঘুরেছি। নয়নিকা আমাকে কখনও প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ, কোনোটাই করেনি, হাতে রেখেছে মাত্র। আমি যখন মিলিটারি সার্ভিসে অরুণাচলের বর্ডারে ছিলাম, সেই সময়ে সে একটা বেসরকারি এয়ারলাইন্সে এয়ার হোস্টেসের চাকরি করত। একবার বিখ্যাত শিল্পপতির ছেলে অভিষেক মেহেরার সঙ্গে একটা ফ্লাইটে তার পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতা হয়। অভিষেক নয়নিকাকে বিয়ে করে সোজা লন্ডনে চলে যায়। সেখানেও মেহেরাদের বিরাট ব্যবসা। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট।

—এ তো সেই রেবারই গল্প। তবে রেবা স্বেচ্ছায় শ্রীমন্তকে বিয়ে করেনি, তফাত এটুকুই। কিন্তু ফল আউট তো একই।

—যে আজ্ঞে। তবে রেবারই সঙ্গে নয়নিকার যুগোপযোগী একটু তফাত আছে। আগে মেয়েরা বিয়ে হওয়ার পর সেটল হয়ে যেত। আজকাল নানা রকম ফ্যাঁকড়া হয়। আমি অরুণাচল থেকে ফিরে এলে হঠাৎ একদিন চয়নিকা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে।

—চয়নিকাটা কে? নয়নিকার বোন নাকি?

—হ্যাঁ, ছয় বছরের ছোট। শি ইজ আ টিন এজার।

—বুঝলাম, এরপর বলুন।

—প্রথমটায় কথাই বলতে পারে না। ভীষণ নার্ভাস, ভীষণ অ্যাজিটেটেড। তিনটে আইসক্রিম খাইয়ে তাকে খানিকটা ঠাণ্ডা করার পর সে খুব সংক্ষেপে, খানিক কথায়, খানিক চাউনিতে, খানিক চোখের জলে যা বলল, তাতে মনে হল, শি ইজ অর অলওয়েজ ওয়াজ হেড অ্যান্ড ইয়ারস ইন লাভ উইথ মি। কিন্তু দিদির জন্য সে সেটা এক্সপ্রেস করতে পারেনি। তার দিদি আমাকে ডিচ করায় সে একটুও দুঃখ পায়নি।

—বলেন কী মশাই, এ তো নভেল!

—যে আজ্ঞে।

—তা আপনি কী করলেন?

—আমার মনের অবস্থা অনুমান করে নিন। নয়নিকা গন। আমি ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছি, ঠিক এই সময়ে চয়নিকা ইজ নকিং অন দ্য ডোর। অ্যাকসেপ্ট করার প্রশ্নই ওঠে না।

—ঠিক ঠিক। ও রকমই হয় বটে।

—কিন্তু চয়নিকা হাল ছাড়ল না। আমার মানসিক অবস্থা বুঝে সে আমাকে কম্পানি দিয়েছে, এগজিবিশন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান, থিয়েটার ইত্যাদি নিয়ে গেছে। কবিতা শুনিয়েছে, গল্পের বই এবং ধর্মগ্রন্থ পড়তে দিয়েছে, গঙ্গার ধারে বা থেকেছে পাশে।

—তবু কি মেয়েটার প্রতি আপনার মন নরম হল না?

—হল, চয়নিকা নয়নিকার মতো অত সুন্দরী নয় ঠিকই, কিন্তু শি হ্যাজ আ চার্ম অফ হার ওন। স্মার্ট বা ছলবলে মেয়ে নয়। একটু ঘরোয়া, শান্ত। আস্তে আস্তে আমার মন নরম হচ্ছিল। এমন একটা সময় এল যে, আমার মনের মধ্যে নয়নিকা আর চয়নিকার একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হল। দু'জনেই আমার মনের দুটো দিক দখল করে দুটো বনবেড়ালের মতো ফুঁসছে।

—না না গন্ধর্ববাবু, এই উপমাটা ঠিক জুতসই হল না। দু'জন লেডিকে বনবেড়ালের সঙ্গে তুলনা করা আনরোমান্টিক।

—উপমাটা জুতসই হল না ঠিকই। তবে কথা আছে।

—কী কথা।

—ঠিক এই সময়ে নয়নিকা অভিষেক মেহেরাকে ডিভোর্স করে বিলেত থেকে দেশে ফিরে এল এবং এসেই হন্যে হয়ে সে তার পুরনো জমি পুনরুদ্ধারে নেমে গেল। বাপের বাড়িতে পুরনো ঘর দখল করল, পুরনো চাকরি ফিরে পেল এবং পুরনো প্রেমিকের ওপর চড়াও হল।

—মানে আপনি?

—যে আজ্ঞে। ফলে দুই বোনের মধ্যে প্রবল প্রবলেম।

—ভাগ্যবান লোক মশাই আপনি, দু'জন লেডি আপনাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছে!

—আমার তো উল্টোটাই মনে হয়। দোটানায় পড়ে আমার তো নিজেকে জরাসন্ধের মতোই লাগছে।

—আহা, গল্পটা আপডেট করুন। এরপর কী হল?

—সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। নয়নিকা আর চয়নিকাকে আমি বলে দিয়েছি তারা নিজেরা বসে একটা সিদ্ধান্ত নিক। আমি ওদের দু'জনকেই অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি, কিন্তু তা আইনে আটকায়। তবে আমার পক্ষপাত নেই। তারা যে সিদ্ধান্তই নিক, আমি মেনে নেব। হয় নয়নিকা, নয় চয়নিকা।

—তা শেষ অবধি কী হল?

—হল নয়, হচ্ছে। কাজেই দেশপ্রিয় পার্কে নয়নিকা আর চয়নিকা পাশাপাশি বসে একটা সেটলমেন্টে আসার চেষ্টা করছে। রায় যার পক্ষে যাবে সে এসে আমাকে জানাবে।

—আর সেই জন্যই আপনি এই ঠাণ্ডায় বসে আছেন?

—যে আজ্ঞে।

—এ তো খুব টেনশনের ব্যাপার হল মশাই।

—খুব।

—তা রায়টা কার পক্ষে যাবে বলে আপনার মনে হয়?

—আপনিই বলুন।

—আমার ভোট চয়নিকা।

—তাও হতে পারে।

—তবে নয়নিকাও তো ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নন। বড্ড মুশকিল হল গন্ধর্ববাবু। তবে আমি মশাই এখন বাড়ি যাচ্ছি না। এই চেপে বসে রইলাম। এর একটা হেস্তনেস্ত না দেখে বাড়ি গেলে রাতে আমার ঘুম হবে না।

—ইউ আর ওয়েলকাম।

কাঁইবিচি

আচ্ছা, তেঁতুলবিচির কি কোনো খাদ্যগুণ আছে?

তেঁতুলবিচি! তার আবার খাদ্যগুণ কি মশাই? ও কি কেউ খায়, না খেতে পারে? যুদ্ধের আমলে তেঁতুলবিচি গুঁড়ো করে আটায় ভেজাল দিত বলে শুনেছি।

হঠাৎ তেঁতুলবিচির কথা উঠল কেন বলুন তো?

আগে দেখতুম ছোটো মেয়েরা তেঁতুলবিচি দিয়ে কীসব যেন খেলে, খানিকটা গুটি খেলার মতো। আমার বোন তো এক পোঁটলা তেঁতুলবিচি জোগাড় করেছিল বলে খুব বড়াই করত।

তেঁতুলবিচিকেই তো কাঁইবিচি বলে, না?

হ্যাঁ, একসময়ে কাঁইবিচির বেশ কদর ছিল। এখন আর নেই।

দুনিয়ার তো সেইটেই নিয়ম। ওই যে রাম সরকারকে দেখছেন, হেঁপো-কেশো রুগি, পশ্চিমের বারান্দায় বসে খকখক করে কাশছে আর ছোটো বৌমার মুখনাড়া খাচ্ছে। ওই রাম সরকার একদিন এই গঞ্জে হাতে মাথা কাটত।

কিন্তু তেঁতুলবিচি নিয়ে কথাটা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি।

হয়নি! কী আশ্চর্য! তেঁতুলবিচি নিয়ে আর কী কথা থাকতে পারে বলুন তো রাখালবাবু?

আমারও ভালো মনে পড়ছে না। তবে তেঁতুলবিচি নিয়ে কী যেন একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ল না। বনমালীবাবু, কাঁইবিচিকে যত তুচ্ছ ভাবছেন ততটা তুচ্ছ হয়তো নয়।

আহা, তেঁতুলবিচিতে আছেটা কী?

সেইটেই তো ভাবছি। হঠাৎ যে আজ কেন প্রাতঃকাল থেকে কেবল কাঁইবিচির কথা মনে আসছে!

তা ওরকম হয়। এক-একদিন এক-একটা ভাব মনের ওপর এমন চেপে বসে থাকে যে নড়ায় কার সাধ্যি? এই তো পরশুদিন গোহাটায় যাব বলে ভোরবেলা আঁধার থাকতে উঠে পড়েছি, ভালো করে ঠাকুর-দেবতার নামটাও নেওয়া হয়নি। হঠাৎ মনের মধ্যে নয়নতারা নামটা একতারার মতো বেজে উঠল। সে কী জ্বালাতন মশাই। গণেশবাবা, শিবঠাকুর, মা কালী যাই বিড়বিড় করি না কেন, ওই সঙ্গেই কোথা থেকে যেন নয়নতারা, নয়নতারাও এসে যায়। যেন বীজমন্ত্র।

তা বনমালীবাবু, নয়নতারাটা কে?

কে জানে কে মশাই?

ভালো করে ভেবে দেখুন। মন এক অদ্ভুত চিজ মশাই। কখন গর্ত থেকে সাপ বের করে আনে তার কোনো ঠিক নেই। ভালো করে চোখ বুজে ভেবে দেখুন, ও নামে কাউকে মনে পড়ে কিনা।

অত ভাববার দরকার নেই। নয়নতারা একজন ছিল।

ছিল? বলেন কি বনমালীবাবু। ছিল?

তা ছিল। তখন আমার সতেরো বছর বয়স; সবে গোঁফ উঠেছে। বিধুভূষণ বিদ্যামন্দিরে ক্লাস নাইনে পড়ি। জষ্ঠিমাসের ছুটিতে বিদ্যেধরপুরের মামাবাড়িতে বেড়াতে গেছি, তখন দেখা।

কে মশাই? ঝেড়ে কাশুন।

বটকৃষ্ণ দাসের মা-মরা মেয়ে। বড্ড দুঃখী, রোগাপাতলা চেহারা, মুখখানা যেন শ্রী-মাখানো। মা মরে যাওয়ায় সেই তেরো-চৌদ্দ বছর মেয়েটাই সংসার আগলায়, দুটো ছোটো ভাইবোনকে মানুষ করে।

পছন্দ হয়ে গেল বুঝি?

তা ওই কাঁচা বয়সে যার ওপর চোখ পড়ে তকেই উর্বশী-মেনকা মনে হয়। তবে নয়নতারা যে ভারী লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে সেটা সবাই বলত।

তবে উদ্ধার করে ফেললেই তো পারতেন।

দুর, কী যে বলেন। তখন আমার মোটে সতেরো বছর বয়স। ভালো করে গোঁফটাও ওঠেনি। আর বিদ্যাধরপুরে ছিলুম তো মোটে দশ দিন। তারপর একজামিনের পড়া করতে চলে আসতে হল?

আর কোনো খবর পাননি বুঝি নয়নতারার?

শুনেছিলুম কাটোয়ায় না কোথায় যেন বিয়ে হয়েছিল। তারপর আর কিছু জানি না। তবে দিনসাতেক আগে ছোটোমামার শ্রাদ্ধে বিদ্যেধরপুরে যেতে হয়েছিল। কাজের বাড়িতেই বছর চল্লিশের এক বিধবাকে দেখেছিলুম। ওইরকমই যেন চেহারা। আমার মামাতো বোন টগরকে জিগ্যেস করলুম, মহিলাটি কে রে? টগর বলল, ও তো নয়নতারাদি।

আপনার দোষ কী জানেন বনমালীবাবু?

দোষ? দোষের কী দেখলেন?

আপনার দোষ হল, আপনি একজন কাটখোট্টা লোক, কোনো গল্পই তেমন রসিয়ে বলতে পারেন না। পাকা রাঁধুনির কাজ দেখেছেন? একটা কুমড়োর ছক্কা বানাতেও কতরকম মুষ্টিযোগ কাজে লাগায়, চিমটি দিয়ে কতরকম মশলা মেশায়। আপনার তো রসবোধই নেই, একটা বয়ঃসন্ধির প্রেমের গল্প ফাঁদলেন, কিন্তু আগুপিছু কিছুই ভণিতা করতে পারলেন না। একটা ন্যাড়া গল্প।

আহা, রসের কিছু হয়নি যে?

জীবনের রসের ঘটনা আর ক'টা ঘটে? রসটা তৈরি করে নিতে হয়।

তা বুঝলুম যে, আপনি একটি রসের নাগর। কিন্তু সেই থেকে তো শুধু কাঁইবিচি-কাঁইবিচি শুনে যাচ্ছি। তাতে রস আছে কিছু?

কাঁইবিচি জিনিসটা একটা ফালতু জিনিস বটে, কিন্তু কত তুচ্ছ জিনিসই তো ঘটনাক্রমে আলাদা মূল্য পেয়ে যায়।

সে আপনি যাই বলুন, কাঁইবিচিকে শত চেষ্টা করেও জাতে তুলতে পারবেন না। ও তো আর কাজুবাদাম বা আখরোট নয়।

সে তো ঠিক কথাই। কাঁইবিচি কি আর একটা খাদ্যবস্তু? তবে কিনা ওই কাঁইবিচির জন্যই ফুটফুটে মেয়ে কেঁদে-কেটে একশা করেছিল। বুঝলেন কিনা, বাবার সঙ্গে গোঁসাইপাড়ায় গৌর রায়ের বড় মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে গেছি। গৌর রায়ের পাটের ব্যবসায় তখন টাকার টংকার লেগেছে। আয়োজনও করেছিল বিরাট। সদর থেকে বাজনাদার আনিয়েছিল। কেষ্টনগর আর রাণাঘাট থেকে হালুইকর, রসনচৌকি বসিয়েছি। সেই সঙ্গে চন্দননগর থেকে আলোকসজ্জার কারিগর। আর খাওয়ার কথা? সে আর বলবেন না মশাই। লাচ্ছা পরোটা, হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানি, মুর্গ মুসল্লম, দমশুক্ত কী করেনি বলুন। সতি কলতে কী ওরকম ফাঁসির খাওয়া আমি কাউকে খাওয়াতে দেখিনি। এমন দই করেছিল যে, সেটা দই না রাবড়ি তা বুঝে ওঠা মুশকিল।

রাখালবাবু, পরোটা-বিরিয়ানি-রাবড়িতে যে কাঁইবিচি হারিয়ে গেল।

না মশাই, কাঁইবিচি হারাবে কেন? এ গল্পের তলায় তলায় ফলগু নদীর মতো কাঁইবিচি বয়ে যাচ্ছে।

এটা কী বললেন রাখালবাবু! কাঁইবিচি তো আর তরল জিনিস নয় যে, স্রোতের মতো বয়ে যাবে!

ওই জন্যই তো আপনাকে কাটখোট্টা বলতে হয়? কাঁইবিচি কি আর সবসময়ে কাঁইবিচি হয়েই থেকে যাবে? তাতে রসের সঞ্চার হবে না?

হল বুঝি?

তা হল বইকি? সন্ধেবেলা বিয়েবাড়ি পৌঁছে দেখি, বর তখনো আসেনি। বাড়ি হুলুস্থুলু চলছে। ওই বিয়েবাড়ির ব্যস্ততা যেমন হয় আর কি। কারো যেন আর কারো দিকে তাকানোর সময় নেই। তা আমি ঘুরে ঘুরে বিয়েবাড়ির উদ্যোগ আয়োজন দেখছিলাম। তখন আমার তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স। দোতলার সিঁড়ির তলায় দেখি একটা ছয়-সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে খুব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পরে জেনেছিলাম যে গৌর রায়ের ছোটো মেয়ে বাসুলী। তা আমি মেয়েটাকে কাঁদতে দেখে বললাম, ও খুকি, তুমি কাঁদছ কেন? তোমাকে কি কেউ মেরেছে? সে তখন বলল, তার সব কাঁইবিচি নাকি তার মা ফেলে দিয়েছে। ঘরদোর নাকি নোংরা হচ্ছিল, তাই। বড্ড কষ্ট হল মেয়েটার জন্য। সারা বাড়িতে সবাই আনন্দ করছে, আর ওই ছোট্ট মেয়েটার মনে সুখ নেই।

তা কী করলেন?

কী বলব মশাই, মেয়েটার চোখের জল দেখে সেই পেল্লায় ভোজও যেন বিস্বাদ ঠেকেছিল। তাই পরদিন আমি আবার বোনের পোঁটলা থেকে অর্ধেক কাঁইবিচি চুরি করে নিয়ে আড়াই মাইল ঠেঙিয়ে গোঁসাইপাড়ায় গিয়ে মেয়েটাকে কাঁইবিচি দিয়ে এলাম। তাতে সে কী যে খুশি হল তা বলার নয়।

গল্পটা কি এখানেই শেষ?

দুনিয়ার কোনো গল্পেরই ঠিক শেষ হয় না। গল্প থেকে ফের আরও একটা গল্প জন্মায়।

কী রকম?

ওই কাঁইবিচি থেকে যেমন তেঁতুল গাছ জন্মায়। বুঝলেন কিনা বনমালীবাবু। গল্পটা কাঁইবিচি দিয়ে শুরু হলেও কাঁইবিচিতেই শেষ হয়নি। আমি মাঝে মাঝেই আড়াই মাইল ঠেঙিয়ে বাসুলীকে পেয়ারা, কুল, কাঁচা আম, হজমি পৌঁছে দিয়েছি আর কতবার যে তার পুতুলের বিয়েতে মিছিমিছি নেমন্তন্ন খেতে গেছি তার হিসেব নেই।

গল্পটা কি এখানেই শেষ?

এ তো শুরু? ওই যাতায়াত করতে করতেই আমি যুবক হলাম আর বাসুলী ডাগর। বুঝলেন কিছু?

আহা, আপনি তো সোজা জিনিসকে বড় ঘুরিয়ে বলেন। শেষে কি হল বলে ফেললেই তো হয়।

আপনাকে কি আর সাধে কাটখোট্টা বলি বনমালীবাবু? তবে শেষের দিকটা খুব আনন্দের নয়। গৌর রায়ের অবস্থা পড়ে গেল। ব্যবসার শরিকদের বেইমানিতে বিস্তর টাকা চোট, তার ওপর স্ট্রোক হয়ে চিকিৎসার বিস্তর খরচ। এমন অবস্থা হল যে হা-ভাত জো-ভাত।

এই তো কথা ঘোরাচ্ছেন। কাঁইবিচি গেল কোথায়?

ওই মধ্যেই আছে।

তার মানে?

বাসুলীর বিয়েটা আর তেমন জমকালো করে দিতে পারেননি গৌর রায়। কোনোরকমে শাঁখা, সিঁদুর দিয়েই মেয়েকে বিদেয় করতে হয়েছিল। ভোজটাও তেমন দিতে পারেননি। বাসুলী বিয়ের রাতে তার বরকে বলেছিল, ওগো, আমার বাবা তো আমাকে কিছুই দিতে পারেননি। খালি হাতে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। তার বর বলছিল, সেই যে তোমাকে চুরি করে কাঁইবিচি এনে দিয়েছিলাম সেগুলো সঙ্গে নিয়ে নাও। ওটাই তোমার গয়না।

রাখালবাবু, তার মানে কি আপনিই শেষ অবধি বাসুলীকে বিয়ে করেছিলেন?
তা তো বটেই।
আপনার স্বভাব কি জানেন রাখালবাবু? আপনি সব কথাই ঘুরিয়ে বলতে ভালোবাসেন।

সাধ

বাড়ি। বাড়িটা অবশেষে শেষ হল। অবিশ্বাস্য। গৃহপ্রবেশের ঝামেলা চুকে যাওয়ার পর খুবই ক্লান্ত শরীরে শুতে গিয়েছিল শচীন। শরীর ক্লান্ত, মন ভরা বিস্ময়। বাড়িটা শেষ হল তাহলে! অ্যাঁ; শেষ হল! কলকাতা শহরে একটা পাকা আস্তানা? আর বাড়িওয়ালারা হুড়ো দিয়ে তুলে দেবে না। জল নিয়ে তুমুল ঝগড়া হবে না। প্রতি দুমাস অন্তর কেউ ভাড়া বাড়াতে বা বাড়ি ছাড়তে বলবে না।

এই বিস্ময় তাকে সারা রাত ঘুমোতে দিল না। কেবল এপাশ ওপাশ করল। জানলা দরজা থেকে মোহময় নতুনের রঙের গন্ধ আসছিল। দেয়াল থেকে আসছিল ঝাঁঝালো চুনের গন্ধ। বিশ্বাস হচ্ছিল না।

তার ছেলে মেয়ে বউ মা এবং প্রত্যেকেই পছন্দমতো ঘর পেয়ে গেছে। ট্যাপ দিয়ে জল পড়ে চাবি ঘোরালেই। দেয়ালে ইচ্ছেমতো পেরেক ঠোকা যায়।

শচীন নিজস্ব ঘরে শুয়ে বড় বড় করে চেয়ে রইল। শরীর ঘুম চাইছে। কিন্তু মনটা বড় চঞ্চল। মাথা ভরা এক অবাক কাণ্ড।

শেষ রাতে শচীন আর বিছানায় থাকতে পারল না। উঠে বাতি জ্বালল। চার দেওয়ালের চার রকম রঙ হেসে উঠল। মেঝের ছেঁড়া কাগজ প্যাটরনে মোজেইক ঝিকমিক করতে লাগল। বাজারে প্রচুর দেনা হয়ে গেছে শচীনের। বহুদিন লাগবে শোধ দিতে। কিন্তু বাড়িটা হাসছে তো! তার নিজের বাড়ি।

সামনে গ্রিল বারান্দা। দক্ষিণমুখী। শচীন চাবি নিয়ে বারান্দায় আসে। কাল বিকেলে কালবৈশাখী এসে বাতাস ঠান্ডা করে দিয়ে গেছে। ফুরফুর করছে দক্ষিণের হাওয়া। সামনে খানিকটা খালি জমি। বাগান হবে।

শচীন গ্রীলের দরজার তালা খোলে। বারান্দার আলো অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। সে তার ভাবী বাগানে পা দেয় এবং বাড়িটার মুখোমুখি হয়।

ও বাড়ি, আমার বাড়ি।

বলুন স্যার।

কেমন বুঝছো।

ভালই। তবে জলছাদ করলেন না, বর্ষা আসছে।

হবে, সব হবে। দোতলাই তুলে ফেলব দেখতে দেখতে। জলছাদের জন্য আর খরচ করে কী হবে?

ও স্যার, সবাই বলে? কিন্তু দোতলা আর ক'জন করতে পারে?

শচীন হাসে, বলো কী? এতটা পারলাম আর দোতলাটা পারব না।

পারতেন স্যার, কিন্তু আপনার স্টিম ফুরিয়ে গেছে। বাঙালির স্টিম বেশিক্ষণ থাকে না।

দেখো, থাকবে। অনেক উঁচুতে উঠে যাবে তুমি। কী সুন্দর দেখাবে তোমাকে।

বাড়িটা খুঁত খুঁত করতে থাকে, প্লাস্টারটা ভাল করে লাগালেন না স্যার, সুন্দর আর কী করে দেখাবে? ট্যাকসের ভয়ে এটুকু ফাঁক না রাখলেই কি হতো না?

প্লাস্টারও হবে বাড়ি। আগে একটু সামাল দিয়ে নিই। আমার এক বন্ধু করপোরেশনে কাজ করে। সে বলেছে আনফিনিশড বাড়ির ট্যাকস কম হয়। তাই প্লাস্টার লাগাইনি। তা বলে চিরদিনই কি একরকম থাকবে নাকি? ভিতরে কত খরচ করেছি তা কি ভুলে যাচ্ছো! দেয়ালে ডিসটেম্পার, মেঝেয় দামী টালি, বাথরুম।

সে তো স্যার, বাইরের লোকে দেখবে না। তারা দেখবে একটা ছালওঠা চেহারা। আমার স্যার বেশ লজ্জাই করছে।

লজ্জা পেও না বাড়ি। বাইরে চেহারায় কী আসে যায়।

আঃ ওদের কথা বাদ দাও। কথা হচ্ছে তোমার আর আমার মধ্যে।

বাদ দিলে কি চলে স্যার? আমি তো আইনত আপনার স্ত্রীর বাড়ি। হকও তাঁর। কারণ, আপনি জন্মে নিজের গরজে বাড়ি করতেন না। বউ চেপে ধরেছিল বলে আদাজল খেয়ে লেগে ছিলেন।

তা বটে। কিন্তু এখন অত প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমগুলো না তুললেই কি নয়। এই সদ্য তোমাকে গড়ে তুলেছি। এখন তোমার সঙ্গে একটু খুব ভাব—ভালবাসা হোক। প্রবলেমগুলোর কথা না হয় পারে হবে।

পরে কি আর সময় পাবেন স্যার। সময় পাব না মানে? সারাটা জীবন, পড়ে আছে সামনে।

সে আর কতটুকু স্যার! বাড়ি দীঘশ্বাস ফেলে বলে, কতটুকু আয়ু আর পড়ে আছে আপনার বলুন তো!

কেন বাড়ি আমার বয়স মোটে আটচল্লিশ। এখনো যুবক বলা যায় আমাকে। যায় না?

বাড়ি একটু উশখুশ করে। তারপর বলে যৌবন শুধু বয়সের ওপর তো নির্ভর করে না স্যার। কার যে কখন আয়ু ফুরোয়, যৌবন যায় তা বলা ভীষণ শক্ত।

বাড়ি তুমি কী বলতে চাইছো?

বলতে চাইছি স্যার, জমি বাড়ি করে করে যখন চারদিকে ছোটাছোটি করে নাকের জলে চোখের জলে হাচ্ছিলেন আপনি তখন আপনার হার্টে বেশ বড় রকম ধাক্কা লেগেছিল। তারপর জমি পেলেন, বাড়ি শুরু হল। ধারকার্জের চিন্তায় আপনার জীবনী-শক্তি শুষে যেতে লাগল। রোদে—জলে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন বাড়ি তৈরির তদারক করতেন তখন আপনার শরীরের বারোটা আরও বাজতে লাগল। উত্তেজনা উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা আপনার বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে। তারপর আমি গড়ে উঠলাম। গৃহপ্রবেশ হয়ে গেল। হঠাৎ এই আনন্দ এই তৃপ্তি এ কি আপনার সইবে?

শচীন তার বুকে হাত রেখে বলে, হ্যাঁ বাড়ি, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। ভীষণ আনন্দ। আমি সারা রাত ঘুমোতে পারিনি।

জানি স্যার, সেইজন্যই প্রবলেমের কথাগুলো বলে নিতে চাইছিলাম। আমি জানি মধ্যবিত্ত বাঙালির স্টিম বেশিক্ষণ থাকে না। আপনাকে মাসে মাসে প্রায় হাজার টাকা ধার শোধ করতে হবে। এর ওপর সুদ সবটাই যাবে প্রায়। খাবেন কী? আবার দুশ্চিন্তা আসবে। না স্যার, দোতলার প্ল্যান খামোখাই করেছেন, ওটা আর আপনার এজন্মে হয়ে উঠবে না।

উঠবে না?

না স্যার, প্ল্যাস্টারটা হওয়ার চানস নেই।

বলো কী বাড়ি! তুমি বড় নৈরাশ্যবাদী।

অভিজ্ঞতা থেকেই জানি স্যার, গৃহপ্রবশের রাতটাও অনেকের পার হয়নি। পটল তুলেছে।

শচীনের দম আটকে আসতে থাকে। বুকের মধ্যে দমাস শব্দ। সে বুক চেপে ধরে ককিয়ে ওঠে, বাড়ি! আমার বাড়ি!

বাড়ি হাই তুলে বলে, সবাই ভুলটাই করে স্যার। কেবল বলে আমার বাড়ি আমার বাড়ি। বাড়ি কারো নিজের হয় কখনো?

শচীন ধীরে ধীরে ঢলে পড়ে মাটিতে। নীমীলিত চোখে চেয়ে বলে, তবে তুমি কার? একজন তৈরি করে, ভোগ করে অন্যজন।

শচীন চোখ বোজে। ভাবী বাগানে তার শরীরটা পড়ে থাকে নিস্তেজ হয়ে!

থামো চ্যাম্পিয়ান, থামো। বুড়ো হয়েছো, অত ছুটোনা। হাড়গোড় ভাঙলে এই বুড়ো হাড় জোড়া যাবে না।

বুড়ো বলছিস হতভাগা।

তোর বাবা আমাকে এক সাহেবের কাছ থেকে কিনেছিল। খাঁটি বিলিতি মাল, তা জানিস? সাহেবরা তোদের মতো চল্লিশে বুড়ো হয় না।

জানি অস্টিন দাদা, তুমি এখানো ভিনটেজ কারদের দলে পড়ো না। কিন্তু এটা তো জানো, বিদেশী পার্টস সহজে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও দাম আকাশ ছোঁয়া।

তাহলে বেচে দে না। এখনো লোকে লুফে নেবে। আমাকে বেচে দিশি মাল কিনে নে। ওই যে মুড়ির টিনের মতো বাড়িতে ভুটভুটে মেশিন লাগিয়ে লাগিয়ে গাড়ি বলে বেচেছে ওই হল তোর উপযুক্ত জিনিস।

অত রাগছো কেন?

রাগব না? তোর বাবার বিয়ে দেখেছি। নতুন বউ এই গাড়িতে চড়ে শ্বশুর বাড়ি এল। তারপর হনুমান করতে বেড়িয়ে পড়ল কাঁহা কাঁহা মল্লুক আমাকে চেপে।

বটে। তলে তলে এত।

সব জানি রে উল্লুক। তুই যখন সদ্য জন্মালি তখন আমাতে চেপে নারসিং হোম থেকে বাড়ি এসেছিল। সেসব অবশ্য তোর জানার কথা নয়।

মাপ করে দাও দাদা, কিন্তু সামলে চলো। আজকাল বড্ড তেলের খাই হয়েছে তোমার।

তো হতেই পারে। তেল ছাড়া আর কী দিস রে বাঁদর? গত চারটি বছর রঙ করাসনি, শরীরটা আমার ঝুরঝুর হয়ে গেল।

দেশের জন্য কি তোমার মন কেমন করে অস্টিনদাদা?

তা করবে না? সেখানে গাড়ির এত অযত্ন চলত নাকি? সামনের বাঁ দিকের হেডলাইটটা কবে কানা হয়ে গেছে, সারাসনি। একজস্ট পাইপটার খানিকটা উড়ে গেছে, মেরামত করিসনি। পিছনের বাম্পারটা ঝুলে আছে, তা তোর চোখেই পড়ে না। বিলেতে হলে এরকম গাড়ি রাস্তায় বের করতে পারতিস? পুলিশে ধরে নিয়ে যেত।

তুমি কেবল নিজের কথাই ভাবছো অস্টিনদাদা, আমাদের কথাও একটু ভাববে তো।

তোর কথা আবার কী?

আমাদর গড়পড়তা আয় জানো? জানো যে গাড়ি দাবড়ানো আমাদের দেশে এখানো বিলাসিতা? ওপেক তেলের দাম কোথায় তুলছে সে খবর রাখো?

কিছু কিছু রাখি। আর সেইজন্যই তেমন কিছু বলি না। তা বলে বুড়ো বুড়ো খোটা দিবি কেন?

আহা, বুড়ো তো কি? আমাদের দেশে বুড়োদের যথেষ্ট সম্মান করা হয়। সাহেবদের মতো আমরা ওল্ড ম্যানদের হ্যাকছি করি না।

বাকতল্লার জোরেই তো বেঁচে আছিস। বুড়োদের প্রতি যদি অতই শ্রদ্ধা তো বাপটাকে বাড়ি থেকে তাড়ালি কেন?

ওকে তাড়ানো বলে না অস্টিনদাদা। বাবা কাশী যেতে চেয়েছিল, তাই পাঠিয়েছি।

আমাকে ছোলাগাছি দেখাচ্ছিস! তোর বাবা কাশী যেতে চায় কেন রে? তোর বউয়ের মুখনরা সইতে পারে না বলে।

আঃ হা, আবার ওসব কথা তোলে কেন?

তুলি কি অত সাধে রে হাড়কম্পন? এই আমাতে চেপে হাওয়া খেতে খেতে বউয়ের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করিসনি? বলব সেসব?

আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। থামো।

থামব কেন? তোকে ভয় পাই নাকি? তোর হাতে আমার যা হাল হয়েছে তোর বাপের আর তার চেয়ে ভাল কী হবে!

কেন, তোমার উপর আমার টান নেই। এখনো তোমাকে রোজ যত্ন করে ধুই মুছি। টুকটাক সারাই। গতবার আমার শালা তার ভোক্সওয়াগানটা আমাকে সস্তায় দিতে চেয়েছিল নিইনি।

নিলিনা কেন তাও জানি। সস্তা না হাতি। যা দাম চেয়েছিল তা আমাকে বেচে তোর উঠত না। আরও বিশ হাজার টাকা ধার হতো।

তোমাকে মোটেই বেচতে চাইনি। মায়া অস্টিনদাদা, মায়া।

খুব জানি। ঝলমল দাস আমার জন্য পনেরো হাজার দর দিয়েছিল। তুই পঁচিশের নিচে দিবি না। তাই।

আচ্ছা অস্টিনদাদা, আমার মা-বাপের সেই হনিমুনের গল্পটা বলবে?

কথা ঘোরাচ্ছিস?

মাইরি না। শুনতে ইচ্ছে করছে।

শুনবে? তখন আমি গাঁক গাঁক করে ছুটতে পারতাম। কখনো তোর বাবা হুইল ধরত, কখনো তোর মা। আহা কী মানিয়েছিল দুজনকে। পুরী গোপালপুর হয়ে সোজা ওয়ালটেয়র। ঘুরপথে হায়দ্রাবাদে। তারপর মধ্যপ্রদেশ। আমি যত যাই তত দুজনের মধ্যে প্রেম ভালবাসা গাঢ় হয়ে ওঠে। বুঝলি রে হনুমান মানুষের জীবনে গাড়িরও একটা ভূমিকা থাকে। শুধু লোহালক্কড় মনে করলেই হয় না।

মানছি।

—তুই মানবি? তবে হয়েছে। নিজের বাপকেই আপন ভাবলি না তো বাবাকেলে গাড়িকে।

বাপকে আপন ভাবি না, কে বলল?

আমিই বলছি। তোর মুখের ওপর অত বড় সত্যি কথাটা বলতে এমন সাহস আর কার আছে?

কথাটা ঠিক নয় অস্টিনদাদা। বাবা বুড়ো বয়েসে একটু খিটখিটে হয়ে উঠেছিল। বড় অশান্তি হচ্ছিল।

খিটখিটে কি লোকে সাধে হয়। খিটখিটে করে তুলেছিল তোর বউ।

আহা, কথাটা এখন থাকে না, পরে হবে।

পরে আর কখন হবে?

কেন, পরে কি আর সময় হবে না?

তাই হয় রে পাজি? তোর মতলব আমি জানি!

—কী মতলব?

বাপকে যেমন নিংড়ে নিয়ে ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়েছিস, তেমন আমাকেও দিবি। আমি তা হতে দিচ্ছি না।

—মাইরি না।

এখনও কিছু ঠিক করিসিনি আমি জানি। কিন্তু দর পেলে ঠিক আমাকে বেচে দিবি তুই। তোর বউ আজকাল পরামর্শ দিচ্ছে, গাড়ি বেচে মিনিবাসে অফিস যেতে। দেয়নি?

—তা দিয়েছে।

আমি তা হতে দিচ্ছি না। আমার তো কাশী নেই, তাকে তোকে শুদ্ধু কোথাও ধাক্কা লাগিয়ে অককা পাব।

বলো কী অস্টিনদাদা! ও বাবাঃ থামো! থামো! লরি আসছে যে উল্টোদিক থেকে।

আসুক। চুপ করে বসে থাক। আজ এসপার কি ওসপার!

—পায়ে পড়ি অস্টিনদাদা! বাঁচাও।

এভাবেই বাঁচবি রে, এভাবেই বাঁচবি।

সুরেন

সুরেন আজ সকালে ঘুম ভেঙেই বুঝতে পারলেন, আজ দিনটা ভাল যাবে না।

সুরেন ঘোষের বয়স উনআশি। ষাট বছর বয়সে একবার তাঁর সামান্য একটু হৃদরোগ হয়েছিল। খুবই সামান্য। তারপর থেকে এই গত উনিশ বছর তাঁর আদিব্যাধি প্রায় কিছুই নেই। জন্মবধি তাঁর স্বাস্থ্য চমৎকার। বুড়ো বয়সে চামড়া কুঁচকেছে, শরীরের শক্তি কমেছে, কিছু চুল সাদা হয়েছে। এছাড়া শরীর তাঁর বরাবর স্ববশে, বেয়াদপি বড় একটা করে না।

আজও যে কথাছিল তা নয়, তবে কী যেন একটা টের পাওয়া যায় শরীরে, মনে, মগজে। একটা অন্ধকার, একটা ছুট বা এক ধরনের শূন্যতা, হৃদপিণ্ড চলছে, শ্বাস ঠিক আছে, নাড়ীর স্পন্দনও স্বাভাবিক, তবু বোধ হচ্ছে, একটা কী যেন ঘটবে।

তাঁর প্রথম স্ত্রী বিয়ের তিন বছর পর একটি ছেলে রেখে গত হন। তখন সুরেনের বয়স মাত্র উনত্রিশ, তিন বছর পরে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন। সেই স্ত্রীর বয়স এখন সাতষট্টি। পাঁচটি কৃতী সন্তানের জননী। সুরেনের আগের পক্ষের একমাত্র ছেলে বাপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। থাকে সুইজারল্যান্ডে, দ্বিতীয় পক্ষের চার ছেলেই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় ভাল চাকরি করছে। কনিষ্ঠটি ব্রিটেনে। একমাত্র মেয়ে কানাডায় প্রবাসী। সুরেনের কাছে কোনও ছেলেই থাকে না। তিনটি ছেলের একজন দিল্লী, অন্যজন জব্বলপুর, তৃতীয়জন আলাদা বাড়ি করেছে কলকাতায়।

সুরেন কলকাতা পছন্দ করেন না। তিনি থাকেন কলকাতা থেকে একটু দূরে, আদিসপ্তগ্রামে। অনেকটা জমি নিয়ে বাড়ি, গোয়াল, সব্জী আর ফুলের বাগান, পুকুর, ধানজমি। সুরেন নিজে বিদেশে এবং দেশে চিরকালই শহরবাসী ছিলেন। রোজগারও করেছেন দেদার। প্রথম দিকে সরকারি চাকরি, করলেও পরে নিজের কনসালটেনসি ফার্ম খুলেছিলেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকনমির ক্ষেত্রে তিনি একদা বেশ বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। এখন তাঁর মেজো ছেলে সেই ফার্ম দেখাশোনা করে। রোজকার ভালই। সুরেনের যা জমে গেছে হাতে তা যথেষ্ট, শেষ জীবনে আবার গ্রামবাসী হবেন, চাষবাষ করবেন, গাছপালার মধ্যে বাস করবেন, গরুর খাঁটি দুধ খাবেন, এরকম তীব্র বাসনা ছিল। তারই ফলে আদিসপ্তগ্রামে এই গেরস্থালি। তাঁর স্ত্রীর আপত্তি ছিল, কিছু তিনি তা অগ্রাহ্য করেছেন।

শরৎকাল, বাইরে এক আশ্চর্য সোনালী সকাল, গ্রামে আসার পর থেকে তিনি ঋতুচক্র বুঝতে পারেন। শহরে পারতেন না। এই যে শরতের শিউলি, শিশির, রোদে এক সোনার রঙ, এসব যত দেখেন তত যত দেখেন তত যেন বুকটা ভরে ওঠে সৌন্দর্যের তৃপ্তিতে।

সুরেন তাঁর দোতলার পূর্বদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকালের পরিষ্কার বাতাসে দম নিতে নিতে সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, আজই শেষ দিন নয় তো; কী যেন বিকল হয়েছে ভিতরে। উনআশি বছরের পুরানো যন্ত্র তো। কবে বিগড়োয়।

চোখে ছানি পড়েনি কখনও। চশমা পরেন বটে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি এখনও তীক্ষ্ণ। দাঁত অবশ্য সবই গেছে, কানেও সামান্য কম শোনেন। বয়সের খাজনা।

তবু সুরেন কিন্তু খারাপ নেই।

চন্দ্রিমা ঘুম থেকে ওঠেন অনেক আগে। কাকভোরে। চন্দ্রিমার ঘুম পাতলা, বেশি হয়ও না, দোতলা থেকে সুরেন দেখতে পেলেন চন্দ্রিমা কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে কাঠকয়লায় দাঁত মাজতে মাজতে শিয়রে উঠোন ঝাঁটানো দেখছেন আর কথা বলছেন।

সুরেনের সাড়া পেয়ে ওপর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি উঠলে?

হ্যাঁ।

গোয়াল খুলে গরু দুটোকে বের করে আন। বড় ডাকছে।

গরুর হাঁক ডাক সুরেনও শুনছিলেন, গরুর লোক হল হারু। তার নিজের গেরস্থালি আছে, গরু আছে। একটু বেলায় আসে। সুরেনের গরুর দুটো বাছুরই তার কাছে। দোয়ানোর সময় নিয়ে আসবে।

সুরেন চটির শব্দ করতে করতে নিচে নামলেন। গোয়াল ঘরে গিয়ে গরু দুটোকে বের করে খড়ের গাদার কাছে খুঁটিতে বাঁধলেন। কাছেই মাটির গামলায় জল, চারিদিকে দেদার ঘাস। থাক।

গরু দুটোকে বাঁধার পরই গোলমালটা হ'ল। কুয়োর দিকে যেতে গিয়ে সুরেন কিছুতেই হাঁটাটা সোজা রাখতে পারলেন না। অনেকটা বেভুল বেঁকে বেগুন খেতের দিকে চলে গেলেন। তারপর সামলে নিয়ে আবার একবার চেষ্টা করতে গিয়ে কুয়োর জল যে নালা বেয়ে বাগানের ধারে গিয়ে পড়ে সেটার কাছে চলে গেলেন। থিকথিকে কাদা, নোংরা।

ও কী গো জ্যাঠা, বলে চেঁচিয়ে উঠল কদম ঝি।

চুপ, চুপ—বলে সুরেন একটা মৃদু ধমক দিলেন।

চন্দ্রিমা বারান্দায় বস্তায় পা ঘষতে ঘষতে ফিরে চেয়ে বললেন, কী হয়েছে? অ্যাঁঃ

সুরেন মাথা নেড়ে বললেন, কিছু হয়নি।

কিন্তু হয়েছে। সুরেন স্পষ্টই টের পেলেন, গলাটা কাঁপছে। শরীরটা অবশ লাগছে। ঘাম হচ্ছে শরীরে।

চন্দ্রিমা আর কদম যখন দৌড়ে এসে তাঁকে ধরল তখন সুরেন রীতিমত হাঁপাচ্ছেন।

চেঁচামেচি, লোক ডাকাডাকি বড় কম হল না। চ্যাংদোলা করে তাঁকে দোতলায় তুলে বিছানায় শোয়ানো হল। ডাক্তার এল। প্রেশার দেখল, রক্ত নিল।

সুরেন নীরবে সবই দেখে এবং সহ্য করে যেতে লাগল। কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। ডাক্তার একটা ইনজেকশান দিয়ে বলে গেল, এখন ঘুমোন। নড়াচড়া বারণ।

সুরেন ঘুমোলেন।

কিন্তু জাগতেও হল ফের। দুপুরবেলা ঘর রোদে ভেসে যাচ্ছে। চারদিক থেকে রৌদ্রে তপ্ত প্রকৃতির গন্ধ আসছে। মৌমাছির শব্দ। পাখির ডাক।

সুরেন ডাকলেন, চন্দ্রিমা।

কেউ এল না। কোথাও আছে। বেশ বড় বাড়ি, তাঁর ক্ষীণ গলা তো কোথাও গিয়ে পৌঁছাবে না। সুরেন পাশ ফিরে নড়তে গিয়ে টের পেলেন, পারছেন না। একটা বাধা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে।

আজই কি শেষ দিন?

মরতে কি তাঁর খুব কষ্ট হবে? মনের কষ্ট?

হবে হয়তো। ব্যক্ত জগৎ ছেড়ে কোন অব্যক্তে মিশে যাওয়া। কষ্ট হবে কেন, হচ্ছে। সুরেনের দুটো চোখে টলটল করছে জল। চোখ বুজতেই জলটা গড়িয়ে নেমে গেল কানের দিকে, জুলপি ভিজিয়ে।

জানলা দিয়ে সজনের ডাল উঁকি দিচ্ছে, নীল আকাশ তাঁকে অপলক দেখছে, আসছে মৃদুমন্দ বাতাস। কী যে সুন্দর চারদিককার এই সব দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ! সুরেন পৃথিবীকে বড় ভালবাসতেন।

উঠে বসবেন একটু? বসা উচিত হবে কি?

সুরেন চেষ্টা করলেন, কিন্তু মাথাটা তুলতেই কেমন একটা চক্কর খেল মাথাটা, ঘুলিয়ে উঠল।

সুরেন বালিশে মাথা রেখে সিলিঙের দিকে চেয়ে রইলেন।

উনআশি বছর বয়স অবশ্য ঢের বয়স। মরলে সেটা অকালমৃত্যু হবে না। তবু সুরেনের মনে হচ্ছিল, বড় তাড়াতাড়ি কেটে গেল জীবনটা। এখন তিনি শৈশবের কথা স্পষ্ট সব স্মরণ করতে পারেন, যৌবনের দামাল দিন আজও ছবির মতো স্পষ্ট। খুব বেশিদিনের কথা বলে মনেও হয় না। এত তাড়াতাড়ি কেন চলে যেতে হবে?

চোখ বুজে ছিলেন সুরেন। ঘরে কেউ এসেছে টের পেয়ে ক্ষীণ গলায় ডাকলেন, চন্দ্রিমা।

কেউ সাড়া দিল না।

সুরেন খুব ধীরে ধীরে চোখ মেললেন। দেখলেন আশ্চর্য এক সবুজের আভায় ঘর ভরে আছে। ঘর? সুরেন চারিদিকে তাকালেন। না, ঘর তো নয়। চারদিকে কেবলই গভীর ঘাস বন, আর ভারী সতেজ সব গাছপালা, চারিদিকে অজস্র মৌমাছির গুঞ্জন আর পাখির ডাক, নীল আকাশে সাদা মেঘও ধীরে উড়ছে।

এ কোথায় তিনি?

একটা মুখ তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। ভারী সুন্দর এক যুবতী। কিন্তু নিশ্চয়ই বাস্তব নয়। এত সৌন্দর্য মানুষের থাকে না। দু'খানা প্রবল আয়ত চোখে রৌদ্রের দীপ্তি, জ্যোৎস্নার মতো গায়ের রঙ, রেশম সুতোর মতো চিকন চুলের রাশি অপরুপ মুখখানা ঘিরে আছে।

যুবতী একটা সুগন্ধী শ্বাস ফেলল তাঁর মুখে। বলল, যেতে চাও না?

না।

খুব ভালবেসেছিলে পৃথিবীকে?

খুব।

একদিন তো যেতেই হবে।

জানি। যেতে রাজি; তবে এখনও প্রস্তুত নই।

যুবতী সামান্য হাসল। লক্ষ নক্ষত্রের ঝিকিমিকি খেলে গেল হাসিতে। যুবতী মৃদু স্বরে বলল, কী পেয়েছ এ জীবনে?

এই শেষ বয়সে এসে মনে হয়, শুধু এই সৌন্দর্য ছাড়া এই বুভুক্ষু হৃদয় আর কিছুই চায় না। আরও কিছুদিন শুধু চারদিকটাকে শুষে নিতে ইচ্ছে হয়।

যুবতীর মুখখানা করুণ হয়ে গেল। এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সুরেনের চোখে চোখ রেখে। তারপর বলল, আরও কিছুদিন?

হ্যাঁ, আরও কিছুদিন।

তাই হোক।

সুরেনের ঘুমন্ত মুখে হাসি দেখে চন্দ্রিমা অবাক হলেন। ডাকলেন, ওগো কেমন লাগছে?

সুরেন চোখ খুলেও হাসলেন। বললেন, ভাল, ভাল। বেশ ভাল, একটু ধরো। জানলার কাছে নিয়ে যাও আমাকে। দেখব, যতক্ষণ বাঁচি।

নিধে

নিধে চোরের দিন গেছে। মাজায় বাত, চোখে ছানি, রক্তচাপের রোগ। চুরি করা বড়ো সোজা কথা নয়। দেখার চোখ, শোনার কান, গন্ধের নাক, সবই চাই। আর চাই ঠান্ডা মাথা, সাহস। নিধের এককালে সবই ছিল। দশটা গাঁয়ে ছিল তার নামডাক। দিনমানে তাই লোকালয়ে যেতে পারত না নিধে। লোকে তাড়া করত। আমাদের গাঁয়ের দু-ক্রোশ উত্তরে কবরখানার পিছনে আমবাগানের ধারে একটা ঝোপড়ামতো তৈরি করে স্ত্রী পুত্র নিয়ে থাকত। সারা দিন ঘুমিয়ে রাতে বেরোত চুরি করতে। কিন্তু নিধের সেই দিনকাল আর নেই। কান শুনতে ধান শোনে। দড়ি দেখতে সাপ দেখে বিপদের সময় মধ্যে গোলমাল হয়ে যায়। সেবার মোড়লের বাড়ি চুরি করতে এসে শোবার ঘর ভুল করে ঢেঁকি ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে তার মনে হল এ গোয়াল ঘরে ঢুকেছে। তখন ঢেঁকির মুষলটাকে গোরুর শিং মনে করে সে কী টানাটানি। সেই সময় এক আরশোলা গায়ে বেয়ে ওঠে। নিধে কাঁকড়াবিছে ভেবে ভয়ে চেঁচিয়ে মেচিয়ে একশা। মোড়ল উঠে দেখে নিধে রক্তচাপে ছটফট করছে, চোখ উলটে ভয়ে একশেষ। তখন মোড়লই নুনপোড়া খাইয়ে মাথায় জল চাপড়ে সঙ্গে লোক আর হ্যারিকেন দিয়ে নিধেকে বাড়ি পাঠায়। তাই বলছিলুম নিধে-চোরের দিন গেছে। তার ছেলে চাকরিবাকরি করে, বাপের চুরি করা পছন্দ করে না। নিধে তাই চুরি করা ছেড়েই দিল। কেবল তার নাতি হওয়ার পর নিধে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে ঢুকে খোকা-খুকিদের পুতুল চুরি করে এনে নাতিকে দিত।

নাতি বড়ো হয়েছে। দাদুর সঙ্গে বেড়ায়। চোর পুলিশ খেলে। মাঝে মাঝে বলে—দাদু, গাঁয়ে নিয়ে চলো রঙিন পিরান কিনে আনি।

নিধে ভয় পায়। গঞ্জে সবাই তাকে চেনে। নাতির সামনেই হয়তো বলে বসবে—কীরে নিধে, এখনও চুরি টুরি করিস নাকি? তাই নাতিকে বলে—কয়ে যাই কী করে? অনেক ব্যাপারীকে ধারকজ্জ দিয়েছি গেলে তারা ভাববে তাগাদায় গেছি। সে বড়ো লজ্জার কথা। ভদ্রলোক কখনো ধার দিয়ে তাগাদা করে না। তার চেয়ে চ পীর সাহেবের কবর দেখে আসি।

নাতি মুখভার করে বলে—তাহলে চলো সাতগাঁয়ে যাই, শিবরাত্রির মেলা দেখি গিয়ে।

সাতগাঁয়ে লোকেরা নিধেকে একবার মাথা কামিয়ে উলটো গাধায় ঘুরিয়েছিল। নিধে তাই বলে—কী করে যাই বল। সেবার জমিদার মশাইয়ের নাতির অন্নপ্রাশনে একাশিটা কই মাছ খেয়েছিলাম, দশটা গাঁয়ের লোক সেই খাওয়া দেখতে ভিড় করেছিল। আধ হাত পৌনে এক হাত বড়ো চ্যাটালো মাছ, ল্যাজামুড়ো কাঁটা পর্যন্ত চিবিয়ে ছিবড়ে করেছিলাম। সেই থেকে আশপাশের গাঁয়ে গেলেই লোকে এসে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যায়। বলে—সেই খাওয়া আবার আমাদের দেখাও, কিছুতেই ছাড়ছি না। সেইটেই হয়েছে বিপদ। বুড়ো বয়সে এখন তো আর খেতে পারি না, খেলে পেট ঢাক হয়ে যায় ফলে চোখ ওলটাব তার চেয়ে চ পুকুর থেকে গেঁড়াগুগলি তুলি দুজনে ঝোল খাব 'খন...।

আজকাল নিধের বড়ো ভূতের ভয়। অন্ধকার হয়ে এলেই সে অস্থির হয়ে পড়ে। নাতিকে কাছে ডেকে বসায়, ছেলের বউকে ডাকাডাকি করে। মাঝরাতে বাইরে শব্দ পেলেই ঘুম ভেঙে উঠে রামনাম করে। একা বেরোয় না।

ছেলের বউ ভারি দজ্জাল। নিধেকে খুব শাসনে রাখে। ডালের বড়ি কি আমসত্ত্ব রোদে দিয়ে, নিধেকে পাহারায় বসিয়ে বলে যায়—যদি কাকপক্ষী মুখ দেয় তাহলে কিন্তু ভালো হবে না। নিধে খুব সাবধানে পাহারা দেয়। ছেলের বউ বাপের বাড়ি যখন যায় তখন নিজেদের ঘরে তালা দিয়ে নিধেকে বাড়িতে রেখে বলে যায়—সাতদিনের জন্য বাপের বাড়ি যাচ্ছি, এর মধ্যে যদি কুটোগাছটা এধার-ওধার হয়েছে তাহলে রক্ষে থাকবে না। নিধে ভয় পেয়ে খুব সাবধানে সব পাহারা দেয়।

একদিন দারোগাবাবু পাশের গাঁয়ে তদন্তে চলেছেন মস্ত ঘোড়ার পিঠে। নিধের বাড়ির কাছে ঘোড়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কার বাড়ি রে?

একটা পাইক বলল—আজ্ঞে নিধে চোরের।

—দিব্যি বাড়ি তো। ডাক তাকে।

খবর পেয়ে নিধে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল। বলল—বড়োবাবু একটু পায়ের ধুলো দিন, তামাক ইচ্ছে করুন। আপনার বিস্তর নুন খেয়েছি।

দারোগাবাবু খুশি হয়ে নিধের উঠোনে গিয়ে মোড়া পেতে বসলেন। নিধের ছেলের বউ মোয়া নাড়ু জল দিল, নিধে তামাক সেজে আনল।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তোকে আজকাল বড়ো দেখিনি নিধে, কী করিস?

—আজ্ঞে সময় কই যে দেখা করব?

—কেন সারা দিন করিস কী?

—আজ্ঞে ছেলে চাকরিতে যায় ছেলের বউ ঘাটের কাজ সারতে যায়, নাতিটা পাড়ায় পাড়ায় খেলে বেড়ায়, আমি বসে বাড়ি আগলাই।

—আগলাস? দারোগাবাবু চোখ বড়ো বড়ো করে বলেন—কেন আগলাস রে?

নিধে দারোগাবাবুর কথা শুনে হেসে বাঁচে না। বলে—না, আগলালে রক্ষে আছে? সারাদিন আগলাই রাতেও ঘুম হয় না চিন্তায়, মাঝে মাঝে জেগে শব্দ সাড়া করি, পাহারা দিই। ওরা যা ঘুমকাতুরে।

—পাহারা দিস কেন?

নিধে ভারি রেগে গিয়ে বলে—দেব না, যা চোর-ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব চারদিকে দারোগাবাবু। পাহারা না দিলে রক্ষে আছে? চোর-ছ্যাঁচোড়দের যে বড়ো বাড়াবাড়ি। একটু অসাবধান হলেই...

দারোগাবাবু এমন হাসতে থাকেন যে তাঁর চোখে জল এসে যায়।

যুদ্ধ

আচ্ছা বাবা যদি সিংহের সঙ্গে অসুরের লড়াই লাগে তবে কে জিতবে?'

'অসুর'।

'অসুর। কী করে? সিংহ তো দুর্গার বাহন।'

'তাকে কী! অসুরই জিতবে। অসুরের গায়েও দারুণ জোর।'

'আচ্ছা সিংহের সঙ্গে যদি শিবের ষাঁড়ের লড়াই হয় তবে?'

'সিংহ।'

'কেন! শিবের ষাঁড় কি সোজা কথা?'

'না, সিংহ তো ষাঁড় টাঁড় খেয়েই থাকে।'

'কার্তিক আর গণেশে যদি লড়াই লাগে?'

'কার্তিক।'

'কালী আর দুর্গায়?'

'দুর্গা।'

'দুর্গার দশ হাত বলে।'

'হুঁ।'

'আচ্ছা বাবা, দুর্গা কি শিবের বউ?'

'তাই তো শুনি। তবে কথাটা ঠিক নাও হতে পারে। শুনেছি অসুরকে মারার পর দুর্গাকে নিয়ে দেবতারা খুব ফ্যাসাদে পড়েন। কী করা যাবে দুর্গাকে নিয়ে? তিনি তো আলাদা কোনো দেবী নন, অনেক দেবতার অংশ দিয়ে তৈরি। তারপর—'

ছেলে ধৈর্য হারাচ্ছিল। সে পুরাণ ইতিহাস চাইছে না। তার কৌতূহল গায়ের জোরের ব্যাপারটা নিয়ে। ছ-বছর বয়সে সেটাই সবচেয়ে জরুরি তথ্য বলে মনে হতেই পারে। সুতরাং সে বাধা দিয়ে বলল, 'অসুরের গায়ে অত জোর হল কী করে?'

'বোধ হয় ব্যায়াম করত।'

'বক্সিং জানত? কুং ফু?'

'জানারই কথা।'

'কত হাজার বছর ধরে লড়াই হয়েছিল দুর্গা আর অসুরের?'

'দশ হাজার বছর।'

'এতদিন লাগল কেন?'

'কেউ কাউকে হারাতে পারছিল না যে।'

'দশটা হাত নিয়েও দুর্গা পারছিল না? অসুরের তো মোটে দুটো হাত।'
'সেটাই তো মজা।'
'আর দেবতারাও তো দুর্গাকে শক্তি দিচ্ছিল।'
'হ্যাঁ।'
'তাহলে কে বেশি বীর?'
'শক্ত প্রশ্ন।'
'তোমার সঙ্গে যদি মা-র লড়াই হয় তবে কে জিতবে?'
'তোমার মা-ই তো জেতে রোজ। দেখ না তোমার মা বকুনি শুরু করলেই আমরা কেমন জুজুবুড়ি হয়ে যাই।'
'আ, বকাবকির কথা নয়। যদি মারপিট হয়?'
'তাও বলা শক্ত।'
'ছেলেরা কি মেয়েদের সঙ্গে পারে না?'
'বেশির ভাগ সময়েই পারে না।'
'ইঃ, দিদি যে আমার কাছে হেরে যায়।'
'তোমার কথা আলাদা। তুমি তো বীর।'
'আচ্ছা বাবা, অসুর আর রাক্ষস কি এক?'
'না, তফাত আছে?'
'বক রাক্ষসের সঙ্গে মহিষাসুরের লড়াই লাগলে কে জিতবে?'
'মহিষাসুর।'
'কেন?'
'বেশি বীর বলে।'
'ভীমের সঙ্গে মা দুর্গার লড়াই লাগলে?'
'মা দুর্গা!'
এ-রকম অন্তহীন প্রশ্ন এবং উত্তর চলতে থাকে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কিন্তু আমার ছেলে ক্লান্ত হয় না। তার প্রশ্ন এবং উত্তর শুনে তার প্রতিক্রিয়া দেখে ধরতে পারি, সে অর্জুনের কাছে কর্ণের পরাজয়টা যেমন ভালো চোখে দেখে না, তেমনি তার অপছন্দ রামচন্দ্রের অন্যায়যুদ্ধে বালি বধ। নারী পুরুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য ভেঙে মা দুর্গার জয়লাভটাও তার কাছে কিন্তু বিস্ময়কর। দশ হাত হলেই বা, মেয়ে তো।
'বাবা, তুমি চামুণ্ডা পাহাড়ে গেছ?'
'গেছি।'
'কোথায়?'
'মহীশূর। কর্ণাটকে।'
'কেমন পাহাড়? খুব বড়ো। এভারেস্টের মতো?'
'না না। সামান্য একটা ছোট্ট পাহাড়। তেমন উঁচুও নয়।'
'দুর্গার আর অসুরের লড়াই তাহলে সেখানেই হয়েছিল?'
'লোকে তাই বলে।'
ছেলে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দৃশ্যটা কল্পনা করে। যুদ্ধ হবেই, সাংঘাতিক যুদ্ধ। যুদ্ধ থামছে না। মানুষ জন্মাচ্ছে, বড়ো হচ্ছে, বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, একের পর এক প্রজন্ম কেটে যাচ্ছে, তবু চামুণ্ডা পাহাড়ে দুর্গা আর অসুরের লড়াই শেষ হচ্ছে না।
'সিংহটা অসুরকে কামড়ে দিয়েও পারল না?'

'সিংহ? সিংহ তার কাছে ছেলেমানুষ।'
'আচ্ছা, দুর্গার চেয়ে তো অসুর অনেক মোটা। তাই না?'
'তা বটে।'
'তাহলে পারল না কেন?'
'আসলে কী জানো, এটা ঠিক যুদ্ধ নয়। এটা হল পাপ আর পুণ্যের লড়াই। ন্যায় আর অন্যায়ের লড়াই। এ লড়াই আজও চলছে। আসলে—'
'বুঝেছি বুঝেছি, এখন বলো তো গণেশ কী করে খায়। হাতির মতো শুঁড় দিয়ে না মানুষের মতো হাত দিয়ে?'
'বোধ হয় হাত দিয়ে।'
'ভাত খায়, না ঘাস আর কলাপাতা?'
'ভাতই হবে। অমৃতও হতে পারে।'
'কার্তিকের ক-টা হাত বাবা?'
'কেন, দুটো।'
'দুটো কেন? মা দুর্গার দশটা আর কার্তিকের মোটে দুটো।'
'তাই তো দেখি।'
'কার্তিকের গায়ে তো অনেক জোর।'
'হ্যাঁ, তা ভালোই হবে।'
'কৃষ্ণের সঙ্গে পারবে?'
'কী জানি। তবে দেবতায় দেবতায় লড়াই হয় না তো।'
'কেন হয় না?'
'ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে না।'
'আচ্ছা, বাবা, মা দুর্গার বাপের বাড়ি কোথায়?'
'এই তো, এইখানেই।'
'কলকাতায়!'
'তা ঠিক নয়। তবে ভারতবর্ষেই বলতে পারো।'
'কিন্তু তুমি যে বলো মা দুর্গার বাবাই নেই।'
'সেটাও একটা কথা।'
'মাও নেই তো।'
'না।'
'তবে বাপের বাড়ি আসে কী করে।'
'কী জানো আমরা মা দুর্গাকে এই বাঙালির ঘরের মেয়ে হিসেব কল্পনা করি, তাই...'
'আচ্ছা বাবা। ও কথা থাক। এখন বলো তো মা দুর্গা যদি অসুরের কাছে হেরে যেত তাহলে কী হত?'
'খুব মুশকিল হত।'
'কী মুশকিল?'
'পৃথিবীর ছারখার হয়ে যেত।'
'রাবণের কাছে রাম যদি হারত?'
'তাহলেও তাই হত।'
'আর কর্ণের কাছে অর্জুন?'
'তাহলেও বিপদ ছিল।'

'তাহলে এখন আর বিপদ নেই তো?'
'না।'
'পৃথিবী কী যেন বললে ছারখার না কী যেন?'
'হ্যাঁ। মানে লন্ডভন্ড হয়ে যেত।'
'তাহলে অসুর হেরে গিয়ে ভালোই হয়েছে তো বাবা?'
'হ্যাঁ। তা তো বটেই।'
'তাহলে পৃথিবীটা এখন বেশ ভালো আছে?'
একটু মাথা চুলকোই। তারপর নরম করে বলি, 'না বাবা, ঠিক তাও নয়। আসলে লড়াইটা এখন চলছে।'
'কোন লড়াইটা?'
'ওই মা দুর্গার সঙ্গে অসুরের। রামের সঙ্গে রাবণের। কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের।'
ছেলে অবাক হয়ে বলে, 'চলছে কোথায় বাবা?'
চলছে সেটা টের পাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু ছেলেকে বোঝাই কী করে?

এক প্রাচীন বাতাসে কিছুক্ষণ

বেলগাঁও থেকে হসপেটের বাসে উঠলাম বিকেলে। লাক্সারি বাস নয়, বেশ লজঝড়ে চেহারা। তার ওপর ভিড়। ভারতীয় জনগণ সম্পর্কে আমার ধারণা তারা যথেষ্ট বিনয়ী এবং ভীরু। জনগণের অধিকাংশই তথাকথিত ভদ্রলোক নয়, এবং সেজন্যই তারা ভাল পোষাক পরিহিত তথাকথিত ভদ্রলোকদের সমীহ করে। তাদের সেই অযাচিত সমীত ভাঙিয়েই জানালার ধারে একটা সিট পেয়ে গেলাম। বেলগাঁওয়ে যাদের বাড়িতে ছিলাম তারা আমার বন্ধুর দিদির জামাইবাবু। দুদিন হাতে পেয়ে তারা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল আমার অভ্যন্তর নানা সুখাদ্যে ঠেসে নিশ্চিদ্র করে দিতে। পার্টিং কিক হিসেবে রওনা হওয়ার আগেই একপ্রস্ত অনাবশ্যক পরোটা আলুর দম সৌজন্যবশত গিলিয়েছে। সঙ্গে প্রায় জনাপাঁচেক লোকের মাপমতো খাবার বেঁধে বেঁধে দিয়েছে তারা।

যাই হোক, ভরা পেট এবং বাসের দোলাচলে বেশ ঘুম ঘুম এসে যাচ্ছিল। কিন্তু জানলার ধারে বসলে আমার চোখ কিছুতেই বিশ্রাম নিতে চায় না। বাইরে যে প্রকৃতি বয়ে যাচ্ছে পিছনের দিকে, তার মধ্যে নতুন কিছু নেই। সেই পাহাড়, জঙ্গল নদী, গাঁ। তবু আকণ্ঠ পান করতে থাকি দৃশ্যাবলি। যখন অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক তখনও প্রেতের মতো চেয়ে আছি, বাসের মধ্যে যাত্রী বদল ঘটছে ক্রমাগত। বাস থামছে, কিছু লোক নামছে, উঠে আসছে নতুন মানুষ। প্রতিটি মানুষই আলাদা, বিশিষ্ট। কিন্তু আমার আনমনা চোখ কোনো তফাত বুঝতে পারছে না। মনে হচ্ছে, একইরকম, হুবহু একইরকম মানুষ উঠছে, নেমে যাচ্ছে, নামছে, উঠে আসছে।

রাত যত গভীর হতে থাকল যাত্রীসংখ্যা তত কমে যেতে লাগল। দাঁড়ানো যাত্রী আর নেই। বহু সিট খালি। গুটিকয়েক যাত্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাসে ঢুলছে।

নিশুত রাত্রি এবং নির্জনতার একটা মাদকতা আছে। নেশাগ্রস্ত করে তোলে আমাকে। রাত বারোটায় একটা ভারী নির্জন জায়গায় বাস থামল। কয়েকটা চা-কফির দোকান। নিতান্তই দীনদরিদ্র তাদের চেহারা। পায়ের ঝিঁঝি ছাড়াতে সেখানে নেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক গেলাস গরম চা খাচ্ছিলাম। রাস্তার ওধারে গাছপালা, ফাঁকা মাঠে জ্যোৎস্না, তার ওপাশে নাতিউঁচু টিলা। চেয়ে থাকতে থাকতে আমার ভিতরে এক পুরোনো আমলের বাতাস বয়ে গেল।

এ-রকম আমার মাঝে মাঝে হয়। বহু ব্যথা বেদনার কথা আমি ভুলে থাকি। কাজকর্মে ডুবে থেকে মনেও পড়ে না সেসব। কিন্তু এইরকম বিরল অবসরে, নির্জনে বা নিশুত রাতে হঠাৎ বাতাস আসে। বহুকালের পুরোনো সেই বাতাসে উড়ে আসে অতীতের খড়কুটো, ছিন্নপত্র। সেই নিশুতি রাতে জয়শ্রীর কথা কেন মনে পড়েছিল কে জানে।

নারীপ্রেম না পেলেও পুরুষের তেমন কিছু যায় আসে না, আজ এই সরসতা জানি। বাইশ বছর বয়সে এই সত্যের মুখ আবৃত ছিল। জয়শ্রী আমার সেই রকমের অঘটন। আট বছর বাদেও আমার জীবনের

সাফল্য ঠেকল এসে শিক্ষকতায়। তার বেশি কিছু নয়। গরিবের স্বপ্ন জোরালো হয় অনেক বেশি ইম্যাজিনেটিভ হয় তাদের প্রকৃতি। তার জোরেই সুন্দরী জয়শ্রীকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারতাম।

জয়শ্রীও কি তাই ভাবত না?

মাঝে মাঝে বলত, তুমি চেষ্টা করলেই আর একটা বেটার কিছু করতে পারো, তাই না?

নিস্পৃহভাবে বলতাম, কী বলো তো!

ধরো যদি প্রফেসারি বা অন্য কিছু।

বুঝতাম আমার ক্যারিয়ার সম্পর্কে জয়শ্রীর সংশয় এবং দ্বিধা আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম। তবু জানতাম অসফল এই লোকটিকে বিয়ে করা ছাড়া জয়শ্রী আর কীই-বা করতে পারে?

কিন্তু জয়শ্রী করল। এত অপ্রত্যাশিত ও নিপুণভাবে যে, তার টেকনিক দেখে আমি প্রথমে শুধু বিস্ময় বোধ করেছিলাম, শোক বা দুঃখ নয়।

কানাডা প্রবাসী এক জীববিজ্ঞানী স্বদেশে এসেছিলেন বিয়ে করতে। প্রবাসী বাঙালিরা খুব ঝটিতি বিয়ে করতে আসেন বলে মেয়ে দেখা থেকে বিয়ে অবধি ঘটে যায় দ্রুতগতিতে।

সেই ঝটিকা-বিবাহের এক ইগল ছোঁ মেরে তুলে নিলে জয়শ্রীকে। সেই সময়টায় কপালদোষে আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দিঘায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেড়াতে না গেলেও যে ইতরবিশেষ হত এমন নয়। পরে শুনেছি, আমি হামলা করতে পারি আশঙ্কা করে জয়শ্রীর বাবা কয়েকজন পেশাদার গুন্ডাকে ভাড়া করে এনেছিলেন।

প্রেম নয়, অপমানটাই সহজে ভোলা যায় না। প্রত্যাখ্যান কি এভাবে করতে হয়? আমার তো জানাই ছিল জয়শ্রী আর একধাপ ওপরে ওঠার কথা ভাবে। আমাকে আমার ক্যারিয়ার সম্পর্কে সচেতন করে দেয়।

নিশুত রাতে অখ্যাত অজ্ঞাত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ আজ জয়শ্রীকে মনে পড়ল। খুব মনে পড়ল। জয়শ্রীর সেই বিয়েটা টেকেনি জানি। কয়েক বছর পর এক ছেলে নিয়ে জয়শ্রী একা হয়ে যায়।

তার এক বছর বাদে এক বিদেশিকে বিয়ে করে। তারপর আর খবর পাইনি। বহু দূরে কোথাও জয়শ্রী তার নিজস্ব জীবন যাপন করছে, সুখ-দুঃখ স্মৃতি জড়িত এক জীবন। এখন, এই মুহূর্তে সে জেগে আছে কি পশ্চিম গোলার্ধে!

কে জানে! আমি আরও একটু নির্জনতার দিকে সরে গেলাম। তারপর হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ করে বললাম, আজ কেন মনে পড়ল তোমাকে জয়শ্রী? বড়োদিনের বিস্মৃতির ধুলোয় ম্লান হয়ে গেছে পুরোনো প্রত্যাখ্যান, ক্ষতস্থানে পড়েছে প্রলেপ, আমি আর সেই আমিও তো নেই। তবে কেন মনে পড়ল? বেঁচে আছ তো জয়শ্রী? ভালো থেকো, যতদূর ভালো থাকা যায়।

এই টেলিপ্যাথি শূন্যে ভাসিয়ে আমি ফিরে এলাম সিটে। বাস ছাড়ল। আস্তে আস্তে রাত গভীর হতে লাগল। আমার ঢুলুনি এল কখন যেন।

শেষরাত্রে হঠাৎ ঝলমলিয়ে উঠল অনেক আলো। চারদিক আলোয় আলোময়। একটা টিলার ওপর থেকে বাঁধ বেয়ে জল নেমে আসার প্রবল শব্দ। চমকে খাড়া হলে বসলাম।

ওই তো তুঙ্গভদ্রা ড্যাম। এই তো হসপেট।

হ্যাভারস্যাক, অ্যাটাচি, সুটকেস আর জলের বোতলের গন্ধমাদন বয়ে নেমে পড়লাম।

প্রচলিত মত অনুযায়ী হসপেটেই প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা। কিষ্কিন্ধ্যার উপকণ্ঠেই জটায়ু আর রাবণের প্রবল মরণপণ যুদ্ধ ঘটেছিল। রামচন্দ্রের প্রাচীন পদচিহ্ন ধরে ধরে আমি এক অদ্ভুত পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছি। আমাকে শেষ অবধি যেতে হবে।

হসপেটের রিকশার মতো রিকশা আমি জীবনে দেখিনি। সিট এত নীচু যে, সেটা প্রায় পিঁড়ির মতো। ফুলপ্যান্টের অবরোধে লম্বা হাঁটু ভেঙে বসা রীতিমতো কসরতের ব্যাপার। বিচিত্র সেই রিকশায় উঠে হোটেলের নাম বললাম।

রিকশাওয়ালা মাথা নেড়ে জানাল, চেনে।

কিন্তু কার্যকালে সে সেই নির্জন লোকশূন্য মধ্যরাত্রে গোটা শহর পেরিয়ে একটা ঘিঞ্জি রহস্যময় পাড়ায় আর একটি এঁদো গলির সামনে নামিয়ে যে হোটেলটা দেখিয়ে দিল তা মোটেই সেই হোটেল নয়। তা ছাড়া হোটেলটার চেহারায় একটা ধূর্ত ঠকবাজের ছাপ আছে। ভুক্তভোগী ছাড়া এটা কেউ বুঝবে না।

আবার রিকশা ফিরিয়ে ভিন্নপথে ঘুরে ঘুরে যখন ভদ্রগোছের হোটেলটা খুঁজে পেলাম তখন প্রায় ভোর। কর্ণাটকে চোরছ্যাঁচড় গুন্ডা বদমাশ, বড় একটা নেই, থাকলে সেই নির্জন রাত্রে সব কেড়েকুড়ে নিতে পারত। গুপ্ত পকেটে হাজার পাঁচেক টাকা, দামি ক্যামেরা, ঘড়ি।

স্নান সেরে সকালের দিকেই বেরিয়ে পড়া গেল, বিজয়নগর বাহমনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখতে। ট্যাক্সিওলা নিজে থেকেই বলল যে, সে আমার গাইড হবে। সবই সে জানে। এখানেই তার জন্ম, কর্ম।

তুঙ্গভদ্রা দিয়ে একসময়ে সমুদ্রগামী বহিত্র চলাচল করত। বাণিজ্যও সেই কারণে ছিল প্রবল।

এখন বাঁধে বাঁধা-পড়া তুঙ্গভদ্রার সেই তেজ নেই, গভীরতা নেই, চারদিকে পাহাড় আর পাথরের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নাতিপ্রশস্ত এক স্রোতধারা। তার দুই তীর ধরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে একদা সমৃদ্ধ এক সম্পদশালী মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ।

ডাইনে পাহাড়, সেখান থেকে পাথরের এক অসমান চাতাল নেমে এসেছে কূর্মপৃষ্ঠের মতো। সেই কালচে পাথরের ওপর দুটি চওড়া দাগ। একটি সোনালি, একটি রুপোলি। আমার গাইড সে দুটো দেখিয়ে বলল, ডাইনের ওই পাহাড়ের ওপর জটায়ু আর রাবণের যুদ্ধ লেগেছিল। জটায়ু যখন রাবণকে আটকায় তখন রাবণ সীতাকে রথ থেকে চুল ধরে নামিয়ে ছেঁচড়ে নিয়ে এসে বাঁ-ধারে একটা গুহায় পুরে দেয়। তারপর জটায়ুর সঙ্গে লড়াই করতে যায়। হেঁছড়ে আনার সময় সীতার গায়ের গয়নার ঘষটানিতে পাথরে ওই সোনালি দাগ পড়েছিল। আর সীতার শাড়ির দাগ ওই রুপোলি রেখা।

কিংবদন্তি বটে, কিন্তু পাথরের ওপর ওই আশ্চর্য দাগ মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। যে গুহায় সীতাকে রাখা হয়েছিল সেটি যথেষ্ট প্রাচীন এবং খুবই সংকীর্ণ। আমি গুহার মধ্যে নেমে ঝুম হয়ে থাকি। চারদিকের পাথর স্পর্শ করি। রাম কি সত্য? সীতা কি সত্য?

হয়তো সত্য, হয়তো নয়। কিন্তু রামকথা আজও বিশাল ভারতবর্ষে, আসমুদ্র হিমাচল, প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। প্রাসাদে, গাছতলায়, হাটেবাজারে সেই প্রাচীন বাতাস আজও বয়ে চলেছে।

বিজয়নগর ধ্বংসাবশেষের যেন শেষ নেই। যতদূর চোখ যায় কেবল ভাঙা খিলান, গম্বুজ, প্রাসাদ, সেতু, ঘরবাড়ি, মন্দির। অজস্র, অসংখ্য। আমার ট্যাক্সিড্রাইভার আমাকে দুটি মন্দির দেখাল, যার থামের নিচের নানা কারুকার্যময় কয়েকটি ছ'ইঞ্চি লম্বা মিনি স্তম্ভের সারি আছে। আশ্চর্য এই যে, তাতে কঠিন কোনো বস্তু দিয়ে সামান্য আঘাত করলেই বাদ্যযন্ত্রের সুরেলা শব্দ ওঠে। বাঁশি, বীণা, মৃদঙ্গ। এই অদ্ভুত সুরেলা পাথর আমি আর কোথাও দেখিনি।

আশ্চর্য আর এক বস্তু হল পাথরের একটি প্রকাণ্ড রথ। অখণ্ড একটিমাত্র বিশাল প্রস্তরখণ্ড কুঁদে তৈরি। এই রথটির কারুকার্য এবং গতিময়তা বেশ অনেকক্ষণ সম্মোহিত রাখল আমাকে।

চারদিকে নানা শিল্পকীর্তি, অফুরন্ত ভাণ্ডার। কিন্তু কোনো যত্ন নেই, মেরামতি নেই। সরকার নিযুক্ত চৌকিদার হয়তো আছে ছড়িয়ে ছটিয়ে, কিন্তু তাদের গরজ বা উদ্যোগ কিছু নেই, নেহাত চাকরি করছে বলে করা। ফলে যে কী অপুরণীয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এইসব পুরাকীর্তির, তা সহজেই অনুমেয়। সুরেলা ওই পাথরের কথাই ধরুন। যদি রোজ একশো দর্শক এসে ওগুলোতে পাথর বা লোহা দিয়ে ঠোকে তবে ক-দিন আর অক্ষত থাকবে ওগুলো। যেসব শিল্পমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড খসে পড়ছে সেগুলো যে কেউ কুড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং যাচ্ছেও। যে সর্তকতা ও যত্ন এর জন্য প্রয়োজন তা একেবারেই নেই। বাঁচোয়া যে হসপেট-এ পর্যটক-সমাগম খুব বেশি নয়।

কিছুক্ষণ তুঙ্গভদ্রার তীরে দাঁড়িয়ে চারদিককার উচ্চাবচ ভূমিখণ্ডে শিলাকীর্ণ পরিবেশে এক সভ্যতার বিস্তার দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, সেই মহার্ঘ শিল্পসৃষ্টির দিন শেষ হয়ে গেছে নাকি? সে-আমলে রাজা বাদশার এইসব শিল্পসৃষ্টির পিছনে যে অর্থব্যয় করেছেন তা আজকের দিনে অর্থনীতি-সচেতন সমাজে আর সম্ভব নয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে একখণ্ড পাথর খসে পড়ে গিয়েছিল। আধুনিক ভাস্করকে দিয়ে হুবহু ও-রকম কারুকার্য করানো হচ্ছিল। সেসময়ে আমি ওখানে হাজির ছিলাম। জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছিলাম, সামান্য একখণ্ড পাথরের ওপর শিল্পকর্মটি করতে খরচ হচ্ছে ছত্রিশ হাজার টাকা। গোটা মন্দিরটি তৈরি করতে তাহলে কত কোটি টাকা খরচ পড়বে এখন তা ভাবতে মাথা ঘুরে যায়। এযুগে তাই এসব আর হয়ে উঠবে না। কিন্তু যা হয়েছিল এবং যার ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে সেটুকু যথোচিত রক্ষা করতে পারলে একটা মস্ত জাতীয় কৃত্যই করা হবে।

এখান থেকে শুরু উপলাকীর্ণ কিষ্কিন্ধ্যার, কথিত আছে, বিস্তার অন্ধ্রের কিছু অভ্যন্তর অবধি। তবে কিষ্কিন্ধ্যা প্রকৃতই কোথায় তা কে বলবে? সে-আমলের কোনো ধ্বংসাবশেষ তো নেই। শুধু আছে কিংবদন্তি, শুধু আছে কাব্যের সাক্ষ্য।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানিদের স্নানাগার দেখতে চললাম। প্রাসাদ থেকে প্রাসাদে, ছাদহীন ভবনে, ভাঙা প্রাচীর পেরিয়ে ইতিহাস গায়ে মাখতে মাখতে পরিক্রমাটি যখন শেষ হল তখন শরীর ক্লান্ত বটে, কিন্তু মনটি ভারি তরতাজা।

দুপুরে সামান্য কিছু খেয়ে ট্যাক্সিতে চেপেই চললাম তুঙ্গভদ্রার বিখ্যাত বাঁধ দেখতে।

এই অঞ্চলটায় নাতিউচ্চ পাহাড়ের ছড়াছড়ি, তারই একটিতে বিশাল বাঁধ তুলে আটকানো হয়েছে তুঙ্গভদ্রাকে, আছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। বাঁধের বিভিন্ন ধাপে জাপানি বিশেষজ্ঞদের তৈরি অসামান্য সব বাগান।

একদম ওপরে পাহাড়ের চূড়ায় একটি অতিথিনিবাস। কোনো রহস্যময় কারণে সেখানে কাউকে থাকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু চারদিকে গাছপালায় সমাচ্ছন্ন এবং তুঙ্গভদ্রার বিপুল জলরাশির আলোকসামান্য দৃশ্যের মুখোমুখি এই নিবাসটি যে রোমাঞ্চকর তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু নির্জন অবহেলায় কেয়ারটেকারের আশ্রয়ে পড়ে আছে। কেন এখানে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না তা বহুবার জিজ্ঞেস করেও কেয়ারটেকারের কাছ থেকে বের করতে পারলাম না। অন্য সব প্রশ্নের জবাব দিল, শুধু এই প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল বার বার মৃদু হেসে।

কেয়ারটেকার আর ট্যাক্সিওয়ালা গল্প করছে, আমি পায়ে পায়ে তুঙ্গভদ্রার বিশাল জলরাশির ওপর সুউচ্চ বাঁধে এসে দাঁড়ালাম। তুঙ্গভদ্রা এবং তার পশ্চাৎপটে বহুযোজনব্যাপী এক প্রসার। আকাশ মাটি জল মেশানো সেই ব্যাপ্তিতে এক প্রখর অ্যালকেমি।

কেন যে হঠাৎ সেই দিগন্ত থেকে ধেয়ে এল এক আশ্চর্য বাতাস তা কে বলবে। সেই বাতাসে সুস্পষ্ট বিজয়নগর সভ্যতার ঘ্রাণ, সেই বাতাসে জননী সীতার ক্রন্দন, সেই বাতাসে জটায়ুর পক্ষনিধন। কী যে হয়েছিল কে বলবে? কিন্তু আচমকাই আমার স্মৃতি গুলিয়ে গেল। ভুলে গেলাম আমি কে, ভুলে গেলাম আমি কোথা থেকে আসছি। তুঙ্গভদ্রার বিপুল নীলবর্ণ জলরাশি এক আশ্চর্য চুম্বকের মতো আমাকে টানতে লাগল।

কেউ বিশ্বাস করবে না, যদি বলি যে, সেদিন লাফিয়ে পড়া ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না। আত্মবিস্মৃত আমি সেই জলের দিকে ঝুঁকে পড়লাম।

ঠিক সেই সময় বাতাসে সাত হাজার মাইল দূর থেকে এল টেলিপ্যাথি, তুমি ভালো আছ তো রন্টু! রোজ তোমার কথা ভাবি আর কাঁদি। কত কাঁদি যে। ভালো থেকো রন্টু, পায়ে পড়ি, ভালো থেকো।

চমকে উঠি। টানটান শরীরে ফের দাঁড়াই।

হয়তো সত্য নয়, তবু কত সত্যের মতো। এভাবেই তো কিছু সত্য আর কিছু কল্পনার মিশেল দিয়ে তৈরি হয় এই জীবন।

সেই সাহেব

মুখার্জি সাহেব নামক যে পাক্কা সাহেবটিকে আমি শিশুকাল থেকে চিনি তাঁর ইংরেজিতে ভুল নেই, কাঁটা-চামচে ভুল নেই, টাই-এর নট-এ ভুল নেই, ফুট বুট কোথাও ভুল নেই। ব্রিটিশ আমলে সাহেবদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রেলের প্রশাসন সামলাতেন। ডিনার খেতেন তাঁদের সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বন্ড সই করেছিলেন। ছিলেন মিলিটারির লেফটেনান্ট। ক্রিকেট টেনিস খেলতেন অনায়াস দক্ষতায়। এই সাহেবকে আমি খুব কাছে থেকে চিনি, কারণ, ইনি আমার বাবা।

এই সাহেবিয়ানার নির্মোকটি খসে যেত যখন পুজো আসত। পুজোর চারটে দিন এই পাক্কা সাহেব কিন্তু পালটে যেতেন। তখন এত বাঙালি দেখাত তাঁকে যে বিশ্বাস হয় না এই সেই সাহেব মানুষটি। শুধু তাই নয়, ধুতি আর গরদে সেজে উপোস থেকে অঞ্জলি দেওয়া আর তারপর ধুতি পাঞ্জাবিতে সেজে সেই লাঠি হাতে বিকেলে পায়ে হেঁটে ঠাকুর দেখতে বেরোনো। আর কী অক্লান্ত হাঁটা।

সে-আমলে এত গায়ে গায়ে পুজোর আয়োজন ছিল না। একটা প্যান্ডেল থেকে আর একটা প্যান্ডেলের দূরত্ব থাকত অনেক। বাবার সঙ্গে আমারা কদাচিৎ ঠাকুর দেখতে গেছি। দু-একবার তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দম বেরিয়ে যেত। পায়ে ব্যথা আর রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে ফিরতাম। কিন্তু বাবার চোখ-মুখ উজ্জ্বল। ঠাকুর দেখে ফিরে এসে এক কাপ গরম চা নিয়ে বসে যেতেন কোন ঠাকুর কেমন হল তা নিয়ে উন্নত আলোচনায়।

আমাদের ছেলেবেলার বিজয়া সম্মিলনীটা ছিল এক অসাধারণ ঘরোয়া আসর। তার আগে বিকেল বেলায় মেয়েদের উলুধ্বনি আর কান্নাকাটির ভিতর দিয়ে দর্পণ-বিসর্জনের পর প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিরঞ্জনে। ফাঁকা প্যান্ডেল হাঁ হাঁ করছে শূন্যতায়। সেদিকে তাকালে কী-নেই কী-নেই বলে একটা হাহাকারে বুক ভরে যায়।

কিন্তু সন্ধের পর প্যান্ডেলে ফিরে আসত নিরঞ্জনকারীরা। ধীরে ধীরে জমায়েত হতে থাকত পল্লির মেয়ে বুড়ো বাচ্চারা। শান্তিজল নিতে পা ঢেকে বসত সবাই। ভাবগম্ভীর পরিবেশ।

তার পরদিনই বসত বিজয়া সম্মিলনীর আসর। কোলাকুলির নাড়ু-তক্তি বিতরণের পর সেই আসরটি ছিল ভারি চমৎকার। আর সেই আসরে আমি আমার সাহেব বাবাকে গান গাইতে দেখেছি।

পুজো এলেই আজও সাতাত্তর বছর বয়সে বাবা উজ্জ্বল চঞ্চল হয়ে ওঠেন, এখন আর তিনি পাড়া সাহেব নন। সুট ধরে ধরে বাক্সে পড়ে থেকে পুরোনো হচ্ছে। কত জোড়া ফিতেওলা জুতো ছিল, সব পড়ে থেকে বেঁকেচুরে নষ্ট হয়ে গেল।

তবে টান টান মেদহীন শরীরটা নিয়ে এখনও ঠিক যৌবনকালের মতোই লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গী পেলে ভালো, না হয় তো একলাই। সঙ্গী জোটানো তাঁর পক্ষে মুশকিল। কেউ ওঁর ওই দূরপাল্লার হাঁটায় রাজি নয়। তাই একাই বেরিয়ে পড়েন। দূরদূরান্তে ঘুরে ঘুরে পুজো দেখেন। রাতে ফিরে এসে এক কাপ গরম চা নিয়ে বসে যান ঠাকুর দেখার গল্প করতে। চোখে-মুখে উজ্জ্বল আভা।

আমরা ঠিক বাবার মতো নই। অত প্রাণশক্তি আমাদের নেই। ঠাকুর দেখতে যাওয়ার ভিড় ঠেলাঠেলির কথা ভাবতেই যেন নিজেকে ভারি বুড়ো লাগে।

তাই ভাবি, আমাদের চেয়ে বাবা কত বেশি যুবক। আর তাঁর তুলনায় আমরা কতই-না বুড়ো।

বিষাদ বিন্দু

একদিন দুর্গা আমাকে মাঝরাতে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে বলল, শুনছ? বলে বালিশে কনুইয়ের ভর রেখে মাথা তুলে উৎকর্ণ হয়ে রইল। শিয়রের জানালা দিয়ে রাস্তার ফিকে আলো জ্যোৎস্নার মতো ওর সুন্দর মুখটিতে এসে পড়েছে। বড়ো করে তাকানো চোখ আর একটু ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটে ওকে বড়ো ভীতু দেখাচ্ছিল। বললাম—কী শুনছ? ও বলল—শোনো। রাত বাড়লেই কারা যেন রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করে ঘুরে বেড়ায়। খাবার চায়।

এ আমার চেনা চিৎকার। আমাদের একতলার ঘর। জানালার কাছেই কে যেন একটু টেনে টেনে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—মাগো। একটু কান পাততেই আরো দূরে দূরে প্রতিধ্বনির মতো শোনা যায়—মাগো। গলিতে গলিতে রাস্তায়, বড়ো রাস্তায় কারা যেন ছায়ার মতো শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের গলায় ওই অপার্থিব চিৎকার। কলকাতায় আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। এরা পাত-কুড়ুনি। মানুষের রাতের খাওয়ার সময় পার হয়ে গেলে রাস্তায় বেরোয়।

দুর্গার ভীতু সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে ঘুমচোখেও আমার হাসি পেল। বললাম—এ তো রোজকার ব্যাপার। আজ নতুন করে শোনার কী?

ওর মাথা নড়ে উঠল। ইয়ারিং-এ জ্যোৎস্নার মতো আলো ছোট্ট বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠল। বলল, রোজ শুনি। তুমি তো ঘুমোও, আমার কেন যেন গায়ে কাঁটা দেয়, ঘুম আসে না। জেগে থেকে শুনি অনেক মেয়ে মদ্দ রাত জেগে পথে পথে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে। কলকাতার এত রাতেও ভিক্ষে। মাগো! বুকের মধ্যে কেমন করে।

—কেমন? বলে আমি স্মিতমুখে চেয়ে থাকি।

দুর্গা বলল—হেসো না। আগে এরা এত বেশি ছিল না। দিনকে দিন বাড়ছে।

—জানি। বলে পাশ ফিরবার চেষ্টা করলাম, অমনি দুর্গার একরাশ সুগন্ধি চুলওয়ালা মাথাটা টুপ করে আমার বুকের মধ্যে ডুব দিল—ঘুমিয়ো না। আমার ভয় করছে।

—ভিখিরিকে ভয় কীসের দুর্গা?

ও প্রথমে কথা বলল না অনেকক্ষণ। চুপ করে শুয়ে রইল আমার বুকে। অনেকক্ষণ। যে জায়গায় ও মাথা রেখেছিল আমার বুকের সেই জায়গাটা আস্তে আস্তে ঘেমে উঠল। তারপর ও আস্তে আস্তে বলল—ওদের সবাই কি ভিখিরি?

—তা না তো কী? গাঁয়ে যখন খরা কিংবা বন্যা হয় তখন দলে দলে চলে আসে শহরে। এবারও হয়তো কিছু একটা হয়েছে। প্রতিবছরেই হচ্ছে তো!

—কী হয়েছে?

—কী জানি! সব জেলার খবর তো আর অত খুঁটিয়ে দেয় না কাগজে। যতদূর জানি এবারকার ফলন ভালো নয়।

—আহা, তুমি চাষবাসের কথা কত বোঝো।

—হাসলুম—আমি যেটুকু বুঝি তুমি তাও না।

দুর্গা মফসসলের মেয়ে। সেই অহংকারে মাথা তুলে বলল—খেত খামার আমি তোমার চেয়ে বেশি দেখেছি।

—ছাই। ও তো রেলগাড়িতে বসে গ্রাম দেখার মতো।

ও আবার চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ শিউরে উঠে বলল—দেখ, দেখ।

মুখ তুলে বললুম—কী!

—আমাদের জানালায়।

বালিশে কনুইয়ের ভর রেখে আমি উঠে দেখলুম রাস্তার আলোর আমাদের জানালার কাচের শার্সিতে একটা ছায়া। ঘোমটা মাথায় একটা বউ, তার কোলে বাচ্চা ছেলে। স্থির হয়ে আছে। যেন আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনবার চেষ্টা করছে। বুঝবার চেষ্টা করছে আমরা জেগে আছি কি না।

গভীর রাতে জানালার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে এটা ভাবতে ভালো লাগে না। আমি উঠতে যাচ্ছিলুম।

দুর্গা আমার বুকের ওপর তার নরম হাতখানা দিয়ে আমাকে শুইয়ে রাখল। বলল—উঠো না।

—কেন?

—কে না কে, কে জানে?

—দুর!

—ও-রকম বোলো না। আমি প্রায় রাত্রেই ছায়া দেখি। কে কেন আমাদের জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে গোঙাতে গোঙাতে বলে, 'মা গো।' কী যে বিশ্রী লাগে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ইতস্তত করে দুর্গা বলল, প্রায় রাতেই যাদের ছায়া আমি জানালায় দেখি তারা সবাই কি ভিখিরি?

হেসে বললুম—চোর-টোরও হতে পারে। বলতে বলতে দুর্গা আবার তার মাথা আমার বুকের মধ্যে ডুবিয়ে দিল—আমার মনে হয়—ভিখিরিও নয়।

তবে?

অস্বস্তির হাসি হাসল দুর্গা—কেন যেন মনে হয় জানালার কাছে গেলে দেখতে পাব কেউ নেই, শুধু ছায়াটাই আছে ওখানে। দুপুর রাতে যারা রাস্তায় খাবার চেয়ে বেড়ায় তারাও আসলে কেউ নয় বোধ হয়। মনে হয় রাস্তায় গেলে দেখতে পাব কেউ নেই, কেবল চিৎকারগুলো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক এ-রকম অদ্ভুত মনে হয় আমার।

—তাহলে ওরা বোধ হয় ভূতই হবে।

দুর্গা আমার বুকের ওপর ঘাড় কাত করে অনেকক্ষণ জানালাটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর একসময়ে বলল, দেখ, দেখ।

মাথা না তুলেই বললুম—কী?

—ছায়াটা চলে গেল।

বললুম—ছায়াটা নয় দুর্গা, ভিখিরিটা।

আঙুল নিয়ে আমার বুকের ওপর আঁকিবুকি কাটছিল দুর্গা। আরও অনেকক্ষণ আমাদের ঘুম আসবে না। আমি মশারিটা তুলে টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়িয়েছিলুম। দুর্গা আমার হাত টেনে আনল—এখন না। তারপর আস্তে আস্তে বলল—আচ্ছা গো, এই যে দিন রাত জুড়ে দেশময় ভিখিরিরা হাঁটছে তার মানে কি ভিখিরি খুব বেড়ে যাচ্ছে?

—খুব?

—ভয় করে গো?

—ভয় কীসের?

—কী জানি। মনে হয় ওরা শিগগিরই দলে ভারী হয়ে যাবে খুব। আর দেখ, আজকাল আর আগের মতো কানা খোঁড়া ঘেয়ো ভিখিরি বেশি নয়। এখন হাত পাওলা সুস্থ অল্পবয়সী ভিখিরিই বেশি। এরা দল বাঁধলে...

হাসলুম—ওদের সকলেই আসল ভিখিরি নয়। এটা একটা ব্যাবসার মতোই তো। দেখ, রোববারে ওদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তার মানে সারা সপ্তাহ চাকরি বাকরি করে কোথাও রোববারে ভিক্ষেয় বেরোয় উপরি রোজগারের আশায়। ভয় পেয়ো না, এদের জোট বাঁধার কোনো কারণ নেই।

—তুমি বলছ। বলে ও আগের মতোই আমার বুকের ওপর আঁকিবুকি কাটতে লাগল। আমি ওর পিঠে হাত বোলাচ্ছিলুম, ভাবছিলুম, কীভাবে ওর মন ভালো করা যায়। ও আস্তে আস্তে বলল—দেখ, তুমি যখন আমাকে আদর কর তখন তো আমার খুব সুখ হওয়ার কথা। আমার পেটে পাঁচ মাসের বাচ্চা। তার কথা ভাবলেও তো আমার সুখ হওয়ার কথা কিন্তু হয় না গো, কেবলই মনে হয় দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে না-খাওয়া খিদে-পাওয়া লোক। দিনরাত জুড়ে ঘুরে ঘুরে ডাকছে। বড়ো ভয় করে গো।

—ভয়, দুর্গা? ভয় কীসের?

—কী জানি, আমি যেন টের পাই আমাদের এই ছোট্ট একটু ঘর সংসারের দিকে আমাদের এক ফোঁটা না-হওয়া বাচ্চাটার দিকে চারদিকের দেশজোড়া খিদে-পাওয়া মানুষের শাপশাপান্ত ছুটে আসছে। আমার বিধবা ঠাকুমা মাঝে মাঝে মা-র সঙ্গে ঝগড়া হলে আক্রোশে মাটিতে লাথি মারতে মারতে বলত—তোর অবস্থা যেন আমার মতো হয়। আমার মতো হয়। ঠিক সেইরকম, বুঝলে ঠিক সেই রকম আমি চারদিকে মাটিতে লাথি মারা শব্দ শুনি। আমার বুকের মধ্যে ধুপ ধুপ শব্দ হয়। কারা যেন আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে—তোদের অবস্থা যেন আমার মতো হয়। আমার মতো হয়। আমার মতো হয়। অনেক সময়ে শাপ শাপান্ত ভীষণ ফলে যায় জানো?

শুনতে শুনতে আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছি। ও বাচ্চা মেয়ের মতো শান্তভাবে আমার বুকের মধ্যে মিশে রইল। আধফোটা গলায় বলল—তুমি এ সব বিশ্বাস কর না, না?

বিশ্বাস করি কি না কে জানে। কিন্তু আমার অস্বস্তি আমি চাপা দিলুম। ফিস ফিস করে বললুম—এবার আমাকে একটা সিগারেট খেতে দাও।

ও মাথা নাড়ল না। আর একটু জড়িয়ে থাকো আমাকে। আমার বিশ্রি লাগছে গো। একটু চুপ করে থেকে দুর্গা আবার আস্তে আস্তে বলল—দেখ, কাল রাত্রে একটা খুনখুনে বুড়ি এসেছিল। বোধ হয় তিনশো বছর বয়স। দেখলে বিশ্বাস হয় না যে সে হাঁটতে চলতে পারে। এক্কেবারে জটাই বুড়ি। সিঁড়ির নীচে একগোছা ছেঁড়াখোঁড়া এঁটো রুটি নিয়ে বসে ছিল। আমাকে দেখেই বলল—একটু বেনুন দেবে মা? আমি ঢাকা জেলার মেয়ে, 'বেনুন' মানে বুঝি না, মঙ্গলা বুঝিয়ে বলল, তরকারি চাইছে। জিজ্ঞেস করলুম, রুটি কোথায় পেলে? বলল, তোমাদের বাড়ির তিনখানা আগে দাড়িওলা পাগড়ি-বাবুদের বাড়ি থেকে দিলে। ছেঁড়া খোঁড়া রুটি মা, পাতের। বেনুন দিলোনি। শুকনো রুটি মা, বেনুন ছাড়া কি দে খাই বল। জিজ্ঞেস করলুম, দাঁত নেই কী দিয়ে খাবে? বলল, দাঁত? না, মা, নেই। ছোটোলোকের মুখ মা, আমরা কি দাঁতে চিবিয়ে খাই? মুখে ফেললেই সব তল হয়ে যায়। সেই কবে থেকে খিদে পাচ্ছে। বোধবুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই মা, কেবল খিদে টের পাই। যখন ত্যাখন। ঠিকঠাক মেটে না কখনো। খিদে ছাড়া আর তেমন কিছু টের পাইনে মা, তেমন কোনো দুঃখু নেই। খিদে মিটলেই হাওয়া-বাতাস, খিদে মিটলেই চাঁদের আলো।

—দুর্গা!

—উঁ।

—তুমি বানিয়ে বলছ।

—না গো, ও ঠিক অমনি সাজিয়ে গুছিয়ে বলেছিল। শুনে আমার এমন বুক কাঁপছিল। ও হাওয়া বাতাস চাঁদের আলোর কথা বলতেই আমার যেন দম আটকে এল। আরও কত কী বলল গো, হিঁদুর ঘরের বিধবা হয়েও গোরুর মাংস খেয়েছে। বলল, ভিক্ষে তো আর হিঁদু মোচরমান দেখে চাওয়া যায় না। সেই একটা ছোঁড়া আমার কোঁচড় অ্যাই বড়ো বড়ো টুকরো ফেলল খুব ধোঁয়া আর বাস। ফুটপেতে বসে চিল কুকুর তাড়িয়ে সেই মাংস খেলুম। একটু কষা আর নোনা তার স্বাদ, বড়ো বড়ো হাড় আর মোটা রোঁয়া। সেই গোমাংস মা জাতধর্ম চলে গেল সেদিন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। অ্যাদ্দিন পর্যন্ত মা জাতধর্মের বড়ো বালাই ছিল।

আমি চুপ। দুর্গা আবার বলল—বুড়ির স্বামীর শোক, পুত্রশোক নেই, ভয় ডর নেই, সব তলিয়ে গেছে কোথায়। ঘুমও নেই বোধ হয় আমার বড় দুরদুর করছিল বুক, মনে হচ্ছিল চারদিকেই বড়ো অমঙ্গল। বুড়ি যখন আমার দেওয়া বড়ো ঢ্যাঁড়শ চচ্চড়ি আর ডাল দিয়ে রুটি খাচ্ছিল গপাগপ তখনও তার চোখে একটুও আশীর্বাদ ছিল না, কৃতজ্ঞতাও না। খাওয়ার সময়ে ওর চোখ দুটো কী যে ভয়ংঙ্কর হয়ে গেল, যেন যুদ্ধ জয় করে নিচ্ছে—এমন বিভোর আর নিষ্ঠুর দেখাচ্ছিল ওকে। আমার কী মনে হল, আঁচলে পেট ঢেকে ঘরে পালিয়ে গেলুম, যার স্বামীপুত্র ধর্ম গেছে তাকে বড়ো ভয় করে গো। কেননা আমার তো সব আছে। এমন খিদে-পাওয়া চারদিক আমাদের, এমন ধর্ম-ছাড়া, এর মধ্যে দেখ, আমাদের বাচ্চাটাকে আনতে বড়ো খারাপ লাগছে।

আস্তে আস্তে আমরা দুজনেই উঠে বসেছিলুম। আমি মশারির বাইরে হাত বাড়িয়ে নিয়ে এলুম, আমার সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই আর ছাইদানি। এবার দুর্গা আপত্তি করল না। মুখোমুখি বসলুম দুজনে। হঠাৎ দুর্গা বলল। হ্যাঁ গো, তোমার কি মনে হয় আমরা খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি?

—না। আমি মাথা নেড়ে বললুম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে এখন দুর্গার আবছা মুখের দিকে চেয়ে মনে পড়ে যে আমার ভিতরেও অনেক ক্ষোভ। আমার কত সাধ মেটেনি। মিটবে না। জিনিসপত্রের দাম, বিক্ষোভ, মিছিল, এলোমেলোভাবে আমার মনে পড়ে গেল। মিটছে না, কিছুই মিটছে না। দুর্গা অভিশাপের কথা বলছিল। মনে পড়ল মিছিলের স্লোগানেও কত অভিশাপ থাকে। সব কি ফলছে? দুর্গার শুধু শুধু ভয়। ভেবে দেখলে আমারও মনভরা অভিশাপ। কাকে দিতে হবে তা জানি না।

দুর্গা বলল—দেখ, আমার মনে হয় আমাদের কিছু করা দরকার, আমরা খুব সুখে নেই? বরং অভাবেই দিন চলে আমাদের। তবু চারদিক বিচার করলে মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা বড়ো বেশি সুখে আছি। দেখ, চারদিকটা ভালো না হলে আমরা কি ভালো থাকব? কেবল মনে হবে আমরা আর কারোটা কেড়ে খাচ্ছি।

আমি ম্লান হেসে বললুম—কী করব দুর্গা। আমার পৃথিবী তো এইটুকু মাত্র। এই তুমি, এই ছোট্ট দুটো ঘরের সংসার, ভাবী সন্তান। এর বাইরে ভাবতে মাথায় কুলোয় না যে।

আমার বলার ভঙ্গিতে দুর্গা হাসল। বলল—মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে তোমাকে বড়ো জ্বালাচ্ছি, না গো?

বলতে বলতে ও আমার আধ-খাওয়া সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে বলল—এবার শোও।

শোয়ার পর দুর্গা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল—বীরপুরুষ আর যদি কিছু না পারো তবে অন্তত সারা রাত আমাকে আদর কোরো যেন বাইরের কোনো শব্দ কানে না আসে।

দুর্গার সুন্দর মুখখানা আমি আমার বুক ও থুতনির খাঁজের মধ্যে ধরে রেখে আস্তে আস্তে বলছিলুম—দেখ দুর্গা, ছেলেবেলা থেকে আমারও বড়ো ইচ্ছে ছিল একটা কিছু করি। কিছু করা বড়ো দরকার। আমার চারদিকটার জন্য আমারও একটা কিছু যেন করার ছিল। তবু দেখ নিজেদেরই এত ঝামেলা। অথচ দেখ তবু তোমার কথা শোনার পর এখানে মনে হচ্ছে আমাকে ছাড়িয়েও আমাদের অস্তিত্ব রয়েছে আমার চারিদিকে। সব ভালো না থাকলে আমি থাকব না। সন্তানের জন্ম দিতে ভয় পাব, রাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে যাবে নিশাচর ভিখিরিরা...

বলতে বলতে আমি ঘুমে ঢলে পড়ছিলুম। আর তখন বাইরে বহুদূরে দূরে কলকাতার অলিতে গলিতে রাস্তায় অলীক ভিখিরিরা অপার্থিব চিৎকার করে খাবার চেয়ে বেড়াচ্ছিল। আর পরস্পরের কুক্ষিগত আমরা দুজন সারাটা রাতের জন্য ছোট্ট একটু দ্বীপের মতো জায়গায় হাওয়া-বাতাস আর চাঁদের আলোর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ছিলুম। আমাদের ঘিরে স্বপ্নের মধ্যে চারদিকে সমুদ্রের গর্জন ফিরতে লাগল।

একটি কান্নার জন্ম

অনিন্দ্যকে কেউ ডাকছে।

খুব হতাশ হয়ে অনিন্দ্য ফিরে আসছিল। ডলির এই ট্রেনে আসবার কথা ছিল। কিন্তু ও এল না। ঘুম তাড়িয়ে এত রাতে স্টেশনে আসাটা বৃথাই গেল তার। মনে মনে রাগ করতে করতে ও ফিরে আসছিল আর ভাবছিল, বাপের বাড়িতে গেলে মেয়েগুলো যেন কীরকম হয়ে যায়। কেন যে এ-রকম হয়। অথচ অনিন্দ্য এখানে একা। এত রাতে আবার তাকে একা একা ফিরতে হবে সেই নির্জন ঘরে।

গাড়িটা অনেক লম্বা। প্ল্যাটফর্মটা শেষ হওয়ার আগে যেখানে একটু ঢালু হয়ে গেছে সেখানে থেমে একটা সিগারেট ধরাল অনিন্দ্য। পিছন ফিরে স্টেশনটার দিকে তাকাল। নিয়নের আলোয় উজ্জ্বল প্ল্যাটফর্ম, চায়ের ট্রলির ঘরঘর শব্দ আর কুলিদের ধুপধাপ মাল লোড করার শব্দ তার কানে এল। তার খারাপ লাগল। বাঁ-দিকে গাড়িটা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়েও অনেকখানি লম্বা গাড়িটা। গাড়িটাকে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, বলে গাল দিতে ইচ্ছে করছিল অনিন্দ্যর। পরের গাড়ি কাল।

ঠিক এই সময়ে সে টের পেল কেউ তাকে পিছন থেকে ডাকছে। অনিন্দ্য ফিরল। এদিকটায় আলো নেই। তবু অনিন্দ্য বুঝল এগুলো সারি বাঁধা উঁচু-ক্লাসের কামরা।

—একটু শুনবেন? ভাঙা ভাঙা ভারী গলায় কেউ তাকে ডাকছে।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অনিন্দ্য এগিয়ে গেল।

ফার্স্ট ক্লাস কামরার দরজায় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। কামরার ভিতর নীল রঙের মৃদু আলো জ্বলছে। আলোটা ভদ্রলোকের পিছনে। অনিন্দ্য তাঁর মুখ দেখতে পেল না।

ভদ্রলোক ঝুঁকলেন। বললেন,—আমার এক্ষুনি একটু মেডিকেল হেলপ দরকার। আপনি সাহায্য করতে পারেন? আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ।

ভদ্রলোকের গলাটা ভাঙা, ভাঙা, ভারী। অনিন্দ্যর মনে হল অনেক রাত জেগে, ক্লান্ত হয়ে গলাটা বসে গেছে। অনিন্দ্য পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বলল,—নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারি। কী করতে হবে বলুন?

—একটা স্ট্রেচার আর অ্যাম্বুলেন্স। এখানে হাসপাতাল আছে আশা করি।

—হ্যাঁ, বড়ো হাসপাতাল। আড়াই মাইল দূরে।

—তবে বন্দোবস্ত করুন। আমি নামাতে পারছি না, এ কামরায় আর কেউ নেই। আমার স্ত্রী একা। খুব অসুস্থ উনি। প্লিজ।

—ঠিক আছে। ব্যস্ত হবেন না। অনিন্দ্য বলল।

—একটু তাড়াতাড়ি। আমাকে এখানেই ব্রেকজার্নি করতে হচ্ছে। কয়েকটা কুলি যদি পাঠিয়ে দিতে পারেন দেখবেন। সময় পাওয়া যাবে তো?

—নিশ্চয়ই। এখানে ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়ায়।

—বাঁচালেন। কষ্ট দিলাম আপনাকে।

—কিচ্ছু না।

অনিন্দ্য হাসল একটু। সে ভাবল, এর কোনো মানে নেই। ডলি আসলে এ ঝামেলায় পড়তে হত না। কবজি উলটে ঘড়িটা দেখল সে। রাত দেড়টা। নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে অনিন্দ্য এগিয়ে গেল। কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে অনুভব করল, একটু আগে যেরকম ক্লান্ত লাগছিল, এখন আর ততটা লাগছে না। এখন সে চটপট এগিয়ে যেতে পারছে। কারুর জন্য কিছু করতে পারছে না। এ অনুভূতিটাই হয়তো কাজ করছে ভিতরে ভিতরে। অনিন্দ্য হাসল। আজকাল সে কোনো কাজেই খুব একটা বিরক্ত হয় না। কিছুদিন আগে খবর পেয়েছে তার একটি ছেলে হয়েছে।

ওভারকোটটা গলার কাছটাতে কুটকুট করছিল। অনিন্দ্য একটা বোতাম খুলে দিল। টুপিটাকে নামিয়ে আনল প্রায় চোখের উপর। ডলিকে দেখবে, ছেলেটাকে দেখবে—আজ না হয় কাল। অনিন্দ্য আপনমনেই হাসল। তার পায়ের গতি বাড়ল। ছেলেটা কেমন হয়েছে কে জানে! ডলি লিখেছে, 'তুমি আসবে বলেছিলে। এলে না কেন?' তারপর লিখেছে, 'বাচ্চাটা ঠিক তোমার মতো। খুব হাত পা ছোড়ে। ভীষণ চঞ্চল। তোমার মতো।' দুটো হাত পাখনার মতো দোলাতে দোলাতে অনিন্দ্য স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল। ডলি বানিয়ে লিখেছে—অনিন্দ্য ভাবল। গল্প বানাতে সে যা ওস্তাদ। অতটুকু ছেলে কখনো হাত পা ছোড়ে? কিংবা ছুড়তেও পারে, অনিন্দ্য ঠিক জানে না। আজ ডলি আসলে বেশ হত। তার বদলে কোন এক উটকো ভদ্রলোকের স্ত্রী ট্রেনে যেতে যেতে খামোকা রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনিন্দ্য মাথা নাড়ল—না এর কোনো মানে নেই। হায় ঈশ্বর, আমাদেরও এ-রকম হতে পারত। আমার আর ডলির। ভাগ্যিস হয়নি।

অনিন্দ্য স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকল। অনুমতি নিয়ে ফোনটা তুলে কানে লাগাল।

তাই বলো!—এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারল অনিন্দ্য। বুঝে মনে মনে খুব একচোট হাসল সে।

রেলের লোকেরা একটা স্ট্রেচার ইতিমধ্যে জোগাড় করে এনেছে। কামরাটার সামনে একরাশ কৌতূহলী লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে যারা এতক্ষণ প্ল্যাটফর্মের এখানে ওখানে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে বসে ছিল। কম্বল-ঢাকা দেহটাকে ধরাধরি করে নামানো হল, তারপর বয়ে নিয়ে গেল ওয়েটিং রুমের দিকে।—মালপত্রগুলো নামানো হয়ে গেছে। কামরাটা শেষবারের মতো ভালো করে দেখে নিয়ে ভদ্রলোক নেমে এলেন। প্রসারিত হাতে অনিন্দ্যর হাত দুটো নিয়ে ঝাঁকানি দিলেন। জোরে। বললেন—অনেক ধন্যবাদ।

এবার অনিন্দ্য হাসল—তাহলে আপাতত আপনি নিরাপদ।

ভদ্রলোক লজ্জা পেলেন—হ্যাঁ যতক্ষণ না—

—সে তো বটেই। উইশ ইউ গুড লাক।

—কিন্তু—

অনিন্দ্য চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরেছিল। আবার ফিরল। বলল—কী?

—ভাবছি আমি তো এখানকার রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না। জরুরি ওষুধপত্রের দরকার হলে এত রাত্রে কোথায় যে পাওয়া যাবে।

একথাটা আগেই ভাবা উচিত ছিল—অনিন্দ্য ভাবল। অনিন্দ্য মাথাটা এধারে ওধারে দোলাল।

এই প্রথমবার পিতা হতে চলেছেন ভদ্রলোক। মাথা ঠিক রাখা মুশকিল এ সময়টাতে। নিজেকে এ ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞ মনে হল। অনিন্দ্য মুচকি হাসল। নিজেকে খুব খুশি খুশি লাগছে তার। আমি তো সিনিয়র—অনিন্দ্য ভাবল—হ্যাঁ অনেক সিনিয়র।

—আমি যাব। চলুন। অনিন্দ্য বেপরোয়াভাবে বলল—আমার নাম অনিন্দ্য মজুমদার। আপনার নাম?

—ধন্যবাদ। আমার নাম বিদ্যুৎ বসু। কিন্তু আপনি আবার কষ্ট করে—

—উপায় কী? তা ছাড়া আমি এখানে একা থাকি—বাড়িতে ভাববার কেউ নেই। চলুন।

—হয়তো দরকারই হবে না।

—হবে। এখানকার রাস্তাঘাট আমার চেনা। চলুন। ওরা এগোল।

অনিন্দ্য এগিয়ে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক পিছিয়ে পড়ছিলেন। অনিন্দ্য পিছন ফিরে বলল— আসুন। তাড়াতাড়ি।

—অ্যাম্বুলেন্স তো এখনও আসেনি।

—না, কিন্তু আসতে কতক্ষণ?

ভদ্রলোক তাড়া দেখে হাসলেন। অনিন্দ্য হাসল না। সে ভাবল অতটা নিশ্চিন্ত থাকা ভালো না। যতদিন খবর পায়নি ততদিন একটা রাতও সে ঘুমোতে পারেনি, তারপর টেলিগ্রাম পাওয়ার পর রোজ ডবল করে ঘুমিয়েছে। হুঁ, ডলি নিশ্চয়ই এবার মোটাসোটা গিন্নিগোছের হয়ে উঠবে। এতদিন হেসে খেলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেশ ছিল, কিন্তু এখন সে মা, সত্যিকারের মা। আর অনিন্দ্য নিজে আস্ত একটা বাবা। নিজে নিজেই হাসল অনিন্দ্য। অ্যাঁ—বাবা বলে ডাকল নাকি ছেলেটা? সত্যি? দুর, ভাবতেও কেমন লাগে। আর ডলি কী বলবে তাকে? খোকার বাবা না অতটা সাহস পাবে না। কারণ তাহলে সেও উলটে তাকে খোকার মা বলে ডাকতে পারে।

ডলির এ গাড়িতে আসা উচিত ছিল। অনিন্দ্য ভাবল। আর ভাবতে ভাবতেই ভদ্রলোকের পাশাপাশি ওয়েটিং রুমে ঢুকল সে। ওয়েটিং রুমের দেওয়ালের বিরাট আরশিটায় দুজনের প্রতিবিম্ব পড়ল। দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়াল, দু-জোড়া চোখ একইসঙ্গে গিয়ে পড়ল মেঝেতে...রাখা স্ট্রেচারের উপর।

স্ট্রেচারের উপর ঘন নীল রঙের কম্বলে ঢাকা একটি ক্ষীণ দেহ। বিশীর্ণ একটা সাদা হাত কম্বলের বাইরে। ঘন নীলের উপর সাদা হাতটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মুখটা খোলা এলোমেলো চুল সিঁদুরের মাখামাখি। চোখ দুটো বোজা—একটা গভীর যন্ত্রণার ছাপ মুখে। ফর্সা গালের উপর টিকোলো নাকটার ঠিক পাশেই একটা কালো কুচকুচে আঁচিল।

বহুদিন কেটে গেছে, তবু ভুল হল না অনিন্দ্যর।

কেউ যেন তাকে একটা ঝাঁকানি দিল। তারপর তাকে স্থির করে দিল। সে পাথরের মতো স্থির হয়ে রইল। কতগুলো অদ্ভুত স্পর্শ আর শব্দকে সে স্থির হয়ে যেন অনুভব করল। আলোগুলো লাল, নীল, সবুজ হয়ে দোল খেল। সে চোখ বুজল। চোখ খুলল।

অনিন্দ্যর ভুল হয়নি, হতে পারে না। সে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়াতে হল, নইলে সে পড়ে যেত। কেউ যেন তার মুখে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে। আঙুলগুলো লম্বা নরম, সুগন্ধি। কেউ তার বুকে হাত রাখল, মাথা রাখল। একটা অস্পষ্ট দুর্বোধ্য গন্ধ। অস্বস্তিকর। 'আমি মরে যেতাম,' অনিন্দ্য আপনমনে বলল, 'আমি মরে গিয়েছিলাম। এখনও আমি মরে যেতে পারি।' অনিন্দ্য নিশ্বাস টানল জোরে। চোখের সামনে আলোগুলো যেন নিভে গেছে।

কিন্তু অনিন্দ্য সোজা হয়ে দাঁড়াল। বিদ্যুৎ তার দিকে তাকিয়েছিলেন। অনিন্দ্য হাসল। হাসিটা কান্নার মতো দেখাল। ভদ্রলোক চঞ্চল হলেন। একটা হাত রাখলেন অনিন্দ্যর কাঁধে। বললেন, কী?

—প্রেশার। উত্তর দিল অনিন্দ্য।

—তাহলে—

—কিছু না, এ-রকম হয় আমার মাঝে মাঝে।

একজন এসে খরব দিল অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে। বিদ্যুৎ বললেন, এক মিনিট।

উনি বাথরুমে গেলেন। অনিন্দ্য তাকাল। টানা টানা দুটি চোখের পাতা ক্লান্তি আর যন্ত্রণার নয়। কিছু দেখছে না সুধা, কিছু শুনছে না। ঠোঁট দুটো সাদা, দৃঢ়বদ্ধ। সে যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। অনিন্দ্য আরও ঝুঁকল, হাত বাড়িয়ে সে সুধাকে এখন ছুঁতে পারে। সে তাকাল। নীল রঙের কতকগুলো শিরা দেখা যাচ্ছে সুধার গালে কপালে। 'বড়ো রোগা হয়ে গেছ তুমি, বড়ো রোগা, অনিন্দ্য ভাবল, তবু বেঁচেই আছ। কিন্তু

আমি মরতে চেয়েছিলাম। পুরো চার দিন আমি অজ্ঞান হয়েছিলাম। আমি বিষ খেয়েছিলাম। সুধা বেঁচে থাকাটা কী অদ্ভুত! বেঁচে না থাকলে তোমাকে দেখতাম না।'

ভদ্রলোক বাথরুম থেকে এ ঘরে এলেন। অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা এল।...ওরা ধরাধরি করে সুধাকে তুলল। অনিন্দ্য বলল—চলুন।

—হ্যাঁ।

কিছু বলতে হবে ভেবে অনিন্দ্য বলল, কোথায় যাচ্ছিলেন এ অবস্থায়?

—মরিরানি যাচ্ছি। সরকারি চাকরি, না গিয়ে উপায় ছিল না। বাড়িতে ওকে দেখবারও কেউ ছিল না। কিন্তু এ-রকম হবে যদি জানতাম তবে ছুটি নিতাম নিশ্চয়ই।

—ঠিক। তবু সাবধান হওয়া ভালো ছিল।

ভদ্রলোক কোনো উত্তর দিলেন না। ওরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

হাসাপাতালের চত্বরটা ওরা পাশাপাশিই পার হল। ট্রলিতে করে সুধার দেহটাকে নিয়ে গেল ওরা মেটারনিটি ওয়ার্ডের দিকে। ডাক্তার নার্স ব্যস্ত হয়ে ঘুরে ফিরে দেখে গেল। ওরা এল, গেল। অনিন্দ্য আর বিদ্যুৎ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল। বিদ্যুৎ চুপ, গম্ভীর। তার মুখটা থমথম করছে, অনিন্দ্য বলল, আপনাকে ওদের দরকার হবে। আপনি যান, আমি আছি। এখানেই।

—রাত ক-টা?

—আড়াইটে।

উনি চলে গেলেন। বারান্দাটা অন্ধকার। কয়েকটা বেঞ্চ পাতা। অনিন্দ্য এগিয়ে গেল। সিঁড়ি ভাঙল গুনে গুনে। সামনে যে বেঞ্চটা পেল তাতেই বসল।

অনিন্দ্য একা। হাসপাতালের খোলা বারান্দাটা ফাঁকা। শীতটা ভয়ংকর। একটা কুকুর কাঁদল। একবার, দু-বার...। অনিন্দ্য হেলান দিল দেয়ালে। তার মনে হল তার ঘুম পাচ্ছে—অনেকদিন আগে ব্রোমাইড খেয়ে যেমন ঘুম পেয়েছিল। অনিন্দ্য আপন মনেই বলল, 'তুমি পালিয়ে গেলে, হারিয়ে গেলে, মরে গেলে। আমি ছিলাম। কিন্তু সে কি থাকা? তাকে কি অস্তিত্ব বলে? তুমি কী বল? সারাজীবনে তুমি কাউকে তেমন করে চেয়েছিলে কি না জানি না। সে-অভিজ্ঞতা না থাকলে তুমি বুঝবে না আমার কী হয়েছিল। আমার ভয়ংকর রোগ হয়েছিল, সে-রোগের নাম সুধা। তুমি আমাকে 'শিখিয়ে গেলে তোমার নাম, আর জানিয়ে গেলে তুমি ধরাছোঁয়ার কত বাইরে। আমি বোকা। বোকারা এভাবেই ঠকে। নইলে তুমি যা ভেবেছিলে তুমি তো তা নও। এই তো তুমি, অত্যন্ত সাধারণ এক ভদ্রলোকের স্ত্রী, প্রথমবার মা হতে যাচ্ছ। আর আমি তোমাকে দেখলাম। কিন্তু তখন আমার রোগ হয়েছিল। যে রাতে তুমি আমার সঙ্গে চলে যেতে চেয়েছিলে তার আগের রাতেই তুমি হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিলে, আমার জীবন থেকে। চিরদিনের জন্যে। আমিও পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম পৃথিবী থেকেই। কিন্তু বাবা টের পেয়ে গেলেন। মা, বাবা, ঠাকুমা—সবাই আমাকে পাহারা দিতেন। তারপর আমি মরতে চেয়েছিলাম। পুরো চার দিন মৃত্যু আমাকে নিয়ে যাবে বলে দোরগোড়ায় বসে ছিল। মৃত্যু আমার আশেপাশে ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছে, আমাকে ছুঁয়েছে। কিন্তু বেঁচে উঠতে হল। সুধা, ভাগ্যিস মরে যাইনি। তুমি জানো না, আমার ছেলে হয়েছে, তুমি জানো না আমার স্ত্রী আজকে, আমার ছেলেকে নিয়ে এখানে আসত। সে আসেনি, তার বদলে তুমি এলে। কিন্তু সে আসবে—আজ না হয় কাল।'

চৌকো চৌকো কয়েকটা আলোর আভাস মেটারনিটি ওয়ার্ডের জানালা দিয়ে ঘাসের উপর এসে পড়েছে। বাইরে একটু কুয়াশা। অনিন্দ্য কোটের কয়েকটা বোতাম খুলল। ক'টা বেজেছে তা অনিন্দ্য জানে না। জানবার ইচ্ছেও নেই। যেন তার চারদিকে শীতার্ত অন্ধকার পৃথিবীটা ভয়ংকর শূন্য। কেউ যেন এল। জুতোর শব্দ। সে ফিরে গেল। জুতোর শব্দ। অনিন্দ্য ভাবতে লাগল—'সুধা, একসময়ে মনে হয়েছিল তোমাকে ছাড়া পৃথিবীতে কাউকেই চাওয়া যায় না।' ভুল। আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি, তুমি আমার স্ত্রী হলে তোমাকেও তেমনিই বাসতাম, হয়তো অন্য কেউ হলে তাকেও বাসতাম। ভালোবাসাটা আমার জন্মগত সংস্কার। তুমি

জানো না, প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুই আবার আমাদের সঞ্জীবনী দিয়ে যায়। আমার মনে যখন তোমার মৃত্যু হয় তখন আমারও হয়। এক আমিকে পিছনে ফেলে আর এক আমি এগিয়ে যাই। কিন্তু টের পাই না। সুধা, যখন দুঃখ পাই, যখন কাঁদি, যখন মরতে ইচ্ছে করে তখন আমি বড়ো স্বার্থপর হয়ে যাই। তোমাকে বুঝিনি, জানিনি, অথচ চেয়েছিলাম। কেন? তুমি নিশ্চয়ই হেসেছিলে, কিংবা কে বলতে পারে হয়তো একটু দুঃখও পেয়েছিলে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, আমি আমার নিজের দুঃখে কেঁদেছিলাম, মরেছিলাম, আবার নিজের জন্যেই বাঁচছি। আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কখনো তোমার জন্যে দীর্ঘশ্বাস পড়েনি আমার—কারণ তুমি তো মৃত, আর সে আমারও মৃত্যু হয়েছে।

অনিন্দ্য আপনমনে বলল, 'আমি তো কতকগুলো মৃত্যুর যোগফল। এই যোগফলটাই বেঁচে থাকা। আজকে তোমাকে দেখে আমি খুব চমকে গিয়েছিলাম। তারপর তোমাকে মনে পড়ল, নিজেকে মনে পড়ল। আমার স্মৃতিগুলো যেন অনুভূতি হয়ে ফিরে আসছিল। আমার মনে হচ্ছিল তুমি আমার মুখে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছ, বুকে হাত রাখছ—যেমনটা করতে। তারপর ঝোঁকটা কেটে গেল। আমি তখন একটি ছেলে ও একটি মেয়ের কথা ভাবতে লাগলাম। যেন তারা তৃতীয় পক্ষ, আমি নই, তুমি নও। তারা যেন অনিন্দ্য আর সুধা—যাদের আমি চিনতাম—তারা এখনকার তুমি কিংবা আমি নই। তারা আলাদা জাতের, আলাদা গোত্রের।

বড়ো যন্ত্রণা সুধা। এসব ভাবতে আমার ভালো লাগে না। কাল রাতে আমি যা ছিলাম আজ আর তা নেই। আমি যেন বদলে গেছি। সুধা, আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কেন যে জানি না।

আকাশের রং ছাই ছাই। একটা মস্ত বড়ো কুয়াশা শরীরী জন্তুর মতো আকৃতি নিয়ে মাঠের উপর স্থির হয়ে আছে। অনিন্দ্য অনুভব করছে একটা শিরা-ছেঁড়া, পাগল করে দেয়া কান্নার যন্ত্রণা বুকের মধ্যে আছাড় খাচ্ছে। তাকে যেন ভেঙে ফেলবে, গুঁড়ো করে ফেলবে যন্ত্রণাটা। তার গলাটা শক্ত। কান্না, একঘেয়ে, বিষণ্ণ।

অনিন্দ্য উপুড় হয়ে শুল বেঞ্চটার উপর। তার চোখ বেয়ে ধারা নামল। সে কাঁদল। কাঁদতেই লাগল। আর হঠাৎ সব কান্নাকে ছাড়িয়ে আর একটা নতুন, একেবারে নতুন কান্না শোনা গেল।

অনিন্দ্য উঠল। আস্তে আস্তে প্রায় ফিসফিস করে বলল—'আহা, সুধা! তুমি কি বেঁচে আছ? শুনতে পাচ্ছ?'

তারপর অনিন্দ্য, কেন যে সে নিজেই জানে না, বলল, 'পৃথিবীর এক গোলার্ধে যে সূর্যকে দেখছ সে আর এক গোলার্ধে অন্ধকার করে এসেছে। সুধা আমি তোমাকে দেখব না, দেখা দেব না।'

অনিন্দ্য উঠে দাঁড়াল। কোনো দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর সে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। এক, দুই, তিন, চার...

ভূত ও ভাসান

ঈশান পণ্ডিতের বাগানের দক্ষিণে পুকুরপাড়ের আমগাছে ঠিক দুপুর বেলা ঢেলা মারছিল ভাসান। এ সময় দেখল, পুকুরের অন্যধারে একটা উটকো লোক দাঁড়িয়ে তাকে দেখে ফিক ফিক করে হাসছে। রাস্তায় নানারকম ভোজবাজি দেখিয়ে বেড়ায় যে তাজু ওস্তাদ, অনেকটা তারই মতো চেহারা লোকটার। মাথায় একটা নোংরা পাগড়ি—তাতে পায়রার পালক গোঁজা, ময়লা জামা, পরনে লুঙ্গি, কাঁধে গামছা। ভাঙাচোরা মুখ, তাতে বিজবিজে দাড়ি। লোকটা হাসছে দেখে একটু ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ভাসান, তারপর আবার ঢেলা মারতে যাচ্ছিল, ঠিক এ সময়ে লোকটা ওপরের ঘাট বেয়ে জলে নামল, তারপর দিব্যি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে সটান এপারের ঘাটে এসে উঠল, বলল—কী করছ খোকা? ভাসান ভালো করে লোকটার পা দেখল, একটুও ভেজেনি। ভাসান শুনেছে বটে যে ঈশান পণ্ডিত ভূত পোষে। তা সেই ভূত কেউ কখনো চোখে দেখেনি। এ লোকটা কি সেই ভূতেদেরই একজন? সে আমতা আমতা করে বলে—এই, এই আম পাড়ছি। আ-আপনি কে?

—আমি! লোকটা ভারি কাপ্তানের মতো হেসে বলে—তোমার হাতের একটা ঢেলা আমাকে ছুড়ে মারো। বুঝতে পারবে। ভাসান একটু ভেবে-টেবে আলটপাকা একটা ঢিল ছুঁড়ল লোকটাকে। ঢিলটা লোকটার বুক ফুটো করে ওধারে মাটিতে পড়ল। লোকটা তাজুর চেয়েও বড়ো ওস্তাদ, বুঝল, ভাসান। লোকটা হেসে বলে—বুঝতে পারছ তো। আমি হচ্ছি ঈশান পণ্ডিতের ভূত। এইসব বাগান-টাগান, পুকুর-টুকুর, জমি-জিরেত পাহারা দিই। বলে লোকটা ভাসানের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাসান একটু শ্বাস ছেড়ে বলে—তাহলে আর আম পাড়ব না। চলেই যাই।

লোকটা ভারি অবাক হয়ে বলে—সে কী! তুমি যে আমাকে দেখে ভয় পেলে না। এ কী কাণ্ড! অ্যাঁ?

ভাসান হাই তুলে বলে—ভয় লাগছে না যে।

—লাগছে না! লোকটা খুব মুষড়ে পড়ে—একটুও লাগছে না। কিন্তু এই যে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে এলুম আমার শরীর ফুঁড়ে তোমার ঢিল বেরিয়ে গেল—এমন মারাত্মক দুটো খেলা দেখেও তোমার ভয় লাগছে না।

—মাইরি না। ভাসান লোকটার জন্য দুঃখিত হয়ে বলল—তাজু ওস্তাদও এ-রকম কত দেখায়।

—কিন্তু ভয় পাওয়াই এর নিয়ম। চিরকাল ভূত দেখে মানুষ ডরায়। তা তুমি সে নিয়ম ভাঙছ কেন? মাইরি, একটু ভয় পেয়ে যাও, নইলে প্রেস্টিজ থাকে না। চাও তো আরও ভয় দেখাই তোমাকে। আরও

অনেক জানা আছে আমার। আমি ওই তালগাছটার মতো লম্বা হয়ে যেতে পারি, নিজের মুণ্ডু খুলে লোফালুফি করতে পারি, কিংবা অদৃশ্য হয়ে যাই।

ভাসানের দুঃখ হয়, বলে—থাক গে। কষ্ট করে কী হবে। একবার ভয় ভেঙে গেলে আর ভয় পাওয়া কি সোজা! আমার আর কিছুতেই ভয় করবে না যে।

—করবে না।...আমার আরও চার স্যাঙাত আছে, বলো তো তাদেরও ডেকে আনি, তারপর সূর্যের আলো সুইচ টিপে নিভিয়ে দিয়ে এমন ভূতুড়ে নাচ নাচব অন্ধকারে।

ভাসান, বিরক্ত হয়ে পিছন ফিরে চলে যেতে যেতে বলে—তাতে লাভ কী? আমি তো জানি আপনারা ভূত, তার বেশি কিছু নন।

ভূতটা কথা খুঁজে পায় না। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে ভাসান ভয় না পেয়ে চলে যাচ্ছে। দিনকাল পালটে গেছে, এখন আর ভূতেদের সেই দিন নেই। এইসব ভেবে বড়ো দুঃখিত চিত্তে সে বসল গাছতলায়। দুঃখে তার চোখে জল এসে গেল। তারপর অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল ঈশান পণ্ডিতের পোষা ভূতটা।

পুরোনো ছবি

কোন মহামায়া? বলতে বলতে তিনি উত্তেজনায় বিছানার ওপর উঠে বসলেন। ওঁর বোধ হয় রক্তচাপের রোগ, সে-কারণেই পলকে মুখ রাঙা হয়ে উঠল, বড়ো ছেলেমানুষের মতো আনন্দে উপচে-পড়া হাসি ওঁর মুখে। 'মহামায়ার মাথায় কত চুল ছিল জানো? এই এত, একরাশ।' তিনি দু-হাতে অনেকটা ছড়িয়ে দেখালেন, কোঁকড়া কোঁকড়া কী ঘন আর কালো চুল ছিল ওর। বললে বিশ্বাস করবে না, সেই চুল বাঁধতে দুজন লাগত। মস্ত খোঁপা মাথায় নিয়ে যখন হাঁটত তখন মনে হত ওর মাথা টলমল করছে, এক্ষুনি ও পড়ে যাবে। বাব্বা! কত বড়ো খোঁপা? শূন্যে একটি কলস ধরে রাখার মতো করে তিনি দু-হাত তুলে দেখালেন, স্মৃতিতে ফিরে যাচ্ছিলেন বলে ওর চোখ অন্যমনস্ক, মুখে তেমনি চাপা হাসি। হঠাৎ খেয়ালে ফিরে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আরে! তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বোসো।' খাটের পাশেই চেয়ার। বসতে যাচ্ছিলুম, উনি অধৈর্যের স্বরে বললেন, 'আর না, চেয়ারে না। অত দূরে কথা হয় না। এই বিছানাতেই বোসো।' লেপে ঢাকা পা গুটিয়ে নিয়ে বললেন, 'বোসো বাবা।' নিজের রুক্ষ এলো চুল তিনি দু-হাতে পিছন দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। বিকেলের শেষ আলোটুকু ওঁর মুখের একপাশে এসে লেগেছিল, আলোর বিপরীত দিক থেকে আমি ওঁর ছায়া মতো মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম। উনি আমার দিকেই চেয়ে ছিলেন, বললেন, 'তোমাকে দেখেই চেনা উচিত ছিল। একেবারে মায়ের মতো মুখ। মহামায়ার সঙ্গে দেখা নেই প্রায় চল্লিশ বছর, তবু মহামায়ার মুখ আমার হুবহু মনে আছে। দেখতে সুন্দর ছিল বলে না, কত সুন্দর মেয়ের মুখই তো ভুলে গেছি, মহামায়াকে মনে আছে শুধু ওই চুলের জন্য। ওর পিছনে কত ঘুরে ঘুরে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলুম জানো। লক্ষ্মী মেয়ে ছিল মহামায়া, আমরা প্রায়ই ওকে দাঁড় করিয়ে চুল মেপে দেখতুম, আর ও চুপটি করে দাঁড়িয়ে আমাদের কাণ্ড দেখে হাসত।' ওঁর প্রাচীন মুখে ছেলেমানুষের ঠোঁট-টেপা দুষ্টু হাসি দেখে আমি হেসে মায়ের জন্য অহংকারে আর লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলুম। উনি আবার বললেন, 'একেবারে মায়ের মতো মুখ তোমার। কী বলব তোমাকে, সাত আট বছর ধরে আমি প্রায় বিছানাতেই পড়ে আছি। রোগে এত ভুগছি বলেই কি না কে জানে আজকাল আর খুব চেনা লোকেরও নাম মনে থাকে না, রোজ দেখা হয় এমন লোকেরও নাম ভুলে যাই। কিন্তু যেই তুমি বললে, আমার মার নাম মহামায়া, অমনি বুকের ভিতরটা চমকে উঠল, সারদেশ্বরী আশ্রমের সে সময়ের সব মেয়ের মুখ যেন সারি সারি ভেসে উঠল চোখের সামনে। ভাবতেই হল না, মহামায়াকে মনে পড়ে গেল, যেন কালকেও দেখেছি ওকে। দুজন মহামায়া ছিল আমাদের, তোমার মা ছিল চুল-ওলা মহামায়া।' বলতে বলতে উনি ঝুঁকে পড়ে ওঁর একটু উষ্ণ নরম একখানা হাত রাখলেন, আমার হাতের ওপর। 'মহামায়ার কথা আমি একটুও ভুলিনি। একা একা থাকি, আর প্রায়ই সেই দিনের মধ্যে চলে যাই, মহামায়ার কথা আমার আজও ভীষণ মনে পড়ে। কতদিন রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে সকালে উঠে মনে হয়েছে মহামায়াকে, সবাইকে চিঠি লিখি—তোমারা সবাই আমার কাছে একবার এসো। যারপরনাই মনে পড়ে যায় যে, কারুরই ঠিকানা জানি না, কে কোথায় আছে, বেঁচে আছ কি না, তাও জানি

না। কত বছর হয়ে গেল।' আমি লক্ষ্য করলুম যে, ওঁর হাত কাঁপছে না, কিন্তু বোধ হয় ওর রক্তের ভিতর কিংবা অস্থিমজ্জার ভিতরে কোথাও টান মতো কিছু একটা কাঁপছে। তা শুধু আবেশ না শুধু দুঃখ না, শুধু ভালোবাসা না, তার চেয়েও ভিন্ন কিছু। সেই কল্পনা খুব ধীরে ধীরে আমারও অস্থিমজ্জার ভিতরে চলে আসছিল। মায়ের সেই কৈশোরে আমি যে কোথায় ছিলুম। আমার মায়ের সেই কিশোরী মুখ একবার দেখতে বড়ো সাধ হয়। ওঁর একটা হাত আমার হাতের ওপর উনি নিঃসংকোচে অন্য হাতটি বাড়িয়ে আমার মাথার সামনের চুল সরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, 'ওমা। তোমার সেই চুল কই? এইটুকু বয়সেই মাথার সামনেটা যে ঢাকা।' একটু ধমকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়েই হেসে ফেললেন, আর এই বুঝি এখনকার স্টাইল, এই ছোটো করে চুল ছাঁটা? একে চুল না কি বলে? মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকি বলে এইটুকু বয়সেই আমার বুকের ভিতরে বাদলা বাতাস লাগছিল, ধরে আসা গলা সামলে হেসে বললুম, 'আমার চুল উঠে যায় বলে ছোটো করে ছাঁটি। ওতে কম ওঠে।' উনি গলা নামিয়ে গোপনে বলার মতো করে বললেন, মহামায়া বকে না? যার মায়ের মাথায় অত চুল, তার মাথার এই ছিরি দেখে বকে না? যেন বড়ো ছেলের কাছ থেকে কৌশলে কথা বের করে নিচ্ছেন, ওঁর এই ভাব দেখে আমার স্বভাবত বয়স্ক গম্ভীর মনের ভিতর আমি প্রাণপণে শিশু হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, মাথা নেড়ে বলি, বকে। বিচ্ছিরিভাবে বকে চলে, আমি মরে গেলে এ রকম করে চুল কাটিস। আমি তোর ওই ন্যাড়া-ন্যাড়া মাথা দেখতে পারি না। উনি ঝুঁকে থাকা মুখ ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, ঠিকই বলে। আমাদের আমলে পুরুষদের স্টাইল ছিল বাবরি চুল, আর বড়ো জুলপি। খিল খিল করে হাসলেন। তারপর আস্তে আস্তে ওঁর মুখ শান্ত হয়ে এল। শুধু চোখে-মুখে অন্তর্নিহিত আনন্দের স্মিত ভাবটুকু ছড়িয়ে রইল। বললেন, তুমি যে খুঁজে খুঁজে আমার কাছে এলে একে ভাগ্য ছাড়া কী বলে? কী জানি, কেন মহামায়ার কথা আমার এত মনে পড়ে। মহামায়ার কথা অত ভাবি বলেই বোধ হয় ভগবান তোমাকে আমার কাছে এনে দিলেন। কী নাম তোমার? নাম বলতেই উনি আবার কিশোরী মেয়ের মতো হেসে উঠলেন, জীবনলাল, সে কী! ও তো পুরোনো নাম। মহামায়া ওই নামে তোমাকে ডাকে? লজ্জায় মুখ নীচু করে আমি মাথা নাড়ি, না। আমাকে অন্য নামে ডাকে। ওঁর প্রাচীন রুগণ মুখখানায় আবার মুখ টেপা দুষ্টু হাসি ফুটে ওঠে, সে-নাম কি খুব খারাপ? পচাগচা গোছের কিছু? আমি জোরে মাথা নাড়ি, না। মা-র মেজাজ ভালো থাকলে আমাকে বাবা বলে ডাকে, কখনো রুণ্টু বাবা। মেজাজ ভালো না থাকলে শুধু দুষ্টু। আমার ডাকনাম রন্টু। বড়ো খুশি হলেন উনি। মাথার রুক্ষ চুল বার বার হাত দিয়ে পিছনে ঠেলে দেওয়া ওঁর প্রায় মুদ্রাদোষ। মাথার চুলে আঙুল চলন্ত রেখে উনি বললেন, 'রন্টু-বাবা, বেশ নাম। আমিও তোমাকে ওই নামে ডাকব। কিছু মনে কোরো না, আমি নাম বড়ো ভুলে যাই। যদি তোমার নামও কখনো মনে না পড়ে তাহলে আমিও তোমাকে বাবা বলে ডাকব। কেমন?' টের পেলুম উনি যে হাতটি আলগোছে আমার হাতের ওপর রেখেছেন সেটি ক্রমে ঘেমে উঠল। একটুক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে উনি আবার হাসলেন, আমার যে ছেলেটা মরে গেছে তার নাম রাখা হয়নি। তিন মাসের হয়ে মরে গেল, তার মধ্যেই এত ভুগছিল যে, আমরা ওর অসুখের ভাবনা-চিন্তায় নাম রাখার কথাই ভুলে গিয়েছিলুম। কেবল ছেলেটা বা বাছাটা বলে কাজ চালিয়ে নিতুম। ছেলেটা কিছুই ভোগ করতে পারল না। কপাল। বড়োলোকের ঘরে জন্মানো বৃথাই। বাপ মায়ের আদর পেল না, একটা নামও সময় করে দিয়ে উঠতে পারলুম না। বলতে বলতে আবার উনি বেশ জোরে হেসে উঠলেন তোমাকে দেখে আমার মরা ছেলের কথা মনে পড়ছে, একথা বললে, খুব বিচ্ছিরি শোনাবে, না! আসলে তো নয়, রন্টুবাবা নামের কথায় হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছিল কার যেন নামই দেওয়া হয়নি—মনে করতে করতে বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে গেল। নইলে ওর কথা আমার মনেই নেই। উনি স্মিত মুখে চুপ করে রইলেন। এইসব কথা শুনে কী করতে হয় তা জানা নেই, বলে আমি মুখ নামিয়ে রাখলুম। বেড-শিটের ওপর দুটো মাছি খেলছে, ওঁর সারা রোগা হাতখানা আমার হাতের ওপর রাখা, আমি হাত নাড়তে পারছি না।

মুখ নীচু করে ছিলুম বলেই মেয়েটির ঘরে আসা আমি টের পাইনি। ওঁর গলায় 'একে চিনিস?' এই কথা শুনে মুখ তুলে দেখলুম যেন মায়ামন্ত্রবলে একটি মেয়ে বাতাসের ভিতর থেকে এসে সামনে দাঁড়াল, ওষুধ রাখা টেবিলটার ওপাশে। এক পলক আমাকে দেখে চোখ সরিয়ে নিল। ওঁর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল না। চেনে না, উনি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। এই আমার মেয়ে রিখিয়া। এটাই একমাত্র। আর আমার কিছু নেই। উনি মেয়ের দিকে হাসিমুখ ফিরিয়ে বললেন, 'এ হচ্ছে রন্টুবাবা, মহামায়ার ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির চোখ বড়ো হল, মায়ের দিকে ঝুঁকে চাপা স্বরে বলল, আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম, 'কোন মহামায়া? চুল-ওলা মহামায়া?' উনি হেসে উঠে আমার দিকে তাকালেন, 'দেখ, মহামায়ার কথা ওই বাড়ির সবাই জানে। চল্লিশ বছর দেখা নেই, চিঠিপত্র নেই, তবু ওর কথা এত মনে আছে যে, সবাইকে বলে বেড়াই।' আমার হাতের ওপর থেকে ধীরে ধীরে উনি হাত সরিয়ে নিলেন, তারপর হাতটা শূন্যে তুলে রিখিয়ার কাঁধের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, এমনভাবে যেন আঁকড়ে ধরতে চান। শ্যামলা-সুন্দর, কিশোরী রিখিয়া, তার ছিপছিপে শরীর যেন কোন অদৃশ্য ছিলার টানে নোয়ানো ধনুক, গুটিসুটি হয়ে মায়ের বুকের কাছ থেকে বিছানায় বসল, আমার মুখোমুখি। আমি প্রাণপণে চোখ সরিয়ে রাখলুম।

আমি চোখ না তুলে ওঁর গলা শুনলুম, 'জানো রন্টুবাবা, রিখিয়া কেন আমার কাছে এসেছে?' হাসির শব্দ আর সেই সঙ্গে রিখিয়ার 'উঃ মা, চুপ করো না,' উনি চুপ করলেন না, 'বুঝলে, কষ্ট হচ্ছে রিখি ঘড়ি ধরে এসে দেখে যায় আমি রেগে গেছি কিনা। যদি চোখ বুজে কখনো শুয়ে থাকি, তবে নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখে শ্বাস চলছে কিনা, বুকে হাত দিয়ে দেখে টিপ-টিপ করছে কিনা। মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যায়, চমকে চেয়ে দেখি পালিয়ে যাচ্ছে।' রিখিয়া একবার মাথা ঝেঁকে বলল, 'মোটেই না।' উনি চুপ করে রইলেন। খানিকক্ষণ বাদে আবার ওঁর হাসির শব্দ শোনা গেল। 'রিখিয়া নামটা খুব অদ্ভুত, না রন্টুবাবা! ওর এ নাম রেখেছিল ওর বড়োমামা। তার ছিল পেটের ব্যামো, বিহারে রিখিয়ায় চেঞ্জে গিয়ে সেই রোগ সারল, ফিরে এসে দেখে ভাগনি হয়েছে, নাম রাখল রিখিয়া। আমাকে বলল, তোর মেয়ের রোগ বালাই রুখে দিলুম। ওর কোনো পেটের রোগ হবে না, রিখিয়া নামের গুণ দেখিস। নামের গুণ কি না জানি না। রন্টুবাবু, তবে রিখি আমাকে ভোগায়নি। জন্মের পর থেকেই ও দেখছে আমি বিছানায় শোয়া। বিছানাই বলতে গেলে আমার ঘরবাড়ি, পৃথিবী, জীবন যা বল। ও বোধ হয় জেনে শুনেই এসেছিল আমার পেটে, লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে ছিল বরাবর, একটুও ভোগায়নি।' আমি আড়চোখে দেখলুম উনি দেয়ালের দিকে অন্যমনে তাকিয়ে আছেন, আর আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন রিখিয়ার কাঁধ থেকে হাত পর্যন্ত। রিখিয়ার কৌতূহলী চোখ আমাকে দেখছিল, একটু আড়ষ্ট হয়ে আমি আবার মুখ নামিয়ে নিই। রিখিয়া, কী অদ্ভুত নাম।

উনি রিখিয়ার কাঁধ ছেড়ে খোলা চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, মুখে অন্যমনস্ক হাসি, বললেন, রিখিয়ার আরও একটা নাম আছে, জানো রন্টুবাবা? রিখিয়া ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আ! মা...।' উনি আমার দিকে ঝলমলে চোখে চেয়ে বললেন, 'ওর বাপ ওকে ডাকে গোগো। কেন জানো? ওর বাবা কাজের মানুষ, পাঁচ সাতটা ব্যাবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে সবসময়। রিখিয়া প্রায় সময়েই বাপের অফিস ঘরে গিয়ে ওকে জ্বালাত, আর ওর বাবা ওকে গো, গো, বলে তাড়াত। সেই থেকে মেয়ের নাম হয়ে গেল গোগো।' মুখ নীচু করে আমি একটু হাসলুম। তারপর মুখ তুলে রিখিয়ার চোখে চোখ রেখে প্রথম কথা বললুম, 'আমার ছোটো বোনেরও ওই রকম একটা নাম আছে।' কিশোরী রিখিয়ার চোখে হাসি মিট মিট করে উঠল। লাজুক মুখে জিগ্যেস করল, 'কী নাম?' বললুম, 'গুনগুনিয়া।' খিল খিল করে হেসে ওঠে রিখিয়া, সে-হাসি দেখে মনে হয় সে মায়ের কাছে ওরকম হাসতে শিখেছে, নয়তো মা তার কাছে। বলল, 'কেন এরকম নাম কেন?' আমি রিখিয়ার হাসিমুখ দেখতে দেখতে লজ্জায় আমার মাথা নামাই, 'ওর অনেক নাম। ভালো নাম পাঞ্চালী, বাবা ডাকে থুড়ি, মা ডাকে খুকু। আর সারাদিন গুন গুন করে গান গায় বলে আমি ডাকি গুনগুনিয়া।' রিখিয়া মাথা কাত করে বলে, 'পাঞ্চালী বেশ নাম। গুনগুনিয়া আরো সুন্দর।' বলেই সে তার মায়ের দিকে চেয়ে একটু ঘুরে বলে 'মা, আমার একটা নামও সুন্দর নয়। গোগো, রুখু, রিখি, রিখিয়া একটাও না।' উনি নিঃশব্দে হেসে বললেন,

'কত দীনদুঃখীর কত ভালো নাম থাকে। নামে কী যায় আসে? পছন্দ না হলে বিয়ের পর নাম পালটে নিস। আজকাল তো ওরকম হয়।' রিখিয়া 'ইস' বলে মায়ের বুকের কাছে মুখ গুঁজে দিল। উনি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি খুব লাজুক, রন্টুবাবু?' পলকেই আমার নাকে মুখে রক্ত ছুটে আসে বলে আমি মুখ নামাই। উনি বললেন, 'কিছু মনে কোরো না। আজকালকার ছেলেদের আমার একদম পছন্দ হয় না। চোঙা প্যান্ট পরে রাস্তায় শিস দিয়ে হাঁটে, মাথা ফাঁপিয়ে চুল আঁচড়ায়। দেখো না রিখি এইটুকু মেয়ে প্রায় নাকি স্কুলের রাস্তায় ছেলেরা ওকে ইশারা-ইঙ্গিত করে...' রিখিয়া চাবুকের মতো ছিটকে উঠে বলল, 'মা এরকম করলে কিন্তু...।' উনি হাসিমুখে যেন ওর পোষমানা বেড়ালকে টেনে নিচ্ছেন, এইভাবে রিখিয়াকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'রিখি, রন্টুবাবাকে কিছু খেতে দিবি না। ফ্রিজ এ রসগোল্লা আছে, আর একটু দইয়ের শরবত....।' আমার দিকে মায়াবী চোখ তুলে বললেন, 'একটু খাও রন্টুবাবা।' রিখিয়া আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে উঠে গেল। রিখিয়া দরজার কাছে গেলে উনি ডেকে বললেন, 'আর সেই ফটোটা আনিস রিখি।'

উনি আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন, 'বাইরেটাকে আমার যে কী ভয় রন্টুবাবা। ঝড়বাদল, গাড়ি-ঘোড়া, গুন্ডা-বদমাস, শিস দেওয়া বখাটে ছেলে—আরো কত কী। সারাদিন শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবি। রিখির জন্য ভাবি রিখির বাবার জন্য ভাবি...' বলতে বলতে উনি হাসলেন।

রিখিয়া ফিরে এল। তার হাতের প্লেটের দিকে চেয়েই আমি বললুম, 'এত খাব না।' রিখিয়া ঠোঁট উলটে হাসল, 'এত কোথায়?' টুকুমাসি বড় চোখে চেয়ে বললেন, 'ইস। উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে, খাবে না কী?' আমি রিখিয়ার মুখ থেকে চোখ নামিয়ে প্লেট হাতা নিলুম। বললুম না যে আমার বয়স বাইশ।

খাওয়া হয়ে গেলে টুকুমাসি সেই ঠোঁট টেপা দুষ্টু হাসি হাসলেন। 'রন্টুবাবা, এবার তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।' বলতে বলতে উনি আমাকে সামনে পুরোনো লাল হয়ে আসা একটা গ্রুপ ফটো তুলে ধরলেন, 'খুঁজে বের করো তো কোনটা তোমার মা, আর কোনটা আমি।'

মাকে চিনলুম এক পলকেই সেলাইয়ের মেশিনের সামনে বসা রোগা কিশোরী, মস্ত চোখ, চুলের ঢল নেমেছে পিছনে প্রতিমার চলচিত্রের মতো, দু-খানা হাতের একটি হুইলের ওপর, অন্যটি ছুচের কাছে শান্ত, কনুই ঢাকা ব্লাউজ। চেনা অথচ অচেনা এই আমার মা? আমি বিস্ময়ে হেসে উঠলুম, ব্যগ্র আঙুল বাড়িয়ে দেখালুম এই তো আমার মা। টুকুমাসি হেসে উঠলেন, 'ঠিক। নিজের মাকে চিনতে একটুও দেরি হয়নি। আর, আমি?' ফটোতে সারি সারি ভালোমানুষ মেয়েদের শান্ত আশ্রমিক মুখ, প্রায় একই রকমের পোশাক। আমি ব্যস্ত আঙুল বাড়িয়ে খুঁজতে লাগলুম। টুকুমাসি ম্লান একটু হেসে বললেন, 'বরং আমার মুখটা আর একবার ভালো করে দেখে নাও রন্টুবাবা।' শুনে বড়ো লজ্জা পেলুম, আমার হাত ঘেমে উঠল—এর ভিতরে কোনটা টুকুমাসি। সামনে বসে একসারি মেয়ে, পিছনে দাঁড়িয়ে আর একসারি—আমার অনির্দিষ্ট অসহায় আঙুল ঘুরতে লাগল। খেয়াল করিনি, রিখিয়া ঝুঁকে ছিল আমার ঘাড়ের পাশে। হঠাৎ তার বাড়িয়ে দেওয়া হাতের আঙুল আমার আঙুলে ঠেকল ফটোর ওপর, তার চাপা গলা আমার কানের কাছে ফিসফিস করে ওঠে 'এই আমার মা?' তারপর আরো চাপা সুরে 'বোকা কোথাকার।' টুকুমাসি চোখ বুজে বালিশে হেলান দিয়ে বললেন, 'সত্যিই আর চেনা যায় না রন্টুবাবা।' শুনে লজ্জায় আমার কান্না পাচ্ছিল। এই তো টুকুমাসি আমার আঙুলের নীচে আমার কিশোরী মায়ের পাশে বসা যত রোগা তত সুন্দর এই তো টুকুমাসি। উনি চোখ বুজে শান্ত গলায় বললেন, 'এই আমি রন্টুবাবা, তোমার মায়ের পাশে।' হাসলেন, 'একজন রন্টুবাবার মা, অন্যজন রিখিয়ার মা। বিশ্বাস হয় না রন্টুবাবা, না?'

অনেকক্ষণ পর আমি সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছিলুম। পিছনে রিখিয়া, দরজার কাছে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললুম, আসি। রিখিয়া সিঁড়ির শেষ ধাপটায় দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছিল, বলল, 'আবার আসতে হবে।' বললুম, 'আসব।'

রাস্তায় নেমে হঠাৎ খেয়াল হল, আমার বুক পকেটে মায়ের চিঠি। টুকুমাসিকে লেখা। তাতে লেখা, রন্টু তোমার কাছে যাচ্ছে। এ বছর বি-এ পাশ করল। ওকে একটু দেখো, যদি পারো কাজের একটু সুবিধে করে দিয়ো। বড়ো দুঃখে কষ্টে আছি...ইত্যাদি। চিঠিটা দেওয়া হল না টুকুমাসিকে।

কিন্তু তার জন্য আমার দুঃখ ছিল না। আমি হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বললুম, তোমার কাছে আবার আসব টুকুমাসি। একটু থেমে আবার বললুম, তোমার কাছেও আসব রিখিয়া। তারপর একটু দ্বিধা, একটু লজ্জা আমাকে পেয়ে বসল।

কেননা আমি তো জানি, একদিন সুসময়ে রিখিয়ার সঙ্গে...আমার ভালোবাসা হবে।

গণেশের বিপদ

কিল, ঘুঁসো, চড়চাপড়, লাথি, ঝাঁটা—সে একরকম। তাতে অন্তত প্রাণের ভয়টা নেই। কিন্তু দা-কুড়ুল বেরোলেই মুশকিল। গণেশ ভাবে, এতটা না করলেও হত। লাকড়ির ঘর থেকে কুড়ুল নাচাতে নাচাতে কার্তিক আর রান্নাঘর থেকে দা হাতে দামিনী না বেরোলেও কি আর গণেশ ঘর ছাড়ত না? ছাড়তে তাকে হতই। অনেকদিন ধরেই সে বুঝতে পারছে, অবস্থাটা দিনে দিনে বড্ড টাইট হয়ে পড়ছে।

কার্তিক মিলিটারিতে ছিল। মাঝে মাঝে একেবারে মিলিটারির পোশাক পরেই হাজির হয়ে যেত গ্রামে। বাপ রে, বুটের কী ঘটাং ঘটাং শব্দ। শুনলে গণেশের বুকের ভিতরটা ঢিব ঢিব করত। কার্তিক মিলিটারি ছেড়ে এখন ঘরে এসে জুত করে বসেছে, এখন আর বুট-টুট নেই। তবু শব্দটা যেন এখনও রয়ে গেছে। কেবল গণেশ শুনতে পায়।

পীতাম্বর কি শুনতে পায়? কে জানে। তবে পীতাম্বরের অবস্থাও আর সুবিধের নয়। কার্তিক তার দুটো ধানের গোলা পুড়িয়েছে, ফি বছর খেতের ধান কেটে নিয়ে আসছে। সেই ডাকসাইটে পীতাম্বর তো করছে কাঁচকলাটা। ভাগ্য ভালো, কার্তিক এখনও তার ধানকল বা সোনার দোকান বা বাড়িতে হানা দেয়নি। তাও দেবে, পীতাম্বর জানে, তারও ঘণ্টা বেজে গেছে।

মুশকিল হল, তামাশা দেখার জন্য গণেশ আর গাঁয়ে থাকবে না। তারও নোটিশ পড়ে গেছে।

কিন্তু কার্তিকের কথাও নয়, পীতাম্বরের কথাও নয়। খেতের ধারে এক গাছতলায় বসে গণেশ আজ নিজের কথা ভাবছিল। বরাবরই তার মাথাটা গবেট। ভাবনা চিন্তা বড়ো একটা আসতে চায় না। তার সুখ দুঃখ কম, নেই বললেই হয়। তার শোকতাপ খিদে-তেষ্টা সবই যেন কেমন স্যাঁতানো। তার শরীরে রাগ-টাগ মোটে নেই। সাহসও নেই। সে যে কেমন ধারা তা সে আজও বুঝতে পারল না।

আগে, তাকে ভালো লোকই বলত, পাঁচ গাঁয়ের মানুষ। তারপর হল কী, একদিন সিদ্ধিনাথ খুড়োর সঙ্গে নোনাপুকুরের বিখ্যাত রাসমেলায় গেল। সেখানে সিদ্ধিনাথ খুড়ো ট্যাঁক থেকে একখানা লাল গোঁজ বের করে বসে গেল জুয়ায়। পাশে গণো। সারাক্ষণ সে চোখের পলক ফেলেনি। আর তার পলকহীন চোখের সামনে একখানা অদ্ভুত দুনিয়ার দরজা খুলে যেতে লাগল।

সিদ্ধি খুড়ো একবার চোখ টিপে বলল, 'খেলবি?'

না না করেও একসময়ে বসে গেল গণেশ। তিন পাত্তির খেলা। আঃ গায়ে যেন নতুন একখানা জোয়ার এল।

ব্যস, সেই যে বারোটা বাজল গণেশের এখনও বেজেই চলেছে। তিন পাত্তি, সাট্টা, এমনকী কলকাতায় গিয়ে মাঝে মাঝে রেস খেলা, গণেশের কিছুই বাকি নেই। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, হাঁড়ি চড়ে না, চাষবাস চুলোয় গেছে। সেই ফাঁকে বিচক্ষণ পীতাম্বর যথেষ্ট হাতিয়ে নিল।

বাপ রেখে গিয়েছিল মন্দ নয়। দেখেশুনে চললে দুই ভাইয়ের ভেসে যেত। কিন্তু গণেশ এমন অবস্থা করে তুলল যে, মা মরলে পর ঘাটকাজের খরচটা পর্যন্ত ঘরে ছিল না।

তখন থেকে গণেশকে ভালো লোক বলার অভ্যেসটা লোকে ছাড়ল।

বলতে নেই মিলিটারিতে কার্তিক যে চাকরিটা করত তাতে কাঁচা পয়সার ছড়াছড়ি। প্রতি মাসে মোটা টাকা আসত ইনসিয়োর করা খামে। কার্তিক লিখত, 'এই টাকায় অমুক জমিটা কিনিবে, তমুক পুকুরটা বন্দোবস্ত লইবে, অমুকের বাগানটা ডাকিয়া লও।' কিন্তু অত সব ভাববার সময় কোথায় তখন গণেশের। টাকা হাতে এলেই তাকে টানে তাস, তাকে টানে রেস, তাকে হাতছানি দেয় সাট্টা।

কার্তিকের টাকা পাখা মেলে উড়ে গেল। উড়ে গেল ফুলকুঁড়িও।

লজ্জার কথা, ফুলকুঁড়ি তার বিয়ে করা বউ। একেবারে রাইকিশোরী। দিব্যি দেখতে ছিল। কিন্তু দেখবে কী গণেশ, তার চোখ তখন ভাগাড়ে। যার দিনমান এ-গাঁয়ে, ও-গাঁয়ে হাটে-মেলায় জুয়া খেলে বেড়াচ্ছে। রাত-বিরেতে ফিরত কমই। ঘরে সোমত্ত বউ আর বুড়ি মা।

ফুলকুঁড়ির নামে কিছু কুচ্ছো কানে এসেছিল বটে গণেশের। মাছির মতো সেসব কথা উড়িয়ে দিয়েছে। কে এক ঢ্যামনা নাকি প্রায়ই এসে ফুলকুঁড়ির সঙ্গে গুজ গুজ ফুসফুস করে। তা করুকগে।

মায়ের শ্রাদ্ধটা মিটিয়ে গণেশ গিয়েছিল নবাবগঞ্জের দত্তবাবুদের বাড়ি। কালীপুজোর রাতে সেখানে হাজার হাজার টাকার হাত বদল হয়। খুব জমে গিয়েছিল।

সকালে এসে শুনল, ফুলকুঁড়ি উড়ে গেছে। পাশের বাড়ির নবীনের মা বলল, বাপু দোষ তো ওর নয়। কচি মেয়ে, একা বাড়িতে ভূতের ভয়ও তো করতে পারে।

পারে বইকি। খুব পারে।

ফুলকুঁড়ি যাওয়ায় দু-খানা পাখা গজাল গণেশের। আর পিছুটান নেই। কেবল ওড়ে; আর ওড়াও।

সেই ফাঁকে পীতাম্বর খুব টাইট মারতে লাগল। টাকা ফেলত আর এটা ওটা লিখিয়ে নিত।

সবাই চলে গিয়েছিল প্রায়, আচমকা কার্তিক এসে হাজির না হলে। না এসে তারও উপায় ছিল না। চাকরি গেছে চুরির দায়ে। ধরা পড়ে জেল খাটার কথা। তা কোন ফাঁকফোঁকর দিয়ে গলে বেরিয়ে এসেছে। এবার গাঁয়ে জমিদারি হাঁকিয়ে গেড়ে বসার ইচ্ছে।

কিন্তু জমিদারি কোথায়। তার পাঠানো টাকা যে কবে ফুঁকে দিয়েছে গণেশ।

কার্তিক বড়ো ভাইকে কিছু বলল না। তবে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল দাওয়ায় অনেকক্ষণ।

তারপর যখন তাকাল তখন চোখটা অন্যরকম। সেই চোখ দুটির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। লোকটাকে কেমন যেন ভাই বলে আর মনেও হয় না। বড্ড ভয় খেয়ে গিয়েছিল গণেশ।

তিন চার দিন গুম হয়ে বসে থাকার পর কার্তিক গাঁয়ের বদ কয়েকটা ছোঁড়াকে ডাকিয়ে এনে আমবাগানে গোপনে মিটিং করল। তারপর আরও কিছু শাকরেদ জুটে গেল তার। মাসখানেকের মধ্যেই গোটা তিনেক ডাকাতি করে ফেলল তারা।

এদিকে ঘরে মেয়েমানুষের অভাব। রান্নাবান্না একরকম শিকেয় উঠেছে।

কার্তিক একদিন ডাকাতি করে লুটের মালের সঙ্গে একটা মেয়েছেলেও এনে ফেলল। সে ওই দামিনী। বিয়ে-টিয়ে কিছু করল না, তবে সিঁদুর পরিয়ে দিল। দিব্যি ঘর-সংসার পেতে ফেলল দুজনে। আর তার চেয়ে বড়ো কথা, গণেশকেও ফেলল না। যে কাণ্ড করেছে গণেশ তাতে অন্য কেউ হলে তার হাল বেহাল করে ছেড়ে দিত, বড়ো ভাই বলে রেয়াত করত না। তবে কার্তিকটা বরাবরই গণেশকে একটু খাতির-টাতির করত। ছেলেবেলায় ভাইটাকে কোলেকাঁখে গণেশ বড়ো কম করেনি। গণেশ ওকে সাঁতার শিখিয়েছে, গাছ বাইতে শিখিয়েছে, বাঁশি বাজাতে শিখিয়েছে।

গাছতলায় বসে গণেশ সেইসব কথা ভাবছে। ভেবে অবশ্য লবডঙ্কা। মানুষ বিয়ে করলেই কেমন হন্যে হয়ে ওঠে। এই যে গণেশ পৈতৃক বাড়িতে টিকেছিল, ও শুধু কার্তিক বিয়ে করেনি বলেই। যেই করল অমনি

সব সম্পর্ক পাল্টাপাল্টি হয়ে গেল। ভাইকে শালা বলতে মুখে আটকাল না আর কার্তিকের।

অবশ্য পাল্টেছে আরও অনেক কিছুই। কার্তিকের এখন কাঁচা পয়সা হয়েছে মেলা। সোনাদানা হয়েছে। গাঁ সুদ্ধু লোকের কাছে কার্তিক এখন মহা মান্যগণ্য লোক। সবাই ভয় খায়। খাটো গলায় গালমন্দ করলেও প্রকাশ্যে সেলাম বাজায়।

গণেশ একেবারে পোষা বেড়ালটার মতো ছিল। সাতে পাঁচে থাকত না। দু-বেলা দু-মুঠো পেলেই যথেষ্ট। কিন্তু দামিনীর তাও সইল না। লাগানি ভাঙানি শুরু হল কার্তিকের কাছে।

পীতাম্বর শালার অবস্থাও যে ভালো নয়, এত দুঃখের মধ্যে এটাই যা একটু ভেবে সুখ হচ্ছে গণেশের। খুব পাম্পু হচ্ছে পীতাম্বরের। দু-দুটো ধানের গোলা পুড়েছে, লুটপাট হয়েছে, ভরসার কথা আরও হবে। কার্তিক যা মিলিটারি।

আপন মনেই হাসল গণেশ। পেটে খিদে, গলায় তেষ্টা, মনে দুঃখ, তবু হাসল। ঘুরে ফিরে চিন্তাটা ফের নিজের জায়গায় ফিরে এল। গণেশ ভাবতে লাগল, সে কেমন লোক? সে কি লোক ভালো? না খারাপ? জুয়াটা ধরলে অবশ্য তাকে খুবই বিপাকে ফেলা হবে। অত ধরলে মানুষের মধ্যে আর ভালো লোক পাওয়াই যাবে না। কিন্তু জুয়ার নেশাটা যদি না ধরো, তাহলে কি গণেশ খুব খারাপ?

গণেশ অনেক ভাবল। নানা দিক দিয়ে নিজেকে মাপজোখ করল। তারপর মাথা নেড়ে বেশ জোর গলায় বলে উঠল, না হে, আমি লোকটা খারাপ নই। উঁহু, তেমন খারাপ কিছুতেই বলতে পারা যায় না।

বাঁই করে কী যে একটা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল চোখের পলকে তা ঠাহর পেল না গণেশ। কিন্তু এমন দিনে দুপুরে এরকম অশৈলা কাণ্ড দেখে সে চোখ বুজে ফেলল। তার মনের মধ্যে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। বিপদ। বিপদ। ঘোর বিপদ।

জিনিসটা কী, তা জানে না গণেশ। কিন্তু সেটা পিছনে গাছের গুঁড়িতে গিয়ে লেগেছে। গণেশ সাবধানে ঘাড় একটু ঘোরাতেই জিনিসটার ডগা দেখতে পেল। পাখির পালক গোঁজা বাহারি জিনিস। ফলাটা একেবারে গোটা সেঁধিয়েছে, গাছের গায়ে।

গণেশ 'বাবা গো।' বলে উপুড় হয়ে পড়ল। তিরটা যে-ই মারুক, সে কাছেপিঠেই আছে। দু-নম্বর তিরটা এল বলে।

কিন্তু এল না। সামনে দু-খানা লম্বা ঠ্যাং এসে দাঁড়াল। গণেশ মিটমিট করে চেয়ে লোকটাকে বুঝবার চেষ্টা করল।

এই শালা।

গণেশ উঠে বসল, তারপর হাঁ করে চেয়ে রইল। লোকটা ভারী, লম্বা, হাড়ে-মাসে জড়ানো পাকা শরীরখানা, গায়ে ফতুয়া আর পরনে হেঁটো ধুতি। চোখ দু-খানা ফোঁস ফোঁস করছে। কাঁধে ধনুক, কোমরে লতায় বাঁধা একগোছা তির।

গণেশ কাঁপা গলায় বলল, যে আজ্ঞে।

তুই কার্তিক দাস?

গণেশ শশব্যস্ত বলল, আজ্ঞে না, আমি গণেশ।

তার সঙ্গে কার্তিকের চেহারা খুব মিল। মিলটা থাকাটা যে কত খারাপ তা আজ বুঝল গণেশ।

লোকটা কিছুক্ষণ সন্দেহের চোখে চেয়ে থেকে বলল, তাই হবে। কার্তিক আর যাই হোক তোর মতো ময়দার বস্তা নয়। ওঠ শালা, গাঁ ছেড়ে লম্বা দে। ফের এই তল্লাটে দেখলে ফুঁড়ে দেব।

যে আজ্ঞে। বলে গণেশ খুব বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল। তারপর অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বলল, আপনি কে বটেন আজ্ঞে?

তোর যম। যা, শালা।

একটু তফাতে বকুলতলায় ছাতা মাথায় পীতাম্বর দাঁড়িয়ে। ওখান থেকেই হাঁক মারল, বটকেষ্ট, চলে আয়।

বটকেষ্ট—অর্থাৎ যমদূতটা ফিরে দাঁড়াল।

পীতাম্বর তাহলে ভাড়াটে খুনে এনেছে। গণেশের বগল বাজাতে ইচ্ছে করছিল। ওঃ, খুব লেগে যাবে এবারে। এক্কেবারে শুম্ভ নিশুম্ভের লড়াই যাকে বলে। খেলাটা দেখে গেলে হত।

গণেশ উঠল। কাঁধের গামছাখানা নিয়ে কপালটা মুছল। তারপর বিগলিত মুখে বলল, পীতাম্বরদা যে! বলি কাণ্ডখানা কী?

পীতাম্বর তার দিকে গম্ভীর বদনে একটু চেয়ে থেকে বলল, টের পাবি।

আমার তো হয়ে গেছে গো। কার্তিক খেদিয়ে দিয়েছে।

ভালোই হয়েছে। এবার প্রাণটা নিয়ে কেটে পড়।

সে আর বলতে! তা ইনিই বুঝি—! বলে কথাটা অসমাপ্ত রেখে একটু রেশ টেনে গণেশ খুব বুঝদারের মতো একটু হাসল।

গাছ থেকে তিরটা টেনে নিয়ে বটকেষ্ট তার দিকে আর একবার চেয়ে বলল, পেট থেকে যদি কথা বের করেছ তাহলে ত্রিভুবনে কোথাও গিয়ে আমার চোখকে ফাঁকি দিকে পারবে না। বলে দিচ্ছি।

কার্তিকটাকে তাহলে বটকেষ্টই নিচ্ছে। তাই বলে যে মায়া একটা না হচ্ছে এমন নয়। তবে পাপের শাস্তি তো হবেই। সেও তো ঠেকানো যাবে না।

গণেশ গামছাটা দিয়ে রোদ ঠেকাতে মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধল। তারপর রওনা হয়ে পড়ল।

কোথায় যাবে তার অবশ্য ঠিক-ঠিকানা নেই। বোধ হয় কিছুদিন মুনিশ বা মজুর খাটাতে হবে। তারপর কপালে যা আছে তাই হতে থাকবে। আর কী করবে গণেশ?

বটকেষ্টর চেহারাটা চোখের সামনে ভাসছিল গণেশের। বাপ রে, যেন যমের দোস্ত। কার্তিকটাও বড়ো কম যায় না। সেও তো মিলিটারি। কিন্তু বেচারা এযাত্রা রক্ষে পাবে বলে মনে হচ্ছে না গণেশের। বটকেষ্ট আধমাইল দূর থেকে তির মেরে ফুঁড়ে দেবে।

একটা বাঁশবনের আড়ালে গ্রামটা ঢাকা পড়তেই গণেশ একটা বিড়ি ধরিয়ে ফের একটা গাছতলায় বসল। জীবনটা নতুন করে শুরু করতে হবে। তবে তাড়া নেই। ঢের সময় আছে হাতে।

সামনে পতিতপাবনের বীজতলা। পিছনে কুঁড়ে। একটু জল খেয়ে নিলে হয়।

গণেশ গিয়ে হাঁক মারল উঠোনের বাইরে থেকে, পতিত, আছ নাকি হে?

পতিত বেরিয়ে এসে গণেশের দিকে চেয়ে বলল, আছি বটে হে। কিন্তু কী সব হচ্ছে বলো তো?

গণেশ হেসে কুটিপাটি, খুব হচ্ছে হে, খুব লেগে পড়েছে। এক ঘটি জল খাওয়াও সব বলছি। না বললে কথাগুলো পেটে বুজকুড়ি কাটবে হে।

পতিতপাবন তাড়াতাড়ি দাওয়ায় একা মাদুর বিছিয়ে দিল।

বোসো, বোসো, ঠান্ডা হও।

ঠান্ডাই মেরে গেছি হে। ওফ, তিরটা যা মেরেছিল, এক চুল এদিক সেদিক হলেই হয়েছিল আর কি।

পতিতপাবন খাপ পেতে বসে গলা খাটো করে জিজ্ঞেস করল, আমিও নানা রকম শুনছি। ঘটনাটা তাহলে কত দূর গড়াল?

অনেক দূর! পীতাম্বর একটা জাঁকালো রকমের খুনেকে আনিয়েছে। ওদিকে কার্তিকের দলবলও শানাচ্ছে। আমাকে কুকুর-তাড়ান তাড়িয়েছে। এবার নারদ নারদ বলে লেগে গেল আর কি, দেখ ভায়া, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আমাকে না খেদালে বটকেষ্ট তো আমাকেও গেঁথেও ফেলত। খুব বাঁচা বেঁচে গেছি।

পতিতপাবন সব শুনল। মন দিয়েই শুনল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আমাদের রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। যাঁহা কার্তিক তাঁহা পীতাম্বর।

একটা বাজি ফেলবে নাকি ভায়া?

কীসের বাজি?
আমি বলি কী, পীতাম্বর শালাই জিতবে। তুমি কী বলো?
আমি আর কী বলব?
আহা, একটা কিছুই বলোই না। পাঁচটা টাকা বাজি ধরে রাখি।
আমি ওসব বুঝি-টুঝি না। তবে কার্তিকও কম নয়।
তাহলে তুমি কার্তিকের দিকেই ধরো। ওই পাঁচ।
পতিতপাবন একটু হাসল, তোমার স্বভাবটা আর গেল না হে গণেশ।
জীবনটাই জুয়া রে ভাই। তাহলে ওই কথাই রইল।
গণেশ উঠে পড়ল। বেলা অনেক হয়েছে। একটা ঠেক খুঁজে বের না করলেই নয়। দশটা গাঁ তার চেনা। চেনা জায়গায় কাজ কারবার করতে যাওয়া ঠিক নয়। জুয়াড়িকে তেমন ভালো নজরে দেখেও না কেউ।
হঠাৎ মাথায় চিড়িক করে একটা মতলব খেলে গেল। আজকের রাতটা শ্বশুরবাড়িতে কাটালে কেমন হয়? ফুলকুঁড়ি হাওয়া হওয়ার পর আর অবশ্য খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি। গিয়ে দাঁড়ালে কি আর ফেলবে? জামাই-আদর না করলেও লোকনিন্দের ভয়ে দুর-ছাইও করবে না। শত হলেও জামাই। বেশি দূরও নয়। মাইল কুড়ি পঁচিশ রাস্তা। বাস যায়।
গণেশ রওনা হয়ে পড়ল।
শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালোই। বড়ো গেরস্ত।
পেল্লায় সংসার। ভাই-ভাই সব মিলেজুলে রাবণের গুষ্টি। বড়ো বড়ো উনুন জ্বলে, ফলে বিশাল সব হাঁড়ি কড়াইয়ে রান্না হয়, আর নেমন্তন্ন বাড়ির মতোই সারি বেঁধে পাত পড়ে রোজ। বড়ো বড়ো ধানের গোলা, বিশ ত্রিশটা গাই, পাকা বাড়ি, ভুসিমালের ব্যাবসা, বাতাসার কারখানা, আরও সব আছে, আর চাই কী? বেশি আসেনি গণেশ। মেরে কেটে বার তিনেক হবে। তবে মনে আছে বেশ।
গণেশ পৌঁছোল সন্ধের মুখটায়। শ্বশুরবাড়ির উঠোনে তখন খুব নামগান হচ্ছে। মেলাই লোক মোয়ার ওপর মাছির মতো জুটে গেছে। কারো কথা কওয়ার সময় নেই। কার কাছে যে পরিচয়টা দাখিল করবে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল গণেশ। বড়ো মুশকিলে পড়া গেছে।
এদিক-সেদিক একটু হাঁটাহাঁটি করল গণেশ। তারপর আধবুড়ো একটা লোককে দাওয়ায় একটু আন্ধকারের দিকে বসে হুঁকো টানতে দেখে এগিয়ে গেল।
মশাই, বাড়ির কর্তা কোথায় বলতে পারেন?
কর্তা সবাই। কাকে চাই বাপু?
আজ্ঞে আমার নাম গণেশ। এ বাড়ির জামাই।
লোকটা হুঁকো নামিয়ে হাঁ করে তার দিকে চেয়ে থাকে বলল, জামাই?
আজ্ঞে, একটু গোলমাল আছে। ফুলকুঁড়ি আমার বউ। এখন অবশ্য...
লোকটা হুঁকোটা নামিয়ে তার একটা কাঁধ খামচে ধরে বলল, জুতোপেটা করতে হয়, বুঝলে? জুতোপেটা।
গণেশ ভয় খেয়ে ককিয়ে উঠে বলল, তা বটে। তার এখন ততটা না করলেও চলবে। বিপদে পড়েই এসে পড়েছিলুম। তা না হয় যাচ্ছি।
লোকটা তার কাঁধ ছাড়ল না। একখানা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, তোমাকে নয় হে, তোমাকে নয়। ফুলুর কথাই বলছিলুম। আমি তার খুড়ো হই, সতীশ। চিনতে পারলে না?
ফুলকুঁড়ির মেলা খুড়ো-জ্যাঠা, সবাইকে মনে রাখা সম্ভব নয়। তবু গণেশ মাথা নেড়ে বলল, খুব চিনতে পেরেছি। খুব।
আর বাপু, তুমিও ম্যাদামারা বড়ো কম নও। জুয়াও নাকি খেলো বাপু?
আজ্ঞে...

তুমিও লোক ভালো নও। কিন্তু তা বলে ফুলু কাণ্ডটা যা করল তারই কি মাপ আছে! তবে প্রায়শ্চিত্ত বড়ো কম হয়নি। পল্টু ছোঁড়া তো, রাত না পোয়াতেই মোলো।

ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না গণেশ। ধাতস্থ হতে সময় লাগছে। পাশে বসিয়ে মেলা বকে গেল। গণেশ বুঝল, পালানোর সময়েই মনসা ঠুকে দিয়েছিল সেই ছোঁড়াকে। রাত না পোয়াতেই ছোঁড়া মরে। তবে তাকে বাঁচাতে বেহুলার মতো একটা চেষ্টা করেছিল ফুলু, অর্থাৎ ফুলকুঁড়ি। ছোঁড়া তো আর লখীন্দর ছিল না, তাই বাঁচেনি। ফুলু নাকি তারপর বিধবা সাজবারও চেষ্টা করেছিল। তা সেই ভূতও ছাড়ানো হয়েছে।

খুড়ো এত সব বৃত্তান্তের পর বলল, তা বাপু, আমরাও সব তোমার কাছে যাচ্ছিলুম। গিয়ে ধরে পড়তুম, ফুলুর দোষঘাট যাই থাক ঘরে নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

গণেশ বেজার মুখে বলল, ঘরই নেই তার—

নেই মানে?

তখন গণেশকেও তার বৃত্তান্ত বলতে হল।

খুড়ো হুঁকোটা সরিয়ে রেখে শিরদাঁড়া সোজা করে বলল, বটে। তা তুমি যদি ফুলকুঁড়িকে ঘরে তোলো তাহলে তোমার ব্যবস্থাও আমরাই করব।

ঘাড়ে যেন হাড় নেই এমনভাবে ঘাড়খানা হেলিয়ে দিল গণেশ, তা আর বলতে।

এর পর গণেশের যা খাতির হল তা সে সাতজন্মে পেয়েছে বলে মনে হয় না। গরম ভাতে ঘি পর্যন্ত জুটে গেল রাতে। স্বয়ং শাশুড়ি সামনে পাখা-হাতে বসে। নষ্ট মেয়ের মা হলে কত সইতে হয়। তার আরও রাতে যা হল তা গণেশ স্বপ্নেও ভাবেনি। বিছানায় ফুলকুঁড়ি। ঘোমটায় মুখ ঢেকে কৃতকর্মের জন্য কাঁদছে। গণেশের পা জাপটেও ধরল।

তারপর রাতখানা একেবারে ফুলশয্যার রাতের মতো কেটে গেল। দুজনের কারোই দু-চোখের পাতা এক হল না। কখনো গণেশ ফুলুর মুখপানে চেয়ে থাকে হাঁ করে, কখনো ফুলু হাঁ করে থাকে গণেশের পানে চেয়ে, আর কখনো দুজনেই দুজনের দিকে।

রাত না পোয়াতেই ফুলুর তিন জবরদস্ত খুড়ো তাদের জনা দশেক জাকাবুকো শাকরেদ নিয়ে রওনা হয়ে গেল। ফুলু গণেশের কানে কানে বলল, আমার মেজোকাকা হল ডাকাত। মস্ত দল।

শুনে গণেশের ধাত ছাড়ার উপক্রম।

বিকেলের দিকে মেজো খুড়ো হাসতে হাসতে ফিরে এল, ওঃ খুব রগড় হল যা হোক। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—

সবাই ভিড় করল চারপাশে। রগড়টা কীসের?

মেজো খুড়ো দাওয়ায় ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে বলল, সে খুব রগড়। বটকেষ্ট কার্তিককে গাঁথবে বলে আপসাচ্ছিল, তা তার জ্বর এসেছে। কাঁথামুড়ি দিয়ে কোঁ কোঁ করছে। আর কার্তিক আমাকে দেখেই ধড়াস করে পায়ের ওপর পড়ে হাউ মাউ করতে লাগল। ছাড়াতে পারি না। তা বাড়ি-টাড়ি সব ভাগজোগ করে দিয়ে এলাম। বটকেষ্টকে জ্বর গায়েই একটা গো-গাড়িতে তুলে রওনা করে দিয়ে এসেছি। ওঃ খুব রগড় হল। ভেবেছিলুম বুঝি একটু গা গরম করতে হবে, দুটো চারটে লাশও পড়বে। কোথায় কী। হাসতে হাসতে মরি।

গণেশ কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ভগবান একসঙ্গে এত দিলে লোকে সামলায় কী করে। গণেশ হার্টফেলই করত। তবে ঘোমটার আড়াল থেকে ফুলকুঁড়ি চোখের একটা ইশারা করায় হার্টটা ফেল হতে হতেও ফের নেচে উঠল।

বিকল্প
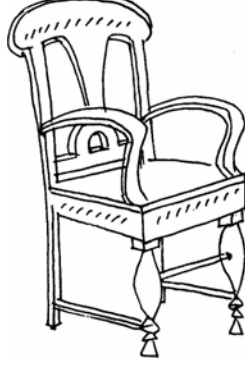
এমন একটা ঝাঁ-চকচকে অফিসে একটা গেঁয়ো চেহারার অপ্রতিভ মেয়ে যে কী ভাবে ফোন আলটপকা ঢুকে পড়ল সেটাই ভেবে পেল না ঋষি। তার এখন পিক আওয়ার। অবিরল ফোন আসছে। একটু বাদেই একজিকিটিভ মিটিং টপ বস-এর সঙ্গে। সমস্ত মন মগজ তৈরি রাখতে হচ্ছে। দেখে নিতে হচ্ছে দরকারি কাগজপত্র।

এমন সময়ে দরজা ঠেলে মেয়েটা ঘরে ঢুকল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল দরজার কাছেই। তাকাতে সাহস পেল না।

ঋষি অবাক। মেয়েটার পরনে একখানা তাঁতের খোলের শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। মুখে চোখে ভয়।

কী চাই?

মেয়েটা অতিশয় ঘাবড়ে গেছে। কথাই বলতে পারছে না। গলাও বোধ হয় শুকনো।

কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর ক্ষীণ স্বরে বলল ঋষি রায়।

কিন্তু আপনি এখানে এলেন কি করে! কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো ছিল না। ঋষি মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত। দরজায় একটি দারোয়ান থাকে। বোধ হয় সে আড্ডা মারতে গেছে। রিসেপশনও যে কেন আটকায়নি কে জানে!

কী দরকার বলুন তো!

মেয়েটাকে ফের বোবায় ধরেছে। কথা বলতে পারছে না। বগলে একটা সস্তা ভ্যানিটি ব্যাগ, হাতের মুঠোয় দলা পাকানো রুমাল। যেখানে ব্রেক কষেছে সেখান থেকে এক পা-ও এগোতে পারেনি।

ঋষি অপরিসীম বিরক্তির গলায় বলল, দেখুন, আমি ভীষণ ব্যস্ত। একটু পরেই জরুরি মিটিং। কোনও দরকার থাকলে আপনি অপয়েন্টমেন্ট করে আসবেন। এখন কথা বলার সময় নেই।

বোধ হয় এতক্ষণ চোখের পলকও ফেলেনি। এবার বিশাল দুই চোখ মেলে ঋষিকে দেখল মেয়েটা। খুবই ভীত চোখ। খুবই অপ্রস্তুত অবস্থা।

এবার কথাটা তার মগজে বোধ হয় ঢুকল। মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

পিছন ফিরে দরজাটা খোলার চেষ্টা করতে পারছিল না।

ঋষি টপ করে লাফিয়ে উঠল। চটপটে হাতে নব ঘুরিয়ে দরজাটা টেনে খুলে বলল আসুন।

তারা এবার খুব কাছাকাছি। নতমুখ তুলে ভীত চোখে আর একবার ঋষির দিকে তাকিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। একটা বন্য গন্ধ পেল ঋষি। রোদের গন্ধ। ঘামের গন্ধ। দরজা আপনা থেকেই লক হয়ে গেল।

ঋষি ফোন তুলে রিসেপশনকে ধমকাল, এইমাত্র একটা আনকলড ফর মেয়ে এসে কী করে ঢুকে পড়ল আমার চেম্বারে?

রিসেপশন সদুত্তর দিতে পারল না।

ঋষি ফোন রেখে দিল রাগের হাতে। তারপর জরুরি কাজে ডুবে গেল। মেয়েটার কথা তার মনে রইল না।

মনে পড়ল রাতে। ক্লাবে বিকেলের কিছুক্ষণ সুইমিং পুলে সাঁতার কেটে, কিছুক্ষণ বিলিয়ার্ড খেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে, কিছু লঘু আড্ডা মেরে যখন গাড়ি চালিয়ে নিজের কোয়ার্টারে ফিরছিল।

দুর্গাপুরের রাস্তাঘাট এ সময়ে নির্জন এবং ফাঁকা। ঋষি ফিরে আসছে তার ফাঁকা বাংলোয়। এখানে তার কেউ থাকে না। শুধু একজন রান্নার লোক। মা বাবা ভাই বোন কলকাতায়। তার সঙ্গে ঝুমরির বিয়ে হবে সামনের বছর। ঝুমরি যাদবপুরে ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং পড়ছে। শেষ বছর।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ কি কোনও বন্য গন্ধ পেল ঋষি? কে জানে কী। হঠাৎ মেয়েটার কথা মনে পড়ল। কী চেয়েছিল মেয়েটি?

গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে আলোকোজ্জ্বল ঘরে ঢুকে ঋষি পোশাক পাল্টাল। বাথরুমে গিয়ে স্নান করল। সারাদিন অসহনীয় গরম গেছে। এয়ার কন্ডিশনিং থেকে বেরোলে গরমটা বেশিই লাগে।

তার কাজের লোক পটেশ্বর বুড়ো মানুষ। খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে বলল, আজ আপনি অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর একটি মেয়ে এসেছিল।

কে মেয়ে?

নাম-টাম বলেনি।

কোথা থেকে এসেছিল?

অত কথা হয়নি। খোঁজ করেছিল, আমি বললুম, অফিসে গেছেন।

সাদা শাড়ি পরা?

হ্যাঁ।

ঋষি বিরক্ত হয়ে বলল, সে অফিসেও হানা দিয়েছিল। কী চায়! কে জানে।

চাকরি-বাকরিই চায় বোধ হয়। গরিব।

চাকরি কি হাতের মোয়া?

এইটুকু কথা হল। ঋষি খেয়ে উঠে যথারীতি পেপারব্যাক নিয়ে শুতে গেল। রাত বারোটায় আলো নিবিয়ে চোখ বুজল। এই সময়ে—অর্থাৎ রোজ ঘুমের আগে কয়েক মিনিট—সে ঝুমরির কথা চিন্তা করে। ঝুমরি শান্তশিষ্ট ভাল মেয়ে। ব্রিলিয়ান্ট। তবে ঝুমরি খুব কিছু সুন্দরী নয়। একটু আবেগহীন। বেশি ঠাণ্ডা। ঝুমরির সঙ্গে তার কোনও প্রেম—ট্রেম হয়নি। ঋষি পড়াশুনো কেরিয়ার নিয়ে এত ব্যস্ত যে তার সেই সময়ও ছিল না। ঝুমরিকে তার ভাবী স্ত্রী হিসেবে বেছে রেখেছিল তার বোন রেখা। ঝুমরি রেখার বান্ধবী। বাড়িতে ডেকে এনে দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। মা বাবারও অপছন্দ নয়। ঝুমরি বেশ বড়লোকের মেয়ে। অপছন্দের কিছু ছিল না।

মুশকিল হল, ঝুমরিকে ঘুমের আগে ঋষি রোজ ভাবে। ভেবে ভেবে তাকে বিছানায় তার পাশে কল্পিত স্ত্রীর মূর্তিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু মূর্তিটা আসবার আগেই তার ঘুম এসে যায়।

ঋষি খুব বাস্তববোধসম্পন্ন যুবা। কল্পনা নিয়ে তার কোনও কারবার নেই। ফলে অল্প বয়সেই সে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যেমন ভাল, তেমনি ভাল অফিস ম্যানেজমেন্টে। চোখা, চালাক, বলতে কইতে ওস্তাদ।

আজ ঝুমরিকে ভাবতে গিয়ে বিপত্তি হল।

ঝুমরি এল না। সাদা খোলের শাড়ি-পরা সেই করুণ মুখের মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল। কী চেয়েছিল মেয়েটি? চাকরি তো তাকে দিতে পারবে না ঋষি? আর পারলেই বা একটা উটকো মেয়েকে দিতে যাবেই

বা কেন?

শেষ অবধি আজ ঝুমরির বদলে উটকো একটা মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমোল সে। মেয়েটা বাড়িতে এসেছিল, তারপর অফিসে গিয়েছিল। এখান থেকে অফিসের দূরত্ব অনেক। মেয়েটা কি অতটা পথ হেঁটে গিয়েছিল? তাই হবে। বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। যাকগে।

অফিসের কাজে সাতদিনের জন্য জার্মানি যেতে হল ঋষিকে। যেতে হল দিল্লি। কলকাতাতেও ঢুঁ মারল কয়েকবার। মাস তিনেকের মধ্যে এত সব।

একদিন খুব ভোরবেলা অভ্যাসমতো উঠে ঋষি তার প্রাত্যহিক ব্যায়াম সেরে নিচ্ছিল। পরনে শর্টস, খালি গা।

পটেশ্বর এসে বলল, সেই মেয়েটি।

কে মেয়ে?

সেই যে একদিন এসেছিল।

এত সকালে! কী চায় জিজ্ঞেস করো তো!

বসতে বলেছি বাইরের ঘরে।

বসতে বলেছ! কেন? বসানোর কী আছে?

বিদেয় করে দেব?

জেনে নাও কী চায়। চাকরি চাইলে বলে দাও, কিছু হবে না।

আচ্ছা।

চলে যেতে যেতে পটেশ্বর ফিরে এসে বলল, মনে হয় অনেক দূর থেকে এসেছে। বড্ড কাহিল দেখাচ্ছিল বলে বসিয়েছি।

বুলওয়ার্কারটা রেখে তোয়ালে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে ঋষি বলল, তোমার দয়ার শরীর।

পটেশ্বর কী বুঝল কে জানে। চলে গেল। ঋষি স্নান করে একেবারে অফিসের পোশাক পরে নিল। তারপর বাইরের ঘরে এসে দেখল, সেই মেয়েটি বসে আছে। মুখখানায় অপরিসীম ক্লান্তি। আজও সাদা খোলের শাড়ি। মুখে ঘামতেল।

ঋষিকে দেখতে পায়নি। দরজার দিকে মুখ। আনমনা। ঋষি আড়াল থেকে দেখল।

ভোরের আলোয় মেয়েটিকে ভারী ভাল দেখাচ্ছে। সাজগোজ নেই, ক্লান্ত, তবু ভারী কমনীয় একটা শ্রী নজরে পড়ে যায়।

ঋষি ঘরে ঢুকে একটু শব্দ করল গলায়।

মেয়েটি চমকে উঠে দাঁড়াল।

কী চাই বলুন তো!

মেয়েটিকে আবার বোবায় ধরল। বড় বড় নিষ্পলক ভীতু চোখে চেয়ে রইল অভিভূতের মতো।

আমার হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই।

মেয়েটি কয়েকবারের চেষ্টায় ক্ষীণ স্বরে বলল, আমি একটা দরকারে এসেছিলাম।

কিসের দরকার বলুন। চাকরি-টাকরি চাইলে কিন্তু কিছু করা সম্ভব নয়।

মেয়েটি হতাশ দৃষ্টিতে একটু চেয়ে থেকে মাথা নত করে ফেলল। তারপর ক্ষীণতর কণ্ঠে বলল, চাকরি নয়।

তাহলে?

মেয়েটি আর একবার তাকাল। ভীতু চোখে কিছু একটা পড়ে নিল ঋষির মুখে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আজ থাক। আপনার তো সময় নেই।

তেমন জরুরি দরকার থাকলে কয়েক মিনিট—

মেয়েটি জবাব দিল না। কাঁপা হাতে চেয়ার থেকে তার ব্যাগটি কুড়িয়ে নিয়ে বলল, আসি।

কিন্তু এসেছিলেন কেন সেটাই তো বললেন না।

মেয়েটি অস্ফুট স্বরে শুধু বলল, আজ থাক।

ঋষি বিরক্ত হল। মেয়েটি ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল।

সারাদিন ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে কেটে গেল ঋষির। মেয়েটির কথা মনেও পড়ল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাতে শোওয়ার সময় ঠিক মনে পড়ল। ঝুমরি নয়, মেয়েটি। ঋষির শ্বাস গাঢ় হল। কেমন গরম লাগল শরীরে। ভাল ঘুম হল না।

সকালে ব্রেকফাস্টে বসে পটেশ্বরকে জিজ্ঞেস করল, মেয়েটার নাম জেনে নিয়েছিলে?

কী একটা বলেছিল যেন। রাণু বোধহয়। কী চায় বলল না তো!

সে যাকগে।

যাকগে কেন?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওরা পাঁচ মাইল দূরে এক গাঁয়ে থাকে। ওর বাবা একসময় কলকাতার কোন স্কুলে পড়াত, সে সময়ে আপনি তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি এখন মৃত্যুশয্যায়, আপনাকে একবার দেখবেন বলে খবর পাঠিয়েছিলেন।

কী নাম তাঁর?

জিজ্ঞেস করিনি। করে লাভ কী? আপনার সময় কোথায় যে যাবেন! বরং নামটা শুনলে হয়তো মনে মনে ছটফট করবেন। দরকার কী!

কথাটা যুক্তিযুক্ত। সে কলকাতার তিনটে স্কুলে পড়েছে। প্রথমবার একটা বাজে স্কুলে, পরে ভাল এবং তারপর আরও ভাল স্কুলে অনেক মাস্টার তাকে পড়িয়েছে। ওসব নাম মনে রেখে লাভ কী?

পটেশ্বর ফের বলল, শুধু দেখতে চাইছেন নাও হতে পারে। সাহায্যও চাইতে পারেন, চাকরিও চাইতে পারেন মেয়ের জন্য ঋষি উঠে গেল।

বছরখানেক বাদে ঋষি মেয়েটিকে আরেকবার দেখল। চমকে উঠল আপাদমস্তক। তার সমান র‍্যাঙ্কের একজন অফিসারের রিসেপশনে গিয়ে ঘটনাটা ঘটল। কোনে বসা মেয়েটি। কী দারুণ দেখাচ্ছে ঝলমলে! চোখে চোখ পড়তেই স্থবির হয়ে গেল ঋষি। ঝুমরি তাকে সচেতন করে দিল কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে, বলল, ওরকম রিজিড হয়ে গেলে কেন? ঋষি কিছু বলতে পারল না।

তারপর দেখা হতে লাগল, ক্লাবে, পার্টিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। দেখা তো হবেই।

শুনুন, আপনি...আপনি কে বলুন তো। সেই যে এসেছিলেন আমার কাছে...

রাণু মিষ্টি করে হেসে বলে, শুনে আর কী করবেন বলুন। যা হয়ে গেছে, গেছে।

আপনার বাবার নাম?

জেনে লাভ নেই। আপনার মনে পড়বে না। ভিতরে ভিতরে ভারী ছটফট করে ঋষি। চঞ্চল হয়।

রাত্রিবেলাই হয় বিপদ। পাশে ঝুমরি কিন্তু তার রাণুকে মনে পড়ে। কেন যে পড়ে! সবচেয়ে বেশি অপমান লাগে, তাকে উচ্চশ্রেণীর, ব্যস্ত ঝাঁ-চকচকে সামাজে রাণু—গেঁয়ো ভীতু মেয়েটা কোন ফাঁকে ঢুকে পড়ল বলে। রাণুর চোখে সব ফাঁকি ধরা পড়ে যাচ্ছে।

ঋষি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর সব ধরনের জ্বালা নিয়ে ঝুমরিকে প্রাণপণে ধরে। ঝুমরি সেটাকে ভালোবাসার প্রকাশ মনে করে ককিয়ে ওঠে, ছাড়ো ছাড়ো, দম বন্ধ হয়ে আসছে—।

আনন্দ

বসন্ত রায় ছিলেন সাদামাটা গেরস্ত মানুষ। বড় কোম্পানীর অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সিনিয়ার কেরাণী। মাইনে দেড় হাজারের মতো। তার ওপর ওভারটাইম, বোনাস, ভালই ছিলেন বলা যায়। চাকরীঅন্ত প্রাণ। কখনো কখনো, মাসে দু-একবার একটু আধটু হুইস্কি খেতে যেতেন বার-এ। অবসর সময়ে রেডিও বা রেকর্ড প্লেয়ারে একটু আধুনিক বা রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনতে ভালবাসতেন। খবরের কাগজ পড়াটা ছিল নেশার মতো। নিজের হাতে বাজার করতে ভালবাসতেন। ছেলেমেয়েদের খুব যত্ন নিয়ে পড়াতে বসতেন। মাঝে মধ্যে হিসেব করতে বসতেন যে আরো পনেরো বছর চাকরির পর তিনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি নিয়ে কত পাবেন। কিংবা দুটো জীবনবীমার পলিসি থেকেই বা কত আসবে। হিসেবে তাঁর মাথা পাকা। হিসেব করে টাকার যে অঙ্কটা পেতেন সেটা খুবই ভাল। বাকি জীবনটা চিন্তার কোনো কারণ নেই। তাঁর স্ত্রীও খুব হিসেবী, এবং সংসারের পাকা গৃহিণী। সুতরাং জীবনটা তাঁর কাছে কখনো কখনো কুসুমাস্তীর্ণ বলে মনে হত। নিজের অবস্থায় কেউ সুখী নয়। এই আপ্তবাক্যটা তাঁর কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হত। সুখী নয় কেন? এই তো তিনি, তিনি বেশ সুখী। বড় কেরাণী থেকে অফিসার হওয়ার কোনো বাসনাই তাঁর ছিল না। কারণ বড় প্রাইভেট কোম্পানীগুলোর অফিসাররাই হচ্ছে বলির পাঁঠা। তাদের বড় কর্ত্তারা হুড়ো দেয়, কেরাণীরা মানে না। এই সব প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে সুখী চাকরি বড় কেরাণীর আর ডাইরেক্টারদের। কাজেই অফিসারের প্রমোশনের বাঞ্ছা বসন্ত রায়ের নেই। সেদিক দিয়ে তিনি সুখী! ছোটোখাটো কিছু চাহিদা, সামান্য কিছু অভাববোধ যে ছিল না তা নয়। তবু তেমন কোনো তীক্ষ্ন যন্ত্রণা বা তীব্র সমস্যা ছিল না। তিনি সুখীই ছিলেন, তুলনামূলকভাবে।

সপ্তাহে দুটো ছুটির দিন, শনি আর রবি। এই দুদিন নানাভাবে কাজে লাগে। বিশেষ ঋতুতে মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রকৃতি দেখাতে ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং বা ব্যাণ্ডেলে চলে যান। কলকাতার পাষাণপুরীতে ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির অভাবে না দরকচা মেরে যায়, সেই ভয়ে।

এইরকমই একদিন প্রকৃতি দেখতে গিয়েছিলেন ঢেলকো গাঁয়ে। গড়িয়া রেলস্টশন থেকে কিছু পূবদিকে, ছেলেবেলার বন্ধু অম্বুনাথ সেখানে বাড়ি করেছে। বাড়ি বলতে অবশ্য কিছুই না। অম্বুনাথ দা পোতা প্রাইমারী স্কুলের হেডমাষ্টার, বাঁশের বেড়া, মাটি, কিছু ইঁট গেঁথে জগাখিচুড়ি রকমের গোটা দুই ঘর তুলেছে, ওপরে টিন একটু উঠোন আছে। উঠোনের পাশে একটু বাগান মতো। অম্বুনাথ এবং তার পরিবারের সকলেরই চেহারায় একটু গেঁয়ো ভাব।

উঠোনে দুই বন্ধু মোড়া পেতে বসে গল্প করছিলেন। মাথার ওপর একটা নারকেলদড়ির জাল চালির মতো ঝুলছে তাতে লাউডগা লতিয়ে গেছে। ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে আলো চিকরি হানছে। ভারী সুন্দর পরিবেশ। ছেলেমেয়েরা অম্বুনাথের বাচ্চাদের সঙ্গে মিশে খেলা-টেলা করছে। অম্বুনাথের বৌ ঘোমটা টেনে মুড়ির বাটি আর চা দিয়ে গেল।

অম্বুনাথ হঠাৎ বললেন—বসন্ত আমি বড় সুখে আছি হে।

বসন্ত একটু অবাক হল। সুখ! চারদিকে চেয়ে তিনি অম্বুনাথের সুখের কোনো হদিশ পান না। তাছাড়া এধরণের কথা আজকাল কারো মুখে শোনাও যায়না বড় একটা।

তিনি অবাক হয়ে বলেন—কীরকম?

রোগা এবং ট্যারা অম্বুনাথ তার তেড়াবেঁড়া বড় দাঁত বের করে হাসেন। বলেন—কীরকম- টীরকম জানিনা। তবে মনে হয়, বেশ আছি।

গেঁয়ো স্বভাবের অম্বুনাথ রহস্য করার মানুষ নয়। বসন্ত এক চিমটি মুড়ি মুখে দিয়ে এক চুমুক চা খেয়ে বলেন—সুখ।

—সুখ। মাঝে মাঝে মাঝরাতে উঠে এত আনন্দ হয় যে নাচতে ইচ্ছে করে। দিনমানেও বড় সুখ টের পাই। ভাবি, চারদিকে অবস্থা তো দিনকে দিন খারাপই হচ্ছে, তো আমার এই ভুতুড়ে সুখটা আসছে কোত্থেকে।

বসন্ত চিন্তান্বিত মুখে বলেন—লটারী-টটারী পেয়েছ নাকি?

—দূর! ওসব, নয়, এর মধ্যে পারত্রিকতা নেই। এটা অন্য জায়গা থেকে আসে।

—কোত্থেকে?

—সেটাই তো ভাবি। ইস্কুলটা চলছে না, সরকারী টাকা আটকে আছে বহুকাল, চালের দর উঠি-উঠি করছে, নগদ পয়সা নেই যে আকালের জন্য কিছু ধরে রাখব, চারদিকে কেমন দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ গন্ধ ছাড়ছে, তার মানে আমার সুখে থাকার কথা নয়। তবু সব কিছু চাপা দিয়ে কোত্থেকে যে সুখটা আসছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ভূতে পেল নাকি?

—আরো খোলসা করে বলো। সুখ যখন হচ্ছে তখন কারণও একটা আছেই।

—তা আছে বোধ হয়। তা সে তোমার গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সার সুখ নয়। অন্যরকম। নইলে আমার সুখের কি আছে বলো। তবু আনন্দটা আসে ঠিক ঝড় বাতাস বা বাদলার মতো, আমার ভিতসুদ্ধ নাড়িয়ে দেয়। আমার আর কিছু চাওয়ার থাকে না।

—বটে?

—বুঝলে বসন্ত, আজকার ঘরে থাকতে ইচ্ছে হয় না। অবসর পেলেই মাঠে-ঘাটে চলে যাই, গাঁ-গঞ্জে ঘুরি, মানুষের শব্দ পেলেই বসে যাই আলাপ-সালাপ করতে। চারদিকে পৃথিবীটা যেন বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে। মানুষজন যেন বা সব আত্মীয়ের মতো হয়ে উঠেছে। কাউকে শত্রু বলে, পর বলে মনে হয় না। একটা আকাল আসছে জানি, তবু মনে হয় দুনিয়ার মাটি খামচে ধরে ঠিক টিকে যাবো। ভয় নেই।

বসন্ত রায় একটা শ্বাস ছেড়ে বলেন—এ তো হল তত্ত্বকথা। মানুষজনকে আপন করা, নিজের দুঃখকে পাত্তা না দেওয়া। তত্ত্বকথা তো ভাল জিনিস।

—আরো আছে। বুঝলে। সে কথা থাক। এখনকার যা অবস্থা তাতে আমাদের ডুবজল, পায়ে পাথর বাঁধা। বোঝোই তো। তবু কিন্তু ঐ আনন্দটা লেগে আছে পেছনে। তাই বলি, এ লক্ষণ হয়তো ভাল, আবার ভাল নয়। পাগল-টাগল হয়ে যাবো নাকি!

বসন্ত রায় মাথা নেড়ে বলেন—আরে না। তবে একটু ডাক্তার কবরেজ দেখিও। আর কথাটা পাঁচকান কোরো না।

অম্বুনাথ মাথা নাড়েন। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে হঠাৎ ফিক ফিক করে হাসতে থাকেন আপনমনে।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফেরার পথে ভারী চিন্তায় পড়েন বসন্ত রায়। অম্বুনাথের আনন্দটা ঠিক বুঝতে পারেন না তিনি। এ বড় অবাক কাণ্ড, দুঃখের কারণ বিদ্যমান থাকতেও একজন কোন চোরাচালানের রাস্তায় এক বিদেশী আনন্দ আমদানী করছে।

অম্বুনাথ পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো। এরকম ভেবে বসন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। আবার তাঁর নিজের জন্য এরকম দুঃখ হতে থাকে। অম্বুনাথের ঐ চোরাই আনন্দটা তিনি নিজে কোনদিন পাবেন না বলে।

টুলটুলের দুঃখ

নিজেদের ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসেছিল টুলটুল। তার আজ মন খারাপ। তার মা বাবা বেড়াতে গেছে, তাকে নিয়ে যায়নি।

টুলটুলদের বাড়িটাকে বলা যায় আকাশবাড়ি। পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে মাধ্যাকর্ষণ যেখানে কম সেইখানে তাদের ভাসমান কাচতন্তুর বাসা। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে সমান তালে ঘুরছে বলে সেটাকে স্থির বলে মনে হয়। এই বাড়িটা টুলটুলের ভালই লাগে! তবে এত উঁচুতে জানালায় পাখি আসে না, মেঘ আসে না, প্রজাপতি আসে না। আর এখান থেকে আকাশটাকে কালো মিশমিশে দেখায়। নক্ষত্রগুলো ভীষণ উজ্জ্বল, চাঁদ সূর্যের আলো বহুগুণ বেশী।

আর কেউ না আসুক, জানালার ফেরিওলারা আসবেই। এ তো আর পৃথিবীর বাড়ির মতো খোলামেলা বাড়ি নয়। তাই জানালার পাল্লা খোলার উপায় নেই। আবহের সঠিক চাপ বজায় রাখতে গোটা বাড়িটাই সীল করা, কোথাও কোনো রন্ধ্র নেই। শুধু কাচের ভিতর দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। ফেরিওয়ালা আসে আকাশি ভেলায় চড়ে। মস্ত মস্ত বুদ্বুদের মতো তাদের আকাশ-যান। বাইরে থেকে তারা বেতার সংকেত পাঠায়, ও খুকি, আইসক্রীম নেবে? ও খুকি, ঝালমুড়ি আছে। বেলুন চাই বেলুন! কাচের চুড়ি!

না, টুলটুলের আজ কিছুই চাই না। মন খারাপ। মা বাবার সঙ্গে তারও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল বুধ গ্রহের মাটির নীচেকার নিউ মার্কেটে। এ বাজারটা সে কখনো দেখেনি। সেখানে নাকি অদ্ভুত সব খেলনার দোকান আছে। কিন্তু মাস্টারমশাই আসবেন বলে মা বাবা তাকে নেয়নি।

বিকেল পাঁচটা বাজতেই বৈঠকখানায় একটা অ্যালার্ম বাজল। রান্নাঘরে একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মানুষ বা রোবো অ্যালার্ম শুনেই ফ্রিজ খুলে দুধের ডেকচিটা বের করে সৌরচুল্লিতে বসিয়ে দিয়ে ডাক দিল, টুলটুল বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসো। তোমার টিফিন খাওয়ার সময় হয়েছে।

টুলটুল বিরক্ত হয়ে উঠল। বাথরুম থেকে এসে খাবার টেবিলে বসতেই চাকাওলা রোবো এসে তার সামনে দুধের গ্লাশ আর বিস্কুটের প্লেট রেখে চলে গেল।

খাওয়া শেষ হতেই আর একটা যন্ত্র মানুষ বলে উঠল, এবার ড্রিল। চলে এসো জিমনাশিয়ামে।

টুলটুল জানে অবাধ্য হয়ে লাভ নেই। জিমনাশিয়ামে রোবো তাকে নানারকম ব্যায়াম করাল আধঘণ্টা ধরে।

ব্যায়ামের পর আর একজন রোবো গ্যারাজ খুলে ডাকল, এসো টুলটুল, বেড়িয়ে আসি।

গ্যারাজঘরে নানারকম আকাশ-যান। টুলটুলের যানটা টুকটুকে লাল একটা নৌকো। তাতে কাচতন্তুর ছই লাগানো। নৌকোটা ভারী ভাল, দুলুনী নেই, জোরে ছোটে না। টুলটুল আর রোবো নৌকোয় উঠে পড়ল। একটা চাপ নিয়ন্ত্রিত গলির ভিতর দিয়ে নৌকোটা হুশ করে বেরিয়ে এল বাইরে।

টুলটুল বায়না করল, চলো না চন্দ্রমাধবদা, একটু পৃথিবী থেকে বেড়িয়ে আসি।

এক এক রোবোর এক এক নাম দেওয়া আছে। চন্দ্রমাধব রোবো গম্ভীর গলায় বলল, পৃথিবী ভীষণ নোংরা। তাছাড়া খুব ফ্লু হচ্ছে।

আমার যে দিদিমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

সে তো ফটো টেলিফোনেই দেখে নিতে পার।

আহা, ফটোতে বুঝি দিদিমা আমাকে কোলে নিতে পারে?

কী করব বল, তোমার মা-বাবার বারণ, এখন দিন পাঁচেক তুমি পৃথিবীতে যাবে না।

টুলটুল গোঁজ হয়ে বসে রইল। নৌকোটা অনেকটা নেমে এসেছে। পৃথিবীর কাছাকাছি সোনালী মেঘ ভাসছে। তার ভিতর দিয়ে নৌকোটা ভেসে চলল। আরও নামলে দেখা মিলল পাখিদের। গাছপালা, নদী সবই দেখতে পায় টুলটুল। কিন্তু মাটিতে পা রাখার উপায় নেই।

চন্দ্রমাধব ঘড়ি দেখে বলল, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ফিরে চলো, মাস্টারমশাইয়ের আসবার সময় হল।

মাস্টারমশাই বুড়ো মানুষ, রোজ পৃথিবী থেকে একটা লজঝড়ে সেকেলে ভারটিকাল এরোপ্লেনের মতো আকাশগাড়িতে আসেন। মাস্টারমশাইকে অবশ্য খারাপ লাগে না টুলটুলের।

ঠিক সাড়ে ছটায় মাস্টারমশাই এসে গেলেন। গায়ে গলাবন্ধ কোট, কমফরটার, বাঁদুরে টুপি। টুলটুল অবাক হয়ে বলল, এত পোশাক পরেছেন কেন মাস্টারমশাই?

মাস্টারমশাই বললেন, ওঃ, পৃথিবীতে এবার ভারী শীত পড়েছে। কলকাতায় আজ বিকেলে দু ইঞ্চি বরফ পড়ল।

ভারী হিংসে হল টুলটুলের, তারা যে কৃত্রিম আবহাওয়ায় বাস করে তাতে শীত বা গ্রীষ্ম টের পাওয়ার উপায় নেই। পৃথিবীতে থাকলে কী মজাটাই না হত!

মাস্টারমশাই কোট কমফরটার টুপি খুলে পড়াতে বসলেন। খানিক পড়িয়েই বললেন, আজ যেন তোমার পড়ায় মন নেই টুলটুল!

একদম ভাল লাগছে না।

কেন বলো তো! তোমার কি বন্ধু নেই?

আছে। তারা সব যন্ত্র বন্ধু। আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে ওই যে সবুজ বাড়িটা ভাসছে, ওখানে। কিন্তু ওরা বড় একঘেয়ে। আমি যা বলি তাই করে। এরকম কি ভাল লাগে বলুন!

তা তো বটেই, বলে বুড়ো মাস্টারমশাই একটু ভাবিত হলেন। তারপর উসখুশ করতে লাগলেন, এক গাল হেসে হঠাৎ বললেন, তুমি কুকুরছানা ভালবাসো?

কুকুরছানা? ওঃ আমি কুকুরছানার ছবি দেখেছি, সত্যিকারের দেখিনি।

মাস্টারমশাই চারদিকে চেয়ে রোবো গুলোকে দেখে নিলেন। ওরা ভারী নজরদার, ঘরে যা হয় না হয় সব রেকর্ড করে রাখে। মাস্টারমশাই উঠে গিয়ে রোবোদের কনট্রোল সুইচটা অফ করে দিয়ে বললেন, আমার আকাশগাড়িতে একটা কুকুরছানা আছে, দাঁড়াও, নিয়ে আসি।

কুকুরছানা দেখে টুলটুল তো অবাক। কী সুন্দর সত্যিকারের জীব! ভেউ ভেউ করে ডাকে, লেজ নাড়ে, দৌড়োয়। আদর করলে গা চেটে দেয়!

টুলটুল কুকুরছানা বুকে করে আনন্দে কেঁদে ফেলে আর কি! সে বলল মাস্টারমশাই আজ আমি পড়ব না।

মাস্টারমশাই গলা খাটো করে বলেন, না না, আজ পড়ার দরকার নেই, ওটাকে নিয়ে একটু খেলা কর। আর শোনো, রোজ আমি ওটাকে নিয়ে আসব, তুমি চুপি চুপি একটু করে ওর সঙ্গে খেলবে, কেমন?

টুলটুল কুকুরছানাটাকে বুকে নিয়ে হেসে মাথা নাড়ল।
না, টুলটুলের মন আর খারাপ রইল না।

বটকেষ্ট

চাটাইয়ে শুয়ে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে দুপুরবেলা বটকেষ্ট তার মাকে বলল, বাবা যে কেন এই জঙ্গলে বাড়ি করতে গেল তা আজও বুঝলাম না। সারাদিনে একটা লোকের মুখ দেখা যায় না।

বটকেষ্টর মা দুপুরের এঁটোপাত কুড়িয়ে কচুগাছের তলায় যত্ন করে ফেলে দিচ্ছিলেন। দুটো শিয়াল আর একটা নেড়ী কুকুর বসে আছে, তারাই খাবে। তিনি বললেন, তার বুদ্ধিসুদ্ধিই ছিল অন্যরকম, গাছপালা খুব ভালবাসত। কিন্তু তা বলে তখন এই জায়গাটা এমন পতিত হয়নি। তখন গাঁ ছিল লোকজন ছিল।

বটকেষ্ট চাটাইয়ে শুয়েই দেখতে পেল একটা মস্ত গোখরো সাপ মেটে হাঁড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে একটা ইঁদুরের গর্তে সেঁদোল। বটকেষ্ট একটু মুখে বেঁকাল। এ তার বাবাকেলে সাপ। এ বাড়িতে আরও অনেককটা আছে। প্রায় সবাই বটকেষ্টর চেনা। সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায় সারাদিন। ভয়ের কিছু নেই। বটকেষ্ট বলল, গাঁ উঠে গেল, কিন্তু আমরা পড়ে রইলাম। কাজটা কি ভাল হল?

তার মা আঁচিয়ে এসে এক কোঁচড় মুড়ি নিয়ে রাজ্যের কাককে খাওয়াতে খাওয়াতে বলেন, তা আর কী করবি বাবা! আমরা গরীব মানুষ, হুট বলতে কি অন্য জায়গায় গিয়ে উঠতে পারি।

বটকেষ্ট ঠাট্টা করে বলে, তা তুমি থাকবে তো থাকো। আমি গিয়ে বরং আমার বড়লোক শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই থাকি।

মা জানেন, এ ঠাট্টার কথা। মাকে ছেড়ে বটকেষ্ট কোথাও যাবে না। তবু তিনি বললেন, তা থাকবি যা না। কে তোকে বেঁধে রেখেছে?

বটকেষ্ট ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে বলে, তাই যাওয়া উচিত। এই জঙ্গলে তারা মেয়ে পাঠাতে চায় না। আমরা আধা বাঘ হাতি সাপ নিয়ে বাস করি, সেখানে মেয়ে পাঠাতে না চাইলে দোষ দেওয়া যায়?

তা বটে, বলে মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। সেই ছেলেবেলায় বটকেষ্টর বাল্যবিবাহ হয়েছিল। সেই বউ এখন কত বড় হয়েছে, কিন্তু একবারও এ বাড়িতে আসেনি। বটকেষ্টও যায়নি। কাক খাওয়ানো হলে তিনি আলাদা করে রাখা কয়েকটা ছোটো মাছের মুড়ো একটা বাটিতে করে কুয়োতলায় রেখে ডাক দিলেন, আয়রে কদমছুট। অমনি একটা নেকড়ে বাঘ বনবাদাড় ভেঙে ধেয়ে এল। কপকপ করে মাছের মুড়ো ক'টা খেয়েই হাওয়া। মা বললেন, জঙ্গল বলেই কি খারাপ। কাউকে হিংসে না করলে কেউ হিংসা করে না। দেখ তো, এরা সব আমার কেমন বন্ধু।

বটকেষ্ট ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটা কাঠবেড়ালি এসে তার কানে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। রোজই দেয়।

হঠাৎ বাইরে কার গলা পাওয়া গেল, বাড়িতে কে আছেন? বাড়িতে কে আছেন?

ধড়মড়িয়ে ওঠে বটকেষ্ট। এখানে কে আসবে? জঙ্গলে পতিত জায়গা, জনমনিষ্যি নেই। চারদিকে নানারকম ভয় ভীতির ব্যাপার। কে? কে? বলে বটকেষ্ট বেরিয়ে আসে।

বাড়ির চারধারে আগে রাংচিতার বেড়া ছিল। ফটক ছিল। সে সব কবে হাপিস হয়েছে। ছাড়া-বাড়ির মতো অবস্থা। বুক সমান ঘাস আর আগাছার জঙ্গল। তার ওপাশে একটা রাস্তা। সেই রাস্তায় একজন আধবুড়ো

লোক দাঁড়িয়ে, সঙ্গে জনা দুই পাইক।

বটকেষ্ট এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কাকে খুঁজছেন?

এটা কি বটকেষ্ট বাবুর ভদ্রাসন?

আজ্ঞে তাই বটে।

আমরা আসছি সোনার গাঁ থেকে। বীরভদ্র চৌধুরীর আমি হলাম নায়েব।

বটকেষ্ট অবাক হয়। বীরভদ্র চৌধুরী তারই শ্বশুর। সে বলল, তা খবর টবর কী?

আমরা অগ্রদূত আজ্ঞে। তেনারা সব আসছেন। বিকেলের মধ্যেই এসে পড়বেন।

বটকেষ্ট একটা বড় করে শ্বাস ছেড়ে বলল, তা আসুন আপনারা, ঘরে আসুন।

নায়েব আর পাইক দুজন চারিদিকে চায় আর অবাক মানে। এখানে মানুষ থাকে? ও বাবা! ওটা কী, সাপ নাকি? সাপই। যেমন তেমন সাপও নয়। কেউটে। নায়েব তিড়িং করে 'বাবাগো' বলে লাফিয়ে ওঠে, পাইক দুজন বল্লম তোলে। বটকেষ্ট হাত তুলে বলে, মেরো না বাপু, ও আমাদের পোষা সাপ। কামড়ায় না।

দেখার আরো বাকি ছিল। শেয়াল নেকড়ে, হায়না, কী নেই এখানে? নায়েব তারস্বরে বীজমন্ত্র জপ করতে থাকে, পাইক দুজন সভয়ে বসে থাকে, বটকেষ্টর বুড়ি মা অবেলায় রান্না করে খেতে দিলেন বটে, কিন্তু অতিথিরা ভাল খেতে পারল না।

বিকেলের মধ্যেই হুমহাম শব্দে পালকি এসে হাজির। পাইক বরকন্দাজ মেলা তার সঙ্গে। চুনোট ধুতি গরদের পাঞ্জাবি আর পাকানো চাদর গলায় বীরভদ্রবাবু পালকি থেকে নামলেন। চারদিকে চেয়ে নাক কুঁচকে বললেন, বাবা বটকেষ্ট, এখানে থেকে যে বেঁচে বর্তে আছো এইটেই আশ্চর্য।

বটকেষ্ট প্রণাম করে বলে, আপনাদের আশীর্বাদ।

ওসব কথা ছাড়ো বাবা। আসল কথা এবার আমি তোমাকে সত্যিই নিয়ে যেতে এসেছি। আপত্তি শুনব না।

বটকেষ্ট অবাক হয়ে বলে, মাকে রেখে আমি কোথাও যাবো না।

তোমার মাকেও নিয়ে যাবো।

মা স্বামীর ভিটে ছেড়ে যাবেন না।

বীরভদ্র গম্ভীর হয়ে বললেন, নিজের আখের যারা বোঝে না তাদের ওপর বলপ্রয়োগই ধর্ম। শোনো বাবা বটকেষ্ট, যদি যেতে না চাও তবে এই মৃত্যুপুরী থেকে তোমাদের জোর করেই নিয়ে যেতে হবে।

বটকেষ্ট সভয় বলে, না-না, ও কাজ করবেন না।

কিন্তু বীরভদ্রবাবু শুনলেন না, তাঁর ইঙ্গিতে পাইক বরকন্দাজরা চোখের পলকে বটকেষ্টকে ঝাপটে ধরে একটা ঢাকা পালকিতে তুলল, দাসীরা গিয়ে তার মাকে তুলে ফেলল একটা ডুলিতে। বীরভদ্রবাবু গোঁফে একটু তা দিয়ে হাসলেন। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

কিন্তু ডুলি আর পালকি কাঁধে তোলার আগেই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল। কোথাও কিছু না, শান্ত পরিবেশ। হঠাৎ সেই শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশকে ফালা ফালা করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল শেয়াল, অট্টহাসি হেসে উঠল হায়না, নেকড়ে হিংস্র শব্দে তেড়ে এল। চারদিকে লকলকিয়ে উঠে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল হাজার গণ্ডা সাপ। পাখিরা তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। তারপরই ধুন্ধুমার কাণ্ড।

পাইক বরকন্দাজরা ছত্রভঙ্গ। কয়েকজন সাপের বিষে মাটিতে ছটফট করছে পড়ে। নেকড়ের পাল এসে কয়েকজনের ঠ্যাঙে দাঁতের গভীর দাগ বসিয়ে দিয়েছে। পাখির ঠোককরে কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে কারো। শেয়ালের ধাওয়া খেয়ে ছুটে পালিয়েছে কেউ। বীরভদ্রবাবু পড়ে আছেন, তার বুকের ওপর থাবা গেড়ে একটা নেকড়ে গরগর করছে। বীরভদ্রবাবু মৃত্যুর আগে ইষ্টনাম স্মরণ করছেন।

পালকি থেকে শান্তমুখে নেমে আসে বটকেষ্ট। নেকড়েটাকে যা বলতেই সে সরে যায়। বীরভদ্র উঠে বসে কেঁদে ফেলেন, আমার এতগুলো লোক সাপের কামড়ে শেষ হয়ে গেল; নেকড়ের কামড়ে মরে গেল।

বটকেষ্ট বলে, চিন্তা করবেন না, মা সব ওষুধ জানেন। কেউ মরবে না। আপনি সবাইকে নিয়েই ফিরে যেতে পারবেন।

বীরভদ্রবাবু জামাইয়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে একটা গভীর শ্বাস ফেলে বললেন, বড় ভুল হয়েছিল বাবা। যে প্রকৃতিকে শাসন করতে পারে সে বড় সোজা লোক নয়। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এবার হাতজোড় করে বলছি, আমার মেয়েকে তোমার এখানে স্থান দাও। তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছি, কিন্তু এখানে সে আরো বড় শিক্ষা পাবে।

বটকেষ্ট বলল, যে আজ্ঞে।

রাম ও হরি

রাম আর হরি দুইজনে একটা নতুন গাঁ পত্তন করতে এক মস্ত মাঠের দু-ধারে বাড়ি বানাল। আস্তে আস্তে জ্ঞাতিগুষ্ঠি বেড়ে আপনা থেকেই গাঁ তৈরি হবে।

বসবাস শুরু করতেই প্রথম দিন রামের বাড়িতে চোর ঢুকে বাসনপত্র নিয়ে গেল। পরদিন হরির বাড়িতে ঢুকে নিয়ে গেল কাপড়-চোপড়।

তৃতীয় দিন সকালে দাঁতন করতে দু'জনে বেরিয়েছে। মাঠের মাঝখানে দেখা।

রাম বলল, আর বোলো না হে, পরশু রাতে চোর ঢুকে বাসনপত্র সব নিয়ে গেছে।

হরি বেজার মুখে বলে, আমারও কাল রাতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে। কাপড়-চোপড় আর কিছু রেখে যায়নি।

তাহলে তো সাবধান হতে হয়।

হ্যাঁ, তা তো বটেই।

দু পক্ষই দরজা জানালা আরো মজবুত করল, রাতে উঠে ঘন ঘন তামাক খেতে লাগল। লাঠি ঠুকে, কেশে, খড়ম পায়ে হেঁটে জানান দিতে লাগল, জেগে আছি হে চোরের পো।

আবার একদিন সকালে উঠে পুকুরঘাটে গিয়ে রাম দেখে, কাকচক্ষু জলে যে মাছগুলো ঘোরাফেরা করত সেগুলো সংখ্যায় কম কম ঠেকছে। রাতে কেউ জাল ফেলে বড় মাছগুলো ধরে নিয়ে গেছে।

ওদিকে হরির তিনটে নারকোল গাছ ফাঁক করে সত্তর আশিটা নারকোল বেপাত্তা।

মাঠের মাঝে দাঁতন করতে এসে দুই বন্ধুর দেখা।

পুকুরে মাছ নেই হে।

আমার গাছেও নারকোল নেই।

বড়ই মুশকিলে পড়া গেল।

বড়ই মুশকিল।

কি করা যায় বলো তো!

তুমিই বলো, আমি ভেবে পাচ্ছি না।

রামের ছাগলছানাটা মাঠে খাস খেতে গিয়ে আর ফিরল না। ওদিকে পরদিন হরির চারটে মুরগী চুরি গেল।

রাম গাছ থেকে লাউ আর পুকুর থেকে একটা মাছ তুলে মাথায় গামছা বেঁধে চলল থানায় নালিশ ঠুকতে, লাউ আর মাছ দারোগাবাবুর ভেট।

ওদিকে হরি গোটাকয় নারকোল আর ডজনখানেক ডিম নিয়ে একই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে।

থানা অনেক দূরের রাস্তা। মাঝপথে জিরিয়ে নিতে রাম একটা গাছতলায় বসে কোঁচার খুটে বাঁধা চিঁড়েগুড় খেয়ে একটু ঠেস দিয়ে চোখ বুজল।

হরিও খানিক তফাতে আর এক গাছতলায় বসে মুড়ি বাতাসা খেয়ে চোখ বুজেছে।

কেউ কারো খবর জানে না।

একটু বাদে রাম চোখ খুলে দেখে তার লাউ আর মাছ নেই। বোধহয় একটা গাছে আর একটা পুকুরে ফিরে গেছে।

জেগে উঠে হরিরও মাথায় হাত। কোথায় নারকোল, কোথাই বা ডিম?

আঁতিপাতি করে খুঁজতে গিয়ে দুজনের সঙ্গে দুজনের ফের মুখোমুখি।

রাম যে!

হরি যে!

কী খবর?

আর কি খবর। যাচ্ছিলাম থানায়, নালিশ ঠুকতে। তুমি কোনদিকে?

আমিও ঐদিকেই যাচ্ছিলাম যে! আমারও নালিশ!

রাম চোখ মিটমিট করে হরির হাতের দিকে চেয়ে বলে, বাঃ দিব্যি লাউটা তো! নধর, কচি! মাছটাও খাসা! বেশ, বেশ।

হরিও একগাল হেসে বলে, তোমার নারকেলগুলো বেশ ঝুনো দেখছি। ডিমগুলোও বড় বড়, দেখলেই ভাল লাগে।

রাম বলল, তা আর থানায় গিয়ে কী হবে? চলো, আমার বাড়িতে ডিমের ঝোল হবে, নারকোলের পিঠে হবে, একসঙ্গে বসে দুজনে খাবোখন।

তাই কি হয়! আমার এত বড় মাছটা পচে নষ্ট হবে যে! লাউটাও শুঁটকো হবে। তার চেয়ে আমার বাড়ি চল, লাউঘণ্ট আর মাছের ঝোল দিয়ে দুজনে সাঁটাই।

ঠিক আছে। আজ আমি তোমার বাড়ি যাচ্ছি। কাল কিন্তু আমার বাড়িতে—

আরে তা আর বলতে—

রাম আর হরি ফিরে আসতে লাগল।

মায়া

জল-কাদা থেকে লোকটাকে তোলা হলো চুলের মুঠি ধরে। দাঁড়ানোর মতো অবস্থা তার নয়। দুর্বল শরীর ইতিমধ্যেই হাটুরে মারের চোটে বিকল হয়ে গেছে। চুল ধরে যখন তোলা হল তখন তার বাঁ-চোখের ওপরকার ইঞ্চি তিনেক হাঁ করে থাকা ক্ষত দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ে চোখটা ঢেকে ফেলেছে। নাক ফুলে মস্ত এক টমেটোর আকার, ঠোঁট কেটে প্রায় দু-আধখানা, মুখভর্তি রক্ত। চোয়ালে ঢিবি হয়ে আছে কালশিটে। পালিয়েই গিয়েছিল প্রায়, একেবারে পাড়ার শেষপ্রান্তে ধরা পড়ে গেল।

পাড়ার লোক এতদিনে একটা বীরত্বের কাজ করল বটে। শিবেন নামে এই লোকটা গত এক বছর হরিহর সাহার বাড়িতে ভাড়াটে ছিল। বিশেষ কারও সঙ্গে ভাব ভালবাসা ছিল না। একটু চোয়াড় ধরনের লোক। মোটর মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করত কোথাও হাওড়ার দিকে। তবে পাকা কাজ নয়। একটু মদ খাওয়ার অভ্যাস ছিল, সন্ধ্যের পর প্রায়ই একটু টলতে টলতে ফিরত। বউ আর দশ বছরের একটা ছেলে ছিল তার। আর কেউ নয়।

মাস খানেক আগে বউটা গলায় ফাঁসি দিল। চিঠিতে লেখা ছিল, স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে মরছে। শিবেন তখন ঘরে ছিল না। সকালবেলা ছেলের চেঁচামেচিতে লোক জড়ো হয়ে দৃশ্যটি দেখল। পুলিশ, ডাক্তার এল। বউয়ের বাপের বাড়ির লোকেরা এল। শিবেনকে খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। কিন্তু শিবেন সেই যে হাওয়া হলো তারপর এই আজ সন্ধ্যায় ধরা পড়ল ধীরুর দোকানের সামনে।

ফুচু আবার একটা লাথি কষাতেই বয়স্ক এবং বিচক্ষণ তপেন হালদার এগিয়ে এসে বলল, ওরে, আর মারধর করিস না। মরে গেলে কেস খারাপ হয়ে যাবে। যা অবস্থা দেখছি, এ বোধহয গত কয়েকদিন খায়নি। বেঞ্চে বসা নিয়ে, জলটল দে। পুলিশ এল বলে।

এসব ঘটনায় যা হয়, সবাই কথা বলছে, কেউ কারও কথা শুনছে না। চারদিকে প্রচণ্ড গণ্ডগোল। ফুচুর গলা সবার ওপরে, আমি না দেখলে তো পালিয়েই যাচ্ছিল মুখে রুমাল চাপা দিয়ে। কেউ ধরতে পেরেছিলি তোরা? আমিই তো শালাকে পয়লা চোটে ধরে ফেলি।

ফুচুর কৃতিত্ব কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু লোকটাকে শিক্ষা দেওয়ার পিছনে যে কারও অবদান কম নেই সেটা বলতেও কেউ ছাড়ছে না। আস্ত খুনী ধরা কি চাট্টিখানি কথা?

পাশেই গ্রীল দেওয়া বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে তপনবাবু দৃশ্যটা দেখছিলেন। একটা প্রতিবাদ করার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু হাওয়া দেখে সাহস পাচ্ছেন না। স্ত্রীকে বললেন, এসব কী করছে বলো তো! জাজমেন্ট নিজের হাতে নিয়ে ফেলছে যে! ওর বউ তো সুইসাইড করেছিল, ওকে মারবে কেন?

তপনবাবুর বউ আভা বললেন, খুন ছাড়া আর কী? আজকাল ওভাবেই তো বউ খুন হয়। পুরুষদের হাড়ে হাড়ে চিনি বাবা, বেশি দরদ দেখিও না।

আভা যে হাঙ্গামাটা উপভোগ করছেন তাতে সন্দেহ নেই। উপভোগ করছে তাঁদের সপ্তদশী কন্যা মধুরা এবং পাড়ার আরও অনেকে।

শিবেনকে দোকানের বেঞ্চে শোয়ানো হয়েছে। মাথায় মুখে জল ঢালা চলছে, কিন্তু জ্ঞান ফিরছে না। দোকানের আলোয় মুদির দোকানের কর্মচারী পরেশ লক্ষ করছে, শিবেনবাবু বড্ড রোগা হয়ে গেছে। মাথার চুল লম্বা হয়েছে মেলা। মুখের হনু দুটো উঁচু হয়ে গাল বসে গেছে। আঙুলে লম্বা নখ। পরনে প্রায় তেলচিটে জামা-প্যান্ট। লোকটা তাদের দোকান থেকে মাল নিত। সঙ্গে ছেলেটা থাকত প্রায়ই। খুব আগলে রাখত ছেলেকে। ছেলে এক পা দুপা এদিক ওদিক গেলেই, 'এই বিশু' বলে চেঁচিয়ে কাছে টেনে নিত।

পানু শিবেনের মুখে জল ঢালছিল। উদ্ধবকে বলল, শালা আহাম্মকটা পাড়ায় ঢুকেছিল কেন বল তো? এ পাড়ায় যে চামড়া তুলে নেবে তা কি জানত না?

উদ্ধব মারধরের ব্যাপারটা প্রথম থেকেই পছন্দ করেনি, বলল, আরে পাপীতাপী যাই হোক, পুলিশ আছে, ভগবান আছেন, তাঁরাই দেখবেন। আমাদের বাড়াবাড়ি করার দরকার কী? লোকটা কিন্তু খারাপ ছিল না। সাহা বাড়ির লোকরা তো বলেই, বউটা নাকি দারুণ ঝগড়াটে ছিল।

পানু একটু চাপা গলায় বলল, আরে আমিও তো পিছনের ঘরেই থাকতুম, নাকি? জানালা দিয়ে যে সব কথাবার্তা আসত মাইরি, আমাদেরও কানে আঙুল দেওয়ার মতো। তবে এই ঢ্যামনাও বড় কম নয়। মাতাল হয়ে এসে রোজ হুজ্জুত করত।

নাড়িটা দেখ!

মরেনি, ভয় নেই।

পুলিশ এল আরও আধঘণ্টা পর। জিপ থেকে সুদর্শন ও ভালমানুষ ও সি তিনজন কনস্টেবল নিয়ে নামলেন। লোকজন ঘনিয়ে এল চারদিকে।

ও সি দৃশ্যটা দেখে বললেন, এ তো বেশ উন্ডেড দেখছি। এত মারধর করলেন কেন?

ওর নামে যে হুলিয়া আছে স্যার। ফুচু আগ বাড়িয়ে বলে।

তাতে কী হলো? হুলিয়া আছে বলেই মারতে হবে?

পালাচ্ছিল যে স্যার, আর একটু হলেই পগার পার হয়ে যেত। আমি চিনতে পেরেছিলাম বলে দৌড়ে গিয়ে লাইনের ধারে সাপটে ধরে ফেলি।

ও সি যেন একটু বিরক্ত। এত বড় একটা আসামী ধরা পড়েছে তাতে যেন তেমন খুশি নন। মুখটা বেজার করে রেখেই বললেন, কাজটা ভাল করেননি। শুনেছি লোকটার হার্ট সুবিধের নয়। ওর ছেলে জবানবন্দী দিয়েছে।

শিবেনের কোনও সাড় নেই। পড়ে আছে বেঞ্চের ওপর। জলে সপসপ করছে গা, মাথা।

কাছাকাছি ডাক্তার নেই? একজন কেউ গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনুন তো। কেসটা দেখা দরকার।

দোকান থেকে চেয়ার বের করে দিল লোকজন। দারোগাবাবু বসলেন। বসেই ফুচুর দিকে চেয়ে বললেন, আপনিই তো ধরেছেন একে?

ফুচু উৎসাহ পেয়ে বলে, জী আমিই।

একজন কনস্টেবলকে ও সি বললেন, কানাই এর নাম ধাম রেকর্ড করে নে তো।

মনোমোহন ডাক্তারকে ডেকে এনেছে উদ্ধব। রিকশা থেকে নামতে নামতে মনোমোহন ডাক্তার বললেন, কে ওটা রে? এ পাড়ার নাকি?

কে যেন বলল, সেই খুনেটা। বউকে ভোর রাতে ঝুলিয়ে দিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল।

মনোমোহন শিবেনের নাড়ি দেখলেন, বুকে স্টেথো লাগালেন। তারপর প্রেশারটা মেপে নিয়ে দারোগাবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, প্রেশারটা ভাল নয়। রক্ত গেছে মেলা। হাসপাতালে রিমুভ করাই ভাল।

দারোগা কেষ্টবাবু মাথা নেড়ে বললেন, লোকটা এসেছিল বোধহয় ছেলের খোঁজে, ছেলেটাকে বড় ভালবাসত। ছেলেও সারাক্ষণ বাবার কথাই বলে কিনা, বোকার হদ্দ না হলে কেউ এসে পড়ে এভাবে?

মনোমোহন বললেন, কেসটা কী? সত্যি খুন নাকি?

খুন কেন হবে? তবে আজকাল ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তাতে বউ মরলেই স্বামীরও প্রায় সহমরণ। সরকার বাহাদুর এ ব্যাপারে সাঙ্ঘাতিক কড়া। তা এরা দেখছি কেস এগিয়েই রেখেছে। ওরে তোরা ধরাধরি করে লোকটাকে জীপের পিছনেই তোল।

শিবেনকে তোলা হলো এবং জীপ রওনা হলো।

শিবেনের জ্ঞান ফিরল জীপের ঝাঁকুনিতে। কাতর গোঙানির শব্দে ও সি জীপ থামালেন। জিজ্ঞেস করলেন, জ্ঞান ফিরেছে?

কনস্টেবলদের একজন বলল, ফিরেছে মনে হচ্ছে।

শিবেন পুরোপুরি সজ্ঞান হতে আরও একটু সময় নিল। তারপর দিশাহারা গলায় হঠাৎ কেঁদে উঠল, বাবু! আমার বাবু কোথায়?

ও সি জানেন, শিবেনের ছেলের নাম বাবু। এও জানেন, ছেলেটা তার বাপকে অসম্ভব ভালবাসে এবং বোধহয় ভাইস ভার্সা। ও সি-র নিজেরও বারো বছর বয়সের ছেলে আছে। সুতরাং শিবেনের প্রতি তাঁর একটু সহানুভূতি পরোক্ষে কাজ করছে।

শিবেন আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। থানায় আনার পর তাকে বেঞ্চে শুইয়ে আবার খানিক পরিচর্যা করা হলো। ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় জ্ঞান ফেরার পর তাকে গরম দুধ আর বিস্কুট খাওয়ানোর চেষ্টা হলো। কিন্তু কাটা ঠোঁট, ভাঙা মুখ, আহত শরীর দিশাহারা মাথায় লোকটা কিছুই খেতে পারল না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে চেয়ে কাকে খুঁজছে।

ও সি আনমনে বসে ছিলেন নিজের চেয়ারে। লোকটার বউ সুইসাইড নোটে স্পষ্টভাবে স্বামীকে নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে গেছে। এইসব স্টেটমেন্ট মারাত্মক। আজকাল মৃত্যুকালীন জবানবন্দী বা বিবৃতিকে সবিশেষ গুরত্ব দেওয়ার নিয়ম।

একজন এস আই এসে বলল, স্যার, অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে। পুলিশ কাস্টডিতে হাসপাতালে রাখা ছাড়া তো গতি নেই। লোকটার ট্রিটমেন্ট দরকার।

ও সি মাথা নাড়লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ওর ছেলে বোধহয় তার মামাবাড়িতে আছে, না? কোথায় বাড়িটা বলো তো।

নাকতলায়।

ওখানে একটা খবর পাঠানো যায় না? এ লোকটা বোধহয় ছেলেটাকে একবার দেখতে চায়। ছেলের টানেই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে চলে এসেছিল। আফটার অল আমরাও তো বাবা।

এস আইও বাবা। সামান্য মাথা নেড়ে বলে, কথাটা তো স্যার ঠিক, কিন্তু রাত হয়ে গেছে, এখন কি আর...

তা বটে। তাহলে ওকে হাসপাতালে দিয়ে দাও। আর ওর শ্বশুরবাড়িতে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দাও।

থানার করিডোর প্রকম্পিত করে সহসা শিবেনের গলা চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল, বাবু-উ-উ...

স্যার, লোকটার বোধহয় ব্রেন চোট হয়েছে।

হতেই পারে। হাটুরে মারে তো আর মনুষ্যত্ব থাকে না। অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি দেখ।

শিবেনের জ্ঞান ফিরল পরদিন সকালে। কিন্তু সে ঠিক জ্ঞান ফেরা নয়। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। সারা শরীরে ক্ষত বিষিয়ে উঠে এক অসহনীয় বেদনার স্তূপ হয়ে সে পড়ে আছে। হাত বাঁধা, শিরায় ছুঁচ, একটা

চোখ ব্যান্ডেজে ঢাকা।

তার পালানোর কোনও সম্ভাবনা নেই। তবু তার একটা পা খাটের সঙ্গে বেড়ি দেওয়া।

কিন্তু শরীর নিয়ে শিবেনের মাথাব্যথা নেই। সে জানে, তার শরীর আর বেশিক্ষণ প্রাণটাকে ধরে রাখতে পারবে না। শরীরের সূর্যাস্ত সব মানুষই টের পায়। একখানা চোখে সে সর্বত্র খুঁজে বেড়াতে লাগল একখানা মুখ। চলে যাওয়ার আগে একবার যদি মুখখানা দেখতে পায় একটুক্ষণের জন্য। তার ঠোঁট অবিরল জপ করে যাচ্ছে, বাবু! বাবু! বাবু!...

সবই অচেনা মানুষ। কাল তাকে যারা পিটিয়েছিল তারাই কি এরা? এই যে সব শুয়ে আছে, ঘুরছে ফিরছে! মানুষের ওপর শিবেনের কোনও রাগ নেই। মেরেছে বেশ করেছে। সে নিজেই তো কয়েকবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে গত এক মাসে। ভয়ে পারেনি। সে বড়ই ভীতু মানুষ। আজ অবশ্য আর ভয়ডর নেই। যা হয়েছে এই ভাল। কিন্তু শুধু একবারটি যদি...

দারোগা এলেন, কেমন আছো হে শিবেন?

শিবেন চোখ খুলল, আমার প্রণাম। ভাল নেই।

ছেলেকে দেখতে চাও?

অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থাকে শিবেন, দেখাবেন? একবারটি? তারপর লাথি মেরে যদি মেরে ফেলেন তাও রাজী।

ছেলে এল আরও কিছুক্ষণ পর। সঙ্গে কঠোর মুখের দুই মামা, এক মাসি। তাদের মুখ রাগে আক্রোশে ভরা। ভীতু রোগা ছেলেটা এদের মাঝখানে সিঁটিয়ে সভয়ে চেয়ে আছে বাবার দিকে।

শিবেন তার বিকৃত মুখে একটু হাসল। রক্ত গড়িয়ে নামল ঠোঁট বেয়ে। একটা মাত্র চোখ ভরে গেল জলে। আবছা হয়ে গেল দৃষ্টি।

আ-আ-মার চোখ মুছিয়ে দাও! আমি দেখতে পাচ্ছি না যে!

কিন্তু শিবেনের কথা কেউ শুনতে বা বুঝতে পারল না বোধহয়। শিবেন চোখটা মোছার জন্য কাত হয়ে বালিশে চোখ ঘষার চেষ্টা করল। একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যথা কোথাও ওত পেতে ছিল। পট করে একটা শব্দ হলো ব্যান্ডেজের নিচে আর একটা ব্যথার বাঘ যেন একটি থাবায় অন্ধকার করে দিল শিবেনকে। শুধু তার ঠোঁট, 'বাবু' শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে ছুঁচোলো হয়ে স্থির হয়ে গেল।

শিবেন অবশ্য টের পেল না যে, মামা আর মাসিদের ভিতর থেকে তার রোগা ভীতু ছেলেটা হঠাৎ ছিটকে ছুটে এসে দুহাতে আঁকড়ে ধরেছিল তাকে, বাবা! বাবা গো!

পৃথিবীতে কোনও ঘটনারই কোনও গভীর ও স্থায়ী প্রভাব থাকে না। সব ঘটনাই ভেসে যায় এক ঘটনার প্রবহমানতায়। শিবেন বা তার ছেলের ঘটনাও তাই। শিবেনের মৃত্যু হলো। তার বাচ্চা ছেলেটা শোকে বোবা হয়ে রইল। কিন্তু এ সবই সাময়িক। এ ছেলে শোক ভুলবে, বড় হবে, জীবনের নানা কাজে ছড়িয়ে দেবে নিজেকে।

কিন্তু শেষ দৃশ্যটা যাঁরা দেখেছিলেন সেই ও সি, এস আই এবং এমনকি শিবেনের শালারা ও শালী প্রত্যেকেই অনুভব করেছিল কোথাও একটা গরমিল থেকে যাচ্ছে। কিছু যেন বেঠিক হচ্ছে। বড় অবিচার হচ্ছে।

সেই রাতে ও সি ভাল করে ঘুমোতে পারলেন না। বড় ছটফট লাগছিল বিছানায়। জল খেলেন, সিগারেট খেলেন, ঘুমন্ত ছেলের মুখ দেখলেন বাতি জ্বেলে।

তারপর অস্ফুট স্বরে একবার বললেন, ভগবান! লোকটা যেন জুড়োয়। শেষ অবধি জুড়োয়।

অনেক দিন বাদে দূরের একজন মানুষের জন্য এই প্রার্থনাটুকু করে ও সি ভারী তৃপ্তিবোধ করলেন।

চোর

বেলদার ঘুড়ি, লাটাই, আর সুতো তিনটেই ছিল বিখ্যাত। বিখ্যাত ছিল বাঁশের বাঁশি, লাটিম, গুলতি। গগন লাহিড়ী গুণী লোক, তাঁর পয়সাও মেলা, কাজকর্ম কিছু করতে হয় না। সারাদিন বসে বসে নিজের খেয়ালে এইসব তৈরি করেন, ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন, সেইসব জিনিসের চাহিদাও সাঙ্ঘাতিক। কিন্তু গগন লাহিড়ী বড্ড খেয়ালী লোক। যখন ইচ্ছে হবে বেচবেন, আবার যখন ইচ্ছে হবে না তখন খদ্দের এলে কুকুর লেলিয়ে দেবেন। পয়সার পরোয়া তো নেই। একবার কোন বড়লোক পয়সা দেখাতে এসেছিল, গগন লাহিড়ী খুব উদাস গলায় বললেন, ঘুড়ি? এক একটা ঘুড়ি একশো টাকা, লাটাই পাঁচশো, সুতো প্রতি গজ পাঁচ টাকা, এই দর শুনে পয়সাওলা লোকটা রেগেমেগে চলে গেল আর গগন লাহিড়ী খুব হোঃ হোঃ করে হাসল।

গগন লাহিড়ীকে সমঝে চলে না এ তল্লাটে এমন লোক নেই।

পরাশর সান্যাল এ তল্লাটের সবচেয়ে দুঁদে উকিল। দূর সম্পর্কে গগন লাহিড়ীর কী একটু আত্মীয়ও হন। পরাশরও বনেদী বড়লোক, দেদার পয়সা। মেজাজও বেশ গরম। পয়সাটা তিনি খুব চেনেন এবং বোঝেন বলে তাঁর সমস্ত জীবনটাই পয়সাকেন্দ্রিক। যেখানে টাকার গন্ধ নেই সেখানে পরাশর নেই। তবে মানুষটা কৃপণ নন। খুব খরচ করেন, দান ধ্যানও আছে। আর আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোড়ল হওয়ার প্রবণতা। তিনি স্কুলের কমিটির প্রেসিডেন্ট, কলেজের গভর্নিং বডির মাতব্বর, ফুটবল ক্লাবের পাণ্ডা, মহিলা সমিতির পেট্রন, রাজনীতিও করেন একটু-আধটু।

বলাই বাহুল্য গগন লাহিড়ীর সঙ্গে পরাশরের সদ্ভাব নেই। গগন বলতে গেলে পরাশরকে ঘেন্নাই করেন। কথা উঠলেই বলেন, অর্থপিশাচ, ক্ষমতালোভী, দুর্নীতিগ্রস্ত ওই লোকটার ছায়া মাড়ানোও পাপ।

অপর পক্ষে গগন সম্পর্কে পরাশরের ধারণা ততটা তিক্ত না হলেও, বিশেষ মধুর নয়। পরাশর বলেন, বাউন্ডুলে পাগল, কাছাছাড়া ও লোকটা সমাজের জঞ্জাল।

দুই বাড়ির মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি নয়, একই পাড়ার দুই প্রান্তে। কিন্তু মানসিক ও সামাজিক দূরত্ব বহু যোজন।

ঘটনাটা ঘটল পরাশরের ছোটো ছেলেকে নিয়ে। পরাশরের তিন ছেলে। প্রথম দুজন চালাকচতুর, ষণ্ডাগুণ্ডাও বটে। তারা ফুটবল খেলে, সাঁতরায়, দেশভ্রমণ করতে যায়। তাদের নিয়ে পরাশরের চিন্তাও বিশেষ নেই। কনিষ্ঠ পুত্রটিই পরাশরের অন্যরকম, সৃষ্টিছাড়া। জন্মকাল থেকেই নানারকম রোগে ভুগে সে জীর্ণশরীর। খুব ভাবপ্রবণ। বড় বেশি চিন্তাশীল। তেরো চোদ্দ বছর বয়সেও সে মায়ের আঁচলধরা, ভীতু, দুর্বল প্রকৃতির। তিতুকে তাই কেউ তেমন শাসন করে না, প্রায় তুলোয় করে রাখা হয় তাকে। সবাই জানে তিতু কোনও ঘটনা ঘটাতে পারে না।

পরাশরের বাড়ির পিছনেই জেলেপাড়া। গরিব গুর্বো দামাল সব ছেলের বাস সেখানে। তাদের সঙ্গে মেশার কথা তিতুর নয়। কিন্তু বয়সের ছেলে সবসময়ে বন্ধু চায়। সমবয়সীদের আকর্ষণ সে এড়াবেই বা কী করে?

তাছাড়া তিতুর খেলনার ভাণ্ডারটি বেশ সমৃদ্ধ। তার এয়ারগান আছে, দু-চাকার ছোটো সাইকেল আছে, রোলার স্কেটিং-এর জুতো আছে। এইসব খেলনার আকর্ষণেও কিছু ছেলে আসবেই, যাদের ওসব নেই।

এইভাবে কোনও এক দুর্বলতার রন্ধ্র দিয়ে তিতুর সঙ্গে জেলেপাড়ার কয়েকটি ছেলের ভাব হয়েছিল। ছেলেগুলো দামাল হলেও তেমন অসভ্য নয়। তারাও স্কুলে পড়ে, সভ্যভব্য পোশাক পড়ে, খারাপ কথা বলে না। সেজন্য তিতুর সঙ্গে তাদের মেশামেশা খুব একটা পছন্দ না করলেও পরাশর এবং তাঁর গিন্নি বাধাও দেননি। তবে নজর রেখেছেন। ছেলেটা যদি ওদের সঙ্গে মিশে একটু প্রাণচঞ্চল হয় তো হোক।

বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়ি ওড়ানোর একটা বিরাট কমপিটিশন হয় এখানে। ছেলে বুড়ো কেউ বাদ যায় না। শহরের বাইরে বিশাল একখানা মাঠ আছে। সেখানে ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব উপলক্ষে রীতিমত মেলা বসে যায়।

গগন লাহিড়ী নিজে ঘুড়ি ওড়ান না বটে, কিন্তু প্রতিবারই তাঁর তৈরি ঘুড়ি, তাঁর বিশেষ সবুজ মাঞ্জার সুতো ও তাঁর বাঁশের লাটাই নিয়েই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়। ফলে গগন লাহিড়ীর ঘুড়ির চাহিদা এ সময়ে তুঙ্গে ওঠে। গগন চাইলে এ সময়ে ঘুড়ি প্রতি বিশ পঁচিশ টাকা বাড়াতে পারেন। কিন্তু পয়সার জন্য কাজ করবেন তেমন বান্দা গগন লাহিড়ী নন। এই কমপিটিশন উপলক্ষে তিনি গোটা দশেক ঘুড়ি বানান, আর সেই মাপমতো সুতো, কয়েকটা বিশেষ ধরনের বল-বিয়ারিংওলা লাটাই। যার মুখ দেখে পছন্দ হয় তাকেই দেন এবং ন্যায্য দামে।

গগন লাহিড়ীর ঘুড়ি-লাটাই নিয়েই জেলেপাড়ার ছেলেদের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধিটা জাগল। তারা ভালই জানে শহরের তা বড় তা বড় লোকেরা গগনের ঘুড়ির জন্য তীর্থের কাকের মতো বসে থাকে। সুতরাং তাদের মতো বাচ্চা ছেলেদের কেউ পাত্তাও দেবে না। আর যে জিনিস সহজে পাওয়া যায় না তার ওপর বাচ্চাদের আকর্ষণ ঠিক ততটাই বেশি।

সুতরাং গগন লাহিড়ীর ঘুড়ি লাটাই আর সবুজ মাঞ্জার সুতো কি করে পাওয়া যায় তাই নিয়ে জেলে পাড়ার কয়েকজন ছেলে একটি গোপনে মিটিং করল। সেই মিটিঙে ছিল তিতুও। চুরির সে কিছুই বোঝে না। সে চিরদিন যা চেয়েছে তাই পেয়ে এসেছে।

তিতুর উত্তেজনাহীন সযত্নরক্ষিত জীবনে এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চার দারুণ শিহরন আনতে বাধ্য। জেলেপাড়ার ছেলেরা ঠিক করল তারা গগন লাহিড়ীর বাড়িতে ঢুকে গভীর রাতে লাটাই আর সুতো চুরি করে আনবে।

গগনের বাড়িটা বেশ বড় বাগান দিয়ে ঘেরা। বাগানের চারদিকে উঁচু পাঁচিল। লোহার ফটক রাত্রিবেলা বন্ধ থাকে। একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর রাত্রে বাড়ি পাহারা দেয়। আনাড়ী চোরের পক্ষে এ বাড়িতে চুরি করা শক্ত কাজ। তবে শক্ত না হলে সেই কাজ করার মধ্যে আর আনন্দ কী?

গভীর রাতে তিতু বাড়ি থেকে পালিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে চলল গগন লাহিড়ীর বাড়িতে। বুকে ভয়, উত্তেজনা, শিহরণ, আনন্দ।

প্রথম ধাপটা তারা সহজেই উৎরে গেল। একটা মই আনা হয়েছিল সঙ্গে, সুতরাং দেয়ালে উঠে ভিতরে লাফিয়ে পড়তে কারও অসুবিধে হল না। হল শুধু তিতুর। গোড়ালিতে ভীষণ ব্যথা পেল সে। ককিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। তারপর অতি কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে বন্ধুদের সামনে আত্মসম্মান বজায় রাখতে সে উঠে দাঁড়াল।

কুকুরটার কথা তারা মনে রেখেছিল। কুকুরটা তেড়ে এসেছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। একটা ছেলে প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে মাংসের ছাঁট ছুঁড়ে দিতে লাগল তার দিকে। গগন লাহিড়ীর কুকুর জাতে উঁচু হলেও তেমন প্রশিক্ষিত নয়। তাই মাংসের ছাঁট পেয়ে ঘেউ ঘেউ থামিয়ে ল্যাজ নেড়ে দিল।

যে ঘরে ঘুড়ি লাটাই মজুত থাকে সেটা মূল বাড়ি থেকে আলাদা, সামনের দিকে। পাকা ঘরও নয়, একটা চারচালা। তেমন মূল্যবান কিছু থাকে না বলে সামান্য একটা সস্তা তালা ঝোলে ঘরে। সুতরাং তালা ভেঙে ঘরে ঢুকতে অসুবিধে হল না।

কিন্তু অনভিজ্ঞতার খেসারত দিতেই হয়। তারা তালা ভাঙতে হাতুড়ি চালিয়েছিল। নিশুত রাতে শব্দটা হল বিকট। আর মাংস-খেকো কুকুরটাও সেই সময় গগনবিদারী হাঁক মারতে শুরু করল। বাড়ির লোকজন এল তেড়ে।

জেলেপাড়ার ছেলেরা অনেক চটপটে। তারা লঘুপায়ে দৌড়ে এধার-ওধারে ছিটকে দেয়াল টপকে ঠিকই পালিয়ে গেল। গোড়ালি-মচকানো তিতু ব্যথায় নীল হয়ে বসে পড়ল একটা গাছের নীচে। তার মুখে যখন একটা অভদ্র রকমের টর্চের আলো এসে পড়ল তখন সে কাঁদছে, দুঃখে, ব্যথায়, অপমানে।

চাকরবাকর গোছের দু-তিনজন এসে কর্কশ হাতে তাকে দাঁড় করাল। তারপর 'চোর চোট্টা বদমাশ' ইত্যাদি গালাগাল দিতে দিতে টেনে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

ঢুকতেই হলঘর। সেখানে গগন লাহিড়ী আর তার পুরো পরিবারই আচমকা গোলমালে ঘুম ভেঙে উঠে এসে জড়ো হয়েছে।

গগন তিতুকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, কে তুই? কেন ঢুকেছিলি বাড়িতে?

কান্নার ধমকে তিতু এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না।

কিন্তু গগন লাহিড়ীর বড় মেয়ে বন্দনা তার বাবার কানে কানে কী যেন বলল। ঘরে শুরু হয়ে গেল ফিসফাস, চাপা হাসি আর ঠেলাঠেলি।

বন্দনাই এসে চাকরদের হাত থেকে তাকে ছাড়িয়ে ভিতর দিকে আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসাল। তারপর পাখার বাতাস দিল। ঠান্ডা জল খাওয়াল। হাসতে হাসতে বলল, তোমার ঘুড়ি লাটাইয়ের দরকার ছিল তো আমাকে এসে বললে না কেন? তোমার সঙ্গে ওরা কারা ছিল?

অপমানে তিতু মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।

বন্দনা অত রাতে নিজের হাতে চুন হলুদ গরম করে আনল, গগন লাহিড়ীর বউ নিজে নিয়ে এলেন পানের পাতা আর লম্বা ন্যাকড়ার ফালি। গগনের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি অবাক চোখে এসব দৃশ্য দেখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

বন্দনা ব্যান্ডেজ বাঁধা পা-টা নেড়েচেড়ে বলল, হাঁটতে পারবে?

পারব।

তখন চাকরদের ওপর হুকুম হল যেন সাবধানে তিতুকে তার বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়, দরকার হলে যেন কোলে করে নেয়।

তিতু যখন চাকরদের কাঁধে ভর দিয়ে চলে আসছে তখন বন্দনা তাকে একজোড়া সুন্দর ঘুড়ি, একটা ঝকঝকে লাটাই সবুজ মাঞ্জার সুতো সমেত এনে দিল। তারপর নিজের মায়ের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলল, কী সুন্দর চেহারাটা, না মা?

বড্ড রোগা। তবে মুখখানা একেবারে কেষ্টঠাকুরের মতো।

সেই সময় একটা কচি গলা বলে উঠল, ইস সুন্দর না হাতি। ও তো চোর!

কথাটা তিতুর মনে ছিল।

ঘটনাটা চাপা থাকেনি। তিতু এমনিতেই ভীতু স্বভাবের ছেলে, তার ওপর মিথ্যে কথা বানিয়ে বলার অভ্যাস নেই। ফলে বাড়িতে সবই স্বীকার করতে হয়েছিল তাকে। তার বাবা পরাশর কোনোদিনই তার গায়ে হাত তোলেননি। শুধু এই ঘটনাটা সহ্য করতে না পেরে একটা মাঝারি ওজনের চড় কষিয়েছিলেন তার গালে, তোর এত অধঃপতন!

পরদিন থেকেই জেলেপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মেশা বন্ধ হয়ে গেল তার। পায়ের ব্যথায় ক'দিন শুয়েও থাকতে হল ঘরে।

চুরির দায়ে সে ধরা পড়েছিল, আর কেউ পড়েনি। দেয়াল ডিঙোতে গিয়ে তারই পা মচকেছিল, আর কারও মচকায়নি। চোরকে ধরেও চোরের নিতান্ত মেয়েলী কান্না দেখেই ওরা তাকে অত খাতির যত্ন করে।

শুয়ে শুয়ে এসব ভাবতে ভাবতে নিজের ওপর ঘেন্নায় শুকিয়ে যেতে থাকে তিতু। বাবার হাতের প্রথম মার, সেও তো চিরজীবন থাবা গেড়ে থাকবে মনের মধ্যে। সবচেয়ে বেশি তাকে যন্ত্রণা দেয় ওই বন্দনা নামে মেয়েটির ওই ক্ষমাশীল ব্যবহার। ওরা চোর বলে ধরে যদি তাকে শাস্তি দিত, বেঁধে রাখত বা পুলিশ ডাকত তাহলেও তিতু অনেকটা পুরুষ মানুষের মতো বোধ করতে পারত নিজেকে। কেন ছেড়ে দিল ওরা? পরাশর সান্যালের ছেলে বলে চিনতে পারায়?

তাই হবে। ব্যথা পা নিয়ে তিতু ক্লান্তিতে চোখ বুজে শুয়ে থাকে বিছানায়। নিজের বাবার এবং পরিবারের মানমর্যাদা যে সে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে এসেছে এটা বুঝতে তার অসুবিধে হয় না। বাবা গম্ভীর, মা গম্ভীর, বাড়িতে একটা শোকের আবহাওয়া। ভাগ্য ভাল যে, গগন লাহিড়ী পুলিশে খবর দেননি, দিলে দিতে পারতেন।

খানিকটা পায়ের ব্যথায়, খানিকটা লোকলজ্জায় তিতু বাড়ি থেকে বেরোতে সময় নিল। তার ভয় ছিল বেরোলেই পাঁচজন তার দিকে অবাক চোখে তাকাবে, ফিসফাস আলোচনা হবে, হাসাহাসিও হতে পারে।

সেসব কিছুই কিন্তু হল না। এমনকী জেলেপাড়ার যে সব সঙ্গীর সঙ্গে সে চুরি করতে গিয়েছিল তারা অবধি ঘটনাটা ভাল জানে না। তারা যে যার নিজের টিকি বাঁচাতে পালায়। কার কী হল তা তারা জানবে কি করে? তিতুর পায়ে লেগেছিল, শুধু এটুকু তারা জানত।

ঘটনাটা ভুলতে একটু সময় লেগেছিল তিতুর। কিন্তু এ বয়সে এমন সব মানসিক ওলট পালট ঘটে, এত ঘটনাস্রোত চারদিকে বয়ে যায় যে সামান্য এই লজ্জার ব্যাপারটা মোটামুটি বিস্মৃত হতে বছর খানেকের বেশি লাগল না। আরও একটা ব্যাপার তিতুর চোখের আড়ালে ঘটে চলেছিল। সেটা হল গগন লাহিড়ীর পতন।

অবস্থাপন্ন গগন লাহিড়ীর গোটা কয়েক মারাত্মক দোষ ছিল। তার মধ্যে প্রধান হল জুয়া খেলা। এই মফস্বল শহরে বড় স্টেক-এ জুয়া খেলা বড় একটা হয় না। গগন লাহিড়ী জুয়া খেলতে কলকাতা, বোম্বাই, কাঠমাণ্ডু অবধি যেতেন। ফলে তাঁর জুয়ার নেশার কথা এখানকার লোক খুব ভালভাবে জানত না। জানল, হঠাৎ একদিন গগন লাহিড়ী তার বাড়ির লাগোয়া খানিকটা জমি একজন মাড়োয়ারিকে বেচে দেওয়ার পর। অত সুন্দর বাগানওলা বাড়ির কিছুটা অংশ বেচবার মানেই হচ্ছে গুরুতর টাকার টান। ফলে শহরে বেশ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলেন গগন। দাম্ভিক ও খেয়ালী লোকটার চোখেমুখে একটা পরাজয়ের গ্লানিও পরিষ্কার ফুটে উঠল।

পরের ঘটনাটা আরও একটু গোলমেলে। গগন লাহিড়ী তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় আর্ট কালেকশন বেচে দিলেন কলকাতার এক এজেন্টকে। এই আর্ট কালেকশনে পুরোনো পটচিত্র ছাড়া রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগরের স্বহস্তলিপি, অবনীন্দ্রনাথের তিনটে রেখাচিত্র, যামিনী রায়ের অন্তত বারোখানা ছবি, পুরোনো কাশ্মিরী শাল, সোনা আর রূপোর কাজ করা দুশো বছরের পুরোনো বেনারসী শাড়ি, আকবরী মোহর থেকে শুরু করে কত কী যে ছিল। এগুলোকে সন্তানের অধিক স্নেহে রক্ষা করতেন।

আর্ট কালেকশন বিক্রি হয়ে যাওয়ার কিছু পরে তিতু একদিন গগন লাহিড়ীকে দূর থেকে দেখল। রিকশায় চড়ে কোথাও যাচ্ছেন। তিতু অবাক হয়ে দেখল, গগন লাহিড়ীর সমস্ত চুলগুলো ধপধপে সাদা। ক'দিন আগেও মাথাভর্তি কালো চুল ছিল গগনের। এত অল্প দিনে এত বুড়িয়ে যায় কি করে একটা লোক?

তিতুর পৈতের সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। যার কোনও মানে নেই। পৈতের অনুষ্ঠানে স্বভাবতই গগন লাহিড়ীর নেমন্তন্ন হয়নি। হলেও যে তিনি আসতেন এমন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু পৈতের দিন দুপুরে তিতুর স্কুলের এক বন্ধু চুপিচুপি এসে তার দণ্ডীঘরে একটা বাক্স তার হাতে দিয়ে বলল, বন্দনাদি পাঠিয়েছি, কাউকে বলিস না।

অবাক হয়ে তিতু বলল, বন্দনাদি কেন কিছু পাঠাবে?

ভিতরে চিঠি আছে। খুলে দেখিস, আমি কিছু জানি না।

তিতু বাক্স খুলে দেখল, তাতে একটা সেট সবুজ পান্না বসানো দারুণ সোনার বোতাম। ছোট্ট একটা চিরকুটে লেখা, দেবশিশু, আমার এই স্নেহটুকু নিও। তোমার মুখখানা আজও ভুলতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে ভয় হয়, এই পাপে ভরা পৃথিবীতে তোমার মতো নিষ্পাপেরা কি করে যে বেঁচে থাকবে। আমার ছোটো বোন চন্দনা কী বলে জানো, দিদি, তিতু কই আর তো চুরি করতে আসে না? তিতু এবার কী চুরি করতে আসবে রে দিদি? আমি তখন ওকে বলি, তোকে। বন্দনাদি।

তিতু কী করবে ভেবেই পাচ্ছিল না। গগন লাহিড়ীর মেয়ের এই গোপন উপহার গ্রহণ করা কতদূর যুক্তিযুক্ত বা নিরাপদ হবে তা ভেবে সে কিছুক্ষণ এবং কিছুদিন খুব উদ্বিগ্ন রইল। কিন্তু উপহারটা ফেরত পাঠাতেও বড় কষ্ট হল তার। সোনার বোতাম সে লুকিয়ে রাখল নিজের বাক্সে।

গগন লাহিড়ীর অবস্থা পড়ে গেলেও তাঁর দুই মেয়েরই রূপের দারুণ খ্যাতি। বন্দনা রাস্তায় বেরোলে লোকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। সুতরাং বড় মেয়ের বিয়ে দিতে গগনকে বিশেষ কাঠখড় পোড়াতে হয়নি, দানসামগ্রীর অভাব মেয়ে তার রূপ দিয়েই পূরণ করে নিল। পাত্রটি দারুণ ভাল, মধ্যপ্রদেশে একটি ভালো কোম্পানিতে ইনজিনিয়ার।

সেই বিয়েতে পরাশরের নেমন্তন্ন হল না। কিন্তু তিতু একটা অদ্ভুত চিঠি পেল আবার। স্কুলের সেই বন্ধুটিই নিয়ে এল চিঠি। তাতে লেখা, দেবশিশু, আমার বিয়েতে তোমাকে নেমন্তন্ন করছি। যদি ভয় না পাও তো এসো, চলে যাওয়ার আগে তোমার মুখখানা আর একবার দেখে যেতে খুব ইচ্ছে করছে। আমাদের বাড়িতে এলে তোমাকে কেউ একটুও অবহেলা করবে না। আমি সবাইকে বলে রেখেছি, তিতু এলে তোমারা তাকে আদর করে আমার কাছে নিয়ে এসো। আসবে ভাই? বন্দনাদি।

এই চিঠি পেয়ে যে কতটা বিপন্ন বোধ করল তিতু তা সে কাকে বোঝাবে? সেই ঘটনার পর থেকে বন্দনার সঙ্গে তার দেখাই হয়নি বলতে গেলে। দূর থেকে কখনও কখনও এক আধ ঝলক দেখেছে। ভালো করে চিনবেও না এখন। মেয়েটা যে কেন তাকে জ্বালাচ্ছে এত!

আশ্চর্য এই যে, তিতু শেষ অবধি গিয়েছিল।

কলেজে ছুটির দিন ছিল। বড় হওয়ায় এখন একটু স্বাধীনতা পেয়েছে সে। একটু দেরি করে বাড়ি ফিরলে কেউ কিছু বলে না। সন্ধ্যের মুখে সামান্য সাধারণ পোশাক পরে সাইকেলে চেপে সে গগন লাহিড়ীর বাড়ির চারপাশে কয়েকবার ঘুরপাক খেল। সানাই বাজছে, লোকজন যাতায়াত করছে মেলা, বাড়িটা সাজানো হয়েছে যতদূর সম্ভব।

শ্যামের দোকানে সাইকেল রেখে পায়ে হেঁটে তিতু এক ভিড় লোকের সঙ্গে সন্ধেবেলা ঢুকে গেল গগনের বাড়িতে। জীবনে দ্বিতীয়বার। এত লোকজনের মধ্যে কারও তাকে আলাদাভাবে লক্ষ করার কথা নয়। সে ভেবেছিল পরে যদি কখনও প্রশ্ন ওঠে সে বলবে, আমি তো গিয়েছিলাম। এই ভেবে সে এদিক ওদিক একটু উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বিয়েবাড়ির নানা আয়োজন দেখল। দোতলার দিকে তাকাল একটু। তারপর চুপিসাড়ে পালিয়ে আসার জন্য পিছু ফিরল।

ঠিক সেই সময় একটা মেয়েলী হাত এসে নরম করতলে তার বাহুটি চেপে ধরল।

পালাচ্ছো কেন তিতু?

তিতু চেয়ে যাকে দেখল, সে এক অচেনা মেয়ে। মেয়েটি মুখ টিপে হাসছিল। বন্দনাদির বয়সিই হবে মেয়েটি।

তিতু লজ্জায় পড়ে তোতলাতে তোতলাতে বলল, না এমনি দেখে গেলাম আর কি। পাড়ায় বিয়ে হচ্ছে তো।

সে তো বটেই। তোমার তো নেমন্তন্নও আছে। চলো ওপরে।

লজ্জায় সংকোচে এতটুকু হয়ে জড়ানো পায়ে গেল তিতু। দোতলার পিছন দিককার কোণের ঘরে তখন কনের সাজ প্রায় শেষ।

তিতু লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না। ঘরটায় কী সুন্দর ফুল আর রূপটানের গন্ধ মউ-মউ করছে। আর তার মধ্যেই রক্তাক্ত বেনারসী, ফুলের সাজ, গয়নার ঝলকের মধ্যে একখানা অপরূপ মুখ তার দিকে ফিরল। দুখানা মস্ত চোখ কী এক আশ্চর্য মমতায় ভরে গেল।

এসেছো! তখন থেকে মনে মনে ভাবছি, তিতু বুঝি এল না! এসো, আমার কাছে এসে বোসো, ওমা, তুমি যে আরও সুন্দর হয়েছো, দেখতে!

সেই সুবাসিত সুন্দর, অদ্ভুত পরিস্থিতি জীবনে এর আগে কখনও আসেনি তিতুর। কিছুক্ষণ, কয়েক মিনিটই হবে, যেন স্বপ্নে ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। সেই কয়েকটি মুহূর্তকে পরবর্তীকালে কখনও সত্যি বলে মনে হয়নি।

সেই স্বপ্নের ঘোরের মধ্যেই বন্দনা তার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, ওই দেখ, কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে তোমাকে হাঁ করে দেখছে, দেখেছো?

দেখেছিল তিতু! বিয়েবাড়ি বলেই বোধহয় শাড়ি পরেছিল চন্দনা। আগুনরঙা শাড়ি আর সেই সঙ্গে প্রায় কনের মতোই জমকালো সাজগোজ, মেয়েরা কত তাড়াতাড়ি বাড়ে তা দেখে ভারী অবাক হয়েছিল তিতু। সেই ফুটফুটে মেয়েটা দু-বছরের মধ্যেই প্রায় যুবতী। তাকেই দেখছিল প্যাট প্যাট করে। মুগ্ধতা নয়, অবাক বিস্ময়ে। কে এই ছেলেটা তার দিদির গা-ঘেঁষে বসে আছে অমন!

সেই রাতে একরকম মাতাল হয়ে ফিরল তিতু। ফুল, সেন্ট, সুন্দরী মেয়ে এদের সকলেরই নিজস্ব গন্ধ তাকে মাতাল করে দিয়েছিল। মাতাল হয়ে গিয়েছিল তার দুই চোখ। মাটিতে যেন পা পড়ছিল না। নিজের শরীরকে যেন টেরই পাচ্ছিল না সে। গভীর রাতে নিজের বালিশে মুখ গুঁজে তিতু যখন এই মাতলামি কাটাল তখন তার দু-চোখ ভরা জল।

মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন গগনবাবু। বাইরে থেকে ততটা বোঝা যেত না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে জীর্ণ হয়ে আসছিল একটি পরিবার। সেটা আরও প্রকট হল যখন নিজের বাড়ির নীচের তলায় ভাড়াটে বসালেন গগন লাহিড়ী।

অলক্ষ্মী ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছিল তাঁকে।

তিতু ডাক্তারি পড়তে গেল কলকাতায়। মাঝে মাঝে যখন আসত তখন ইচ্ছে হত গগন লাহিড়ীর বাড়ির খোঁজখবর নেয়। কিন্তু হয়ে উঠত না। একদিন দুদিনের ছুটিতে এসে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে হই-হই করে কেটে যেত সময়। গগনের বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াতের সময় খুব তাকিয়ে থাকত। দেখত বাগানে আগাছার জঙ্গল। বাড়ির চেহারা বড়ই মলিন। চন্দনাকে সে কখনো দেখতে পেত না।

পাশ করে যখন ফিরল তখন পরাশর সান্যাল বললেন, আমার অনেক দিনের ইচ্ছে এ শহরে একটা ভালো নার্সিং হোম করি। তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে না, এখানেই থাকো।

নার্সিং হোম-এর কথায় তিতু খুশি হল। এ শহরে ভালো নার্সিং হোম নেই। নিজস্ব নার্সিং হোম থাকলে কাজ করেও সুখ।

পরাশর নিজে থেকেই বললেন, গগনের জমিটা পাওয়া যাচ্ছে সস্তায়। কমও নয়। সামনের দিকে প্রায় বাইশ কাঠা। হবে না?

তিতু থতমত খেয়ে বলল, হবে। কিন্তু ওঁরা যাবেন কোথায়?

কে, গগন? সে তো পা বাড়িয়েই আছে। তবে ছোটো মেয়েটাই গলার কাঁটা, শুনছি তার ভাড়াটের একটা চাকরে ছেলে আছে। তার সঙ্গেই নাকি বিয়ে। বিয়ে হয়ে গেলে গগন বোধহয় আর এখানে থাকবে না। তবে তার বাড়িটা তো আর আমরা নিচ্ছি না। শুধু বাগানখানা।

জীবনে ওই একবার ঘুড়ি চুরি করতে যাওয়া ছাড়া আর কোনও দুঃসাহসের কাজ করেনি তিতু। আজ করল।

বেশ গভীর রাতে সে একা গগন লাহিড়ীর বাড়ির ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হায়! সেই ফটকের আধখানা ভেঙে কেৎরে পড়ে আছে একধারে, কুকুর নেই। আজ গগন লাহিড়ীর বাড়ির অবারিত দ্বার।

তিতু ঢুকল। পায়ে পায়ে এগোল গগনের জাদুইঘরের দিকে, যেখানে থাকত ঘুড়ি লাটাই পুতুল ছবি।

ঘরখানায় কেউ থাকে। দরজা বন্ধ। ভিতরে নাক ডাকার আওয়াজ।

তিতু আস্তে আস্তে গিয়ে দালানে উঠল। নীচের তলার ভাড়াটেরা ঘুমিয়েছে। তিতু দেখল ওপর তলায় ডানদিকের কোণের ঘরখানায় আলো জ্বলছে। ওই ঘরে গগন থাকেন।

একটু হাসল তিতু। আজ আবার একবার চোর দায়ে ধরা পড়তে ইচ্ছে করছে তার। বড্ড ইচ্ছে করছে।

আগের মতো তিতু আর দুর্বল মেয়েলী ছেলেটি নেই। রেইন পাইপ বেয়ে এবং পুরোনো বাড়ির নানা খাঁজে পা রেখে সে দোতলার ব্যালকনিতে উঠে এল অনায়াসে। কেউ জিগ্যেস করল না, কে?

গগনের খোলা দরজার সামনে সে গিয়ে যখন দাঁড়াল তখন দেখল, গগন লাহিড়ী মেঝের ওপর বসে রং তুলি ছড়িয়ে নিয়ে ছবি আঁকছেন। ইজেল টিজেল নেই। টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো ক্যানভাস। মেঝেয় রঙ লেগেছে এখানে ওখানে।

কাকাবাবু।

গগন উত্তর দিলেন না। চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। এবং স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

আমি তিতু।

গগন একটা ঝাড়নে হাতের রঙটা মুছতে মুছতে একটু হাসলেন। তারপর বললে, সেই চোর! অ্যাঁ! আচ্ছা, আচ্ছা বেশ, আজ কেউ ধরেনি তোমাকে, নিজেই ধরা দিতে এসেছো! অ্যাঁ।

তিতু একটু হাসল। গগন যেন একটু নার্ভাস, একটু লজ্জিত।

গগন উঠলেন, বললেন, বোসো। আমি একটু চা করতে বলে আসি। এ সময়ে একটু চা হলে জমবে। তাই না?

আপনি জিগ্যেস করলেন না তো আমি দোতলায় কী করে উঠলাম?

ওঃ তুমি! তুমি কী ভাবে উঠলে! তাই তো! আশ্চর্য ব্যাপার।

গগন খুব যেন অস্বস্তির হাসি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, যে ভাবেই উঠে থাকো সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু আজ কী চাইবে বলো তো! কী দেবো তোমাকে? তুমি মস্ত বড়লোকের ছেলে, তার ওপর ডাক্তার, নার্সিং হোম বানাবে, তোমাকে আজ আমি কী দিতে পারি?

তিতু বরাবর লাজুক ছিল। কোনওদিন মুখ ফুটে চাইতে পারেনি কিছু।

কিন্তু আজ চাইল।

গগন লাহিড়ী খুবই অবাক হয়ে গেলেন। খুবই উত্তেজিত হয়ে ভিতর বাড়ির দিকে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বললেন, চন্দনা, শিগগির চা দে। চা! দু-কাপ।

মাঝরাতে যখন নিঃশব্দে নিজের বাড়ি ফিরল তিতু, একটু চিন্তিত, সন্দেহাকুল।

খোঁজ নিয়ে যে জানতে পেরেছে, ভাড়াটের ছেলের সঙ্গে মোটেই চন্দনার বিয়ের কথা নেই। তার চেয়েও বড় কথা ভাড়াটেদের তেমন কোনও বিবাহযোগ্য ছেলেও নেই।

তাহলে তিতুর বাবা ওকথা বলেছিলেন কেন? উকিল মানুষ, খবর না নিয়ে কি বাজে কথা বলতে পারেন?

অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে ভাবল তিতু। তারপর একসময়ে তার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। পরাশর একটু উস্কে দিয়েছিলেন তিতুকে। সম্ভবত যে বাড়িতে তিতু একদিন চোরের মতো ঢুকেছিল সেই বাড়িতে আর একবার রাজার মতো ঢুকবার পথ তৈরি করে দিতেই। পরাশর সেই ঘটনা ভোলেননি।

লামডিং-এর গল্প

লামডিং-এর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিশ্বেশ্বর সামন্ত দিন আর রাত কোথা দিয়ে যায় তা তিনি নিজেও জানেন না। সবসময়েই তাঁর মাথায় কিছু না কিছু খেলছে এবং সেইসব খেয়াল নিয়ে তিনি হাতে কলমে গবেষণা করেই চলেছেন নিজের ল্যাবরেটরিতে। নতুন যে বাই তাঁর মাথায় চেপেছে সেটা কিন্তু অদ্ভুত। একদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে এক টিপ নস্যি নিতে গিয়ে তাঁর মনে হল নস্যির ডিবেটা যেন শুধুই ডিবে মাত্র নয়। ডিবেটা যেন তাঁর ছোঁয়া পেয়ে বেশ খুশি হয়ে উঠল, যেন নীরবে বলে ফেলল, গুড মর্নিং। বিশ্বেশ্বর নস্যি নিলেন। সকালের প্রথম নস্যির টিপটা খুবই আরামদায়ক। নস্যি নেওয়ার পর চোখে জল চলে এল, নাকটায় ভারী একটা আরাম হতে লাগল, আর তখনই তাঁর মনে হল, নস্যিটাও যেন তাঁর নাকের মধ্যে ঢুকে তাঁকে ভারী আদর জানাচ্ছে।

এইসব অনুভূতি কাউকে বোঝানো যায় না, কিন্তু সামন্ত হঠাৎ যেন টের পেতে লাগলেন, তাঁর চারপাশে যে প্রাণহীন সব বস্তু রয়েছে, যেমন বইপত্র, খাট, আলমারি, টেবিল-চেয়ার, দেয়াল, দরজা-জানালা এ সবই বস্তুত যেন প্রাণহীন নয়। দেয়ালের দিকে তাকাতেই দেয়াল এবং গোচারণরত বংশীবাদক কৃষ্ণের ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার যেন হেসে উঠল। জানালা খুলতে গিয়ে মনে হল, জানালাটা যেন ফিসফিস করে বলল, বাবুর তাহলে এতক্ষণে আমাকে মনে পড়ল! পায়ে চটি পরতে গিয়ে মনে হল, চটিজোড়াও যেন সারারাত অপেক্ষার পর এখন তাঁর পাদস্পর্শে হাঁফ ছাড়ল।

বিশ্বেশ্বরের খুব বন্ধু হলেন গিরিন কুণ্ডু। উল্টো দিকের বাড়িতেই গিরিনের বাস। তিনি গানবাজনার লোক, বিজ্ঞান-টিজ্ঞানের ধারও ধারেন না। তাঁর ধারণা বিশ্বেশ্বরটা আসলে পাগল। ঘরে বসে কী সব যন্ত্রপাতি আর শিশিবোতল নাড়াচাড়া করে আর বিড়বিড় করে বকে। বিশ্বেশ্বরও মনে করেন যে, গিরিনটার মাথায় ছিট আছে, নইলে কেউ সকাল-সন্ধ্যে অমন আঁ-আঁ-আঁ-আঁ করে চেঁচায়? পরস্পরকে পাগল মনে করলেও মনের কথা প্রাণের কথা যা বলবার তা ইনি ওঁকে এবং উনি এঁকেই বলেন।

গিরিন সকালবেলায় বাড়ির সামনের বাগানে দাঁতন করতে করতে পায়চারি করছিলেন। গুনগুন করে একটা সুরও ভাঁজছেন। খুব আনমনা। সর্বদা তিনি সুরের জগতেই থাকেন।

ঠিক এমন সময় সুরের যে জালটা তিনি নিজের চারদিকে তৈরি করে ফেলছিলেন, সেটা ছিঁড়ে হুড়মুড় করে বিশ্বেশ্বর এসে সামনে দাঁড়ালেন, ওহে গিরিন, ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টগুলো যে আসলে ইনঅ্যানিমেট নয় এটা কখনও খেয়াল করেছ? বস্তুজগৎ বলে যেটাকে জানো সেটাও যে আসলে প্রাণময় সেটা টের পাও কি ভায়া?

গিরিনের মেজাজ খিঁড়ে গিয়েছিল। ভ্রু কুঁচকে বিশ্বেশ্বরের দিকে চেয়ে বললেন, দেখ বিশু, বস্তুজগতের কথা আমার সামনে উচ্চারণও কোরো না। জগৎটা ভেসে আছে সুরের ওপর। দুনিয়ায় যদি কিছু দেখছ সবই সুরেরই প্রকাশ। ওই যে গাছ, ওই যে আকাশ, এই যে বাতাস, ওই যে ফুল এ সবই সঙ্গীতেরই ফলিত রূপ। এ তত্ত্ব তোমাকে আগেও বুঝিয়েছি। তবু যে কেন বস্তু বস্তু করে তোমরা এত চেঁচামেচি করো বুঝি না।

বিশ্বেশ্বর থতমত খেয়ে বলেন, দূর! সুর আবার এর মধ্যে কোথায় পেলে? সঙ্গীতের ফলিত রূপ! সেটাই বা কি করে হয়? এ সব তো হেঁয়ালি।

তুমি গবেট বলেই হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। সঙ্গীতের সঙ্গ তো করলে না, সুরের সুড়ঙ্গের মধ্যেও ঢুকলে না, এসব বুঝবে কি করে?

বিশ্বেশ্বর ঘনঘন মাথা নেড়ে বললেন, তা বটে। সঙ্গীতের সঙ্গ বা সুরের সুড়ঙ্গে ঢোকা কোনোটাই আমার হয়ে ওঠেনি। কিন্তু গিরিন, তোমার তবলা, তোমার সেতার বা হারমোনিয়াম এরা কি কথা বলে কখনও?

গিরিন মাথা নেড়ে বলেন, না, তারা কথা-টথা কয় না। তবে তারা গায়। আমার সঙ্গে সঙ্গে তারাও সুরের ওপর ভাসতে থাকে। ওঃ, সে এক অলৌকিক ব্যাপার, তুমি বুঝবে না।

মাথা চুলকে বিশ্বেশ্বর বলেন, বিজ্ঞানে অলৌকিক বলে কিছু নেই। সবকিছু হাতে কলমে প্রমাণ করতে হবে। উঁহু, তোমার লাইনে আমার চলবে না।

বিশ্বেশ্বর গিয়ে নিজের ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়লেন।

গিরিন ফের গুনগুন করতে করতে পায়চারি শুরু করলেন। মনের ভুলে দাঁতন খসে পড়ে গেল। পায়ের তলায় ঘাস শুরু হয়ে গেল, চারপাশে যেন সঙ্গীতের একটা পরিমণ্ডল ঘনিয়ে উঠল। জগৎটা যেন সুরের মধ্যেই লয় হয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু গান নিয়ে থাকলেই তো আর হয় না, খেতে পরতেও হয়। গানের জাল ছিঁড়ে এবার হাজির হলেন গিরিনের বউ, ওগো, বাজারে যেতে হবে যে! ঘরে কিচ্ছুটি নেই।

গিরিন বিরক্ত হলেন, কিন্তু হাত বাড়িয়ে বাজারের থলি আর টাকা নিয়ে রওনাও দিলেন। গান গাইতে গাইতেই তিনি বাজার করলেন। আলুওয়ালা বসন্ত পোদ্দারকে একবার জিগ্যেস করলেন, তোমার চারদিকে যেন গান, কেবল গান, সুর আর সুর, তা বুঝতে পারো?

বসন্ত পোদ্দার গম্ভীর হয়ে বলে, যেদিন বিক্রিবাটা ভালো হয় সেদিন যেন একটু একটু বুঝতে পারি। তবে সেটা গান নয়, একটা ঝুনঝুন শব্দ।

শব্দ! কিসের শব্দ বলো তো! নূপুরের নাকি?

আজ্ঞে না। খুচরো পয়সার শব্দই হবে। কে যেন একেবারে ঝাঁপি উপুড় করে পয়সা ঢেলে দিচ্ছেন আমার কোঁচড়ে। তখন খুব মা লক্ষ্মীর কথা মনে পড়ে।

গিরিন আর দ্বিরুক্তি না করে মাছের বাজারের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

বাজার সেরে ফেরার সময় বটতলার ছায়ায় ঘড়িরামের সঙ্গে দেখা। ঘড়িরামের কথা লামডিং-এর সবাই জানে। খুব ঘড়ির শখ ছিল তার। অতি কষ্টে পয়সা জমিয়ে একখানা ঘড়ি কিনল। সেই সাধের ঘড়ি চুরি যাওয়ায় ঘড়িরাম ক্ষেপে গিয়ে রাস্তা-ঘাটে যাকে পেত তারই ঘড়ি কেটে নিত। এইভাবে অনেক ঘড়ি জমিয়ে ফেলেছিল সে। তারপর একদিন পুলিশ ঘড়িসমেত তাকে ধরতে এলে সে ঘড়ি বাঁচাতে তুমুল লড়াই করে শেষে পুলিশের গুলিতে মারা গেল। অবশ্য মরার পরেই তার ভিতর থেকে ভূত ঘড়িরাম বেরিয়ে এসে পুলিশকে পাল্টা আক্রমণ করে একেবারে পর্যুদস্ত করে দেয়। সেই ঘড়িরাম এখন ভারী গেরস্ত ভূত। মেরি নামে একজন দুঃখী মেয়ে-ভূতকে বিয়ে করে মিত্তিরদের পোড়ো বাড়িতে বাস করে। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না রাত্তিরে তাদের হাত ধরাধরি করে বেড়াতে দেখা যায়। দিনের বেলায় অবশ্য তাদের দেখা মেলে না। তাই আজ সকালে ঘড়িরামকে দেখে গিরিন একটু অবাক হলেন।

এই যে ঘড়িরাম, তা খবর-টবর ভালো? জিগ্যেস করে গিরিন আড়চোখে দেখলেন ঘড়িরামের হাতেও বাজারের থলি। কিন্তু ঘড়িরাম কোথায় বাজার করে সেটা তাঁর জানা নেই।

ঘড়িরাম বেজার মুখে বলল, ভালো আর কোথায় বলুন। লামডিং-এ থেকে আর সুখ নেই।

গিরিন অবাক হয়ে বললেন, কেন বলো তো! লামডিং-এর মতো এমন জায়গা আর কোথায় আছে? এর আকাশে সুর, বাতাসে সুর, চারদিকটা যেন একেবারে গানে গানে মাখামাখি। তুমি শুনতে পাও না ঘড়িরাম?

ঘড়িরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, গান কি করে শুনব বলুন। আমার তিন হাজার ঘড়ির শব্দে বাইরের কোনো আওয়াজই শোনার উপায় নেই। তবে ওই ঘড়ির শব্দই আমার গান। দুনিয়ায় ওর চেয়ে ভাল গান আর কিছু হতে পারে না।

ঘড়িরাম একটু গুণ্ডাপ্রকৃতির বলেই ইচ্ছে থাকলেও গিরিন তার সঙ্গে তর্ক করতে গেলেন না। ঘড়িরামকে চটিয়ে লাভ নেই। তিনি ভাল মানুষের মতো মুখ করে জিগ্যেস করলেন, তোমার তা হলে সমস্যাটা কী?

সে মশাই, খুব জটিল সমস্যা। জ্যান্ত থাকতে যাদের ঘড়ি কেড়ে নিয়েছিলুম তারা ঘরে ভূত হয়ে এসে ঘড়ি ফেরত চাইছে। রোজ ভারী হাঙ্গামা হচ্ছে মশাই।

একগাল হেসে গিরিন বললেন, তাহলে ঘড়িগুলো ফেরত দিয়ে দাও ঘড়িরাম। ঘড়ির শব্দ না থাকলে তুমি তখন এই বিশ্বের সঙ্গীত শুনতে পাবে। আর তাতে—

ঘড়িরাম আর সামলাতে পারল না। পটাং করে গিরিনের মুখে একখানা ঘুষি মেরে হন-হন করে হাঁটা দিল।

ভূতের ঘুষি ঠিক বাস্তব ঘুষির মতো না হলেও তার ধাক্কাতে গিরিন চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেন।

ঘড়িরাম যখন মিত্তিরদের পোড়ো ভিটেয় এসে ঢুকল, তখন মেরি কানে তুলো গুঁজে নেতিয়ে পড়ে আছে। ঘড়িরামকে দেখে হ্যাঁদানো গলায় বলল, আজ সকালেও শ'পাঁচেক ভূত এসে এতক্ষণ এমন চেঁচান চেঁচিয়েছে যে আমার মাথা ধরে গেছে। আজ আর আমি রান্না-টান্না করতে পারব না। হয় তুমি ঘড়িগুলো বিদেয় করে দাও নয়তো কাল সকালেই আমি চললুম। গির্জায় ঝাঁট-ফাঁট দেওয়ার লোক নেই, আমি বরং সেখানেই গিয়ে থাকব।

ঘড়িরাম গম্ভীর হয়ে বলল, মেরি, তোমাকে আমি ভালবাসি বটে কিন্তু মনে রেখো, ঘড়ির জন্যই একদিন আমাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। প্রাণ থাকতে ঘড়ি আমি হাতছাড়া করতে পারব না।

মেরি ঝাঁঝের গলায় বলল, জ্যান্ত মানুষের মতো কথা বোলো না। তোমার প্রাণ আর কোনোদিনই যাওয়ার নয়। ভূতের কখনও প্রাণ যায় বলে শুনেছ?

ঘড়িরাম আর মেরিতে এইভাবে একটা ঝগড়া লেগে পড়ল। সেই ঝগড়ায় ইন্ধন দিতে লাগল হাজার হাজার ঘড়ির টিকটিক শব্দ। আর সেই ঝগড়ার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে পাঁচসাতশো ভূতও এসে জড়ো হয়ে গেল। তারা তুমুল কোলাহল করতে লাগল, ঘড়িরাম, আমাদের ঘড়ি ফেরত দাও।

ঘড়িরাম বলল, প্রাণ থাকতে নয়। ঘড়ি গেলে আমার ঘড়িরাম নামটারই কোনো মানে থাকে না।

কিন্তু ভূতেরা সে কথা শুনতে নারাজ। দেখতে দেখতে ঘড়িরামের সঙ্গে তাদেরও ঝগড়া লেগে গেল।

ভূতেদের কোনো সময়জ্ঞান নেই। তাদের ঝগড়া লাগলে সে ঝগড়াও সহজে শেষ হতে চায় না। ঝগড়া নাগাড়ে চলতে থাকে। কখনও কখনও তিন-চার দিন অবধি গড়ায়। সুতরাং ঝগড়া চলতে থাকুক, আমরা সেই ফাঁকে বিশ্বেশ্বরকে একটু দেখে আসি।

বিশ্বেশ্বর সারাদিন তাঁর নস্যির ডিবে, দেয়াল, দরজা-জানলা, পেপারওয়েট, কলম ইত্যাদি নিয়ে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করলেন। যতই করলেন ততই যেন তিনি একটি রহস্য মোচনের কাছাকাছি পৌঁছতে লাগলেন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, পৃথিবীর কোনো জড়বস্তুই আসলে জড় নয়। শুধু প্রাণময়ই নয়, এইসব জড়বস্তু অতিশয় বুদ্ধিমান ও ঘড়েল। এরা কিছুতেই ধরা দিতে চাইছে না। ধরি-ধরি ছুঁই-ছুঁই একটা ভাব করেই ফের আত্মগোপন করে ফেলেছে।

কিন্তু কুছ পরোয়া নেই। জড়বস্তুর তো আর অভাব পড়েনি। বিশ্বেশ্বর জ্যোৎস্না রাতে বেরিয়ে পড়লেন জড় বস্তুদের রহস্য উদঘাটন করতে। তাঁর বাড়ির কাছেই রাস্তার ধারে একটা ডাকবাক্স। কাছাকাছি একটা ল্যাম্পপোস্ট। একটু দূর থেকে বিশ্বেশ্বর পরিষ্কার টের পেলেন ল্যাম্পপোস্ট আর ডাকবাক্স পরস্পরের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা মারছে। কিন্তু তাকে দেখেই যেন সামলে নিয়ে জড় বস্তুর অভিনয় করতে লাগল।

বিশ্বেশ্বরের মনে হতে লাগল, একটা লাল বাড়ি একটা সাদা বাড়ির সঙ্গে হাসি-মস্করা করছে। একটা ঢিল যেন একটা পাটকেলের কানে কি বলল। জল আর বাতাসের মধ্যেও একটা চাপা ভাব-ভালোবাসা টের পেলেন বিশ্বেশ্বর। যতই টের পেলেন ততই হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলেন। ব্যাটাদের ধরতেই হবে।

গিরিনের বাড়ির সামনে বারান্দায় গিরিন বসে আছে। গলায় গান নেই, একটা মাফলার আছে।

বিশ্বেশ্বর হাঁক মারলেন, ও গিরিন, কিছু টের পাচ্ছ?

গিরিন খিঁচিয়ে উঠলেন, খুব পাচ্ছি।

কী টের পাচ্ছ?

ভূতের কিল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

ভূত! ভূত বলে কিছু নেই হে, বিজ্ঞান ভূত মানে না। তবে ইনঅ্যানিমেটদের ভাল করে লক্ষ্য করে যাও হে গিরিন। তোমার চারদিকে ভীষণ ষড়যন্ত্র চলছে!

গিরিন আঁতকে উঠে বললেন, কিসের ষড়যন্ত্র?

ওহ, সে সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র হে। তোমার পায়ের চটিজোড়াকে লক্ষ কর, তোমার আড়ালে ওরা ফিসফাস করে কথা বলে যাচ্ছে। তোমার তবলার ডুগি, তোমার তানপুরা-হারমোনিয়াম এদের কাউকে বিশ্বাস কোরো না, এরা মহা চালাক, মহা ঘড়েল।

গিরিন লাফিয়ে উঠে আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, বলো কী ওসব কি চুরি হয়ে গেল নাকি?

ওহে গিরিন, শুধু গানের সঙ্গে ঘুঘুপাখিটি হয়ে মগডালে বসে থাকলেই তো চলবে না। চারদিকে ভাল করে তাকাও, তবে মজাটি টের পাবে।

এই বলে বিশ্বেশ্বর হনহন করে এগিয়ে গেলেন। চারদিকে যে জড়বস্তুরা নিছকই জড় সেজে বসে আছে তাতে সন্দেহ নেই। এবং এরা যে ফাঁক পেলেই সাধারণ বুদ্ধিমান প্রাণীর মতোই আচরণ করে তাতেও ভুল নেই। কিন্তু মুস্কিল হলো, প্রমাণটাই করা যাচ্ছে না।

বিশ্বেশ্বর হাল ছাড়লেন না, নানা জায়গায় সময়-অসময়ে ওত পেতে বসে থাকলেন, ধরা ওদের পড়তেই হবে।

ওদিকে মিত্তিরদের পোড়ো বাড়িতে তিন দিন নাগাড়ে ঝগড়া চলবার পরও যখন কোনো পক্ষেরই রণে ভঙ্গ দেওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না তখন হঠাৎ লামডিং-এর লোকেরা এক আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পেল। এর আগে লামডিং-এ দুধ, ক্ষীর, এমনকী বোঁদের বৃষ্টিও হয়েছে। কিন্তু এতকালের মধ্যে কেউ কখনও ঘড়ি-বৃষ্টি দেখিনি। লামডিং-এ সেই আশ্চর্য কাণ্ডই ঘটে গেল। হঠাৎ নির্মেঘ আকাশ থেকে রাশি রাশি ঘড়ি পড়তে লাগল।

আরও বিস্ময়ের কথা সেই ঘড়িগুলো বেশ পরিষ্কার বাংলা ভাষাতেই 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে আর্তনাদ করছিল।

এরকমই একটা ঘড়ি পেয়ে বিশ্বেশ্বর তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন তবে! এতদিনে লুকোছাপা ধরা পড়ে গেল তো বাছাধন।

ঘড়িটা চিঁহি করে বলল, ঘাট মানছি মশাই, এখন দয়া করে আমাকে লুকিয়ে রাখুন। ভূতের ঝগড়ায় আমাদের যে প্রাণ যায়।

বিশ্বেশ্বর ঘড়িটা ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে গিরিনকে ডাকলেন, ও গিরিন, কিছু বুঝতে পারছ?

গিরিন বেরিয়ে এসে শুধু মাথা নেড়ে জানালেন যে, বুঝতে পেরেছেন। তাঁর গলা বসে গেছে। কথা কইবার উপায় নেই।

এক আশ্চর্য শহর

লামডিং সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়ে গেলেও এখনও বহু কথা অকথিত থেকে গেছে। আমরা লামডিং-এর ভূত, পরী, কৃপণ, চোর প্রভৃতির কথা শুনেছি বটে, কিন্তু লামডিং-এর মৃতদের বিষয়ে তেমন করে কিছুই বলা হয়নি।

আসলে লামডিং নামক আশ্চর্য জায়গায় মানুষের মৃত্যুটাও একটু ভিন্ন রকমের। একথা ঠিক যে লামডিং-এর কিছু লোক মরে ভূত হয় এবং ভূতের মতোই আচরণ করে বেড়ায়। এসব ভূতদের মধ্যে উপকারী এবং অপকারী, শিষ্ট ও দুষ্ট, পাজি ও ভাল নানারকম ভূত আছে। আবার কিছু লোক মরে গেলেও প্রকৃতপক্ষে ভূত হয় না। এরা পারতপক্ষে মৃতবৎ আচরণই করে থাকে।

একসময়ে লামডিং-এ মৃতদের দাহ বা কবরস্থ করা হবে কি হবে না এই নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই বিতর্ক চলে বছরের পর বছর এবং বিতর্ক দাঙ্গা পর্যন্ত গড়ায়। সেই দাঙ্গায় উভয় পক্ষেরই বেশ কয়েকজন মারা যায় এবং ভূত হয়ে তারা ফের পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দে লিপ্ত হয়। ফলে লামডিং-এ ঘন ঘন ঝড়, ভূমিকম্প, জলকম্প, দাবানল ইত্যাদি দেখা দিতে থাকে। দীর্ঘ বিতর্কের শেষে ঠিক হয় যে, লামডিং-এর উত্তরদিকে অবস্থিত গুহা-পাহাড়ে মৃতদের বাক্সবন্দী করে রেখে দেওয়া হবে। মৃতদেহে যাতে পচন না ধরে তার জন্য দিগম্বর কবিরাজ একটি চমৎকার আরক তৈরি করে দিতেও রাজি হন।

গুহা-পাহাড় সম্পর্কে জনসাধারণের তেমন কিছু জানা নেই। কারণ, গুহা-পাহাড়ে বিস্তর জটিল গুহা থাকলেও এর শীর্ষদেশটি অত্যন্ত দুর্গম ও সম্পূর্ণ খাড়া। বিশেষ রকমের উঁচুও বটে। এই পাহাড়ের শীর্ষদেশটি সর্বদাই কুয়াশা বা মেঘে ঢাকা থাকে বলে দূরবীন দিয়েও কেউ কখনও এই পাহাড়ের চূড়া দেখতে পায়নি এবং ওখানে কী আছে তাও কেউ জানে না। যারা ওপরে ওঠার চেষ্টা করেছে তারাও কেউ সফল হয়নি। কাজেই এই দুরারোহ পাহাড়টি তার আবছা চূড়াটিসহ এক রহস্যই রয়ে গেছে। তবে পাহাড়ের নিচের দিকে অনেকগুলি ছোটো ও বড় গুহা আছে। বেশিরভাগ গুহাই একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত। গোলকধাঁধার মতো এই সব গুহাগুলি একদিক দিয়ে বিপজ্জনকও। একসময়ে শিশুরাও এইসব গুহায় লুকোচুরি খেলতে এবং প্রেমিক-প্রেমিকারা গোপনে প্রণয় করতে ঢুকত। অনেক সময়েই দেখা যেত তারা আর ফিরে আসছে না। কমলা আর ইন্দ্রধনু নামে দুটি শিশু এইভাবেই গুহার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল, অবশেষে প্রায় দশ বছর পরে তারা যখন ফিরে এল তখন তারা দুজনেই যুবক যুবতী। নন্দা ও শুভকুমার নামে দুটি প্রেমিক-প্রেমিকারও অনুরূপ দশা হয়েছিল। তারা ফিরে এসেছিল প্রায় পঁচিশ বছর বাদে যখন তারা দুজনেই বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ। গুহার মধ্যে তারা কী করে কোথায় এত বছর বেঁচে ছিল তা তারা কেউই কবুল করেনি।

এই গুহার ভিতরেই লামডিং-এর মৃতদেহ রাখার ব্যবস্থা হল। ব্যবস্থাটি সকলেরই মনঃপূত হয়েছিল সন্দেহ নেই। দিগম্বর কবিরাজের তৈরি করা আরক মাখিয়ে মৃতদেহগুলি কাঠের বাক্সে শুইয়ে দেওয়া হত এবং গুহায় রেখে আসত লামডিং-এর লোকেরা।

কিন্তু মুশকিল হল, মৃতদের মধ্যে সকলেই শান্ত ও সজ্জন নয়। যেমন কুহক হালদার লোকটি তাঁর কোপনস্বভাবা স্ত্রীকে মোটেই পছন্দ করতেন না। একদিন মাঝরাতে কুহক শরীর সমেত গুহাবাস ছেড়ে নেমে এসে তাঁর স্ত্রীর গলা টিপে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। ব্রজেনবাবু তাঁর গাইয়ের বিয়োনোর সময় টুকটুক করে এসে হাজির হয়েছিলেন।

গুহাবাসী মৃতদের এই আনাগোনা যথেষ্ট অসুবিধে এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই। উপরন্তু লামডিং-এর ভূতদের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। ভূতদের শরীর নেই, গুহাবাসী মৃতদের শরীর আছে। ভূতরা অতএব শরীরের দাবী তুলতে লাগল। শোনা যায়, গুহাবাসীদের সঙ্গে এক অমাবস্যার রাতে তাদের তুমুল মারদাঙ্গাও হয়েছিল।

এরপর নিয়ম হয়ে যায়, গুহাবাসী মৃতরা আর কোনও অবস্থাতেই শহরে ঢুকতে পারবে না। গুহার মুখে একজন পাহারাদার রাখা হবে। এই নিয়মের ফলে গুহাবাসী মৃতরা যে বেশ চটে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং ফলটাও বিশেষ ভাল হয়নি। যেমন সাত্যকীবাবু মারা যাওয়ার কয়েকদিন পর তিনি লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় রেখে গেছেন তা যখন তাঁর স্ত্রীর জানা দরকার হয়ে পড়ল এবং তাঁর স্ত্রী গুহায় গিয়ে স্বামীর কাছ থেকে খবরটা জানার চেষ্টা করলেন তখন কিন্তু সাত্যকীবাবু মোটেই স্ত্রীর সঙ্গে সহযোগিতা করেননি, বরং মড়ার মতো মটকা মেরেই পড়ে ছিলেন।

সাত্যকীবাবুর স্ত্রী মনোরমার বয়স খুবই কম। বড়জোর বাইশ তেইশ এবং দেখতেও রীতিমতো সুন্দরী। সাত্যকীবাবু মারা যাওয়ায় তিনি বেশ আতান্তরে পড়ে গেলেন। হাতে মোটেই পয়সা নেই এবং লোহার সিন্দুকও খোলা যাচ্ছে না। কয়েকজন চাবিওয়ালা চেষ্টা করে ফেল মেরে গেল। কামারপাড়া থেকে একজন ভাল কামার এসেও চেষ্টা করে পারল না। লামডিং-এর বিখ্যাত চোরকে আনা হল, চোরের তো অনেক বিদ্যে থাকে। কিন্তু চোরও সুবিধে করতে না পেরে মাপ-টাপ চেয়ে পালাল।

একদিন টাকার শোকে শোকাকুলা মনোরমা আলুলায়িত চুলে উদাসীন মুখ করে দুপুরবেলা জানালার ধারে বসেছিল। একটি অতিকায় ধূর্ত চেহারার লোক এসে বলল, সিন্দুক আমি খুলে দিতে পারি, কিন্তু সিন্দুকে যা আছে তার অর্ধেক আমাকে দিতে হবে।

মনোরমা অনেক দরাদরি করার চেষ্টা করল, কিন্তু লোকটা অর্ধেকের নিচে নামল না। অগত্যা মনোরমা রাজি হল।

লোকটা তার ঝোলা থেকে নানারকম যন্ত্রপাতি বের করে সিন্দুকটার ওপর চড়াও হল। ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় সে সিন্দুক খুলে ফেলার পর দেখা গেল, তাতে কিছুই নেই। একটা কানাকড়িও নয়।

লোকটা ভারী রেগে গিয়ে বলল, এর মানে কী? আমাকে শুধু শুধু হয়রান করা!

মনোরমা শূন্য সিন্দুক দেখে কাঁদতে বসল।

লোকটা সুন্দরী মনোরমার চোখের জল দেখে আর থাকতে পারল না। বলল, আর কেঁদো না, চলো আমিই তোমাকে নিয়ে যাই। সুন্দরী মেয়ে হলেও আমার পোষায়।

এ কথায় মনোরমা ভীষণ রেগে গেল। নিজের ওপর ভারী ঘেন্নাও হল তার। সে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির উঠোনের পুরোনো কুয়োর গভীর জলে আত্মহত্যা করার জন্য ঝাঁপ দিল।

ঝাঁপ দিয়ে অথৈ জলের মধ্যে ডুবে গেল মনোরমা। ডুবতে ডুবতে একেবারে তলায় ঠেকে সে দেখতে পেল, দুটো পেতলের কলসী পড়ে আছে। দুটোরই মুখের ঢাকনা সরিয়ে সে দেখতে পেল, গলায় গলায় মোহর।

কাজেই মনোরমার আর মরা হল না।

পরদিন থেকেই সারা শহরের লোক মনোরমার খোঁজ খবর নিতে লাগল। অনেকেই বলতে লাগল, আহা, অনাথা বিধবা, আমাদেরই তো দেখা উচিত। এমন কি বিপত্নীক, তিন ছেলের বাবা, সত্তর বছর বয়সী

কম্বুনাথ হঠাৎ বলতে শুরু করল, বিধবা বিয়েতে আমার আপত্তি নেই। আমি ভেবে দেখেছি বিধবারাই প্রকৃত স্বামীর কদর বোঝে।

ওদিকে কম্বুনাথের ত্রিশ বছর বয়সী বড় ছেলে জম্বুনাথও বলল, আমারও তো বিধবা বিয়েতে তেমন আপত্তি নেই।

এইভাবেই বাপ-ব্যাটার একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠল।

মৃতদের গুহায় যে দারোয়ান বহাল হয়েছে সে একদিন এসে অভিযোগ করল, এতদিন সবই ঠিক ছিল। মড়ারা কেউ জ্যান্ত হওয়ার চেষ্টা করেনি। কিন্তু ইদানীং সাত্যকীবাবু খুবই ঝামেলা করছেন। তিনি প্রায়ই রাত্রে মনোরমার কাছে আসার জন্য ঝোলাঝুলি করেন। ফলে দারোয়ানের সঙ্গে প্রায়ই তাঁর ধস্তাধস্তি হয়। এখন কী করা? সাত্যকীবাবু বলছেন, তিনি তাঁর অনেক কষ্টে জমানো মোহরগুলো কুয়োর তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। মনোরমা সেগুলো তুলে এনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তিনি ওকে গলা টিপে মারবেন।

এ কথায় লামডিং-এর লোকেরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। কেউ বলল, মনোরমা ঠিক কাজই করেছে। কেউ বলল, না, সাত্যকীবাবুই উচিত কথা বলেছেন।

বিধবা বিবাহে যাঁর এত আগ্রহ সেই কম্বুনাথ বলতে লাগলেন, মনোরমার উচিত ঘড়া দুটো ফের কুয়োয় ডুবিয়ে দেওয়া এবং বিধবার মতোই থাকা।

জম্বুনাথ বলল, সাত্যকীবাবুর উচিত গলায় দড়ি দেওয়া।

এ কথায় চটে গিয়ে পঞ্চানন জম্বুনাথের গালে একটা চড় মারে, অবশ্য পঞ্চানন যে উপস্থিত থেকে এসব কথা শুনছে তা জম্বুনাথ টের পায়নি। কারণ পঞ্চানন অশরীরী। লামডিং-এর ইতিহাসে পঞ্চাননই একমাত্র লোক যে বহুকাল আগে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। সেটাই তার অহংকার, সে প্রায়ই অন্যান্য ভূতদের বড়াই করে বলে, গলায় দড়ি দেওয়া সোজা নয় রে, এলেম চাই, বুকের পাটা চাই, তার সেই অহংকারে আঘাত লাগায় বেয়াদপটাকে চড় না মেরে সে থাকতে পারেনি।

জম্বুনাথ যখন অশরীরীর চড় খেয়ে গালে হাত বোলাতে বোলাতে চারদিকে বেকুবের মতো চাইতে লাগল তখন কম্বুনাথ খুব হাসতে লাগলেন।

মনোরমা অবশ্য কারও কথাই গ্রাহ্য করল না। হাতে বিস্তর মোহর পেয়ে সে এমন খুশি হল যে খুব খাওয়াদাওয়া শুরু করে দিল। আসলে সাত্যকীবাবু ছিলেন ভারী কৃপণ লোক। তাঁর সংসারে মনোরমাকে অনাহারে অর্ধাহারে বেঁচে থাকতে হয়েছে। সেইসব খিদে এইবার চাগিয়ে উঠল। খেতে খেতে সে ধীরে ধীরে মোটা হতে লাগল। তারপর তার খিদে আরও বেড়ে যাওয়ায় সে আরও খেতে লাগল এবং আরও মোটা হয়ে গেল। শেষ অবধি সে এতই বিশাল আকৃতি ধারণ করল যে কম্বুনাথ আর বিধবা বিয়ের কথা মুখে উচ্চারণও করে না। আর জম্বুনাথ শহরের সবচেয়ে রোগা যুবতীটিকে বিয়ে করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

খাওয়ার জন্য লামডিং-এর যার সবচেয়ে নামডাক ছিল সে হল ভীম সিং। আস্ত খাসী, জোড়া পাঁঠা, এক গামলা পান্তুয়া, সাত সের দৈ, বারোটা মুর্গী, আস্ত কাঁঠাল, দেড়শ লুচি বা আশি টুকরো মাছ সে অনায়াসেই খেতে পারত। সব বাড়িরই বিয়ে, অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধে তার বাঁধা নেমন্তন্ন, খাওয়া দেখতে লোকও জুটে যেত মেলা।

হল কি, জম্বুনাথের বিয়েতে ভীম সিং-এর উল্টোদিকের সারিতেই খেতে বসেছিল মনোরমা, ভীম সিং বিশ হাতা ডাল খেয়ে ফেলতে না ফেলতেই মনোরমা একুশ হাতা উড়িয়ে দিল। ভীম সিং আশি টুকরো মাছ খেতে না খেতে দেখল মনোরমা পঁচাশিখানা খেয়ে আরও চাইছে। ভীম সিং এক গামলা মাংস দিয়ে পোলাও মাখতে গিয়ে দেখল মনোরমার মাংস খাওয়া আধাআধি এগিয়ে গেছে এবং আরও বড় গামলা। বলা বাহুল্য যে, মনোরমা বিধবা হলেও মাছ মাংস খেত, বাছাবাছি ছিল না।

ভীম সিং জীবনে এই প্রথম খেতে বসে ভারী একটা অনিচ্ছে টের পেতে লাগল। গা গুলিয়ে উঠল একটা বমি বমি ভাবে, ওয়াক তুলে ভীম সিং তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে কলতলায় সব উগরে দিল। হতভম্বের মতো

কিছুক্ষণ বসে থেকে সে গুটি গুটি বাড়ি ফিরে গেল। নিজে সে প্রচুর খায় বটে, কিন্তু ওই রাক্ষুসে খাওয়া সে অন্য কাউকে খেতে দেখেনি। জীবনে এই প্রথম সে বিকট খাওয়া কাকে বলে তা দেখল এবং দৃশ্যটা তার মোটেই মনোরম মনে হল না।

পরদিন থেকেই ভীম সিং-এর খাওয়া কমে গিয়ে সিকির সিকি ভাগে নেমে গেল। তারপর আরও কমে একেবারে এক মুষ্টিতে এসে ঠেকল। নেমন্তন্ন বাড়িতে যাওয়া সে একেবারেই ছেড়ে দিল।

লামডিং-এর একমাত্র বৈজ্ঞানিক ছিলেন রসময় শর্মা। তিনি যে কী আবিষ্কার করতেন কেউ তা জানত না। তবে মাঝে মাঝে তিনি এক একটা কিম্ভূত জিনিস হাতে নিয়ে দৌড়ে তাঁর ল্যাবরেটারি থেকে বেরিয়ে এসে চেঁচাতে থাকতেন, ইউরেকা! ইউরেকা!

লোকে ছুটে এসে জড়ো হয়ে হয়তো দেখল, রসময় একটা শিশি উঁচুতে তুলে ধরে সবাইকে দেখাচ্ছেন আর বীরদর্পে হাসছেন।

কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করল, কী ওটা?

রসময় গম্ভীর হয়ে জবাব দিতেন, হুঁ-হুঁ বাবা, বুঝবে, একদিন বুঝবে।

লোকে লাল, নীল, হলুদ ওইসব আবিষ্কার দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে গেল। কিন্তু জিনিসগুলো কী তা আর কেউই বুঝতে পারে না।

তবে শুধু রসায়ন নয়, রসময় পদার্থবিদ্যার চর্চা করতেন। একদিন ইউরেকা! ইউরেকা!! বলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে তিনি তাদের একটা চাকা দেখালেন, অনেকটা ট্রাই সাইকেলের চাকার মতো জিনিস। জিনিসটা কী জিজ্ঞেস করায় সেই আগের মতো বললাম, হুঁ-হুঁ বাবা, বুঝবে, একদিন বুঝবে।

কিন্তু মুশকিল হল, রসময় নিজেও বুঝতে পারছেন না তিনি ঠিক কী কী আবিষ্কার করেছেন বা করে চলেছেন। লাল, নীল তরল বা চাকা বা আরও এরকম নানা জিনিস তিনি বানিয়েছেন বটে, কিন্তু এগুলো ঠিক কোন কাজে লাগবে তা তাঁর মাথায় আসছে না।

একদিন গভীর রাত অবধি তিনি জেগে ল্যাবরেটরিতে কাজ করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমকে উঠে পিছন ফিরে যা দেখলেন তাতে তিনি হাঁ। ঘর জুড়ে বিশাল এক রাক্ষস কিংবা রাক্ষুসী দাঁড়িয়ে।

আঁ-আঁ করে অজ্ঞানই হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

কিন্তু রাক্ষুসী বলে উঠল, কী সব ছাই পাঁশ বানাও দিন রাত বসে বসে? একটু রোগা হওয়ার ওষুধ বানাতে পারো না?

রসময় ধাতস্থ হলেন। রাক্ষুসী নয়, সাত্যকীর বিধবা বউ মনোরমা। রসময় মনোরমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে বললেন, দাঁড়াও একটা ওষুধ বানিয়ে দিই, তাতে কাজ হতেও পারে।

এই বলে তিনি একটা জার থেকে খানিকটা সাদা রঙের তরল নিয়ে গরম করতে লাগলেন।

এখন হয়েছিল কি, লামডিং-এর খুনী ভূত পচুয়া সেই টেস্ট টিউবে ঢুকে ঘুমোচ্ছিল। পচুয়া এমনিতে খারাপ ভূত নয়, তবে বেঁচে থেকে অনেক খুন-খারাপী করেছিল বলে তার এখন মনস্তাপ এসেছে। সে অন্যান্য ভূতদের মতো বেয়াদপি না করে কোনও একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে সবসময়ে নিজের পাপ নিয়ে চিন্তা এবং অনুশোচনা করে। আজও তাই করছিল, আচমকা খানিকটা ঝাঁঝালো তরল গায়ে পড়ায় এবং তারপর গরম লাগায় সে উঠল।

টেস্ট টিউবের মধ্যে একটা কালো বস্তুকে নড়াচড়া করতে দেখে বৈজ্ঞানিক রসময় চেঁচাতে লাগলেন, ইউরেকা! ইউরেকা!

বলা বাহুল্য পচুয়া নিজেকে সামলানোর আগেই তরলটুকুসুদ্ধু মনোরমা তাকে খেয়ে ফেলেছিল।

পচুয়া এমনিতে খুবই বিষণ্ণ এবং নিরীহ ভূত হলেও আচমকা এরকম ভিজে গিয়ে, গরম হয়ে একটা অন্ধকার স্যাঁত-স্যাঁতে থলথলে গহ্বরে চালান হয়ে যাওয়ায় সে ভীষণ রেগে যায়। রেগে গিয়ে সে লাথি

ছুড়তে থাকে, দমাদম ঘুঁষি চালাতে থাকে এবং চিমটি খামচি ও হাঁচড় পাঁচড় দিতেও ছাড়ে না।

মনোরমা তার অভ্যন্তরে পচুয়ার ওই তাণ্ডবের ফলে নাজেহাল হয়ে 'বাবা রে, মা রে, গেলুন রে' বলে চেঁচাতে লাগল, তারপর দাপাতে লাগল। তারপর শুরু করল ছোটাছুটি।

লামডিং-এর লোকে বলে প্রায় এক মাস ধরে মনোরমা এক নাগাড়ে ছোটাছুটি করত। খেত না, ঘুমোত না। আর আশ্চর্যের বিষয়, এক মাস বাদে মনোরমা আবার আগের মতোই রোগা হয়ে গেল।

বৈজ্ঞানিক রসময়ের খুবই নাম-ডাক হয়ে গেল এই ঘটনায়।

এইসব ঘটনায় অবাক হওয়ার কিছুই নেই। লামডিং নামক আশ্চর্য শহরে এরকম হামেশাই ঘটে থাকে।

আগুনের ঘর, জাফরির ছায়া

১

সকাল বেলাতেই খেলনা ভাঙার জন্য অভী মায়ের হাতে মার খেয়েছিল। অভী ভাবলো সে খেলনার দোকান দেবে। খুব সহজেই জায়গাটায় পৌঁছে যাওয়া যায়। যেন জানালার পর্দা সরালেই সেই জায়গাটাকে দেখতে পাবে সে। সে জায়গাটা এখানকার মতো নয়। সেখানে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে রেল লাইনটা সোজা চলে গেছে। ভারী বাতাসে বুনো গন্ধ। আর পাখি ডাকছে। কত রকমের পাখির ডাক—হরিয়াল, রাধেশ্যাম, ঘুঘু, কোকিল, বগরী। মাথার ওপর ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, রেল লাইন আর পাথুরে নুড়ি থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তাপ। চারদিকে পাহাড়গুলো গভীর নীল। দেহাতী কুলিরা লাইন মেরামত করছে। স্টেশনটা খুব ছোট—একটা খেলনার মতো। চারদিকে মস্ত উঁচু গাছগুলো প্রকাণ্ড ডালপালা নামিয়ে স্টেশনটাকে ছায়া দেয়। সেই ছোট্ট স্টেশনটায় লোকজন নেই, কিংবা আছে হয়ত কিন্তু তাদের দেখা যায় না। সেইখানে অভী খেলনার দোকান দেবে।

সে জায়গাটা আছে কোথাও। কোনোদিন অভী সে জায়গাটা খুঁজে বের করবে। 'সেখানে যাওয়া যায়', অভী ভাবে—'আমি বাবার সঙ্গে যাবো। সেখানে মা যাবে না। মা'কে আমি নেবো না। মা তখন আমার জন্য কাঁদবে।'

মা কাঁদবে, একথা ভাবতে অভীর ভালো লাগলো।

অভী বাবাকে গিয়ে বললো,—'বাবা আমি খেলনার দোকান দেবো।'

বাবা হাসলো—বেশ তো। কোথায়?

—সে জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—ঠিক। আর একটু বড় হও, তখন দেখা যাবে।

—কত বড়?

—বারো বছর।

অভী মনে মনে হিসেব করলো। বারো বছরের হতে এখনো পাঁচ বছর দেরী আছে।

কীভাবে যে গুলতি থেকে পাথরটা ছিটকে গেল অভী তা বুঝতে পারেনি।

জেরী মাটিতে বসে পড়লো, হাতের এয়ারগানটা ছিটকে পড়লো দূরে। আর ঝোপ থেকে কাকটা সর্তকভাবে দুবার ডেকে উড়ে গেলো। জেরী দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে নিঃশ্বাস টানবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অভী ভাবলো—'ও মরে যাবে।' একবার অভীর ইচ্ছে হল পালিয়ে যেতে। সাহেব পাড়ার রাস্তাটা ভয়ঙ্কর নির্জন। কিন্তু সে নড়তে পারলো না।

জেরী উঠে দাঁড়ালো। দুটো হাতে মুঠো পাকালো। দু পা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল—কে তুমি? অভী বললো—'অভি'। জেরী হাল্কা পায়ে এগিয়ে এলো দাঁতে দাঁত চেপে ইংরিজিতে বললো—'তুমি আমাকে মেরেছো। এখন?'

অভী ইচ্ছে করে মারেনি। আসলে অভী কাকটকে মারতে চেয়েছিল; ঝোপের ওধারে জেরীকে সে দেখতেই পায়নি। কিন্তু কথাগুলো বলবার সময় পেলো না সে। জেরী তাকে মারলো। প্রথম ঘুঁষিটাই অভী আটকাতে পারলো না। ঘুষিটা পেটে লাগলো। ভয়ঙ্কর জোরে। অভীর মনে হল তার চোখের সামনে সবকিছুই একবার পাক খেয়ে গেলো। সে দুটো হাত উঁচু করে একটা কিছু ধরতে চাইলো। দ্বিতীয় ঘুষিটা নাকে এসে লাগলো। অভী পড়ে গেলো। জেরী জুতোসুদ্ধু পা দিয়ে লাথি মারলো তার কোমরে। বললো,—'ব্লাডি'।

অভীর মনে হল তার মাথার ভেতরটা হাল্কা হয়ে ধোঁয়াটে হয়ে গেলো। সে অনুভব করলো, তার মুখের পাশে, গালে নরম মিহি ধুলো লেগে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চাপলো সে। মুখের ভেতর ধুলো কিরকির করলো। নাকে ধুলোর গন্ধ। আস্তে আস্তে তার যন্ত্রণার অনুভূতি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তার কি হয়েছে তা'ও সে ভুলে যাচ্ছিল। সেই অস্পষ্ট ঘুমের মতো অনুভূতির মধ্যেও সে টের পেলো কেউ যেন ছুটে এলো। ধাক্কা মেরে জেরীকে সরিয়ে দিয়ে কি যেন চিৎকার ক'রে বললো। আর তারপর নরম সুগন্ধী দুটো হাত তাকে জড়িয়ে ধরলো। টেনে তুললো তাকে মাটি থেকে। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস তার মুখে লাগলো। সে জেন—অভী পরে জেনেছিল। বারো বছর বয়সেও অভীর দেহটা হাল্কা। এতো হাল্কা যে পনেরো বছর বয়সের মাঝারি গড়নের জেন তাকে অনায়াসে দুই হাতের ভেতর তুলে নিলো।

অভী ভাবলো—'শোধ নেবো।'

মা বলতো,—খবরদার ওই ড্রয়ার খুলো না।

—কেন?

—প্রশ্ন কোরো না, যা বলছি শোনো। ওখানে কখনো হাত দিও না।

কিন্তু অভী জানতে পেরেছিল ওই ড্রয়ারে কি আছে। দুপুরবেলা চুপি চুপি অভী এসে যেই 'চেস্ট-ড্রয়ার্স' এর কাছে দাঁড়ালো। ড্রেসিং টেবিলের ওপর চাবির গোছাটা প'ড়ে ছিল, যেটা আনতে অভীর ভয় করেনি।

অভী চাবিটা ঘোরালো। কোনো শব্দ হল না। অভী ড্রয়ারটা টানলো। কাগজ ছেঁড়ার মতো খস খস শব্দ ক'রে ড্রয়ারটা খুলে গেলো। অভী হাত বাড়ালো। হাত টানলো। তারপর তাকালো।

তার হাতের তেলোয় ছোট্ট, ভারী রিভলভারটা ঝকঝক ক'রে উঠলো। অভী তাকিয়ে রইলো। তার বাবার রিভলভার। ঘরটা নির্জন। কেউ নেই। ও ঘরে মা ঘুমোচ্ছে। অভী রিভলভারটা তুললো, তর্জনীটা বেঁকিয়ে ট্রিগারটার ওপর রেখে টানটান হয়ে দাঁড়ালো। এখন সে অনায়াসে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। কেউ বাধা দেবার নেই। তার মনে পড়লো, ওই জেরী তাকে বেধারক মেরেছে। সে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে, তার নাক কেটে গেছে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছে, সে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে, তার নাক কেটে গেছে। জেরী কেন তাকে মারলো, সে ইচ্ছে করে জেরীকে মারেনি, জেরীকে সে দেখতেই পায়নি। হঠাৎ এই নির্জন ঘরে ভীষণ রাগ হ'ল অভীর। জেরীর বাবা মা দু'বেলা এসে তার খোঁজ নিয়েছে, জেন তার পাশে ব'সে চকোলেটের মোড়ক খুলে তাকে খাইয়েছে, জেরীকে তিন দিন ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে—এ খবরও তাকে দিয়েছে জেন। তবু অভীর রাগ গেল না।

জানালা দিয়ে দুপুরের রোদ হ্রস্ব হয়ে এসে পড়েছে কার্পেটের ওপর। একটা গাছের ছায়া ছবির মতো কার্পেটে আঁকা। ছায়াটা দুলছে। অভী তাকিয়ে রইলো। ঘরটা ঠাণ্ডা? সেই ঠাণ্ডা ভাবটা অভীকে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে রইল। অভী ভাবলো—'জেরী মরে যাবে। ওকে আমি মেরে ফেলতে পারি।' অভী বললো—'ব্লাডি। জেরীটা ব্লাডি।' আর কোনো কথা তার মনে এলো না।

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে অভীর মনে হল সে চলতে পারছে না। পা দুটো আড়ষ্ট। অভী বাড়িয়ে দেওয়া পা'কে আবার টেনে নিলো। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। 'আমি ভয় পাচ্ছি',—অভী ভাবলো। তার কপালে একটু একটু করে ঘাম জমলো। তার পা দুটো থর থর ক'রে কাঁপলো। তবু অভী দাঁড়িয়েই রইলো।

অভী দাঁড়িয়েই রইলো। কতক্ষণ যে সে জানে না। তারপর হঠাৎ তার চটকা ভাঙলো। খেয়াল হল অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ? একঘণ্টা, না, তারও বেশী! জানালার রোদটা দীর্ঘ হয়েছে, রঙটা হলদে হয়ে গেছে। এক্ষুনি বিকেল হবে।

অভী ফিরে এলো। রিভলভারটা রাখলো। চাবি ঘোরালো। সে ভাবলো,—'রিভলভারটায় গুলি ছিল না।' বাবা কখনো গুলি ভরে রাখে না। পরীক্ষা করে দেখতে তার সাহস হল না। অভী বেরিয়ে এলো।

ল্যাংড়া আমের বাগান পার হ'য়ে রেল লাইনের ঢালু জমিটা দিয়ে নেমে এসে ছোট্ট, জল-জমে থাকা খাদটা লাফিয়ে গেলে সেই দ্বীপের মতো জায়গাটা। মুকুন্দ মিশিরের সঙ্গে অনেকবার এখানে এসেছে অভী। মুকুন্দ মিশির কাঠ কাটতো আর অভী বসে বসে পাখি দেখতো। যখন তার সাত বছর বয়েস ছিল তখন সে মুকুন্দ মিশিরের কাঁধে চড়ে এখানে আসতো। এখন আর আসে না। আজ এলো অনেকদিন পর।

শিমুল গাছটার তলায় অভী চুপ করে বসলো। একটা পাতা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ছিঁড়তে লাগলো। তার চারদিকে পাখির ডাক। পাতা ঝ'রে পড়ার অস্পষ্ট শব্দ। অভী ভাবতে লাগলো।

এখানে নয়। এখানে নয়। অনেক দূরে কোথাও। সেই ঘোড়াটা তাকে নিয়ে যাবে। কতোবার সেখানে যেন গিয়েছে অভী নিজে নিজে। একা। মস্ত উঁচু কালো রঙের সেই ঘোড়া, পিঠে জিন পরানো। ঘোড়াটা হাওয়ার আগে ছুটতে পারে। সেই জায়গাটা অভী চেনে না, তবু যেন চেনে। লাল কাঁকরের পথটা এগিয়ে গিয়ে শিমুল গাছে ঘেরা সেই আশ্চর্য শান্ত স্বচ্ছ দীঘিটা পার হয়ে সেখানে পৌঁছানো যায়। এখানকার মতো কোনো কিছু সেখানে থাকবে না, সেখানে সব অন্যরকম হবে। কিন্তু ওখানে আবার সবাইকে দেখতে পাবে সে —মা, বাবা, মুকুন্দ জ্যাঠা, সবাইকে। সেখানে সব কিছু অভীর ইচ্ছে মতো হবে। জেনকে মনে পড়লো অভীর।—জেরীর বোন। নরম, উষ্ণ, সুগন্ধী হাত। গন্ধটা যেন ও-রকম হাতে এমনিতেই থাকে—কোনো সুগন্ধী মাখতে হয় না। সেই হাত দুটো তার কাছে কাছে থাকবে। সে পড়ে গেলে, দুঃখ পেলে সেই হাত দুটো তাকে টেনে নেবে।

'মুকুন্দ মিশিরের কাছে আমি কুস্তি শিখবো'—অভী ভাবলো। 'জেরীর বয়স সতেরো, আমার বারো। তাই ও আমাকে মেরেছে, মারতে পেরেছে। কিন্তু আমি তখন ছোটো থাকবো না। অনেক অনেক বড়ো হবো। তখন আমার বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে।'

ঊরুতে চাপড় মেরে নরম মিহি মাটির ওপর সে মুকুন্দ মিশিরের সঙ্গে কুস্তি লড়বে। হাপরের মতো দম ছাড়বে দু'জন, ইঞ্জিনের মতো হাঁফাবে। গা দিয়ে ঘাম ঝরবে দরদর ক'রে। তার গায়ে জোর হবে। রোজ সকালে ছোলা ভেজানো খাবে সে, আর বাদাম। অনায়াসে সে জেরীকে 'চিৎ' করে দিতে পারবে তখন। ইচ্ছে মতো শাস্তি দিতে পারবে তাকে। সে কাউকে ভয় পাবে না, অথচ আর সবাই তাকে ভয় পাবে।

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে যেন কতোবার ঐ দেশে পৌঁছে গেছে অভী। অনেক দূর থেকে ট্রেনের বাঁশীর কান্নার মতো শব্দটা তাকে ডেকে গেছে যেন। চারদিকের নির্জন পৃথিবীটা ছাড়িয়ে ওই ট্রেনটা দূর থেকে দূরান্তরে, যেন অন্য কোনো গ্রহে চলেছে। চারদিকে ঘন অন্ধকার আর অস্পষ্ট কুয়াশা ভেদ করে ট্রেনটা চলেছে, চলেছে। যেন কোনোদিন থামবে না। সেই ট্রেন তাকে ডেকে যায়। বালিশে কান রেখে অভী শুনতে

পায় মাটি থেকে হৃৎপিণ্ডের আওয়াজের মতো একটা শব্দ ট্রেনটার গতির সঙ্গে তাল রেখে বাজতে থাকে। ধুক ধুক ধুক ধুক ধুক ধুক।

'আমার যখন পঁচিশ বছর বয়স হবে'—চারদিকে ঘন হয়ে আসা বিকেলের দিকে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে অভী ভাবলো—'আমি তখন ভয় পাবো না।'

অভী উঠে দাঁড়ালো।

'আমি ভেবেছিলাম খেলনার দোকান দেবো।'

'দিতে পারলে?' মৌ হেসে ফেললো—'বেশ মানাতো কিন্তু তোমাকে। চারদিকে অনেকগুলো মরা খেলনার মধ্যে একটা জ্যান্ত খেলনা। দেবে দোকান?'

'হ্যাঁ, এই তো দোকান—আমার চারদিকে। তুমি আমি সবাই সেই দোকানে আছি।' অভী মনে মনে বললো। মুখে কিছু বললো না। বলতে সাহস হল না। অভী চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো।

ঘরটাতে বিকেলের হলদে রোদ আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। অভী মৌকে দেখতে লাগলো। মৌ শাড়িটাকে আঁট ক'রে পরেছে, আঁচলটা ঘুরিয়ে কোমরে বাঁধা। পা'য়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হাল্কা বাঁশের আগায় লাগানো ঝাড়ন দিয়ে ছাদের ঝুল ঝাড়ছে ও। ওর মস্ত খোঁপাটা কাঁধের ওপর ভেঙে পড়েছে। ঘামে ভেজা লালচে মুখের একটা পাশ দেখতে পাচ্ছে অভী। ও উঁচু হয়েছে, শরীরটাকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করতে চেষ্টা করছে। অভী ওর কোমরের সামান্য অনাবৃত অংশ দেখতে পেলো। সাদা, মসৃণ চামড়া। অভীর হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল আর একটু সাহসী হতে। অভী ভাবলো—'ওর কাছে যাবো? ওকে ছোঁবো একটু?' অভী উঠলো না। সে মৌকে দেখতে লাগলো। ঘরের ভেতর থেকে রোদটা চুপি চুপি সরে যাচ্ছিল। সেই রোদটা অভীর পা ছুঁয়ে তারপর আর পায়ের কাছেই নিভে গেলো।

—বাঃ, চুপ ক'রে আছো যে? মৌ হাল্কা বাঁশের ঝাড়নটা ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে অভীর দিকে ফিরলো। আঁচলটা খুলে মুখ মুছলো তারপর সেই আঁচলটা ঘুরিয়েই বাতাস খেতে লাগলো।

—কী বলবো? অভী বললো।

—যা খুশি তোমার, কি হতে চেয়েছিলে, তুমি আর কি হতে চাও সব বলো। তোমার বকবকানি থামলে আমার ভালো লাগে না।

'আসলে তুমি ভয় পাচ্ছো।' অভী মনে মনে বললো—'বাড়িতে কেউ নেই, তাই আমাকে তোমার ভয়। ঠিক আমাকেও ভয় নয়, আমার চুপ করে থাকাকে ভয়। চুপ ক'রে থাকলে আমি বেশী বিপজ্জনক হতে পারি।'

—কী ভাবছো?

—সব কথা বলা যায় না। বলতে নেই।

—যা বলা যায়, তাতো বলতে পারো! মৌ হাসলো।

অভী তাকালো। মৌ হাসলো। অভী দেখলো ওর বড়ো বড়ো চোখ দুটো কাঁপলো,কুঞ্চিত হয়ে গেলো, ঈষৎ পুরু ঠোঁট দুটো প্রসারিত হল, একটা তরঙ্গ গালের ওপর দুটো টোলকে ঘিরে কাঁপতে লাগলো। ঠোঁট দুটো সম্পূর্ণ সরে গেলো না, দাঁত-গুলো অর্ধেক ঢাকা রইলো। ওর সমস্ত মুখটা উজ্জ্বল হয়ে হাসতে লাগলো। হাসিটা অদ্ভুত। যেন কোনো মানে নেই এই হাসির, তবু যেন আছে। হাসিটা যেন অভীকে বললো —'ভয় কি?' অভী মৌ'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। চেয়ারের হাতল থেকে হাত দুটো নামিয়ে কোলের ওপর জড়ো ক'রলো অভী। সে মনে মনে বললো 'জানো আমি রাজপুত্র হতে চেয়েছিলাম! আমি ভেবেছিলাম সেই কালো ঘোড়াটার পিঠে চড়ে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। কোথায় যাবো, ঠিক ছিল না। সে খুব ছোটবেলাকার কথা, আমার ভালো মনেও নেই। তবে আমি জানি, আমি একটা কিছু হতে

চেয়েছিলাম। তুমি শুনলে হাসবে। হাসবে আমি জানি। কিন্তু তুমি কাঁদবে। মনে ক'রে দেখো, তুমিও একটা কিছু হ'তে চেয়েছিলে। সবাই আমরা একটা কিছু হতে চাই, অথচ অন্যের সাধ শুনলে হাসি। সেই হওয়াটা আর হয়ে ওঠে না। মৌ, তখন আমরা কাঁদি।'

—মৌ তুমিই বলো না, তুমি কি হতে চাও।

—কি আবার! মৌ ভ্রূ দুটো কোঁচকালো বিরক্তিতে। তারপর শরীরটাতে একটা ঝাঁকানি দিলো।

ওর শরীরটাকে দেখলো অভী। ওর হাতে, আঙুলে, কণ্ঠায়, মুখে কোথাও একটা হাড় উঁচু হয়ে নেই। হাড়গুলো পরিমিত, সুন্দর মেদে ঢাকা। সেই মেদও সুন্দর, মসৃণ চামড়ায় মোড়া। একটু দীর্ঘও, তাই সামান্য রোগা দেখায়। মুখটা ছোট, শরীরের তুলনায় বেশ ছোট, তাই বোধ হয় বয়সের তুলনায় ওকে ছোট দেখায়। কপালটা প্রশস্ত নয়, কপালের ঠিক মাঝখান থেকেই যেন সেই নিবিড় কালো চুলের গোছটা শুরু হয়েছে। ওর কাঁধ দুটো নোয়ানো—ও দাঁড়ালে দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা একটু অসহায় মনে হয়। সেই অসহায় ভঙ্গীটা বদলাতে চাইলো মৌ, শরীরটাতে ঝাঁকানি দিয়ে দৃপ্ত হতে চাইলো। তির্যকভাবে অভীকে দেখলো ও।

—ওভাবে তাকিয়ে রয়েছো কেন?

—ভাবছি। অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে গেলো।

—ওভাবে তাকিয়ে কেউ ভাবে নাকি! তুমি একটা পাগল।

—পাগল হওয়ার বয়েস কি এখনো আমাদের আছে মৌ?

—কি জানি বাপু, ওসব কথা বুঝি না। মৌ ঠোঁট দুটো ছুঁচোলো করলো, তারপর হেসে ফেললো, —'আসলে তুমি এখনো ছেলেমানুষ। ছাব্বিশ বছর বয়সের খোকা একটি।'

—কোনো কোনো মানুষ আছে যারা বয়েস বাড়াটাকে টের পায় না। কেমন ক'রে যে বড় হয়ে যায় তা বুঝতেই তাদের বিস্তর সময় লেগে যায়। অথচ তারা কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। আমি বোধ হয় সেই রকম।

—তোমার তত্ত্বকথা রাখো। আমার শোনবার সময় নেই। রান্নাঘরে মা একা।

—বেশ, কি করতে হবে বলো।

মৌ হাসলো। তর্জনিটা উঠিয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ালো। বললো—চুপ ক'রে থাকো।

—তাহলে মৌ-নব্রত? অভী একটু টেনে উচ্চারণ করলো।

ঘরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। অভী মৌ-র মুখটা দেখতে পেলো না। কিন্তু মৌ কাছে এলো। ওর ঘামে-ভেজা শরীরের অস্পষ্ট মিষ্টি গন্ধ অভীর নাকে এলো। তারপর সুডৌল, নরম একটা হাত অভীর মুখটাকে চেপে ধরলো। অভী চমকে উঠলো। একটা অস্পষ্ট চেনা সুগন্ধ। মৌ হাতটা চট করে সরিয়ে নিলো। প্রায় ফিস ফিস ক'রে বললো—'অসভ্য'।

অভী হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু মৌকে পেলো না। মৌ এই প্রথম তাকে ইচ্ছে ক'রে ছুঁলো। সে নিঃশ্বাস টানলো। মৌ সরে গেছে।

খুট ক'রে সুইচ টিপে মৌ আলো জ্বালালো। আলোটা যেন অভীকে জোরে একটা চড় মারলো। সে চমকে উঠলো।

আলোতে মৌকে আবার দেখলো অভী। ওর মুখটা লাল টুকটুক করছিল। মৌ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পর্দাটা হাত দিয়ে অল্প একটু ফাঁক করলো। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

—অভী চুপ ক'রে রইলো। অভী ভাবতে লাগলো। মৌ হঠাৎ কথা বললো।

—এই তুমি যাবে না? সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাড়ি যাও এবার।

—এত তাড়া?

—তাড়াতে চাই যে। বাবার আসবার সময় হল, কাবেরীও ফিরবে এইবার। মৌ অভীর দিকে ফিরে একটু হাসলো। হাসিটা ম্লান নয়। হাসিটা উজ্জ্বল।

অভী উঠে দাঁড়ালো।

অভী ছোট্ট উঠোনটা পার হল। তালা খুললো। নির্জন ঘরটায় ঢুকলো। কেউ নেই যেন চারদিকে। কেউ ছিলও না। অভী চেয়ারটা টেনে বসলো। টেবল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে একটা বই টেনে নিলো। কিন্তু পড়তে বসলো না। কেবলই যেন একটা অস্পষ্ট সুগন্ধী কোমল হাত তার মুখ হাত বুলিয়ে দিলো। চোখের সামনে মৌ যেন হাসলো। সেই নিঃশব্দ, সুদৃশ্য হাসি।

'এই নির্জন লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটা'—অভী ভাবলো, ভাবতে লাগলো—'এই বাড়িটা এ রকম থাকবে না। কারো আশ্চর্য হাতের স্পর্শে ভরে উঠবে এই বাড়ি। মৌ আসবে একদিন। আমাকে ঘিরে রাখবে মৌ, আমাকে বন্ধন দেবে, সুখ দেবে, সন্তান দেবে। অমার ছোট্ট দুটো সুস্থ সবল ছেলেমেয়ে ঐ উঠোনটাতে খেলে বেড়াবে। ওদের উচ্চকিত হাসির শব্দ আমি ঘরে বসেও শুনতে পাবো। অনেক দূর থেকে কর্মক্লান্ত সময়গুলোর যতিতে ওদের আশ্চর্য সুখস্পর্শ পাবো আমি! আমাকে ওরা টেনে আনবে। আমাকে ওরা টেনে আনবে। এইখানেই সেই আশ্চর্য নতুন পৃথিবীর শুরু হবে। মৌ আমাকে বন্ধন দাও।'

নিজেকে বড়ো ক্লান্ত মনে হল অভীর। কতোদিন ধরে সে যেন একা। এই নির্জন ঘরটা তাকে মাঝে মাঝে ক্লান্ত করেছে। প্রথমে বাবা মারা গেলো, তারপর মাও। অভী কেঁদেছিল। সেই কান্নার যেন কোনো ছেদ ছিল না। সে ভেবেছিল—'আমি বাঁচবো কি ক'রে? কি ক'রে আমার চারদিকের এই পৃথিবীটা চলবে?' অভী ভেবেছিল তার নিঃসঙ্গতা কোনোদিন ঘুচবে না। 'কিন্তু মৌ এলে আবার আমি সব কিছু ফিরে পাবো'—অভী ভাবলো। অভী নির্জন ঘরে খুব আস্তে নিজেকে শুনিয়ে ডাকলো—'মৌ, মৌ, মৌ।' অভী নামটাকে বারবার উচ্চারণ করলো, নামটাকে ভাঙলো, বদলালো। বারবার বললো—'মৌ, তুমি আমাকে সেই শান্তি দাও, সেই বন্ধন দাও।'

পাঁচ বছর পর। অভী বললো,—'মৌ আমাকে মুক্তি দাও।' তার কথা কেউ শুনলো না। অভী নিজেকেই নিজে বললো।

অভী বিছানার ওপর উঠে বসলো। অনেক রাত। অভী হাত বাড়িয়ে জানালাটা খুলে দিলো। আকাশে মস্ত চাঁদ। অভী গরাদের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বিছানার দিকে তাকালো। ঠিক তার পাশেই বিকু—তার চার বছর বয়সের মেয়ে। বিকু বালিশ থেকে মাথাটা সরিয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। বিকুর পাশে টুকু—ওর বয়স তিন বছর। টুকু চিৎ হয়ে হাঁ ক'রে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার ওপাশে মৌ-র কোল ঘেঁষে, ওর বুকের সঙ্গে লেগে শুয়ে আছে টুলু,—অভীর এক বছর বয়সের ছেলে। মৌ বাঁ হাতটা দিয়ে টুলুকে জড়িয়ে আছে, মৌ-র মুখটা এপাশে ফেরানো। অভী তাকিয়ে রইলো। মৌ অনেকটা দূরে—অভী ভাবলো। অথচ মৌ কাছে ছিল। বুকের কাছে মৌ-র নরম মুখটা চেপে লেগে থাকতো ওর চুলগুলো অভীর গলায় জড়িয়ে যেতো, গালে মুখে স্পর্শ করতো। হাত বাড়ালেই, কিংবা হাত না বাড়ালেও মৌকে পাওয়া যেতো তখন। বিকু, টুকু, টুলু, এলো তারপর। মৌ আস্তে আস্তে দূরে সরে গেলো। এখন অভী আর মৌ-র মাঝখানে বিকু, টুকু, টুলু। এখন হাত বাড়ালেই মৌকে পাওয়া যায় না, ওদের ডিঙিয়ে যেতে হয়।

'মৌকে পাওয়া যায় না'—অভী ভাবলো—'মৌকে পেতে নেই। স্পর্শ করলেই মৌ মরে যায়, আর তাকে কিছুতেই বাঁচানো যায় না।'। অভী নিঃশব্দে উঠলো। দরজা খুললো। বাইরে এলো। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তাকে স্পর্শ করলো। চাঁদের আলো জাফরি ঘেরা বারান্দায় পড়েছে। জাফরির ছায়া একটা সুন্দর জালের মতো বিছিয়ে আছে। অভী পা বাড়ালো।

অভী নিজের ছায়ার দিকে তাকালো। ঈষৎ তির্যক ছায়া, মাথাটা দোমড়ানো, কাঁধদুটো উঁচু নিচু। চাঁদের আলোটা বেঁকে পড়েছে।

'একটু সাহসী হলে'—অভী ভাবলো—'আর একটু সাহসী হলে এই উঠোনটা পার হয়ে যাওয়া যায়। তারপর মৌ থাকবে না, বিকু, টুকু, টুলু, কেউ থাকবে না। অথচ এরা সবাই থাকবে। এই ঘর, এই দেয়াল

ওদের বন্ধ ক'রে রেখেছে। মৌ এই দেয়ালের মধ্যে থাকতে থাকতে, এই ঘরের মধ্যে থাকতে থাকতে দেয়ালের মতো হয়ে গেছে। ঘরটা আগুনের, সেই অসহ্য আগুন ওকে পুড়িয়ে মেরেছে।'

এই আগুনের ঘর থেকে বাইরে যাওয়া যায় না। এই ঘরে বিকু টুকু টুলু বড় হতে থাকবে। ওরা আমাকে জড়িয়ে থেকে, আমাকে অবলম্বন ক'রে বড় হতে থাকবে আর আমি মরে যাবো।

মৌও মরে যাবে। আর একজন মৌ অভীর বুকের ভেতর ঘুরে ঘুরে কাঁদবে। সেই কান্নার যতি নেই। অভী সেই কান্নাকে শুনবে। আর একজন মৌ কাঁদছে—অভী শুনতে পাবে, একটা শালিখের মৃতদেহকে ঘিরে আর একটা শালিখ যেমন কাঁদে। অভী অস্থির হবে, হাত বাড়াবে। কিন্তু মৌকে পাবে না।

অভী ঘরে ঢুকলো। দরজা বন্ধ করলো।

বুকচাপা অন্ধকার ঘরটা তাকে চেপে ধরলো। অন্ধকারটা নির্মম, কঠিন। একটা কুয়োর মতো একমুখী, গভীর, নিশ্চিত।

অথচ যেন যাওয়া যায়। এখনো যেন চলে যাওয়া যায়। কোনোদিন যাবে অভী সেইখানে। ভাবতে ভাবতে অভী নিশ্বাস ফেললো। তখন আবার ওরা নিবিড় হয়ে ফিরে আসবে। আগুনের ঘর থেকে মুক্তি পাবে ওরা।

'কিন্তু আমি তো সুখেই আছি। কেন ভাবছি মৌ মরে গেছে, কেন ভাবছি এখানে সুখ নেই। এই তো আমার আত্মীয়রা আমাকে ঘিরে আছে। সুস্থ সবল বিকু টুকু টুলু আর ওদের মা। আমার যা আয় তাতে বেশ চলে যায় আমাদের ক'জনের।' অভী নিজেকেই নিজে বললো। 'পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ঘর, উঠোনে তুলসীর মঞ্চ—রোজ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়, শাঁখ বাজে। আমাকে ঘিরে শান্ত, সংযত সুন্দর সংসার। আমি লাইনে গেলে, যাওয়ার সময় দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মৌ—আমার নিরাপদে ফিরে আসবার জন্য মনে মনে প্রার্থনা ক'রে, ওর ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল পরম বিশ্বাসে আমার পকেটে গুঁজে দেয়। আবার আমার ফিরে আসবার প্রতীক্ষা করে, রাত জেগে বসে থাকে, ঘড়িতে সময় দেখে, ট্রেনের শব্দ কান পেতে শোনে। আমার বিরক্তিকে ওরা বোঝে, আমার অবসরকে ওরা জানে, আমার আনন্দে ওরা সায় দেয়। এই তো সুখ আমাকে জড়িয়ে আছে।'

কোথায় যেন খুব সূক্ষ্ম তারে মৃদু আঘাতে বাজলো। সেই আঘাতটা বিস্তৃত হল, একটা সুরের পর্দায় বাঁধা পড়লো। অভী ভাবলো তার দুঃখটা যেন বিলাস।

অভী চোখ বুজলো। অভী যেন শুনতে পেলো ঝাউগাছে বাতাস আছড়ে পড়ার শব্দ। ঝাউগাছ দুললো। দুলতে লাগলো। সমস্ত পাহাড়গুলোকে এতক্ষণ আলো দিচ্ছিল সূর্যটা। এখন ডুবে গেলো। অন্ধকার।

শুকনো পাতা মাড়িয়ে অনেকদূর বন-বনান্তর থেকে তারা ফিরে এলো। ওরা শিকারে গিয়েছিল সবাই। ক্লান্ত দেহে ওরা নিজেদের গ্রামে ফিরে এলো। একটু পরে মহুয়া বনের কাছে ওরা জড়ো হল। বাতাসে মহুয়ার তীব্র গন্ধ। ফুল ঝ'রে পড়ার টুপটাপ শব্দ। আগুন জ্বললো। গাঁয়ের সবচেয়ে বুড়ো লোকগুলো গাছের গুঁড়ির চারপাশে চুপ করে বসেছে। ওদের মুখে আগুনের শিখা কাঁপলো। তারপর নাচ শুরু হল।

যাদের বয়েস অল্প তারাই হাত ধরাধরি করে নাচ শুরু করলো। ওরা ঝুঁকলো, শালিখের ধান খুঁটে খাওয়ার ভঙ্গিতে দুললো, ছিলা ছিঁড়ে যাওয়া ধনুকের মতো ওরা সোজা হ'ল, পিছনের দিকে ঝুল খেয়ে আকাশের দিকে তাকালো। আগুনটা ঠিক মাঝখানে জ্বলতে লাগলো, কাঁপতে লাগলো। একটা করে মেয়ে আর একটা করে ছেলে পাশাপাশি—এ ওর কোমর জড়িয়ে ধরে। ওদের বৃত্তটা কখনো বড় হচ্ছে, কখনো ছোট। ওরা গোল হয়ে নাচছে।

একটু আগে ওরা মহুয়ার মদ খেয়েছে, আর আগুনে ঝলসে নেওয়া মাংস। ওরা সবাই মাতাল। ওদের চোখ নেশায়, শ্রমে আর ঘুমে ঢুলে আসছে। তবু ওরা নাচছে। ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া মাঠ পার হয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ওদের দেহগুলোকে ছুঁয়ে মহুয়ার বন আর ঝাউগাছকে দুলিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে।

তবু ওরা নাচছে, নাচছে, আর নাচছে। 'এই নাচ যেন কোনোদিনই না থামে' অভী ফিসফিস করে বললো—'আমি থাকবো না, তখনো নয়।'

ওরা সবাই সাহসী। আবার সকাল হবে। রাত্রির সমস্ত অবসাদ আর আনন্দকে ভুলে গিয়ে ওরা কাঁধে ধনুক নেবে। তারপর জোয়ান মদ্দ মানুষগুলো পাহাড়ের দিকে পাড়ি দেবে। মেয়েরা ফসলের ক্ষেতে যাবে। কেউ কাউকে মনে রাখবে না। ওদের শিশুরা বড় হবে, ওদের মতোই সাহসী হবে। বেঁচে থাকাকে ওরা পরোয়া করবে না, তাই বাঁচতে বাঁচতে ওরা ক্লান্ত হবে না।

হরেন দত্ত একটা গল্প বলছিলেন। বাকি তিনজন তাকে ঘিরে বসে শুনছিলেন। সকলেরই বয়স ষাটের ও-পাশে।

টেবিলের ওপর একটা ঢাউস লণ্ঠন জ্বলছে। অভী টেবিলের ওপর বাঁ হাতের কনুইটা চেপে সেই হাতেরই তেলোর ওপর বাঁ গালটা চেপে তাকিয়ে আছেন। তার বাঁ দিকে অম্বুজাক্ষ মিত্র চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মাথাটা কাত করে চোখের কোণ দিয়ে হরেন দত্তকে দেখছেন। অভীর ডানদিকে চন্দন সিং। চন্দন সিংয়ের দাড়িগুলো সাদা, মাথার পাগড়িটাকে দেহের তুলনায় মস্ত মনে হয়। দু হাতে লাঠিটাকে ধরে হাতের ওপর থুঁতনিটা রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছেন উনি। দাড়িগুলো চাপ বেঁধে এগিয়ে এসেছে—অনেকটা পরচুলার মতো। বুড়ো পুতুলের মতো চোখ বুজে মাথা নাড়ছেন চন্দন সিং। হরেন দত্ত অভীর মুখোমুখি—টেবিলের ও-পাশে। হরেন দত্ত টেবিলের ওপর দু'হাতের ভর দিয়েছেন—কারো দিকে না তাকিয়ে গল্প বলছেন তিনি। গল্পটা প্রেমের এবং একঘেয়ে। হরেন দত্তের কথায় শ্রী-ছাঁদ নেই—বায়না ধরা রোগা ছেলের কথার মতো বিরক্তিকর। অভী ভাবলেন, গল্পটা কেউ বোধহয় শুনছে না। হরেন দত্তর মুখটা বিচিত্র রেখার আঁকিবুঁকিতে প্রবীণ এবং নীরস, কিন্তু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। হরেন দত্ত গল্প বলায় বেশ উৎসাহী—এ আসরে তিনিই সবচেয়ে ছোট, সবে ষাট পেরিয়েছেন। অম্বুজাক্ষ মিত্র তাকিয়ে আছেন, কিন্তু কিছু শুনছেন না। বোধ হয় অন্য কিছু ভাবছেন: তাঁর বয়স প'য়ষট্টি। চন্দন সিং জেগে আছেন না ঘুমুচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে না। তিনিই সবচেয়ে প্রবীণ। বয়স সত্তর। অভী নিজের কথা ভাবলেন। তাঁর বয়স চৌষট্টি।

হরেন দত্তর গল্পটা একঘেয়ে। তবু গল্পটা যেন অভীকে টেনে রাখছে। অভী অন্য কিছু ভাবতে চাইলেন, পারলেন না। গল্পটা প্রেমের। কবে প্রথম বয়সে হরেন দত্ত কমলা নামে মেয়েটিকে ভালবেসেছিলেন। তাকে পাননি। গল্পটা জমজমাট হয়ে এসেছে। অভী শুনতে লাগলেন। একটা মৃদু, টোকার মতো শব্দ করে একটা পোকা ঢাউস লণ্ঠনটায় ধাক্কা খেলো আর তারপর ঘুরতে লাগলো।

হরেন দত্ত বললেন—'একটা বিবর্ণ শুকনো পাতার মতো মুখ করে কমলা বসে রইলো। আমার যেন মনে হচ্ছিল পরাশর আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। আমি জ্বলে উঠতে চাইলাম। সবকিছুই যেন স্পষ্ট হয়ে এলো।' হরেন দত্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অম্বুজাক্ষ মিত্র টেবিলের দিকে না তাকিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দোক্তার কৌটোটা খুঁজতে লাগলেন। দেওয়ালে গভীর গর্তের মতো একটা জানালা। অভী ভাবলেন হরেন দত্তর গল্পটা যেন একটা অন্তহীন গানের মতো। একটা অনুভূতির বৃন্তকে ঘিরে গল্পটা যেন ফুলের মতো ফুটে উঠছে। মনের কোন আবছা কক্ষে একটা যন্ত্র বাজছে—একটা অদৃশ্য হাত পুরোনো, ভুলে-যাওয়া কোনো এক সুরকে বাজিয়ে যাচ্ছে। চন্দন সিং ঘুমের ঘোরে কি যেন বললেন, শোনা গেলো না।

'তারপর বয়স বাড়লো। আগুন নিভলো। কিন্তু কোথায় যেন ছোট্ট আগুনের মতো একটু জ্বালা থেকেই গেলো। সেই জ্বালা থেকেই গেলো। সেই জ্বালা যায় না। সেই জ্বালা গেলে আমি বাঁচতাম না। কেউ বাঁচে

না।' হরেন দত্ত বলে চললেন।

অভী ভাবলেন 'জ্বালা আর নেই। যন্ত্রণাও নয়। ব্লাডপ্রেসার ছাড়া কোনো উত্তেজনা নেই। অম্বলের জ্বালা ছাড়া অন্য কোনো জ্বালা নেই। তবু তো বেঁচেই আছি।' এ গল্পের শেষটা যেন অভী জানেন। যেন এরকম গল্পগুলো মনের মধ্যেই থিতিয়ে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে। ওদের যেন আলাদা প্রাণ আছে। মাঝে মাঝে ওরা জেগে ওঠে, কথা বলে। পলকের জন্যে যেন একটা পর্দা সরে যায়। একমুহূর্তের জন্যে যেন আশ্চর্য এক রঙ্গমঞ্চ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।'

'পরাশরের জন্যে আমি কমলাকে ত্যাগ করলাম। অথচ পরাশরও তো কমলাকে পুরোপুরি পেলো না। ও নিজের মতো করে কমলাকে ভালবাসলো। যে ভালবাসা ফুটন্ত দুধের মতো টগবগ করলো, ঘন হল—' হরেন দত্ত হাসলেন। হাসিটাকে আর একটু টেনে রেখে নিজেকে প্রায় হাল্কা করে দিয়ে তিনি বললেন, —'তারপর একদিন বোধহয় সেই দুধ পুড়ে গেলো। আমি ঠিক জানি না। তবে এরকমই হয়। ওদেরও বোধহয় মৃত্যু হল। একবার ভালবাসা ফুরিয়ে গেলে নতুন করে আর তার শুরু করা যায় না।'

তা হয় না। অভী জানেন, তা হয় না। ঘরটা একটা ধোঁয়াটে অন্ধকারের সমুদ্র যেন। মাঝখানে টেবিলের ওপর ঢাউস লণ্ঠনটা যেন একটা দ্বীপ। একটা গুবরে পোকা কোথা থেকে এসে আলোর চারধারে কয়েকটা চক্কর খেলো তারপর দেয়ালে গিয়ে লাগলো। পড়ে গেলো। ধোঁয়াটে অন্ধকার। কেরোসিনের গন্ধ। ধোঁয়ার ঘোমটা-পরা লণ্ঠনটাকে একটা পরিচিত মুখের মতো মনে হল অভীর কাছে।

গল্পটা একসময়ে শেষ হল। সবাই চুপ করে রইলেন।

সেই চুপ করে থাকাটা একসময়ে অসহ্য হল। হরেন দত্ত পুরোনো গল্পের জের টেনে বললেন—'এ জন্মে আর না।'

অভী মনে মনে বললেন—'এ জন্মে আর না।' চন্দন সিং বোধহয় ঘুম ভেঙে শেষটুকু শুনছিলেন। তিনি ব্যথিত হয়ে মাথা নাড়লেন। অম্বুজাক্ষ মিত্র পান চিবুনো বন্ধ রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

হরেন দত্ত বললেন,—অন্য জন্মে কি হবে জানি না, কিন্তু এ জন্মটা নেশার ঘোরে কাটিয়ে গেলাম। যা যা পাইনি সে সব কিছুকে মিশিয়ে একটা অদ্ভুত নেশা।

'বড় যন্ত্রণা' অভী ভাবলেন—'বড় যন্ত্রণা। আগুনের ঘর আমাকে ঘিরে আছে। আমাদের সবাইকে ঘিরে আছে।'

অম্বুজাক্ষ মিত্র নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। তর্জনীতে খানিকটা চুন তুললেন কৌটো থেকে। পানের কষে প্রায় কালো হয়ে আসা জিভটা বের করে চুনটা লেপটে দিলেন তার ওপর। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, —'তবে শুনুন। ঠিক গল্প নয় এটা—'

তারপর ওরা সবাই একটা করে গল্প বললেন। অম্বুজাক্ষ বললেন, অভী বললেন, চন্দন সিং বললেন।

'গল্পগুলো আলাদা আলাদা। এক নয়। কিন্তু কোথায় যেন সবগুলো গল্পই এক।' অভী ভাবলেন —'সবগুলো গল্পই এক সুরে বাঁধা।'

গল্পগুলো ফুরোলো। তারপর ওঁরা আরো ঘন হয়ে বসলেন। ঢাউস লণ্ঠনটার চার দিকে ওঁরা চারজন। অভী নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আর তিনজনের মুখ দেখে নিজের মুখটাও যেন দেখতে পেলেন অভী। ওরকমই ঘোলাটে চোখ, রেখাঙ্কিত চামড়া। অভী ভাবলেন—'আমাদের পোষা ইচ্ছেগুলো চারজনের মাঝখানে আগুনের মতো জ্বলছে। সেই আগুনে আমরা হাত সেঁকছি।'

তারপর প্রসঙ্গ পালটালো। ওঁরা কথা বলতে লাগলেন। হাসতে লাগলেন। হরেন দত্ত একটা রুমালকে পাকিয়ে পুতুল তৈরী করলেন। সেই পুতুলটাকে টেবিলের ওপর নাচাতে লাগলেন। যৌবনে উনি নামকরা ম্যাজিসিয়ান ছিলেন।

অম্বুজাক্ষ মিত্র বললেন,—অনেক রাত হল।

হরেন দত্ত বললেন—হ্যাঁ, এবার উঠতে হবে। চলুন সিংজী, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

—বহুত সুক্রিয়া। চলুন। চন্দন সিং বললেন।
ওরা উঠলেন। অভী ওদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

ঢাউস লণ্ঠনটা কমিয়ে দিলেন অভী। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসলেন।

মেয়ে দুজন শ্বশুরবাড়িতে। টুলু বিলেতে। মৌ পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। অভী ভাবলেন—'এই বোধহয় মুক্তি। অথচ এও তো নয়। ওরা সবাই সরে গেছে। আমি একা। পা বাড়ালেই অন্য কোথাও চলে যেতে পারি। কেউ দেখতে আসবে না। কিন্তু যেখানে আমি যেতে চাই সেখানে কেউ কখনো যেতে পারে না; কেউ যায় না। সবাই যেতে চায়—হরেন দত্ত, অম্বুজাক্ষ মিত্র, চন্দন সিং। কিন্তু ওরাও কখনো যায়নি। সেই দেশ নেই বোধহয়। কিংবা আছে হয়ত অন্য জন্মে তাকে পাওয়া যাবে।'

অভী চোখ বুজলেন।

অন্ধকার ঘর। দরজাটা খোলা। অভী অনুভব করলেন সেই দরজা দিয়ে অজেয় অসংখ্য প্রেতের মতো নিঃশব্দে পরীরা ঢুকছে। পরীরা তাকে ঘিরে ধরলো। তারা বায়বীয়—তাদের স্পর্শ করা যায় না। তাঁর চারধারে পরীরা খেলা করতে লাগলো। নাচতে লাগলো।

পরীরা তাকে বললো,—যাবে তুমি?

—কোথায় যাবো? কোথায়?

—যাবো।

পরীরা তাকে নিয়ে গেলো। মা, বাবা, জেন, মৌ সবাই তাকে ঘিরে ধরলো। অভী তাঁর চেনা খেলনার দোকান দেখলেন। মুকুন্দ, মিশির এসে বললো,—কুস্তি লড়বে খোকাবাবু?

ঘুম ভেঙে গেল। অভী তাকালেন। চাঁদের আলো আর জাফরির ছায়া জালের মতো বারান্দায় পড়ে আছে। অভী ভাবলেন—'আমি যেখানে আছি সেটাই কি সত্যি? আর যেখানে আমি নেই সেই জায়গাটা কি মিথ্যে? অভী নিজেকেই নিজে বললেন, 'তবে বেঁচে থেকে কী লাভ? এতদিন বেঁচে আছিই বা কেন?'

নিজের ক্লীবত্বকে অনুভব করলেন তিনি। অনুভব করলেন জরা তাকে ভারী কম্বলের মতো জড়িয়ে আছে। তিনি ভাবলেন—'মরবো। কোনোদিন মরবো। তখন?'

'এই ঘর থেকে আমি চলে যেতে পারি। আমার জীবনটাই তো আগুনের ঘর। আমরা সবাই এক একটা আগুনের ঘরে আছি।'

অভী ভাবলেন 'কখনো যেখানে যাওয়া যায় না সেই দেশ, আর কখনো যাদের পাওয়া যায় না সেই আত্মীয়রা কোথায়? কোথাও নেই। অথচ আছে। আমি তো সেখানেই বারবার যাই, আবার ফিরে আসি।'

বুকের বাঁ ধারে হাত রাখলেন অভী। হৃৎপিণ্ডটা চলছে ঘড়ির কাঁটার নিষ্ঠায়। অভী বললেন—'আছে, তারা আছে। তাই আমি বেঁচে আছি।'

অভী উঠলেন। এগিয়ে গেলেন।

চাঁদের আলো আর জাফরির ছায়ার সুন্দর জালের ভেতর অভীর ঈষৎ তির্যক, দোমড়ানো, কুঁজো ছায়াটা নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

চেনা অচেনা

রাধাকে নিয়ে সেই যে পালিয়েছিল সুভাষ তারপর বহুদিন বাদে আবার তার সঙ্গে দেখা হল সেই কলকাতাতেই। পুরোনো কলকাতা তেমনি বয়ে চলেছে পরিবর্তনহীন—ট্রেন থেকে নেমে আমি দেখলাম হাওড়ার ব্রীজ কলকাতায় মাথা রেখে গঙ্গার কোল জুড়ে শুয়ে আছে। সুভাষের সঙ্গে ট্যাক্সি চেপে আস্তে আস্তে ভিড়, অসহ্য লোক, গরম ও তির্যক সূর্যের প্রখর ছায়ার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মাত্র একবার প্রশ্ন করি, 'কেমন আছ?' বোধ হয় বাইরে কলকাতার প্রতিই এই প্রশ্নের আংশিক উদ্দেশ্য ছিল। সুভাষ উত্তর দিল, 'যেমন দেখছেন।' হাসল। সারাক্ষণ ট্যাক্সিতে যেতে যেতে আমি বাইরে তাকিয়েছিলাম। সুভাষের মুখের দিকে একবারও তাকানো হয়নি। কি জানি এতদিন পর দেখা—হঠাৎ যদি ঘেন্না করতে শুরু করি! রাধা কেমন আছে প্রশ্নটা অনায়াসে করা যেত, কিন্তু কেন যেন আমি সাবধান হয়ে গেলাম, কেননা আমার জিভে যে প্রশ্নটা এসেছিল সেটা হল—রাধাকে কেমন রেখেছ? তার চেয়ে কলকাতার ঠেলাগাড়ি আর ডেবলডেকার আর ট্র্যাফিকের লাল আলোর একলাফে হলুদ আর একলাফে সবুজ হয়ে যেতে দেখা অনেক ভাল। কিন্তু এরপরে কি করা উচিত, কিভাবে ওদের সঙ্গে ব্যবহার করব তা ভেবে দেখবার আগেই হু-হু করে রাস্তা ফুরিয়ে গেল; টালিগঞ্জে সুভাষের ফ্ল্যাটের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামতে নামতে নিজেকে আগোছালো, গ্রাম্য ও বোকা বলে মনে হচ্ছিল।

আমাকে দেখে রাধা খুশী হয়েছে কি না বোঝা গেল না। কিন্তু সে বুদ্ধিমতীর মতোই ব্যবহার করছিল। আমি ওর দিকে একবারও তাকাইনি—ওর পায়ের শব্দ,মাথার তেলের গন্ধ মাঝে মাঝে আমার আশেপাশে ঘুরে গেল। কাপড় ছাড়া হাত-মুখ ধোয়া ইত্যাদি প্রাথমিক কাজগুলো সারবার পর আমি আর সুভাষ নিঃশব্দে চা খেলাম, নিঃশব্দে চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট এগিয়ে দিল রাধা। তারপর সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আমাকে একা রেখে অস্পষ্টভাবে কি বলে সুভাষও ঘর ছেড়ে গেল। পিছন থেকেই ওর মাথার টাকটা চকচক করছিল। আমার চেয়ে বড়জোর বছর চার-পাঁচেক ছোট হবে সুভাষ! তার বেশী কিছুতেই নয়—আমি জানি।

তারপর অনেকক্ষণ আর কেউ এ-ঘরে এল না। আমাকে একা থাকবার, ভাববার সময় দিচ্ছে রাধা, সময় নিজেও নিচ্ছে—আমি বুঝলাম। আমি ওর সাজানো ঘরদোর দেখছিলাম চমৎকার বড় ফ্ল্যাট—আলো-বাতাস আসে। দেওয়াল ডিসটেম্পার করা আলতো সবুজ রঙের, সারা ঘরে একটা ক্যালেণ্ডার আর কয়েকটা কাঠ-খোদাইয়ের কাজ দেওয়ালে ঝুলছে, ছোট্ট একটা হোয়াট-নট-এর ওপর বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া এক-জোড়া রয়েছে। আসবাবপত্রে বোঝাই-করা ঘর নয়, কেমন ফাঁকা ফাঁকা, কৃত্রিম বাঙালী ঘরের মতো নয়।

সুভাষ এত আধুনিক নয়—বিশেষত ওর বয়স হয়েছে, আমি বুঝলাম এ সবাই রাধার কাজ। রাধা কি বরাবর এইসব চাইত! আমি কি রাধাকে কোনোদিন বুঝিনি!

অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। অনেকক্ষণ ট্রেনে থাকবার জন্য আমার সারা শরীর ট্রেনের ঝাঁকুনির মতো দোল খাচ্ছিল। আমার ক্লান্ত শরীর আস্তে আস্তে ভেঙে আসছিল। একি আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া যে, আমার এইখানে আসবার কোনো গুরুত্বই ওদের কাছে নেই! ওরা আমাকে গ্রাহ্য করে না, কোনোদিনই করেনি! রাধা এখন কি ভাবছে আমার জানতে ইচ্ছে করছিল। কেন আমি এখানে এলাম এতদিন পর! বাস্তবিক এতদিন পর শুধু ওরা কেমন আছে, সেটুকু জানতেই আমি এতদূর এসেছি—এ-কথা বিশ্বাস করতে ওঁদের কষ্ট হবে। এইভাবে ভাবতে ভাবতে ক্রমশ আমার কেমন লজ্জা করছিল—এ যেন ভিখিরির মতো হয়ে আসা। ঠিক জবাবদিহি চাইতেও নয় কিংবা অনুতপ্ত হয়েও নয়—আমার অবস্থাটা এখন ওদের কাছে কিরকম কিংবা আমার কাছেই বা কিরকম আমি বুঝতে পারলাম না।

খানিকটা সহজ হয়ে নেওয়ার জন্য আমি উঠে আস্তে, প্রায় পা টিপে টিপে, ঘর থেকে বারান্দায় এলাম। পাশের ঘরেই রাধা রয়েছে টের পাওয়া গেল। সুভাষ বেরিয়ে গেছে কি না, বোঝা গেল না। বারান্দার রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আড়চোখে আমি এতক্ষণে রাধাকে প্রথম দেখলাম। পাশের ঘরের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে রাধা তার ছেলেকে সাজিয়ে দিচ্ছে। রাধার ছেলে হয়েছে—আমি শুনেছিলাম। ওর মুখটা কা'র মতো হয়েছে, দেখবার জন্য আমি স্থির তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু দরজার পাতলা নেটের পর্দাটার জন্য স্পষ্ট করে দেখা গেল না। শুধু মনে হল, ছেলেটা খুব ফর্সা হয়নি—অন্তত রাধার মতো নয়। শুনলাম, রাধা তার ছেলেকে আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি যদি ও-ঘরে যাও, তবে আমি তোমাকে মারব।'

'কেন!' ছেলেটা বলল, 'কে এসেছে?' আমি দেখলাম...' রাধা খুব দ্রুতবেগে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'আস্তে...'

'আমি কাউকে ভয় করি না।' ছেলেটা বলল, 'তুমি চলে যাও।' রাধা উঠে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তীব্র গলায় বলল, 'বাপি ফের...?'

আমি সরে যাব কি না ভেবে পেলাম না। আমি গোপনে অনুচিত দৃশ্য কিছু দেখছি না। এ-ঘরে সুভাষ নেই; সুভাষ থাকলে আমি সরে যেতাম। তবু মনে হচ্ছিল, আমি যে এখানে আছি, তা রাধাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। আমি থাকলে রাধার কি আসে যায়! রাধার আপনজনেরা আস্তে আস্তে আমার চোখের আড়ালে তৈরী হয়ে গেছে। সেই আপনজনের সঙ্গে রাধার সম্পর্ক চোখ চেয়ে দেখবার ভিতরে কোনো জ্বালা আছে কি না, আমি বিচার করে দেখতে চাইছিলাম। নাকি দীর্ঘ, দীর্ঘ দিন পর—আজ এই দুজন—রাধা আর তার ছেলে (আমার এত অচেনা) এবং তাদের ভঙ্গুর দৃশ্যাবলী খুব বাইরে থেকে অতিথির মতো দেখে নিয়ে যেতে চাইছিলাম। কিন্তু আমি যা-ই ভাবি না কেন, আমি জানি, রাধার তাতে কিছুই যায় আসে না।

রাধা ঘর থেকে বারান্দার দিকে আসতে আসতে একটা অদ্ভুত নাম ধরে সরু অনুচ্চ গলায় বোধ হয় আমাকে ডাকল। মনে হল ছেলেকে বেড়াতে পাঠাচ্ছে। আমি নড়লাম না, এমনকি, যখন রাধা পর্দার দিকে হাত বাড়াল, তখনো আমি স্থির রইলাম। বারান্দায় পা দিয়ে রাধা থমকে দাঁড়াল। পালিয়ে গেল না। শুধু নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা ঢাকা দিতে, যদিও বারান্দায় শেষ-বিকেলের মরা আলো ছিল, তবু সুইচ টিপে আলো জ্বালাল রাধা। খুব আস্তে মাথা নীচু করে প্রথম আমার সঙ্গে কথা বলল রাধা, 'তুমি বোরোচ্ছ?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললাম, 'তুমি কত বড় হয়ে গেছ রাধা!' সে মুখ তুলল না। আমি রাধাকে শোনানোর জন্য বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'আমি ঘরে আছি। তোমার ছেলে—কি নাম ওর?' 'অর্চ্চন।' আমি হেসে বললাম, 'তুমি ওকে যে নামে ডাকো, সেই নামটাই ভাল লাগছে। বাপিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।' আমি রাধাকে দেখছিলাম—ভারী সুন্দর লাগছে রাধাকে—রাধা এমন সুন্দর হবে, আমি জানতাম। সে মুখ তুলল না, পিছনে হাত জড়ো করে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে অনেকক্ষণ পরে বলল,

'আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে। এক্ষুনি...' বলে এত দ্রুত ভঙ্গীতে—যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল রাধা।

আমি আবার ঘরে এসে বসলাম। কেউ—বোধ হয় রাধাই—এক ফাঁকে এসে ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে। বাইরে অন্ধকার হয়ে এল। শূন্য ঘর। ঘরের ভিতরে আমি না আমার ভিতরে এই ঘর! তুমি কত বড় হয়ে গেছ রাধা—আমি মনে মনে কথা বললাম—তুমি বড় হয়ে গেছ, এটুকু বলবার জন্য গত বহুদিন আমি রাত জেগে থেকেছি।

একজোড়া ছোট্ট বুটের শব্দ আমার ঘরের দরজায় এসে থামল। 'আসতে পারি?' বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করল বাপি। আমি কথা না বলে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলাম। চটপটে চোখে সে আমাকে দেখে নিল, তারপর প্রায় দৌড়ে এসে ঝুপ করে অনভ্যস্ত ভঙ্গীতে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করল। চেয়ারে উঠে চুপচাপ বসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। নিছক কৌতূহল ছাড়া তার চোখে আর কিছু ছিল না। আমি কথা বললাম না। জানি নাম কিংবা পড়াশুনোর কথা দিয়ে শুরু করলে বাচ্চারা খুশী হয় না। আমি ওকে প্রথম কথা বলতে দিলাম। হয়ত আমি কথা বলব ভেবে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বাপি, তারপর হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে?'

'তোমাকে কেউ বলে দেয়নি?' আমি ভাবতে ভাবতে বললাম।

সে মাথা নাড়ল, 'না। মা বলছিল, আমি নিজেই জানতে পারব।'

'ও।'

সে খুশী হল না। বলল, 'তুমি এখানে এসেছ কেন?'

আমি ঝুঁকে ওর দুটো টানা-টানা মেয়েলী চোখ দেখলাম। হেসে বললাম, 'ঠিক জানি না। বোধ হয় তোমাদের ভয় দেখাতে।'

'ভয় দেখাবে? কি করে?'

'কি জানি।' আমি বললাম, 'হয়ত আমাকে দেখেই তোমরা ভয় পেয়ে যাবে—একথা ভেবেছিলাম।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সে বলল, 'আমি ভয় পাই না।' কিন্তু তার গলায় তখন তেমন বিশ্বাস আর নেই—যেমনভাবে সে তার মাকে বলেছিল 'আমি কাউকে ভয় করি না।'

'সে-কথা ঠিক।' আমি বলি, 'দেখছি, সত্যিই আমাকে দেখে তোমরা ভয় পাওনি।'

'মা তোমাকে ভয় পায়।' সে হঠাৎ বলল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি এখন যেতে পারি? পার্কে যাব।'

'আচ্ছা।' আমি বললাম, 'কিন্তু কার সঙ্গে যাবে?'

'আয়া।'

চলে যাচ্ছিল, আমি হাত তুলে ওকে দাঁড় করালাম। 'কাল তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে।' আমি আস্তে আস্তে, ওর চোখে চোখ রেখে বললাম।

ও ভ্রূ কুঁচকে আমাকে কিছুক্ষণ দেখে ঘাড় নেড়ে জানাল—যাবে। আমি শ্বাস টানলাম। ও আস্তে আস্তে চলে গেল। বুটের শব্দ তেমন জোরালো নয়।

অস্বীকার করে লাভ নেই, রাধার ছেলেকে দেখে আমি একটু হতাশ হলাম। ও বড্ড বেশী বুদ্ধিমান। মনে হয়, ওর আবেগ নেই। কিংবা খুব কম আছে। ঠিক যেমনটা ভেবেছিলাম, রাধার ছেলে ঠিক তেমনটা হয়নি।

আমি আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর পায়চারি করছিলাম। তারপর বারান্দায় গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেক রাতেও সুভাষ ফিরেছে কি না, বোঝা গেল না। কিন্তু সুভাষের জন্য আমার মাথা ব্যথা ছিল না। কিন্তু, রাধাও কি জানতে চায় না—কেন আমি এখানে এসেছি! যদি জানতে চায় রাধা, যদি চোখে চোখ তুলে প্রশ্ন করে আমি এখানে এসেছি কেন—তা হলে জবাবে আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু কেন

যেন আমার স্থির বিশ্বাস হচ্ছিল, রাধা কোনো প্রশ্নই আমাকে করবে না। যদি না করে—আমাকে ফিরে যেতে হবে।

রাতে রাধার চাকর এসে আমাকে খাওয়ার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। ওরা টেবিলে খায়। সেই টেবিলের দুধারে দুখানা চেয়ার পাতা ছিল। একটিতে রাধা বসে আছে, অন্যটা বোধ হয় আমার জন্যে। বসে বললাম, 'সুভাষ—?'

'তুমি খেয়ে নাও।' রাধা মাথা নীচু রেখে বলল।

'তোমার ছেলে ঘুমিয়েছে?'

রাধা মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ!'

'বাঃ', কিংবা 'আঃ' জাতীয় একটা অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করে আমি চুপচাপ ঝকঝকে সাদা প্লেটে স্বাদহীন বর্ণ ও গন্ধহীন খাবারগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলাম। এক সময়ে রাধার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে যে, একা খেতে আমার সুবিধে হবে!'

সে মাথা নেড়ে জানাল—'না।'

'তবে।'

'এমনিই।' সে বলল, 'এটা তো সামান্য ব্যাপার।' বলে এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল, 'তুমি খেয়ে নাও।'

সময়টা তেমনি চুপচাপ কেটে গেল।

দেখা গেল, যে ঘরটায় আমি সারা বিকেল ও সন্ধ্যে বসেছিলাম, সে ঘরটায় একটা চৌকি পাতা হয়েছে এবং খুব অল্প সময়ের ভিতর তাতে সুন্দর বিছানা পাতা হয়েছে; এমনকি, নিখুঁত করে চৌকির সঙ্গে লাগানো স্ট্যান্ডে মশারি খাটিয়ে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। আমি ক্লান্ত ছিলাম—এতক্ষণ সারাটা সময় আমার ঘুম পাচ্ছিল।

শুয়ে পড়লে রাধা বাতি নিবিয়ে দেওয়ার জন্য এ ঘরে এল। ঘুরে ফিরে কি একটু দেখল, বোধ হয় সে আমাকে আজকের দিনটা সময় দিচ্ছে। ঘর অন্ধকার করে দিয়ে সে বলল, 'তুমি ঘুমোও—' বলে বোধ হয় আমাকে সম্বোধন করতে গিয়ে দ্বিধা করল সে। আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। সে বলল, 'পাশের টুলে জল ঢাকা আছে। তোমার বাঁদিকের দেওয়ালে বাথরুমের দরজা। বালিশের পাশে বাঁ ধারে বেড সুইচ। যদি রাতে দরকার পড়ে—ডেকো। একবার ডাকলেই শুনতে পাব।' বলে চলে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে ও বাদবাকী রাত্তিরের জন্য আমাকে আলাদা করে রেখে চলে গেল।

সারারাত মাঝে মাঝে আমার ঘুম ভেঙেছিল। সুভাষ ফিরল কি না, কিংবা কখন ফিরল, কিছুই টের পাওয়া গেল না। ওরা খুব চুপচাপ—কোনো কথাবার্তার শব্দও শোনা গেল না। মনে হচ্ছে, কালকের দিনটি আমার খুব ভাল যাবে না। কি হবে, মাঝে মাঝে ভাবলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, ওদের জন্য আমি কিছুই আনিনি। অন্তত রাধা এবং তার ছেলের জন্য কিছু নিয়ে আসা উচিত ছিল। কিন্তু আমি এখানে আসব বলে এত উত্তেজিত ছিলাম কদিন, আর প্রায়ই এমন ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম যে, এমন অনেক তুচ্ছ জিনিস আমার মনে আসেনি।

ঘুমিয়ে পড়ছিলাম আস্তে আস্তে বোধ হয় তন্দ্রা কিংবা অর্ধস্বপ্নের ভিতর হঠাৎ দেখা গেল, ভেজানো দরজা ঠেলে রাধা দরজায় কয়েক পলক দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভাল করে তাকাতে আর তাকে দেখা গেল না। দরজা তেমনি বন্ধ রয়েছে।

পরদিন যা ভেবেছিলাম, তা কিন্তু ঘটল না। সুভাষ পালিয়ে বেড়াচ্ছে—তার সঙ্গে আর দেখা হল না। আমি যে তাকে কি ভীষণ ঘেন্না করি তা হয়ত সে টের পাচ্ছে। সারাটা দিন বারুদঠাসা-চোরামার ও গোপন অসতর্ক উত্তেজনায় থাকতে না পেরে আমি কিছুক্ষণ আশেপাশে কলকাতার রাস্তাঘাট মানুষজন দেখে বেড়ালাম। দুপুরে বাপি স্কুলে গেছে, সুভাষ নেই, বাড়িতে রাধা ছাড়া কেউ ছিল না। আমি তেমনি একা একা

বসে দুপুরের দেওয়া খাওয়ার প্লেট নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। খুব সামান্যই খাওয়া গেল—না খাওয়ার মতোই। মুখোমুখি মাথা নীচু রেখে রাধা কাল রাত্তিরের মতোই বসে ছিল। বোধ হচ্ছিল আমি উঠে গেলে রাধা ওখানে বসেই কাঁদবে। ও কাঁদবে একথা ভাবতে আমি কি ভীষণ উত্তেজিত হই!

বুঝতে পারছি—আজও রাধা ছাড়া আমার কেউ নেই।

বিকেলে বাপি আমার হাত ধরে পার্কে যাচ্ছিল। লক্ষ করলাম বাপি খুব বেশী কথা বলে না। কিংবা আমার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়নি বলে সে হয়ত মুখ খুলতে পারছিল না। হাঁটতে হাঁটতে সে এক সময় একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টে ঠং করে ছুঁড়ে মারল। বলল 'তুমি সাইন-বোর্ডটা দেখেছ?'

'কোনটা?'

'ঐ যে আমরা পেরিয়ে এলাম।' সে বলল, 'একটা বাড়ির গেটে সাইনে-বোর্ডটা ঝুলছে, বি ওয়্যার অব ডগ—কুকুর হইতে সাবধান!'

আমি মাথা নাড়লাম—'না। দেখিনি।' ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। বলল 'আসলে কিন্তু ও বাড়িতে কুকুর নেই।'

'নেই।'

ও মাথা নাড়ল, 'ছিল একটা। মরে গেছে।'

তবে সাইন বোর্ডটা খুলে নেয়নি কেন?'

'ভয় দেখাতে চায়।' ও মাথা নীচু করে বলল।

আমি কথা বললাম না। বাপি যে খুব বুদ্ধিমান ছেলে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বহুকাল হয় আমি বাচ্চাদের সঙ্গে আর মিশিনি। ওদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করলে ওরা খুশী হয় আমি জানি না। আমি ভাবছিলাম। বাপিও কথা বলল না। আমরা চুপচাপ হেঁটে খানিকক্ষণের মধ্যেই হই হট্টগোলে ভরা পার্কে পৌঁছে গেলাম। বাপি চঞ্চল হল, কিন্তু আমার মনে হল আমার হাত ছেড়ে দৌড়ে যাবার সাহস তার নেই। 'তোমার বন্ধুরা কোথায়, বাপি?'

'নেই।' সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল।

হঠাৎ আমি ওর জন্য খুব কষ্ট বোধ করলাম। হাঁটুগেড়ে ওর সামনে নীচু হয়ে বসলাম, 'আমার সঙ্গে আসতে ভাল লাগেনি, না?'

উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে আমার মুখ দেখল। হঠাৎ বলল, 'তুমি কী ভাবছ যে, তুমি কথা বললে না...!'

আমি ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম, 'আমি সারাক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম, বাপি।'

এমন প্রকাশ্য জায়গায় অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে আমার এই জড়িয়ে ধরা বাপি পছন্দ করল না। 'ছেড়ে দাও' বলে ছটফট করে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি চুপচাপ ঘাসের ওপর বসে রইলাম। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছিল। আমি একই জায়গায় সারাক্ষণ বোধহীন বসেছিলাম—যদি বাপি এসে আমাকে খুঁজে না পায় সেই ভয়ে আমি কোথাও গেলাম না। বোধ হয়, রাধার ছেলেকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। অনেকক্ষণ পর বাপি খেলা সেরে আমার কাছে ফিরে এল।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বাপির হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ আমার কাঁধে যেন ভূত চাপল। প্রশ্ন করলাম 'আচ্ছা বাপি, তোমার জানতে ইচ্ছে করে না, তুমি কে?'

ও আমার দিকে তাকাল।

আমি হেসে বলি 'আমি কে—তুমি জানতে চাও?'

ও মাথা নেড়ে জানায়—হ্যাঁ।

'তেমনি—' আমি বলি 'জানতে চাও না তোমার মা কে? তোমার বাবা কে?'

বাপি আমার হাত টেনে বলল 'তুমি কি সব বলছ?'

'বলছি—' হাসলাম 'ভয় পেও না। তুমি জানো না, তোমার দিদিমা ছিল জার্মান।'

ও আমার কথার বিন্দুমাত্র অর্থ করতে পারল না। একটু হাসল। অবিশ্বাসের হাসি।

আমি বলি 'সত্যিই!'

'মেম?' ও প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ।'

'আমি কিন্তু মাকে জিজ্ঞেস করব।'

'করো।'

'তুমি মার কে হও?'

'বন্ধু' আমি শ্বাসকষ্ট রোধ করে বললাম। কথাটা আমার ঠোঁটে এসে গেল কিন্তু বাপি কথাটার অর্থ করতে না পেরে তাকিয়ে রইল। একটু হোঁচট খেল। আমি ওর হাত আরো জোরে ধরে ওকে অন্যমনস্ক করে দেওয়ার জন্য বললাম 'বলো তা ইন্টারন্যাশনাল কথাটার অর্থ কি হবে!' বলেই বুঝতে পারলাম বাচ্চাদের কি করে ভোলাতে হয় তা আমি একদম জানি না।

'জানি না।' ও অদ্ভুতভাবে বলে।

আমি আবার ওকে অধিকার করবার জন্য ভিখিরির মতো বললাম, 'চলো তোমাকে খেলনা কিনে দিই।'

'না।'

তারপর আমরা চুপচাপ ফিরে এলাম। বুঝলাম রাধার ছেলে আমার কাছে অত সহজ নয়।

আজও সুভাষ বাড়িতে নেই, বোঝা গেল। সে বোধ হয় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। হয়ত অনেক রাতে বাড়ি ফিরছে কিংবা আদৌ ফিরছে না। আমার খুব ক্লান্তি লাগছিল। টের পাচ্ছি এখন আমার বয়স গড়িয়ে গেছে। এই বয়সে আর নতুন করে কিছুই শুরু করা যায় না—স্নেহও নয়, ঘৃণাও না। ভেবেছিলাম সুভাষের সঙ্গে একটা মীমাংসা করা যাবে। কিন্তু আশ্চর্য যে এখনো আমি তাকে অনুরূপ ঘেন্না করি। রাধা তাকে ভালবাসে কি! কি করে বাসে! আমি যাকে এত ঘেন্না করি তাকে রাধা কি করে ভালবাসে—ভেবে পাই না।

সারাটা সন্ধ্যেবেলা বাপি আমার কাছে আর এল না। ভাবছিলাম ওদের ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখব। কিন্তু সাহস হল না। আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে এসে বিছানায় বসলাম। সুভাষের জন্য এত ঘেন্না আমার কোথায় ছিল!

টের পাচ্ছি রাধাদের এই ঘর খুব নিস্পৃহভাবে সাজানো। বড্ড ফাঁকা। এখানে আমার মন বসছে না। স্বস্তি পাচ্ছি না। আমার খোঁজ করতে কেউ এল না। মনে হয় ঠিক গতকালের মতোই আজকের রাতটাও কেটে যাবে। যদি তাই হয়, তবে এবার ফিরে যেতে হবে। কাল—আমি ঠিক করলাম—কাল হয়ত বিকেলের দিকে আমি ফিরে যাব। আমি এখানে কেন এসেছিলাম তা আস্তে আস্তে গুলিয়ে যাচ্ছে।

আজও খাবার টেবিলে রাধা ছাড়া কেউ ছিল না। আজ রাধা আমার চোখে চোখ রাখল কিছুক্ষণ। বলল, 'তুমি দু'দিন প্রায় উপোস করছ।' একটু শ্বাস ফেলে বলল 'এটা অন্যায়।'

আমি আস্তে আস্তে বললাম 'আমি এরকমই খাই।'

ও চুপ করে আমার চোখে চোখ রাখল। এবার আমি মাথা নামিয়ে নিলাম। বললাম 'এখন বয়স হয়েছে।'

বয়সের কথায় কেমন বিব্রত হলে পড়ল রাধা। ওর চুড়িপরা হাত সশব্দে টেবিলের ওপর থেকে পড়ে গেল। মনে হয় সুভাষের কথা ওর মনে হল। নাকি ও বড় বেশী অস্থির হয়ে পড়েছে—আমি বুঝলাম না।

'খাও।' রাধা বলল।

আবার সব চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ চোখ তুলে দেখলাম রাধা আমাকে দেখছে—স্থির, স্নিগ্ধ চোখ তার। আমার লজ্জা করছিল। কাটিয়ে উঠবার জন্য বললাম 'বাপি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি?'

ও মাথা নাড়ল—হ্যাঁ।

'তুমি ওকে এতদিন জানিয়ে দাওনি কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমি খেয়ে নাও।' সে বলল 'পরে শুনো।'

'কিন্তু আমাকে যেতে হবে।'

চুপ করে রইল।

দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম বলে আমি শুয়ে পড়লাম না। একটা মাসিক পত্রিকা খুঁজে নিয়ে চোখ মেলে বসেছিলাম বিছানায়। এমন অর্থহীন সময় আমি আর কখনো কাটাইনি। পর্দায় চলচ্চিত্র দেখবার মতো খুব বাইরে থেকে আমি এইসব দেখছি। এই বাড়িতে শব্দ এত কম হয় যে মনে হয় এ বাড়িতে কারো খুব অসুখ করেছে। মনে হচ্ছে এ অসুখটা আমিই সঙ্গে করে এনেছি। তবে বাস্তবিক আমি কি দেখতে বা কি কথা জানাতে এসেছিলাম তা আমি এখনো জানি না। কিন্তু মনে হয় ঠিক ভিখিরির মতোও আসিনি। একটু অধিকার এবং তার অহঙ্কার কোথাও আমার এতটুকু ছিল। আমি আবার শ্বাসকষ্ট টের পাচ্ছিলাম। বালিশটা উঁচু করে পিঠ হেলিয়ে দিয়ে বসলাম।

কাল আমি ফিরে যাব। স্থির।

যতদূর দেখা যাচ্ছে আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। ভাবছিলাম যাওয়ার আগে একবার সুভাষের সঙ্গে দেখা করে যাব। কাল সকালে আমি রাধাকে বলব, 'সুভাষকে বোলো, আমি ওর সঙ্গে একবার কথা বলে যেতে চাই।' কিন্তু কি বলব সুভাষকে! জানি না, হয়ত মুখোমুখি হলে কথা তৈরী হয়ে যাবে। বড় ক্লান্তি লাগছিল।

একটু ঘুম এসেছিল। দরজার কাছ থেকে নরম বিষণ্ণ গলায় ডাক এল 'বাবা।'

তাকিয়ে দেখি—রাধা। চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল। দ্রুত নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমি আবার শ্বাসকষ্ট টের পাচ্ছিলাম। এলোপাথাড়ি কথা আসছিল আমার ঠোঁটে। কিন্তু আমি চুপ করে নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম।

'বাবা', একটু ভেঙে ভেঙে রাধা বলল 'আমি যদি তোমার কাছে একটু আসি...?'

বললাম 'এসো রাধা, আমি জেগেই ছিলাম।' একটু চুপ করে থেকে বলি 'ঘুম আসছে না।'

'জানি।' সে বলল 'তুমি কাল সারারাত ছটফট করেছ। আমি দরজায় কান রেখে শুনছিলাম।' চুরি করে হাসল।

আস্তে আস্তে প্রায় বিপর্যস্ত রাধা আমার দিকে চোখ না তুলে বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি পা সরিয়ে বললাম, 'এইখানে বিছানায় আমার কাছে বোসো।'

বসল। আমি কথা বললাম না। আমি তীব্র পিপাসায় ওর বসে থাকার এই কয়েকটি মুহূর্ত ভিতরে, গভীরে গ্রহণ করছিলাম। শরীরে তেমনি সুন্দর বাঁক দিয়ে আজো বসে রাধা। ও একটু রোগা, দীর্ঘ গ্রীবা, খুব কালো বড়ো টানা চোখ ওর। এটা জুন মাস, সামনের আগস্টে ওর সাতাশ পূর্ণ হবে।

কেমন সুগন্ধ বাতাসে। এ ঠিক প্রসাধনের গন্ধ নয়। এ আমার অনেকদিনের চেনা গন্ধ—পুরোনো। কয়েক মিনিট আমরা কথা বললাম না। আমি রাধাকে ভাবতে সময় দিচ্ছি, আজ আমিও সময় নিচ্ছি।

'সুভাষ কোথায়?' প্রশ্ন করি। অর্থহীন প্রশ্ন।

'আসেনি।' মৃদু গলায় বলল।

তারপর অনেকক্ষণ আবার কেটে গেল। কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভয় হচ্ছিল কথা বললেই তা খুব আবেগপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। 'তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও রাধা।'

রাধা মুখ তুলল 'কাল থেকে তুমি আমাকে একবারও ডাকলে না, বাবা!' ওর স্বর অনেক স্পষ্ট ও তীব্র মনে হল।

আমি আস্তে আস্তে বললাম 'আমি তো তোমার কাছেই এসেছি।'

ও মাথা ঝাঁকায় 'জানি।' চোখে স্নিগ্ধ চোখ তুলে বলে 'কাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে কতোবার দেখেছি।'

'কেন, রাধা!'

'কেন যেন সামনে আসতে ভয় করছিল।' ও হাসল 'তোমার চিঠি পাওয়ার পর থেকে গত সাতদিন ঘুমাইনি।' বাচ্চা মেয়ের মতো লজ্জায় মুখ নামিয়ে বলল, 'খাইওনি।'

'কেন রাধা?'

'খুব অস্থির লাগছিল।'

চুপ করে রইলাম। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলি 'তুমি কোনোদিন আমাকে ভয় পাও—এ আমি চাইনি। তুমি জানো—'

'বাবা', রাধা বাধা দিয়ে বলে 'তুমি অন্যকোনো কথা বল।'

আমি চোখ বুজলাম 'তুমি কি জানতে চাও?' আড়চোখে দেখি আঁচলে চোখ মুছে নিল। বলল, 'তুমি কি এভাবে কথা বলবে, বাবা?'

হাসলাম। ভিতরে হাসির কোনো তাগিদ ছিল না। কত অকারণে আমরা হাসি! ফিস ফিস করে প্রায় কবিতা পড়বার মতো করে রাধা বলে 'গত সাতদিন আমি খুব অস্থির ছিলাম। তুমি আসবে—আমি জানতাম। কিন্তু সত্যিই যখন আসবে বলে চিঠি দিলে বাবা, আমার সব শক্তি চলে যাচ্ছিল। এক একটা দিন কত আস্তে আস্তে পার হয়ে গেছে। খুব, খুব ভালবাসার কেউ—খুব প্রিয় কেউ এলে বোধ হয় এমন হয়, না বাবা?' ওর গলার স্বর ভেঙে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে শব্দগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল 'এ কেমন একটা পাপবোধ বাবা, মনে হচ্ছিল তোমাকে ভালবাসা বোধ হয় খুব দোষের।' ও মাথা নাড়ল, আপন-মনে লাজুকের মতো হাসল—কিন্তু তোমাকে দেখে আবার আমি সামলে গেলাম। যেন তুমিই আমাকে শাসন ও সংযত করে দিলে। কিন্তু তোমাকে ডাকবার সাহস আমার ছিল না। কেমন যেন মনে হচ্ছিল 'বাবা' বলে ডাকলে ডাকটা নষ্ট হয়ে যাবে! সেই ভয়ে আমি ডাকিনি।'

'রাধা' বললাম 'তুমি এ সব সত্যি বলছ?'

'তুমি সামনে থাকলে বাবা, আমার মনে হয় তুমি আমার সব জানো। আমার ভিতরে যা আছে—আমার মন, বুদ্ধি এ সবই তুমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। আমার কোনো কিছুই যেন আমি কোনোদিন তোমার কাছ থেকে গোপন করতে পারিনি। তুমি জানো আমি মিথ্যেবাদী নই, কিন্তু তুমি জানো না তোমার ভয়েই আমি কখনো মিথ্যে কথা বলিনি! অন্তত তোমার সামনে কখনো নয়। জানতাম তুমি ধরে ফেলবে।'

'কিছু মনে কোরো না, রাধা' আমি হাসিমুখে বললাম, 'তুমি বলো, আমি শুনছি।'

'তুমি আসবার পর আবার আমার ভয় হচ্ছিল যে তুমি আমার সব চালাকি ধরে ফেলবে, তোমার চোখের দিকে একবার তাকালে আমার সব বুদ্ধি, সব ইচ্ছে নষ্ট হয়ে যাবে।

'খুব স্বাভাবিক।' আমি যতদূর সম্ভব আবেগ চেপে রেখে শুকনো গলায় বললাম 'তুমি ছাড়া আমার কোথাও কেউ নেই। আমি তোমাকে ভালবাসব—এতো স্বাভাবিক, রাধা, তুমিও বাসো।'

'বাসি।' আবার বাচ্চা মেয়ের মতো হাসল 'ঠিক। তোমার চেয়ে কাউকে কখনো বেশী ভালবাসতে পারিনি। কিন্তু ছেলেবেলায় যখন কেউ জিজ্ঞেস করত, আমি আমার বাবাকে ভালবাসি কি না, তখন উত্তর দিতে আমার ভয় করত। আমি কখনো সত্যি কথা বলতে পারতাম না, যেন কোন গোপনে কথা ধরা পড়ে যাবে। কেন, বাবা?'

'কেন, রাধা?'

ও ছেলেমানুষের মতো পা দোলাচ্ছিল, বলল 'আমি ভাবতাম, তুমি সব জানো। তোমাকে জিজ্ঞেস করলেই তুমি বলে দেবে। আমি এখনো জানি, এর উত্তর তুমি দিতে পার। তুমি জানো, আই অ্যাম পজেজড।'

'না।' আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম 'আমি জানি না।'

ও আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে এই গরমের মধ্যেও একটা বুড়োটে শীত আমার হাতে পায়ে চেপে বসেছিল। ও আস্তে আস্তে বলে 'তবে তুমি এখানে কেন,

বাবা?' ফিরে তাকাল না। শুধু ওর ঘন গাঢ় চুল ফুলেফেঁপে ওর পিঠময় কেঁপে যেতে থাকে। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বলি 'ঠিক আছে। আমি জানি। আমি স্বীকার করছি।'

ও ওর হাসিমুখ হঠাৎ আমার দিকে ফেরালে আমি চকিতে লক্ষ করি ওর মুখ এখন ঝকঝকে পরিষ্কার এবং বোধহয় খানিকটা নিষ্ঠুরও। ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'আমি কিন্তু কাঁদিনি বাবা। ভান করছিলাম।' আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে বসল। কপাল থেকে কয়েকগুচ্ছ চুল অগোছালো হাতে সরিয়ে দিয়ে বলে, 'আমি ভাবছিলাম—তুমি কেন এলে!' বিষণ্ণ হাসল—'কিন্তু তুমি এত অহঙ্কারী বাবা যে, তুমি জানতেও চাওনি, আমি কেমন আছি! এখানে আমি সুখে আছি কি না।'

'আমি জানতে চাই, আমি হাসিমুখে বলি, তুমি সুখী হয়েছ কি না।'

হঠাৎ ওর বড়ো বড়ো চোখ সম্পূর্ণ খুলে গেল, দাঁতে ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ পরে বলে, 'না। তুমি চাও না, বাবা। আমি জানি।'

আমার শরীর হিম হয়ে আসছিল। রাধা যেন—ওর পুতুলের মতো আমাকে নিয়ে খেলবে—মনে হল। আমাকে কথা বলতে হল না। রাধা নিজেই বলল, 'কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাই—'

'কি'

'বলতে চাই যে, আমি সুখী নই।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, 'কিন্তু এ-বিয়েটাই তার কারণ নয়। বোধহয় কখনো কোনো অবস্থাতেই আমি সুখী হতাম না। বোধহয় একমাত্র বোকারাই নিজের অবস্থাতে সুখী হয়। কিন্তু তুমি জানো—আমি বুদ্ধিমতী।'

'তুমি বুদ্ধিমতী। আমি বলি, কিন্তু আমি কখনো টের পাইনি যে, তুমি সুখী ছিলে না।'

'ছিলাম।' হাসল, 'তোমার কাছে। যখন ছোট্ট ছিলাম, যখন আমার জার্মান মা আমাকে তোমার কাছে ফেলে রেখে গিয়েছিল।' তারপর বেশ ক্লান্ত হয়ে বলল, 'কিন্তু তখন আমি খুব ছোট্ট ছিলাম, আর বোকাও ছিলাম। না, বাবা।' মাথা নাড়ল, 'কিন্তু এখন আর আমি তা হতে পারি না। এমন লোক আমি কখনো খুঁজে পেতাম না—যে ঠিক তোমার মতো। তোমার মতো যে আমাকে বুঝতে পারে, তোমার মতোই যাকে আমি বুঝতে পারি, এমন কেউ বোধহয় নেই। সুভাষ তোমার মতো নয়—আমি জানতাম। না বাবা, আমি সুখী নই—কখনো হতে পারতাম না।'

'কি জানি তুমি এত কথা কি করে বলছ রাধা!' আমি নিষ্ঠুরের মতো বলি, 'হয়ত সুভাষের সঙ্গে তুমি আমার বয়সের মিল খুঁজে পেয়েছিল!'

'পেয়েছিলাম', এতটুকু লজ্জা না পেয়ে আমার মেয়ে আমার চোখে স্নিগ্ধ চোখ তুলে তাকায়, 'কিন্তু আমি জানতাম, তোমার পাশে ওর তুলনাই চলে না। জানতাম, তুমি ওকে ঘেন্না কর। এ-কথা সুভাষও জানে।'

'করি, রাধা।'

হাসল, 'আমি তাতে রাগ করি না, বরং খুশী হই। আমি কখনো ভাবতে পারি না বাবা, আমাকে ছাড়া তুমি আর সবাইকে ঘেন্না না করে থেকেছ! আমিও সবাইকে ঘেন্না করি, বাবা!'

'ছিঃ, রাধা।'

ও নেশাগ্রস্তের মতো হাসে, 'করি বাবা। সে-কথা তুমিও জানো। তুমি আমার সব জানো বাবা।'

'কি জানি।'

তেমনি অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসে রাধা, 'আমি এখানে সুখী হলে—আমি জানি, তুমি খুব কষ্ট পেতে। আমাকে তোমার কাছে ছাড়া আর কোথাও তুমি সুখী দেখতে চাও না।'

'বোধহয় তুমি পাগল হয়ে গেছ,' আমি হতাশ হয়ে বলি।

'জানি।, তোমার চোখ আমাকে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পায়। আমি মুক্তি পাই না।' রাধা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। তারপর এলোমেলো পায়ে—যেন স্বপ্নের ভিতরে মেঝের ওপর হাঁটতে থাকে। যেন আমার মেয়ের বয়স সাতাশ নয়, যেন ও সবেমাত্র হাঁটতে শিখছে। দু-হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া—যেন ও কিছুই

দেখতে পাচ্ছে না—ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ও কোনো অবলম্বন খুঁজছে। 'ঠিক এইভাবে—' ও বলে, 'তুমি আমাকে হাঁটতে শিখিয়েছিলে। কিন্তু আমি নিজে নিজে হাঁটতে শিখলে—আমি জানি, তুমি তখন খুশী হওনি।'

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, 'বোকা!'

'আমি কি নাটক করছি, বাবা!' ও ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকায়। আমি চুপ করে হাসিমুখে চেয়ে থাকি।

'আমি অনেক নাটক করেছি বাবা, ও বলে, 'তুমি জানতে চাও না কেন করেছি? জানতে চাও না কেন নাটক করে পালিয়ে এসেছিলাম?'

'চাই, রাধা।'

রাধা ক্লান্ত হতাশের মতো বলে, 'আজ বাপি সন্ধ্যেবেলায় আমাকে অনেক প্রশ্ন করছিল। সে জানতে চাইছিল, ইন্টারন্যাশনাল শব্দটার অর্থ কি! আমি বলেছি—ট্যাঁশ। বলেছি—তুমি ট্যাঁশ বাপি।'

'ছিঃ, রাধা।'

'সে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, তুমি আমার কে হও। জিজ্ঞেস করছিল, আমি তোমাকে ভয় পাই কি না! আমি ওকে খেলনা দিতে চাইলাম—নিল না। বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলাম—গেল না।' ও দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করে বলল, পুরুষ-মানুষের সামনে আমি কেমন দুর্বল হয়ে যাই বাবা। বাপির ওপরেও আমি কোনো জোর করতে পারি না। মনে হয় ও আমার চোখে চোখ রেখে যদি কিছু করতে বলে, হয়ত আমাকে তাই করতে হবে।' ও হাসল। 'সুভাষের ওপরেও আমার কোনো জোর খাটেনি। আমাকে নিয়ে যেতে চাইল—আমি নিশি-পাওয়ার মতো চলে গেলাম।' ও হঠাৎ সচেতন হয়ে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'এটা কি খুব স্বাভাবিক বাবা?'

আমি কথা বলতে পারলাম না। শুধু মাথা নেড়ে জানালাম—না।

'কিন্তু তুমি আমাকে কখনো জোর করতে শেখাওনি। আমি কিন্তু কখনো ভুলে যাইনি, আমার মা ছিল খাঁটি জার্মান, আমার বাবা ছিল খাঁটি ভারতীয়, কিন্তু আমি তত খাঁটি নই।' একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ স্খলিত ভাঙা গলায় বলে, 'কিন্তু এ-সবই তুমি আমাকে ভুলিয়ে দিচ্ছিলে—আমার বয়সের প্রথম পাঁচ বছর আমি জার্মানিতে যা-যা শিখেছিলাম—সব। তুমি ছিলে আমার চারধারে ঘেরাটোপের মতো। আমি জানতাম—আমি শুধুমাত্র তোমার মেয়ে। আমি অন্য কারো নই, অন্য কিছু নই।'

'তুমি ঠিক কি চেয়েছিলে রাধা?'

আবার ও নেশাগ্রস্তের মতো হাসে, 'বোধহয় জানতে চেয়েছিলাম, তোমাকে বাদ দিলে আমার কতটুকু থাকে। হাতের কাছে তোমার বন্ধু ছিল—সুভাষ।' আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। 'মনে হয়, পুরুষদের প্রতি আমি খুব দুর্বল, না বাবা?'

রাধা হাঁটছিল। হাঁটছিল। একটু মৃদু হাসি ওর মুখে লেগেই ছিল। 'আমি জানি, বাবা', সে তেমনি অপ্রকৃতিস্থের মতো, কবিতা পড়বার মতো গুন গুন করে বলে, 'তুমি ক্ষমা-টমার কথা বলতে এতদূর আসোনি।'

'কেন এসেছি, রাধা?'

'তুমি জানো বাবা' বলে হঠাৎ ও শিশুর মতো কাঁদতে থাকে। আমি বাধা দিই না। কান্নার ভিতরে থেকে ও বলে, 'আমি কখনো নিজের মতো হয়ে উঠিনি।' আস্তে আস্তে ও আবার আমার পায়ের কাছে পোষা বেড়ালের মতো এসে বসে। খানিকক্ষণ কেঁদে চুপ করে রইল রাধা, তারপর বলল, 'কাল থেকে আমি

তোমাকে দেখছি। তুমি কখনো এতটুকু অস্থির হলে না। যেন খুব বড়ো গাছের মতো তুমি। অথচ আমাকে তুমি কাঁদতে দেখেছ, অস্থির হয়েছি—টের পেয়েছ। তুমি আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ বাবা।' হঠাৎ স্খলিত তীব্রস্বরে বলে, 'কিন্তু তুমি জানো, আমি তোমাকে এতটুকু নাড়াতে পারি না।'

'আমি তোমার কি করেছি, রাধা?' আমি ক্লান্তস্বরে বলি, 'তোমার কথা শুনে নিজেকে শয়তান বলে মনে হয়।'

ও ওর হাসিমুখ হঠাৎ আমার দিকে ফেরালে, আমি টের পাই, হঠাৎ ওর সমস্ত আবেগ যেন এইমাত্র কেটে গেল। খুব শান্তস্বরে বলল, 'বাবা, তুমি আমাকে একটা কথা বলবে?'

আমি ভয় পেলাম। যেন অস্পষ্টভাবে হলেও বুঝলাম, ও কি জানতে চায়। বললাম, 'বলো।'

'তুমি কেন আবার বিয়ে করলে না বাবা?' ও আমার চোখে চোখ রাখে। 'মা যখন তোমার কাছে ছাড়া পেয়ে আফ্রিকায় চাকরি করতে চলে যায়, তখনো তোমার বয়স কম ছিল। বোধহয় সাতাশ—না, বাবা?'

আমি ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম। শান্তভাবে বললাম, 'তোমার কাছে এটা আশা করি না, রাধা। সব কিছু জেনে গিয়ে কোনো সুখ নেই। তুমি এত জানতে চাও কেন?'

আমার কথাকে গ্রাহ্য না করে সে ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবে। তেমনি, যেন অস্ফুটে স্বপ্নের ভিতর থেকে বলে, 'বোধহয় আমি জানি।' তেমনি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়, 'তুমি বড়ো একা, বড়ো জেদী। কারো সঙ্গেই তোমার কখনো মেলেনি, বাবা। কোনো মেয়েকেই তুমি সহ্য করতে পারতে না।' '...আর তা ছাড়া, আমার জন্য তুমি সবসময়ে সুন্দরী আর অল্পবয়সী আয়া রাখতে...'

আমি দুটো হাত কাঙালের মতো তুলে বললাম, 'রাধা'।

'বাবা', একটুও বিচলিত না হয়ে সে বলে, 'আমি জানি। তুমি কি ভীষণ ছেলেমানুষ আমি জানি, বাবা। তুমি টের পাওনি—কিন্তু আমি আমার আয়াদের ঘেন্না করতাম।' ও চোখ সরিয়ে নেয়, 'এইভাবে—বোধহয় এইভাবে আমি সবাইকে ঘেন্না করতে শুরু করি—আর কেমন একা হয়ে যাই।' আবার হাসে রাধা। 'তবু মনে হয়, আমি অনেকের কাছ থেকে ভালবাসা পেতে চেয়েছিলাম—বোধহয় আমি অনেকের হতে চেয়েছিলাম।' আমাকে নিয়ে যেন খেলার মতো করে সে হঠাৎ বলে, 'তুমি এ-সবই জানতে। তুমি আমার সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাও।' নিষ্ঠুরের মতো আমাকে কষ্ট দেবার জন্য কৃত্রিম ভয়ের স্বরে বলে, 'আমার কেমন মনে হচ্ছে যে, তুমি আগে থেকেই জানতে আমি আজ এরকম একটা নাটক করব।' যেন খুব হতাশ হয়ে বলে 'কে জানে, হয়ত আমি আর যা-যা বলব, তা-ও তোমার মুখস্থ কি না।'

আমি উত্তর দিলাম না। ও খুব ভেবে নিয়ে যেন অনেকদূর থেকে বলল, 'কিন্তু অবশেষে...'

'কি, রাধা?'

'আমি এখন আলাদা মানুষ।' হাসল।

'তুমি নও, রাধা' আমি নরম স্বরে বললাম।

ও কান দিল না। আস্তে আস্তে বলল, 'আমি এখন খুব একা বাবা। কেউ নেই... সুভাষ না, তুমি না...এমনকি, বাপিও না।' হাসল, 'আই ডোন্ট পজেজ। বিশ্বাস না হয়, বাপিকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

ও উঠে দাঁড়াল, 'তুমি ঘুমোও বাবা। আমি যাচ্ছি। বেচারা সুভাষ হয়ত চোরের মতো এসে বসে আছে।'

ও দরজার কাছে চলে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিলাম না। ভেঙে ফেলার আগে কয়েক মুহূর্ত—মাত্র সেটুকু সময় দিলাম ওকে। ও চৌকাঠ ডিঙোতে পা তুললে আমি নরম গলায় ডাকলাম, 'রাধা।'

ফিরে তাকিয়ে হাসল, 'বলো।'

'আর একবার আমার কাছে এসো।'

ও ফিরে ঘরের মাঝামাঝি এসে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াল। আমি সামান্য হাঁফাচ্ছিলাম। আমি ওকে আমার কষ্ট দেখতে দিলাম। বললাম, 'মনে হচ্ছে তুমি বড় কষ্টে আছ, রাধা। তোমার মুখ বলছে, তুমি বড়ো যন্ত্রণা পাও।'

'পাই বাবা।' একটু চুপ করে থেকে হেসে বলে, 'কিন্তু তুমি ক্ষমা-টমার কথা বোলো না!'

আমি কি বলতে চেয়েছিলাম, ভুল হয়ে গেল।

'আর, তাতে আমার দরকারও নেই, বাবা।' আস্তে আস্তে বলল।

'কেন, রাধা।' আমি বললাম। ভাবছিলাম, ওকে বলি—আমার সঙ্গে চলে চল।

'তোমাকে ছেড়ে আমি বড়ো একা, বাবা। কিন্তু এ আমার নিজের একা থাকবার কষ্ট—এখানে কাউকে আমার সহ্য হয় না।' ও বলে, 'আমি ঠিক পারব। তুমি দেখে নিও।'

'কি পারবে, রাধা!'

'আমি আমার কষ্ট লুকিয়ে রাখতে পারব, বাবা।' হাসল, বলল, 'তুমি ঘুমোও।' তারপর আমাকে শুইয়ে দিয়ে চারধারে মশারি ফেলে দিল সে। বাতি নিবিয়ে দিলে, অন্ধকার থেকে তার গলার স্বর শোনা গেল, 'তুমি পারো না বাবা, তুমি আর কিছুই পারো না। তুমি যখন আমাকে দরজার কাছ থেকে ফিরিয়ে আনলে, তখনই আমি জানতাম—তুমি ভাবছিলে, আমি ভেঙে যাব। না বাবা?' স্খলিত কণ্ঠে হাসল, 'তুমি কি ভীষণ হিংসুক বাবা!'

ও দরজার কাছে গেলে ওকে ওর ছায়ার মতো মনে হয়। ও খুব মৃদু গলায় বলল, 'তুমি কষ্ট পাচ্ছ বাবা।' আবার দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ হয়, 'বরং তুমি চলে যেও।'

চলে গেল।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে আবার দেখা। বাপি আর রাধা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা পরস্পরকে দেখে হাসলাম। কথা বললাম না।

শুধু বাপি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর হঠাৎ লাজুক মুখ করে বলল, 'যদিও এখন আমার বলতে লজ্জা করছে...কিন্তু আমি তো জানতাম না—'

'কি বাপি!' আমি শান্ত দুঃখী স্বরে বললাম।

'জানতাম না', সে মুখ লুকিয়ে বলল, 'যে, তুমি আমার দাদু হও।'

চালচিত্র

কেহে বট বাঁশের দোলাতে চেপে যাচ্ছো চলে শ্মশানঘাটে? কে হে বট? তোমার ঘটিবাটি রইল পড়ে জুড়িগাড়ি কে হাঁকাবে? কে হে বট? যাচ্ছো চলে...

এই সময়টায় কাশি এসে পড়ে। গলায় কে বিচুটি ঘষে দিয়েছে বটে। কাশিটার কোনও বাপ-মা নেই। সেই কবে থেকে সেঁদিয়ে আছে। কাশির তাড়সে তামাক গেছে, তেঁতুল গেছে, পাকা কলার ছায়াটি মাড়ানো পাপ। বটেশ্বরকে বাঁচতে হচ্ছে এসব ছাড়াই। গান-বাজনা যাই-যাই করেও একটু ছিল। এখন তাও যায় বুঝি।

কাশিটা কিছুক্ষণ নাগাড়ে হয়ে যেতে লাগল। কোন বেটাচ্ছেলে শিরীষ কাগজ সাঁদ করিয়েছে গলার মধ্যে। তারপর ঘষটাচ্ছে আর ঘষটাচ্ছে। শব্দ সাত পাড়া ধরে শোনা যাচ্ছে। শুধু নিতাইয়ের মায়ের কানেই বোধ হয় যাচ্ছে না। পুরোনো তেঁতুল আর এখোগুড় জলে গুলে খেলে কাশি ফর্সা। তা এ বাড়িতে দুটোর কোনওটারই জোগাড় নেই। জোগাড় অনেক কিছুরই নেই। এ বেলা হাঁড়ি চড়ে তো ও-বেলা চড়ে না। বটেশ্বরের তিন ছেলে তিন রকমের কুষ্মাণ্ড, বড়টা ছিঁচকে চোর, এখন হাজতে আছে। মেজোটা হাবাগোবা, ছোটটা বাউণ্ডুলে, যাত্রা দলের নটবর। ঘাড়ে এখনও একটা সোমত্ত মেয়ে। সংসারের হাল দেখে বটেশ্বর এখন ফাঁক বুঝে টুক করে মরে যাওয়ার তালে আছে। চোখটি বুজে ফেললে আর কার বোঝা কে বয়? যতক্ষণ শ্বাস চলছে ততক্ষণই এই কাশির কষ্ট, ভাতের কষ্ট, ছেলের কষ্ট, মেয়ের কষ্ট। কত মাপের কত দুঃখ আর কষ্ট, জুড়ে-জুড়ে সেলাই করে তবে বটেশ্বরের জীবনের কাঁথাখানা ভগবান বানিয়েছেন। অনেক হয়েছে, এখন বটেশ্বর কাঁথাখানা খুলে ফেলে দিয়ে একখানা ভোঁ-দৌড় মারতে চায়।

কাশিটার পর শরীর একটু হ্যাঁদানো লাগে। বটেশ্বর রোদে পা ছড়িয়ে মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। যতক্ষণ রোদ থাকে ততক্ষণ বটেশ্বর যতদূর পারে নিজেকে উল্টেপাল্টে রোদে বেগুনপোড়া করে রাখে। শীতটা ঘনিয়ে উঠছে খুব। সামনে বাঘা মাঘ। এমন কাঁপন দেবে এবার 'বাপ' ডাকিয়ে ছাড়বে। কিন্তু এই সারাদিন রোদে ভাজা-ভাজা হয়েও লাভ নেই। যে-ই সন্ধেটি নামল অমনি একেবারে আঁত-অবধি অবশ করে দিয়ে ভেজা কাঁথার মতো শীতও এসে সাপটে ধরল।

বটেশ্বর খানিক জিরিয়ে উঠল। যতই ভাঙা কুলোর মতো ফেলে রাখা হোক তাকে, সে যতদিন না নির্যস মরছে ততদিন বাড়ির কর্তা। এই যে তিনখানা টিনের চালের ঘর, দরমার বেড়া, ইঁটের গাঁথনির ওপর, মাটির পলেস্তারা দেওয়া ভিত এ বলতে গেলে তার নিজের হাতেই গেঁথে তোলা। একসঙ্গে নয়, তিনখানা ঘর তুলতে বছর পাঁচেক লেগেছিল। প্রথমটায় নতুন টিন রোদে এমন ঝিক মারত যে, মাইলটাক দূর থেকে মালুম হত, ওই হল গো বটেশ্বরের ঘর। রং করার পয়সা ছিল না বলে সেইসব টিন এখন মরচে ধরে ঝুরঝুর করছে। মাটির ভিতেও মাটি আলগা হয়েছে অনেককাল। বিস্তর গর্ত। ডেবেও গেছে কয়েক জায়গায়। বেড়ায় মেলা হোঁদল। উঠোনটার দশাও চোখে দেখা যায় না। মাঝখানটা যাহোক একটু নিকোনো বটে, কিন্তু ধার ঘেঁষে ঘেঁষে বুক সমান জঙ্গল উঠেছে ঠেলে। ঘণ্টা দুই কোদাল চালালেই সব উঠে গিয়ে ফের ন্যাড়া

হয়ে যায় উঠোন। কিন্তু কোদালটা টেনে তুলবেটা কে? তিনটে ছেলেই কুষ্মাণ্ড। বটেশ্বর তো এক বুক শ্বাস টানতেই নেতিয়ে পড়ে।

চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখল বটেশ্বর। রোজই দেখে। বেলাটা বাড়লে শরীরটাও একটু ছাড়ে। উঠোনের পশ্চিমধারে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে বটেশ্বর দেখল, উনুনের জ্বালাই ওঠেনি আজ। নিতাইয়ের মা বোধহয় পাড়া-বেড়াতে গেল। সদিটাকেও দেখা যাচ্ছে না কাছেপিঠে। পাড়া-বেড়াতেই গেছে বোধহয়, নয়তো শাকপাতা তুলতে।

চোরের বাড়ি বলেই বোধহয় এ-বাড়িতে চোর আসে না। আর এসে করবেই বা কী? ছুঁচো মারলে নিজের হাতেই গন্ধ। বটেশ্বর তাই দোর খোলা রেখেই বেরোল।

আজ খুব নিতাইয়ের কথা ভাবছিল সে। ব্যাটা চোর বটে, কিন্তু চুরি করেও বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেনি আজও। আজকাল তো সোজা বাপের কাছেও বিড়ি আর ম্যাচিসের পয়সা চায়।

তেমন তেমন চোর হতে পারলে চোরের বাপ হয়েও সুখ ছিল। যত লোক লুটেপুটে খাচ্ছে চারদিকে। নিতাই সেসব নয়। সে হল গ্যাদড়া চোর। লোকের ঘটিটা-বাটিটা সরায়। চোরের মারও খায়। দেগঙ্গার তোতারামের মোটর কারখানায় ঢুকে ব্যাটারি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। হাটুরে কিল তো খেলই। তার ওপর আরও পাঁচটা চুরি মামলা ঘাড়ে চাপিয়ে পুলিশ হাজতে চালান দিল। তিন মাসের মেয়াদ হয়েছে, তার দু মাস পেরিয়ে তিন মাস চলছে। ছাড়া পেয়ে বাড়ি এলে যে সকলের আহ্লাদ হবে এমন নয়। তবে জেল খাটছে বলে বুকের মধ্যেটায় একটু কেমন করেও যেন। শ্বাসবায়ুটার বড্ড বাধা হয় এক এক সময়ে।

বটেশ্বর তার স্থাবর সম্পত্তি দেখতে একটু বাইরের দিকে এল। উত্তর দিকটায় মেটে রাস্তা, দক্ষিণে জঙ্গল, পুবে গিরিধারীদের বাড়ির হাতা, পশ্চিমে পুকুর। মাঝখানে মেরেকেটে কাঠাপাঁচেক জায়গা হবে। এটুকু বটে নির্যস বটেশ্বরেরই। তা এই অজ পাড়াগাঁয়ে এটুকুরই বা দাম কী? নাবাল জমি। বর্ষায় এক হাঁটু জল হয়।

বাইরে ফর্সা রোদে দাঁড়িয়ে তবু বটেশ্বরের বুকখানা একটু ঠেলে উঠল। অনেকের তো পাঁচ কাঠা বাস্তুজমিও নেই। তার চেয়েও মেলা গরিব রয়েছে সংসারে।

জঙ্গলের দিক থেকেই বটেশ্বরের দু নম্বর কুষ্মাণ্ডটা বেরিয়ে এল। চেহারাটা খারাপ ছিল না। কালোর মধ্যে মিঠে একখানা ভাব আছে মুখে। চোখ দুখানা টানাটানা। তাকালে মায়া হয়। কিন্তু ওইখানেই যত গণ্ডগোল। ওই ড্যাবা ড্যাবা চোখের পিছনে কোনও মগজের খেলা নেই। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স হল, এখন রাতে বিছানা ভিজিয়ে ফেলে, মাঝে মাঝে খিদে পেলে বাচ্চা খোকার মতো কেঁদে ওঠে, কথাবার্তায় এখনও আড় ভাঙেনি। সে যাহোক এক রকম সয়ে যেত, কিন্তু বিপদ হয়েছে রাস্তায় বেরোলেই গুচ্ছের ছেলেপুলে ওর পিছুতে লাগে। ল্যাং মেরে ফেলে দেয়, ঢিল মেরে মাথা ফাটায়, জামা ছিঁড়ে দেয়, অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়ে দেয়। ছোঁড়া মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে গালমন্দ করে বসলে তখন সবাই মিলে পিটিয়ে হাতের সুখ করে নেয়। দু নম্বরের কথা ভেবেও বটেশ্বরের শ্বাসবায়ুটা কাঁপে মাঝে মাঝে। মারধর বটেশ্বরও কিছু কম করে না বলাইকে। মায়ের হাতে মার খায়, বোনের হাতে মার খায়, ভাইদের হাতে মার খায়, পাড়াপড়শীর হাতে মার খায়। একটা শরীরে আর কত সইবে ওর? মার খেয়েই না একদিন মরে।

আজও খেয়েছে। ছেলেটা একটু কাছে এগিয়ে আসতেই বটেশ্বর দেখতে পেল, মাথার চুল খামচানো, গলায় দগদগে লাল দাগ, গালে কার আঙুল বসানোর দাগ ফুটে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বটেশ্বর রক্তচক্ষুতে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল। আগে মায়া হত, যারা মেরেছে তাদের ওপর রাগও হত, এমনকি ছেলের হয়ে তাদের সঙ্গে গিয়ে ঝগড়াও করে এসেছে বহুবার। আজকাল আর মায়া হয় না। মনে হয়, মেরেছে বেশ করেছে। মেরেও বোধ হয় ফেলবে একদিন। শিবু আর নন্দর দল হল গাঁয়ের সবচেয়ে ওঁছা। তারা না পারে হেন দুষ্কর্ম নেই। ধুতরো-বিচি আর করবীর গোটা খাইয়ে বলাইকে তারা প্রায় বৈতরণী পার করে দিয়েছিল একবার।

কোথায় গিয়েছিলি? বলে বটেশ্বর একটা চড় তুলল। কিন্তু অত বড় চড়টা কষানোর মতো জুত নেই শরীরে। কষালে চড়ের ধাক্কায় যে নিজেই কাটা কলাগাছের মতো ভূমিশয্যা নেবে।

বলাইও চড়টা উঠতে দেখল, কিন্তু গা করল না। ডান হাতে ডান চোখ কচলাতে কচলাতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, মেরেছে।

তা তো হাল দেখেই বুঝেছি। যাস কেন?

খুব মেরেছে।

বাতাসে গন্ধটা শুঁকল বটেশ্বর। ভাল গন্ধ নয়। এই সাত-সকালেই ছোঁড়াকে কেউ ধেনো গিলিয়েছে।

কী খেয়েছিস হারামজাদা?

নন্দ দিলে যে! খেতে বিচ্ছিরি। বলল না খেলে জুতোপেটা করবে।

তাই খেলি?

খেলুম। সঙ্গে বাদাম ছিল।

ওঃ সেই লোভে!

বটেশ্বর কি আর বলবে! ছেলেটার তো খিদেও পায়। খিদে পেলে চেপে রাখতে পারে না। আপনাপর ভেদবুদ্ধি নেই বলে নানা কাণ্ড করে বসে। দোকান থেকে খাবার তুলে খায় বা কারও হেঁসেলে ঢুকে পড়ে পিঁড়ে পেতে বসে যায়, নয়তো কারও পাত থেকেই খাবলা মেরে তুলে খায়। তার জন্য লাঞ্ছনা গঞ্জনা কিছু কম হয় না। বাড়ি বয়ে এসে কত লোকে আকথা কুকথা বলে যায়।

হ্যাঁ রে, রাস্তার কুকুরে আর তোতে তফাতটা কি তা বুঝতে পারিস?

বলাই এ কথার জবাব দিল না, বলল, বড্ড পেট গুলোচ্ছে। বমি করব।

যা, ওই পুকুরধারে গিয়ে গলায় আঙুলে দিয়ে উগরে দিয়ে আয়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

বলাই টলতে টলতে পুকুরধারে গেল। দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দেখল বটেশ্বর।

হুস হাস করে উত্তুরে হাওয়া ছাড়ল। রোদটা পিছলে যাচ্ছে গা থেকে। বটেশ্বর খয়েরি খদ্দরের চাদরটা আর একটু সেঁটে নিল গায়ে। তারপর উঠোনে ঢুকে ঘরের আড়ালে হাওয়া বাঁচিয়ে উঠোনের রোদে বসল। সকাল থেকে পেটে খোঁদল। দানা নেই। তবে জল অনেকটা করে সাঁদ করিয়েছে ভেতরে। লাভ হয় না। একটু বাদে বাদে পেচ্ছাপ হয়ে বেরিয়ে যায়। তা এরকম প্রায়ই হয়, গা-সওয়া।

হেলেদুলে সদি এসে উঠোনে এক বোঝা কচুর শাক ফেলে বলল, বাব্বাঃ, মুখ নয় তো, আস্তাকুঁড়। চিঁড়ে কুটে দিলুম সেদিন, আজ একটু চাইতে গেছি, নন্দীবাড়ির গিন্নিমাগী কত কথাই শোনালে।

চিঁড়ের কথায় বটেশ্বর নড়েচড়ে বসে। শব্দই ব্রহ্ম। 'চিঁড়ে' বলতেই নাকে নতুন চিঁড়ের গন্ধ এসে লাগে, জিভটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠতে চায়। বটেশ্বর মেয়ের দিকে জুলজুলে চেয়ে রইল, দিলে না বুঝি?

দেবে! সে আত্মা কি ও-মাগীর আছে? দিয়েছিল তো মোটে পাঁচসিকে পয়সা আর একটা ছেঁড়া কাপড়। তা সে-ই তাঁর দানসাগর।

অত কথা কানে গেল না বটেশ্বরের। সে চিঁড়ের কথা ভাবতে লাগল। আহা, চিঁড়ের মতো জিনিস হয় না। নতুন চিঁড়ের সোঁদা গন্ধখানা যেন একেবারে গন্ধমাদন।

কচুর রসে গা চিড়বিড় করছিল সদির। কচু ধরলেই তার এ রকম হয়। চুলকে চুলকে ডুমো ডুমো হয়ে ফুলে যায়। কচু খেলে তার গাল ধরে। তবু ওই কচুই রোজ গিলতে হয়। যেমন গা চিড়বিড় করছে তেমন মন চিড়বিড় করছে চটপটির মতো। রাগের তাড়সে বাজি পটকা ফাটছে মাথায়, চোখে ফুলঝুরির ফুলকি। রাগটা ফেটে বেরোতে চাইছে বলেই নন্দীবাড়ির গিন্নিমাগীর ওপর ঝাল ঝাড়ছে সে। নইলে তার দোষ কী। বিশ্ব সংসারে কোন লোকটা কম বজ্জাত। ওই যে উঠোনে বসে মৌজে রোদ পোহাচ্ছে লোকটা—ও

হারামজাটা কি কম বজ্জাত? সংসার থেকে গা বাঁচিয়ে কেত্তন গেয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিল। এখনও হাঁ করে বসে থাকে কখন বউ-মেয়ে কিছু জুটিয়ে আনবে। আড়াই বিঘে ধান জমি ছিল, কবে পেটায় নমঃ হয়ে গেছে। এখন শুধু মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু আছে। তিন তিনটে হুমদো ভাইকেও কি সইতে পারে সদি? তিনটে তিন রকমের বজ্জাত। রাগ আর রাগে দিনরাত খাক হয়ে যায় সে। রাগ তার মায়ের ওপরেও—তবে একটু কম।

ঘরে এসে সে ভেজা কাপড়খানা ছাড়বে তার উপায় নেই। মোট চারখানা শাড়ি মায়েঝিয়ে ভাগাভাগি করে পরতে হয়। বাহারি জিনিস নয়। নিতান্তই মিল-এর মোটা কাপড়, ছিরিছাঁদ নেই, সাদা খোলে লম্বা পাড়। সকালেই দুখানা জলধোয়া করে গেছে। শুকিয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু ধোয়া কাপড় পরলে মা এসে এমন চেঁচাবে যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। নিয়ম হল, শাড়ি ভেজালে গায়ে গায়ে শুকোও। পরা কাপড়খানা থেকে একটা বিদিকিচ্ছিরি গন্ধ আসছে। কচুর শাক তোলার সময় একটা রোগা পেট-পাতলা গরুর লেজ এসে ক'বার লেগেছিল গায়ে। লেজটা হড়হড়ে গোবরে মাখামাখি। আড়াআড়ি সেই গোবরের দাগ এখনও দগদগ করছে শাড়িতে। থাকগে যাক, শুকোক গায়ে, কে তাকে দেখতে আসছে?

আসবেও না কেউ দেখতে এ জন্মে। হবেও না বিয়ে। দুগাছা ব্রোঞ্জের চুড়িও দিতে পারবে ওই হাড়হাভাতে বুড়ো শয়তান? আসল না হোক নকল বেনারসী? পাত্রের একখানা সস্তা ঘড়ি বা সাইকেল? খাওয়াবে পনেরো জন বরযাত্রীকে? তার চেয়ে মুখে মেচেতা ধরুক, চামড়া আরও খসখসে হোক, মাথার চুল খাক উকুনে আর খুসকিতে। এই ভাল সদির। আমগাছ আর দড়ি আছে। একদিন ঝুলে পড়লেই হয়। ঝুলবে ঝুলবে করছে অনেকদিন ধরে মনটা।

ঘরে এসে সদি নড়বড়ে চৌকিতে বসে একা একা ফুঁসছিল।

গায়ের চুলকোনি যত বাড়ছে, তত রাগ বাড়ছে সদির, মর মর মর সবাই মর। নন্দীমাগী মর, ভাইগুলো মর, মা মর, বাপ মর, নিকেশ হয়ে যা....

কত লোক লটারি জেতে। গুপ্তধন পায়। সাধু-সন্নিসি এসে তাবিজ কবচ দিয়ে যায়। এই মরুণেগুলোর কপালে তাও জুটল না কোনোদিন। সকাল থেকে কেবল শুরু হয় আঁদার-পাঁদার ঠেঙিয়ে, মেগেপেতে ভিক্ষে করে পেটের যোগাড় করা।

বুড়ো ভোঁদড়টা কাশছে। এমন কাশি যে মাথা ঘুরিয়ে দিল।

সদি কিছুক্ষণ শুনল, তারপর দুমদুম করে পা ফেলে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, গলা টিপে কাশি বন্ধ করব, বুঝেছো?

বুড়োটা সভয়ে মেয়ের দিকে মুখ তুলে চাইল। কথা বলার অবস্থা নয়। কাশির দমকে নাল গড়াচ্ছে কষ বেয়ে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। গাল গলার রগ কেঁচোর মতো ফুলে আছে।

সদি দাঁতে দাঁত পিষে বলে, দিন-রাত কেবল কাশি আর কাশি। কেন, যাও আরও ফুর্তি ওড়াতে। তেঁতুল চাই, অম্বল চাই, তামাক চাই ঘড়িঘড়ি। এখন কেমন? গলায় খন্তাটা এনে ঢুকিয়ে দেব এখন?

লোকটা ভয় খেয়েছে। হাত তুলে বুঝি মাপই চাইল। তারপর চাদরে মুখ চাপা দিয়ে কাশি আর দম দুটোই আটকানোর একটা চেষ্টা করল, কোনোটাই পারল না।

সদির মাথাটা পাগল-পাগল। বিড়বিড় করেছিল, এখন চেঁচিয়েই বলল, মর মর মর....

বটেশ্বর একেবারে নাভিমূল থেকে কাশি তুলে আনছে। আজ বোধহয় জীবনের শেষ কাশি কেশে নিতে চায়। এমন খিল ধরেছে বুকে যে দম টানতে পারছে না। যদি বা টানে নাল গিয়ে শ্বাসনালীতে ঢুকে বিষম

খায়।

মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে উবু হয়ে কাশতে লাগল বটেশ্বর। একটা কথাও বেরোল না মুখ দিয়ে। কিন্তু সদির কথাটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে। তাকে মরতে বলছে সদি।

কথাটার জবাবও বটেশ্বরের জানা। সে বলতে চাইছে মরার ফাঁকটাই তো খুঁজছি কবে থেকে। ফাঁকই যে পাই না, তবে ভাবিসনি, কাশির দমকে একদিন কটাং করে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবেই। এ রকম কয়েকটা জম্পেশ কাল-কাশি হতে থাকুক।

কিন্তু কিছু বলাই গেল না।

সদি অবশ্য দাঁড়াল না। তার সারা গা কুটকুট করছে। পাগল পাগল লাগছে। খিদে মরে গিয়ে মুখে তিতকুটো স্বাদ। কষে ফেনা জমে আছে।

সদি ঘরে এসে একটা আস্ত সুপুরি মুখে দিল। একটা সুপুরি গাছ আছে তাদের। মেলা সুপুরি হয়। খিদে চাপতে হলে সুপুরি খেয়ে কত বেলা কাটিয়ে দেয়। একটু কাঁচা থাকলে ভালো। নেশামতো হয় তাতে, কাঁচা সুপুরির ধক পেট অবধি অবশ করে দেয়।

সদির দাঁত শক্ত। মাংসের হাড় চিবিয়ে ছাতু করতে পারে। শুধু জোটে না এই যা। সুপুরিটা কাঁচাই বটে। চিবোলে লহমায় তার মজবুত দাঁতে পিষে কাদামতো হয়ে যাবে। তাই চিবোল না সদি, আছে যতক্ষণ থাক।

ঘরে আয়না নেই, কিন্তু পুকুরে জল আছে। সদির এখন একটু নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করে। বয়স যে যায়। যৌবন এল বটে, শরীরের বসবার জায়গাই পেল না। তেমন ঠেলে উঠল উঠল না বুক, ভারী হল না উরু, কেমন সব দড়ি পাকিয়ে রইল, গুটি পাকিয়ে রইল। কাচের চুড়ি অবধি জোটানো যায় না। আর জোটালেও, রাখতে পারা কি সোজা? কাপড় কাচো, কাঠ টুকরো করো, বাসন মাজো, বেড়া বাঁধো। কাঁচের চুড়ি কি অত ভর সয়? পটাপট ভাঙে। ওসব বিবি-হাতের জন্য, তার মতো ওঁছা মেয়েদের হাতের জন্য নয়।

সদি সাজে না ঠিক কথা, কিন্তু কখনো সখনো দু-একজন বলে ফেলে, সে দেখতে নাকি মন্দ নয়। তাই একটু দেখতে ইচ্ছে যায় নিজেকে মাঝে মাঝে।

বটেশ্বর আর কাশছে না। রোদের দিকে হাঁ করে বসে আছে। ওভাবেই গলা অবধি রোদ সাঁদ করিয়ে ভিতরটা সেঁকে নেওয়ার চেষ্টা করে বটেশ্বর, সদি জানে। সেঁক তাপ আর দিচ্ছে কে?

সদি রান্নাঘরে ঢুকে লক্ষ্মীছাড়া চেহারাটা একবার দেখল। নিবন্ত উনুনের পাশে হাকুচ কালো মেটে ভাতের হাঁড়ি বিড়ের ওপর একটু কেতরে আছে। ঢনঢন। মালসায় একটু নুন পড়ে আছে। অ্যালুমিনিয়ামের চারখানা তোবড়ানো থালা আছে পড়ে। রাতে চালভাজা খেয়েছিল তিনজনে। কানাই ফেরেনি, তবে তারটাও বাড়া ছিল, মা তুলে রেখেছে কানাইয়ের ভাগ। একটা কড়াই উনুনে বসানো, তাতে খানিকটা জল। কিছু আনলে সেদ্ধ হবে বলে কাজ এগিয়ে রেখে গেছে সদির মা। এ রান্নাঘরে বেড়ালেও ঢোকে না। ভারী রাগের মুখ করে সদি চেয়ে রইল। তারপর থালা ক'খানা তুলে নিল। ঘাটে গিয়ে ধুয়ে আসবে। ভাতের এঁটো নয়, তবু ধোয়ার নিয়ম।

সুপারিটা দাঁতের চাপে তিন টুকরো হয়েছে। মুখ ভরে গেল কাঁচাটে সুপুরির তিতকুটে রসে। গলায় ধক লাগছে খুব। মাথাটা ঝিনঝিন করছে। নেশাটা ভারী ভাল লাগে সদির। সুপুরির ধক তার রাগটাকে খেয়ে নিচ্ছে।

যখন উঠোন পেরোচ্ছিল তখন বটেশ্বরের মুখের সামনে কয়েকটা মাছি ভন ভন করছে। বটেশ্বর নির্বিকার। হাঁ করে গলার ভিতরে রোদ ঢোকাচ্ছে। পিছনে ভর দিয়ে চিতিয়ে আছে একটু চোখ বোজা। চোখের কোল জলে ভরে আছে।

একবার বাবা বলে ডাকতে ইচ্ছে হল সদির। তারপর ভাবল, থাকগে মরুকগে।

জামতলায় বদ্রী দাঁড়িয়ে আছে। ওই। কোমরে ঠেস দেওয়া সাইকেল। ভারী রোগা আর ফচকে। সদিকে দেখলেই চোখ নাচিয়ে বলে 'হবে নাকি?'

কী হবে তা অবশ্য বলে না। কিন্তু কুপ্রস্তাব বুঝতে পারে না এমন মেয়ে কে-ই বা আছে।

সদি বরাবর মাথা নামিয়ে নেয়। যৌবন বৃথা চলে গেল। মাঝে মাঝে ইচ্ছে যায় শোধ তুলতে, বদ্রীকে বলে দেয়, হবে। না হবেই বা কেন? এর চেয়ে বেশি আর কীই বা কেলেঙ্কারি হবে তাতে?

বলা যায় না, বদ্রীর দল একদিন টেনেও নিয়ে যেতে পারে তাকে। ওর পেছনে নন্দ আছে, শিবে আছে। ষণ্ডাগুণ্ডা সব ছেলে-ছোকরা। কোথা থেকে পয়সা পায় কে জানে। মদ খায়, সিগারেট খায় হাতে ঘড়ি বাঁধে। সদি শুনেছে, ওদের মেয়েমানুষও আছে।

তবু কেন যে বদ্রী মাঝে মাঝে তার দিকে চোখ নাচায় তা কে বলতে পারে?

জামতলার পাশ দিয়েই সরু রাস্তা। আড়চোখে একবার কলির কেষ্টকে দেখে নেয় সদি। বদ্রী আজ চোখ নাচাল না। তবে তাকে চমকে দিয়ে বলল, অ্যাই, বলাইয়ের কী হয়েছে রে?

সদি থামল, বলাইয়ের আবার কী হবে। ঘরে নেই তো।

পুকুরঘাটে যা। ডুবে যাচ্ছিল, ক'জন মিলে তুলেছে। মৃগী নেই তো!

সর্বনাশ!

সদি-হরিণের বেগে দৌড়োল।

তিন-চারজনে মিলে বলাইকে তুলে এঁটেল মাটির ওপর শুইয়েছে। কাদাগোলায় মনুষ্যকৃতি নেই বলাই, ঠিক যেন একমেটে একটা মূর্তি। চুল অবধি থকথকে কাদায় মাখামাখি। হাঁ করা মুখ দিয়ে ফুক ফুক করে জল উথলে বেরোচ্ছে।

সদি কাঠ হয়ে চেয়ে রইল সেদিকে। শুধু হাত থেকে চারখানা থালা খুলে পড়ল।

ঘরামি বীরেশ্বর মুখ তুলে দেখল সদিকে। বলল, খুব টেনেছিল শালা। তাতেই মরণ লেখা ছিল।

সদি নড়ল না। তার হাতে পায়ে সাড় নেই।

শান্তি কয়াল সদির দিকে চেয়ে বলল, আমিই আগে দেখলুম কি না, জলেও আমিই প্রথম লাফিয়েছি। কিন্তুক, এ যে সেঁতিয়ে যাচ্ছে, যেন চায়ে ডোবানো বিস্কুট!

গলা ফেঁসে গিয়েছিল দ্বিতীয় সিনের আগেই। তা ফাঁসবারই কথা। কানাই তো আর মণ্ডলমশাইয়ের পেয়ারের লোক নয়। সে মাল বয়, ফরমাশ খাটে, পা দাবায়, এত সব করে দু নম্বর সিনে তিন মিনিটের একখানা অন্ধ ভিখারির গান গেয়ে হেঁটে যায়। বাঁধা তিন মিনিট, ব্যস পার্ট ওখানেই খতম।

কিন্তু কানাই জানে তার গলা ভাল। মিষ্টি গলা। যত্নআত্তি করলে এই গলা দিয়ে সুরের সঙ্গে ঝকাংঝক টাকাও ঝরে পড়বে। কিন্তু যত্নআত্তি করবে কি করে? একখানা কমফরটারই জোটানো গেল না আজ অবধি। মায়ের পুরনো শাড়ির ছেঁড়া একখানা পাড় গলায় সময় সময় জড়িয়ে রাখে। পরশু কুঞ্জনগরে পালা ছিল। সীতার বনবাস। জমে গিয়েছিল খুব। কানাই গাইলও ভাল। তবে ক্ল্যাপ পড়েনি। ক্ল্যাপ সব হাতিয়ে নিল মহীন পাল। গায় ভাল। ওস্তাদি গলা। তার গানে ক্ল্যাপ মারতে মারতে লোকের হাতে ব্যথা।

মণ্ডলমশাইয়ের হাঁটুতে বাতের ব্যথা। প্রতি রাতে কানাইকে দিয়ে খানিকক্ষণ দাবিয়ে নেয়। কানাই দাবায় আর দাবায়। মণ্ডলমশাইয়ের নাকের ডাক উঠলে সে পায়ের কাছেই পড়ে থাকে একখানা চট বিছিয়ে। তাতে আর যাই-হোক, রাতটা দিব্যি চারখানা দেওয়ালের মধ্যে কেটে যায়।

পরশু রাতে মণ্ডলমশাইয়ের অন্য রকম ব্যথা উঠল। খাওয়ার পর 'কইরে কানাই' হাঁক শোনার জন্য যখন কান পেতে আছে কানাই তখন মল পরা দুখানা পা ঝুমুর ঝুমুর করে মণ্ডলমশাইয়ের ঘরে ঢুকে গেল। তারপর সারা রাত দরজা বন্ধ।

দোষঘাটের কথা হচ্ছে না। মণ্ডলমশাইয়েরও তো আমোদ আহ্লাদ আছে। মধু হাজরা শুধু চাপা গলায় বলল, আসছে পালার হিরোইন হবে।
কে বল তো?
চম্পাদাসীর মেয়ে। খারাপ মেয়েছেলে, তবে উদয়পুরের সাহাবাবুদের মেজো ছেলে তপন সাহার রাখা ছিল। তারই মেয়ে। নাম শুনেছিলুম লক্ষ্মী।
এতে কানাইয়ের কিছু গেল এল না। তবে তাকে শুতে হল চার দেওয়ালের বাইরে। বারান্দায়। কুঞ্জনগরের ব্যবস্থা ভাল নয়। ছোট্ট একখানা ক্লাবঘরের দুটো কুঠুরিতে বন্দোবস্ত। একটাতে মণ্ডলমশাই। অন্যটাতে তারা গাদাগাদি এতগুলো লোক। কানাইয়ের জায়গা হল না।
বারান্দায় শুয়ে গলাটা গেল। সকাল থেকেই বসা-বসা ভাব। বিকেলে ঘঙঘঙে আওয়াজ। দ্বিতীয় সীনে তার নামবার কথা। বাদ পড়লে নরহরির পোয়াবারো। সে তো ঢোকার জন্য মুখিয়েই আছে। কানাইয়ের কপাল তো ওই তিন মিনিটের জন্য খোলে। সে তাই গলার কথা চেপে গিয়ে নেমে পড়ল আসরে।
তারপর গলা দিয়ে যা বেরোল তা গাধা আর বেড়ালে মেশালে যা হয়। একেবারে কেলেংকারির একশেষ। কানাই যত গলা তুলতে চায় গলা তত টেনে নামায় তাকে। হাসি টিটকারির হল্লা বয়ে যেতে লাগল চারধারে। ভাল গাইলে এরা তার সীনে হাততালি দেয় না কখনো, কিন্তু টিটকারির বেলায় রস দেখ।
মণ্ডলমশাই কম কথার মানুষ। কথার ধার দিয়েও গেলেন না অবশ্য। চটিপরা একখানা পা তুলে মাজায় একখানা লাথি কষিয়ে আঙুলে তুলে দরজা দেখিয়ে দিলেন।
কানাই চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল।
মধু হাজরা একটু নেকনজরে দেখে তাকে। বলল, পা দুখানা যদি চেপে ধরে পড়ে থাকতে পারতিস।
ধরব গিয়ে এখন?
পাগল! লগ্ন পার করে দিয়ে দিলি। তার চেয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে কয়েকদিন জিরিয়ে নে। সাগরদিঘিতে আসর বসবে সাত তারিখে। ওখানে গিয়ে জুটিস। আমি মণ্ডলমশাইকে ভিজিয়ে রাখবখন।
ভিজবে?
সে তোর বরাত। লক্ষ্মী দাসীর সঙ্গে ফস্টিনস্টি হচ্ছে, হতে দে। এ সময়টায় মেজাজ একটু টং থাকে। বুড়ো বয়সে ছুকরিকে সামাল দিতে অনেক মেহনত রে, তুই বুঝবি না। এখন হবে না।
কানাই কাটল।
কুঞ্জনগর জায়গা ভাল নয়। লোকগুলো কেমন যেন ডাকাতে চেহারার। তার চেয়েও ভয়ের কথা হল কুকুর। রাস্তার কুকুর দিনেরবেলায় ভাল মানুষটি, ল্যাং ল্যাং করে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। রাতে এক-একটি বাঘ। তখন তারা জোট বেঁধে তাড়া করে।
কানাইকে বেরোতে হল রাতেই। বেশ নিশুতি রাত। চারদিকটা কুয়াশায় আর জ্যোৎস্নায় একেবারে দুধমুড়িতে মাখামাখি হয়ে আছে। কানাই একটু দৌড়-পায়েই হাঁটছিল। আজ রাতটা পড়ে থাকতে পারত বারান্দায়। কিন্তু মণ্ডলমশাই যা ক্ষেপেছেন তাতে ভরসা হয় না। আসর আজ একেবারে মাটি। বদনাম হয়ে গেল খুব।
শীতলাথানের কাছ বরাবর কুকুর না বাঘ কে বলবে! আর গলার জোরও বটে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে চেঁচানির চোটে।
কানাই তাই কুকুর-ঘেরা হয়ে দাঁড়িয়ে ধমকচমক করতে লাগল। কিন্তু ভাঙা গলা, গলায় ধমকও খুলছে না। গলায় গাধা আর বেড়ালের মিশেল ছিল। এখন বুঝল, গলা থেকে গাধাটা সটকেছে, শুধু বেড়ালের ম্যাও ম্যাও বেরোচ্ছে। ওতে কুঞ্জনগরের বাঘা কুকুরদের ভয় খাওয়ার কথা নয়। তারা বরং আরও দু কদম চেপে এল এবং তার মুখের দিকে চেয়ে এমন বকাঝকা করতে লাগল যে মণ্ডলমশাই অবধি লজ্জা পেতেন।

রাতের খাওয়াটা মার গেছে। পেট জ্বলে যাচ্ছে খিদেয়। পকেটে পয়সা নেই, বিড়ি নেই, দেশলাই নেই। এত 'নেই'-এর মধ্যে পড়ে গেছে কানাই যে, সে নিজেও আছে কিনা তাইতেই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। ভাবতে ভাবতে চোখটা ভিজে উঠল তার। মাজায় এখনো মণ্ডলমশাইয়ের লাথিটা কন কন করছে।

কুকুর-ঘেরা কানাই উবু হয়ে বসল। তারপর বলল, খা বাবারা, খা। নিকেশ করে দে।

তবে উবু হয়ে বসতে দেখে কুঞ্জনগরের বীর কুকুরেরা ভড়কাল। লোকটার ভাবগতিক তাদের সুবিধের ঠেকছে না। তারা কয়েক পা পিছোল। আরও কিছুক্ষণ তড়পাল।

কতক্ষণ এভাবে থাকতে হত কে জানে। হঠাৎ গোটা পাঁচেক ডাকাতে চেহারার লোক লাঠি হাতে যেন আকাশ থেকেই নেমে এল।

কে র‍্যা ওখানে? কী মতলব? অ্যাঁ!

কানাই উঠতে গিয়ে দেখল হাঁটুতে খিল ধরে গেছে, ঝিঁঝিঁতে পা দুখানা অবশ। সে বলল, আজ্ঞে কোনও মতলব নেই, এমনি বসে আছি...

কিন্তু কথাগুলো কুকুরের ডাক ছাপিয়ে লোকগুলোর কান অবধি গেল না। গলার এখন সেই ক্ষমতা নেই। গলায় যতক্ষণ গাধাটা ছিল ততক্ষণ তবু একটু ভরসা ছিল এখন একা বেড়ালটা সুবিধে করে উঠতে পারছে না।

লোকগুলো লাঠি তুলতেই কুকুরগুলো তফাত হল। তবে খুশি হয়ে নয়। এমন একটা বীরত্ব দেখানোর মওকা ফসকে যাচ্ছে তাদের।

লোকগুলো কত লম্বা তা খিদে আর ভয়ের মুখে হিসেব করতে পারল না কানাই। তবে বসা অবস্থায় মুখ তুলে তার মনে হল, তালগাছ প্রমাণ হবে এক-একজনের আকার। মুখে একটা নিবু নিবু টর্চের হলদেটে আলো এসে পড়ল।

অ, এই সেই লোক। তুফান অপেরার গানাদার। তা এখানে কী মনে করে হে?

কানাইয়ের একটু দেমাকও হল, একটু রাগও হল। দেমাক, কেন না লোকে তাকে দেখেই চিনে ফেলছে। আর রাগ, তার বসে থাকা নিয়ে অত খতেন কিসের? লোকে কি একটু ইচ্ছেমতো বসেও থাকতে পারবে না নিরিবিলিতে? কোনও আইন আছে নাকি?

যখন উঠে দাঁড়াল কানাই তখন অবাক হয়ে দেখল, লোকগুলো মোটেই তালগাছের মতো লম্বা নয়। তারই সমান সমান হবে। গায়েগতরে অবশ্য দশাসই। কুঞ্জনগরের লোক বোধ হয় খায়দায় ভাল।

সামনেই গোঁফওয়ালা একটা লোক। বলল, কী হে, তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

কানাই কথাটার সোজা জবাব দিল না। বলল, ফের পায়ে ধরে সেধে আনবে। না এনে উপায় আছে!

সেই ম্যাও ম্যাও বেরোচ্ছে গলা দিয়ে, টাকরা জ্বালা করছে। চোখে যেন লঙ্কাবাটা ঘষে দিয়েছে কেউ। না, ঠান্ডাটা বেশ জমিয়েই লেগেছে তার।

লোকটা তেমন তেড়িয়া নয়। তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, যাত্রাদলের ওইটেই বিপদ, বুঝলে! আজ রাজা কাল ফকির। তা বলতে নেই বাপু, তোমার গানখানা আমার বেশ ভালই লেগেছিল। কী বলিস রে পদ?

পদ মাথা নেড়ে সার দিয়ে বলল, গলায় মাল আছে। তা গলাখানা বসালে কীভাবে বাপ!

সে অনেক কথা। গলা বসার পিছনে লক্ষ্মীদাসী আছে, মণ্ডলমশাই আছেন, আছে কানাইয়ের পোড়া কপালও। কিন্তু অত কথা এই গলায় সাপটে ওঠা মুশকিল।

গোঁফওয়ালা বলল, তা রাতবিরেতে কোথায় বেরিয়েছো? কুকুরে ছিঁড়ে খেত যে। রাস্তাঘাটও সুবিধের নয়। যাবে কোথা?

বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলুম আজ্ঞে। মাইল পাঁচেক পথ হবে।

আরে দূর, পাঁচ মাইল ঠেঙাতে যাবে কোন দুঃখে? তুমি গুণী মানুষ, চলো রাতের মতো একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

ভগবান যে আছেন এ কথাটা মাঝে মাঝে কানাইয়ের মনে হয়। তবে কিনা ভগবান থাকলেও তাদের মতো মনিষ্যির জন্য নয়। এই যেমন মণ্ডলমশাইয়ের ভগবান আছেন, তাদের গাঁয়ের নন্দীদের জন্যও ভগবান আছেন। এইসব গুরুতর লোকদের মধ্যে ভগবান ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গিয়ে তাদের ভাগে আর ভগবান পড়ে থাকেন না। একা মানুষ তিনি কত দিক সামলাবেন? তবে মাঝে মাঝে এক-একটা এমন কাণ্ড হয় যে, ভগবান হঠাৎ মাছের মুড়ো হয়ে পাতে এসে পড়েন, কখনও বা নতুন একখানা লাল গামছা হয়ে কাঁধে এসে এলিয়ে থাকেন, কখনও বা মণ্ডলমশাইয়ের থলি থেকে টাকাটা সিকেটা হয়ে তার হাতে এসে পড়েন। এরকম কাণ্ড ন'মাসে ঘটে বটে, কিন্তু তখন কানাই ভগবানকে ঠিকই টের পায়। নইলে ফুলপুরে পালা গাইতে গিয়ে ওই কাণ্ড ঘটে? সাতটা পাত পেরিয়ে এসে তার পাতেই কেন মুড়োখানা ফেলল লোকটা? গামছাখানার বৃত্তান্ত অবশ্য অন্য রকম। বরুর হাটে গামছার কারবারী হরিহর সাঁপুই তার মায়ের শ্রাদ্ধে কীর্তনীয়াদের একটা করে দিয়েছিল।

ভগবান যে আছেন তা জলজ্যান্ত আজও টের পাচ্ছে কানাই। সামনে পিছনে গোটাকয় লাঠিধারী তাকে নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরগুলোও আসছে বটে পিছু পিছু তবে তাদের আর সেই তেজ নেই। একেবারে চাকরবাকরের মতো অবস্থা।

গুঁফো লোকটার অবস্থা ভাল। বিষয়ী গেরস্ত লোক। গোটা পাঁচসাত ঘর আছে উঠোনের চারধারে। ধানের মরাই আছে। গোয়াল আছে। রান্নাঘর থেকে সেদ্ধ ডালের গন্ধও আসছে।

'বোসো' বলে ঘরে নিয়ে একখানা মোড়া ঠেলে দিল তার দিকে। কানাই বসে পড়ল। লেঠেলরা সব বসে গেল চারদিকে। বোধ হয়, রাত পাহারা দেয় সবাই।

গুঁফো বলল, আর বোলো না হে, বড্ড ডাকাতের উপদ্রব বেড়েছে। সাঁঝবেলা থেকেই আমরা তাই তক্কে তক্কে থাকি। মাসটাক আগে তিনটেকে ওই শীতলাতলাতেই পিটিয়ে মেরেছি। তাইতেও কি দমে? তবু আসে। তা তোমার অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে কিছু খাওটাওনি! খাবে কিছু?

গলার বেড়ালটাও যাই-যাই করছে। গলার ওপর ভরসা রাখল না কানাই। তবে ঘাড়টা এমন হেলাল যে আর একটু হলেই মাথাটা খসে পড়ে যেত ঘাড় থেকে। বেশি করে না হেলালে যদি লোকটা ভুল বোঝে সেই ভয়টাও তো আছে।

তাহলে বলি গে ভিতরবাড়িতে। আর ওই একটা খাটিয়া আছে, লেপও পাবে। খেয়ে শুয়ে পড়ো। ও আমার ঠাকুর্দার বিছানা। এই মাস দুই হল গত হয়েছেন।

ভগবান আজ গরম ভাতে ভাজা মুগের ডাল হয়ে, আলুপোস্ত হয়ে, চুনো মাছের চচ্চড়ি হয়ে, ডালের বড়া হয়ে নেমে এলেন ধরাধামে। পেটের রাক্ষস বধ হয়ে গেল লহমায়। ভগবান তারপর বিছানা হলেন, তারপর ঘুম হয়ে চেপে বসলেন কানাইয়ের চোখের ওপর। মণ্ডলমশাইকে ডেকে এনে যদি দেখানো যেত কাণ্ডটা।

কুঞ্জনগরের কুকুরদের চিনল হাড়ে হাড়ে নিতাইও। এখন সড়গড় হল না তার অনেক কিছুই। অন্ধকারে অচেনা ঘরে সে হোঁচট খায়, ধাক্কা খায়, হাত থেকে বাসনপত্র পড়ে যায়, হাঁচি বা কাশি পেয়ে বসে। সে তো গেল ঘরে ঢুকবার পরের কথা। তার আগে আছে কুকুরের ল্যাঠা। কুকুর বরাবরই ছিল, চোরও ছিল। কস্মিনকালে কেউ শোনেনি যে, রাস্তার কুকুরের সঙ্গে চোরের আড়াআড়ি আছে। এও ওকে চেনে, ও-ও একে চেনে। কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু কপালদোষে নিতাইকে মাথা ঘামাতে হয়।

হাড়ভাঙা খাটুনি ছিল বটে, কিন্তু জেলখানা জায়গাটা মোটেই খারাপ ছিল না। দুবেলা খাবার জুটত। ঘুম হত দিব্যি। পাঁচজনের সঙ্গে পাঁচ রকমের সুখ দুঃখের কথা হত। সময়টা জলের মতো কেটে গেল। তিন

মাসের মেয়াদ কোন আদিখ্যেতার হিসেবে কমে গিয়ে দু মাসে দাঁড়াল। হপ্তা দুই হল ছাড়া পেয়ে নিতাই এখন সত্যিকারের জেল খাটছে। জেল খাটা ছাড়া আর কী? সময়ে অসময়ে খিদে চাগাড় দেয়, রাতবিরেতে আস্তানা খুঁজতে হয়, কুকুরের ভয়, মারধরের ভয়, সাপখোপের ভয়। নিতাইয়ের তো মনে হয়, জেলখানা দিব্যি জায়গা ছিল। আবার ধরা পড়তে নিতাইয়ের আপত্তি নেই। তবে কি না গাঁ-গঞ্জে পুলিস তো আর হাতের মোয়া নয়। মাইল মাইল জুড়ে পুলিসের ছায়াটিও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আর আজকাল গাঁয়ের লোকগুলোও হয়েছে ভারী বজ্জাত। ধরতে পারলে পুলিসটুলিস ডাকে না, নিজেরাই কিলিয়ে নিকেশ করে দেয়। নিতাইয়ের যা অবস্থা, আড়াইটে কিলও হজম হবে না।

হপ্তা দুয়েক ধরে গ্রহের ফের চলছে। হাত এখনো পাকেনি। ভয়ডর আছে। সঙ্কোচ আছে। চক্ষুলজ্জা আছে। এত সব গেরো থাকলে পেট চালানো দায়। তবু নিতাই যে চেষ্টা করেনি তা নয়। চরণগঙ্গায় মাধব কুণ্ডুর বাড়িতে সিঁধ দিয়েছিল। মাধব কুণ্ডুর মেলাই টাকা। বাড়িতে মালপত্রও মেলা। কিন্তু তার বাড়ি পাকা। সিঁধ দিতে হলে মাটির ভিটে ছাড়া সুবিধে নেই। মাধব কুণ্ডুর মাটির ভিতের একখানা মেটে ঘর আছে। সেখানে সেঁদিয়ে নিতাই পেল কিছু পুরোনো শিশিবোতল, কিছু কিছু লোহালক্কর কাঠের তক্তা। কপালটাই খারাপ। কষ্টেসৃষ্টে একখানা তক্তাই সরাল নিতাই। বেশ ভারী। মাথায় বয়ে মাইল তিনেক হেঁটে তবে এক জায়গায় চার টাকায় বিক্রি করল।

সোনাচরের এক বাড়ি থেকে এক টিন গুড় সরিয়ে ফেলে ট্যাঁকে এল আটটি তঙ্কা। এইভাবেই চলছিল। আলায় বালায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এ জায়গায় এসে শুনল জায়গাটার নাম কুঞ্জনগর। নামটা চেনা। তা ছাড়া, মাথায় একটা কথা টিক টিক করে জানান দিচ্ছিল। হারাধন নস্করের মেয়াদ হয়েছিল সাত বছর। বছর দুই মোটে কষ্টেসৃষ্টে কেটেছে। বাকি মেয়াদটা কাটানোর কথা নয়। তাকে মরুনে রোগে ধরেছিল। নিতাই তার খুব দেখাশোনা করত জেলখানায়। যেদিন হারাধনকে হাসপাতালে নেওয়ার কথা তার আগের রাতেই হঠাৎ বাড়াবাড়ি হল খুব। বুকে ব্যথা, তার মধ্যেই হাঁসফাঁস করতে করতে নিতাইকে বলেছিল, কুঞ্জনগরের চণ্ডীতলায়—বুঝলি...চণ্ডীতলায়...আছে সব। মেলা জিনিস...

রাতটা কাটেনি হারাধনের।

এই সেই কুঞ্জনগর। চণ্ডীতলাও বেশি খুঁজতে হয়নি। একখানা পুরোনো পোড়ামাটির মন্দির আছে। ভিতরে চণ্ডীর মূর্তিও আছেন। চারধারে নানা আগাছা, এঁদো পুকুর, ফাঁকা জমি। এখানে কী আছে—কোন গুপ্তধন তা কে জানে। চাপে-টোপে জায়গাটা পরখ করেছে নিতাই। কোনও লক্ষণ ধরতে পারেনি।

কোনও গাঁয়ে বাইরের লোকের গা-ঢাকা দিয়ে থাকা মুশকিল। তবে সুবিধে হল কুঞ্জনগরে দু-দিন হল একটা যাত্রার দল এসেছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে সে বলে দিচ্ছে, যাত্রাদলের লোক। বাঁচোয়া।

আজ রাতের দিকে নিতাই চণ্ডীতলায় হানা দিয়েছিল। রাত ছাড়া সুবিধে নেই। কিন্তু কুঞ্জনগরের হারামজাদা কুকুরদের সে চিনত না। কোথাও কিছু নেই, দিব্যি গটগটিয়ে গিয়ে সে চণ্ডী মন্দিরের দরজার কব্জা আলগা করছে, এমন সময় খা-খা করে যমদুতের মতো কুকুরেরা তেড়ে এল।

নিতাইয়ের আর কিছু না থাক, হাতে পায়ে চটপটে ভাবটা আছে। সে এক লম্ফে নেমে দৌড় যা একখানা মারল, কুকুরেরা পর্যন্ত অবাক। দম ধরে খানিকটা সোজা দৌড়ে, ফের কিছু আঁকাবাঁকা হয়ে সে এক জায়গায় থামল। একটু জিরিয়ে নিল। তারপর ঘরখানা নজরে পড়ল তার। একেবারে নাকের ডগায় জ্যোৎস্নায় হাসছে। আয়—আয় করে ডাকছে। আহা! কী ঘর। মাটির নরম ভিত। দেখলেই বোঝা যায়, ভিতরে মাল আছে।

নিতাই কাজে লেগে পড়ল।

ভজঘট্ট বাঁধল মোড়াটা। ব্যাটাচ্ছেলে পায়ে লেগে কেৎরে একেবারে রেলগাড়ির মতো গড়িয়ে গিয়ে গদাম করে লাগল একটা লোহার ড্রামে। একেবারে বাজপড়ার শব্দ।

একটা থুপথুপে ভূতুড়ে গলায় কে যেন বলে উঠল কে!

একটু ভড়কে গিয়েছিল নিতাই। এমন শব্দ শোনেনি কখনো। মানুষের গলাই বটে তো! সে পিছিয়ে সিঁদের গর্তে সেঁদিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। কপালটাই খারাপ।

সবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফটা সামলাচ্ছে ঠিক এমন সময়ে নিবু-নিবু একটা টর্চের আলো এসে পড়ল মুখে। ঘাড়ের ওপর এক ঘা লাঠি।

নিতাই তাতেই বসে পড়ল। হাতজোড় করে বলল, পেটে দানাপানি নেই, মারলে মরে যাব। ধরা তো দিচ্ছিই, বরং পুলিসে দিন।

গুঁফো একটা লোক কোমরে লাথি কষিয়ে বলল, পুকুরধারে গর্ত খোঁড়া আছে। তোকে মেরে সেখানেই পুঁতব।

আজ্ঞে ও কর্মটি করবেন না। আমি যাত্রাদলের লোক। সকালেই আমার খোঁজ হবে।

যাত্রাদলের লোক! বলে সবাই মুখ তাকাতাকি করল।

গুঁফো বলল, যাত্রাদলে কি মড়ক লেগেছে নাকি। সব খসে পড়ছে যে! তা তোমাকে তো পালায় দেখিনি বাপ।

আজ্ঞে, আমি মেক-আপ করি।

দাঁড়াও, যাত্রাদলের আরও একজন আছে। তাকে ডাকছি। তার আগে বলো তো বাপ, যাত্রাদলের লোক হয়ে সিঁধ দিলে কেন?

যাত্রাদলের একজন এখানে আছে শুনে নিতাইয়ের হয়ে গেল। সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, থানা কতটা দূর হবে বলতে পারেন? না হয় হেঁটেই যাব।

সবাই ফের মুখ তাকাতাকি করতে থাকে। এর মধ্যে একটা লোক এগিয়ে এসে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলে, কই দেখি।

ফের মুখে টর্চের আলো। গুঁফো জিজ্ঞেস করে, কী হে চিনতে পারছো?

নিতাই মুখখানা নববধুর মতো নামিয়ে ফেলেছিল। বিড়বিড় করে বলছিল, দেশে আইন আছে, থানা-পুলিশ আছে, মারধর করাটা কি ভাল? পাপ হবে যে!

ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলা হঠাৎ বলে ওঠে, আজ্ঞে ছিল। দাগী চোর। তবে গুণী লোক বলে মণ্ডলমশাই ছাড়েননি। পুরোনো অভ্যেসবশে করে ফেলে চুরিটুরি। তবে আবার মাল ফেরতও দেয় শুনেছি।

গুঁফো লোকটা সমেত সবাই অবাক হল। এমন কথা তারা জম্মে শোনেনি। চুরির মাল ফেরত দেয়! এর তো পায়ের ধুলো নেওয়া লাগে।

নিতাই ভাল করে বুঝতে পারছিল না কিছু। একটা গণ্ডগুলে ব্যাপার হচ্ছে, এইটুকু যা বুঝতে পারছে। যা শুনছে তা ভুল শুনছে কি না তাও ভেবে দেখা দরকার।

কানাইকে চিনতে আরও একটু সময় লাগল তার।

গুঁফো আর তার দলবল একটু পরামর্শ করে বলল, ওহে, তোমারা কেউই লোক সুবিধের নও। ব্যাপারটা আমাদের ভাল ঠেকছে না। তবে মানে মানে যদি বিদেয় হও তাহলে এ যাত্রায় কিছু আর বলছি না। ওরে পদ, এ দুজনকে ঘাট পার করে দিয়ে আয়।

খরচার খাতা থেকে জমার খাতায় ফিরতে বলাইয়ের বিস্তর মেহনত গেল। পাক্কা একটি দিন সে চায়ে ভেজানো বিস্কুটের মতো নেতিয়েই রইল। এমন ঝিম মারল যে তার মা মাঝে মাঝে নাকের সামনে সুতো ধরে শ্বাস চলছে কিনা দেখে নিচ্ছিল।

তবে হ্যাঁ, পুকুরে ডুবে মরতে বসেছিল বলেই বলাইয়ের খাতিরও বাড়ল খুব। শিবে নন্দর গোটা দলটা কাঁধে গামছা নিয়ে চলে এল। কখন কী হয়, তৈরি থাকা ভাল। ধেনো সে-ই গিলিয়েছিল বলে নন্দ বলাইকে

ডলাইমালাইটাও বেশি করল। অনেক জল ওগরাল বলাই। তারপর ঝিম মারল।

শিবে শ্মশানঘাটে যাওয়ার গামছাখানা কোমরে পেঁচিয়ে নিয়েই হরেন ডাক্তারকে ধরে আনল।

এ বাড়িতে চোরও আসে না। আজ মেলা লোক। বটেশ্বর কাশতে কাশতেও দৃশ্যটা দেখছিল। হ্যাঁ, লোক হয়েছে বটে। বটেশ্বরের বেশ একটু খুশি-খুশিই লাগছিল। তাদের ভারী খাতির করছে সবাই।

নন্দীগিন্নি ঝি দিয়ে চিঁড়ে পাঠালেন। একটু আধটু নয়, এক ধামা। সঙ্গে কয়েক ডেলা গুড়। দেখে সদি হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছিল না। তবে কান্নাটাই এল। অনেক কথা ভেবে এল। সকালেই 'মর মর' বলে সবাইকে শাপশাপান্ত করেছিল। তা সেই শাপই ফলল কি না কে জানে। হাবাগোবা ভাইটা যদি মরে তাহলে কী হবে?

চিঁড়ের ধামা চৌকির তলায় ঢুকিয়ে রাখল সদি। কে খাবে এখন? কার মুখে রুচবে? অপলক চোখে সে বোকা ভাইটার মরুনে মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল সারা দিন। সারা রাত। বিড়বিড় করে কী বকছে ভাইটা? জ্বর এল নাকি তড়াসে?

শিবে দশখানা টাকা ফেলে গেল বলাইয়ের বিছানায়। বলল, কিছু লাগলে কিনে নিস। ওষুধ আমরাই কিনে দিয়ে যাচ্ছি।

কিনে দিয়েও গেল।

বলাইয়ের চেতনাও ফিরল পরদিন সকালে। চোখ চেয়েই বলল, মা, খিদে পেয়েছে।

খিদের কথা শুনলে বলাইয়ের মায়ের রক্ত মাথায় চড়ে। সংসারটা সর্বদাই খাই-খাই করে। আজ রক্ত চড়ল না! চোখের জলে ছেলের মুখ ভাসিয়ে মায়ের গলা বলে, খাবি বাবা, অনেক খাবি। পেট ভরে খাবি।

খিদে-পাওয়া আরও দুই মূর্তি এসে উদয় হল দরজায়। কানাই আর নিতাই। মুখে দেঁতো হাসি। কেমন যেন জব্দ চেহারা।

সব বুঝে সমঝে উঠতে একটু সময় গেল। তারপর সবাই আজ শোওয়ার ঘরে গোল হয়ে বসল। সকলের পেটেই খোঁদল।

ভেজানো চিঁড়ে আর ডেলা ডেলা গুড় সদি বেড়ে দিচ্ছে থালায়। গপাগপ খাচ্ছে সবাই।

বটেশ্বর খেতে খেতে বলল, বরাবর বলে আসছি আমি, চিঁড়ের মতো জিনিস হয় না।

সদি জলে-ভাসা নির্ঘুম জ্বালাধরা চোখে দেখছিল বাপ বটেশ্বর, ভাই কানাই-বলাই-নিতাই আর তার মাকে। মরার বাড়া গাল নেই। না, সে আর কখনও মরার গাল দেবে না বাবা। খুব হয়েছে।

চাঁদ ও অতসীকে ভালবাসি

চাঁদের বোর লেগে আমি পড়ে ছিলাম ছাদে, শীতলপাটিতে। এক দুরন্ত চাঁদ আজ আকাশ ভাসিয়ে দিচ্ছে। মনে হয় চন্দ্রাহতের মতো শীতলপাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা বড়ো ভয়ংকর। এমন চাঁদ ও আমি একসঙ্গে মিলে গেলে প্রায়ই অঘটন ঘটে যায়।

এমন সময় আমার বৌ অতসী ছাদের ওপর উঠে এল। এক পলক আমার দিকে মুখ করে বলল, একা একা ছাদের ওপর শুয়ে চাঁদ দেখা ভাল নয়।

—ভূতে পায়। অতসী বলল।

—অ্যাঁ?

একা একা চাঁদ দেখা ভাল নয়। অতসী হাসছিল, দুহাত তুলে ওর মস্ত খোঁপাটা ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল। দ্বিধা করছিল, আমার কাছে আসবে না আলসের কাছে যাবে।

এসো না। একসঙ্গে দেখি। বললাম।

—ইল্লি। আবার হাসল, আশেপাশের ছাদে লোক রয়েছে।

—নইলে আসতে? আমার সঙ্গে চাঁদ দেখতে?

হুঁ—উ। তুমি তো লোক খারাপ নও। হাসলাম। অতসীকে রোগা দেখায়। প্রায়ই ভোগে ও। রোগা হাতে টালমাটাল খোঁপাটা সামলিয়ে ও আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।

—ঘুমিয়ে পড়ো না। দূর গলায় বলল।

—পড়লে?

আলসেয় ঝুঁকে নীচের গলি দেখতে দেখতে বলল—কাতুকুতু খাবে। আর ঝনাৎ করে ওর চুড়ি পড়া হাত শব্দ করে।

—আর?

—কিছু না।

—বোকা। বলতে পারলে না।

বেশ, বোকা তো বেশ। গলি থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইল। 'ফের লুঙ্গি পরেছ? যা আমি দেখতে পারি না।' প্রায় ধমক দিল—হাঁটু ঢেকে শোও।

আমি নিঃশব্দে হাসছিলাম। আমি চাঁদ দেখছিলাম।

—জেদ না?

—আমাকে না দেখে, চাঁদ-ফাঁদ দেখো—বললাম।

তারপর পাশ ফিরে শুই। আড়চোখে দেখি হাত তুলে টপ করে খোঁপা ভেঙে দিল অতসী। রাগের লক্ষণ। গুন গুন করে গান গাইতে থাকি—'ও চাঁদ চোখের জলে...।'

অতসী ফিরে দ্রুতপায়ে সিঁড়ির ঘরের দিকে চলে যেতে থাকে।

একা থাকব? চেঁচিয়ে বললাম।

ইচ্ছে।

যেও না! পিছু নেব কিন্তু। ও সিঁড়ির ঘরের দরজায় পৌঁছুতেই আমি লাফিয়ে উঠি। কিন্তু ধরা গেল না। অসম্ভব দ্রুতবেগে নেমে গেল। চেঁচিয়ে বললাম—চা পাঠিয়ে দিও। উত্তর পাওয়া গেল—কাঁচকলা।

সামান্য হাঁফ ধরেছিল। আবার শুয়ে পড়লাম এই শীতলপাটিতে মাথা রেখে।

আমাদের তিনতলার এই ছাদটা খুব নির্জন আর ছোট্ট। আমি শুয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। দেশলাইয়ের শেষ কাঠিটা শেষ হয়ে গেল। একটা দেশলাই আনানো দরকার। মনে হচ্ছে অতসী আবার আসবে। ইচ্ছে হল আলসে থেকে ঝুঁকে ঘরের মধ্যেই অতসীকে চেঁচিয়ে বলি, 'আর দেশালাইটা এনো।' উঠতে আর ইচ্ছে হল না। চিৎ হয়ে শুয়ে দুচোখ জুড়ে চাঁদ ভেসে উঠল।

পলকেই সব ভুল হয়ে যেতে থাকে। একষট্টি সালের প্রেম ও তেষট্টির বিয়ে। দেশলাইয়ের শেষ কাঠি ও সিঁড়ির ঘরের অন্ধকারের স্পর্শ ও একটি রোগা হাতে চুড়ির শব্দে ভুল হয়ে যায়। এই জ্যোৎস্না বড়ো মাদক ও অবিবেচক। আমি চাঁদ ও জ্যোৎস্না কি অনেক দেখিনি? তবু মনে হয় আমার ওপর এই চাঁদ চাঁদ আকাশ নিস্তব্ধতার নির্বাহ অধিকার রয়ে গেছে এবং খুব খাঁটি আর অরিজিনাল এবং পুরোনো রয়ে গেল। আকৃতি এতটুকু পালটে গেল না। প্রভাব নষ্ট হয়ে গেল না। বোকার মতো চেয়ে থেকে এখনও আমি চাঁদ দেখছি। আমি স্পষ্ট চাঁদের নির্জনতা শুনতে গলির ভেতর পায়ের শব্দ, কোথা থেকে উঠে আসা চা-তৈরি করবার শব্দ, অল ইন্ডিয়া রেডিওর ভাবুক ঘোষকের ধীর কণ্ঠ ভেসে আসা, সব ভুল হয়ে গেল। নিজেকে আজই আদিঅন্তহীন তুচ্ছ মনে হয়। এই মনে হওয়া ভাললেগে যায়। আমি আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুই। আর একবার 'ও চাঁদ চোখের জলে...' গাওয়ার চেষ্টা করে দেখি—বৃথা।

আমার চেনা জানা কোনও শব্দ দিয়ে কিছুই তৈরি করা যাচ্ছে না। আমি উসখুস করি। গলা চুলকোই। আবার পাশ ফিরে শুই। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। অতসী। অনেকক্ষণ ধরে সিঁড়ি ভেঙে অতসী উঠছে। ক্রমে ঝুলঝুল অন্ধকার সিঁড়িঘর থেকে অতসীর ধীর ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অবয়ব দেখা যায়। বেচারী। অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙতে এক হাতে চায়ের পেয়ালা ও অন্য হাতে সারাক্ষণ মস্ত খোঁপাটা সামলাতে হয়েছে। মায়া হয়।

ঠোঁট টিপে হাসল। চায়ের জন্য হাঁ করে থাকা হয়েছিল এতক্ষণ?

তোমার জন্য।

—'ছাই', চায়ের কাপ দিয়েই পেছন ফিরল।

—'যেও না' বললাম।

—রান্না করছি যে।

—একটু থাকো।

মাথা হেলিয়ে চুপ করে বসে পড়ল—নীচে যেতে ইচ্ছে করছে না।

—একা থাকা ভাল নয়। ছাদেও না ঘরেও না।

—থাকতে দিও না।

—তুমিও দিও না।

—বেশ, কিন্তু কেন, কী হয়?

—ভাল নয়, এইটুকু জানি, অতসীর কাছে শিখেছিলাম।

—ভাল নয় বুঝি! বলে চটি খুলে শীতলপাটির আধখানা জুড়ে শুয়ে পড়ল। আমি সিগারেট বের করে বলি—দেশলাই একটা চাই যে...। শুনে অতসী উঠবার ভঙ্গি করে বলে 'আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ইল্লি, বলে ওকে জড়িয়ে ধরে শুইয়ে দিই। সিগারেটটা আস্তে ছুঁড়ে দিলে চাঁদের আলো কেটে অতি তুচ্ছ বস্তুর মতো আলসের ওপারে উড়ে গেল।

বাঃ, অতসী লাজুক হেসে উঠে ঠোঁট থেকে ঠোঁট সরিয়ে নেয়। আমরা পাশাপাশি নিঃশব্দে শুয়ে থাকি। একষট্টি সালে আমরা প্রেম করি। তেষট্টিতে বিয়ে—মনে পড়ে, তার আগে বরাবর নিজেকে খুব তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল!

—এই, এবারে আমি যাবো। অতসী খুব লাজুক গলায় বলে।

—কেন!

—কেন আবার। তোমার কোন বে-আক্কেলে বন্ধু যদি হট করে উঠে আসে।

—আসলেই কি।

—কিছু না বুঝি। বাঃ।

—কি আবার। দেখবে লজ্জা পাবে...ক্ষমা চাইবে...আর আমরা হাসব।

ও পাশ ফিরল। আমার গলায় ও বুকে ওর লম্বা সরু আঙুলগুলো বুলিয়ে দিয়ে বলল—হিম লাগছে না! এত হাওয়ায় থাকা ভাল নয়।' গলা আলতো জড়িয়ে বলল, 'আমি রাঁধব, আমার কাছে বসে থাকবে চল।' চকিতে চোখে চাঁদ ভেসে ওঠে। ওর কোমরের দিকে উদ্যত আমার হাত এলিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে শীতলপাটির ওপর পড়ে থাকে। অতসী নিঃসাড়ে শুয়ে আছে। ঝিম ঝিম ভাব।

নিঃশব্দে, বড়ই নিঃশব্দে চাঁদ তার কাজ ক'রে যায়। তার উদ্দেশ্যে বাসনার করনিক্ষিপ্ত শিল্প ও প্রেমের তীরগুলি কেবলই বিপথগামী হয়।

অতসীর একটা হাত আস্তে আস্তে গলা জড়িয়ে ধরল, ওর নরম ভেজা ঠোঁট আমার কানে এসে লাগল, ওর ঈষদুষ্ণ শ্বাস ও কথা একই সাথে শোনা গেল, 'সোনা আমার সোনা, এবার যেতে দাও।'

—খারাপ লাগছে?

—না।

—তবে?

—কাজ রয়েছে না।

—আর কিছু নয়?

উঠে বসে হাসল, খোঁপা ঠিক করতে করতে বলল, 'কেমন যেন স্বপ্ন মনে হয়। মনে হয় মরে গেছি। ভয় করে। এমন খোলা জায়গায়।' হাসলাম, 'পাগল।'

—তুমি বেশিক্ষণ থেকো না। বলে চলে গেল। চেঁচিয়ে বললাম, 'মাঝে মাঝে এসে দেখে যেও মরে গেছি কি না।'

সিঁড়ির ঘর থেকে ওর ক্ষীণ গলা শোনা গেল 'আজ ঘরে এস মজা দেখাবো।'

আমাদের প্রেম বড়ো ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। আমরা আত্মীয় হয়ে গেছি নাকি! মাঝে মাঝে ভ্রম হয়—আমি অতসীকে বড়ো ভালবাসি। চাঁদ বড়ো ভালবাসি। মনে হয় আমি বড়ো প্রকৃতি প্রেমিক। কিন্তু হায়, আমি চাঁদ ও অতসীকে ভালবাসি। এই ভালবাসা থেকে পরিত্রাণ নেই।

মেঠো ও জংলা চাঁদ আমার দিকে চেয়ে থাকে। ক্রমে ম্যাজিসিয়ানের চোখের মতো সেই জ্যোৎস্না তার সম্মোহনে আমাকে টেনে নিতে থাকে। আমি এক নিঃশব্দ চিৎকার অনুভব করি। গান গাইতে গাইতে যাই। কোনও শব্দ হয় না। অতসীকে ডাকবো—ভাবি। উঠতে পারি না।

হু-হু করে আকাশ পেরিয়ে যাচ্ছি—টের পাই। সকলেই আছে—কেউ ছাদে, রান্না ঘরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে, মাঠে। কেউ কি অনুভব করে আকাশ পেরিয়ে যাওয়া। লক্ষ লক্ষ মাইল অনির্দ্দেশ্য গতি—কোথাও চলে যাওয়া চিরকালের মতো। এমন চাঁদ ও আকাশে ও তারাদের সাথে কোন জন্মসূত্রে বাঁধা আছি—অনুভব আসে কি। আমার জন্ম, আগামী মৃত্যু, আমার চেতনা ও বুদ্ধি এক মুহূর্তেই একচোখ চাঁদের ভিতর দিয়ে

প্রয়োজনহীন বলে মনে হয়। আমি ছাদে শীতলপাটির ওপর শুয়ে থেকে, চাঁদে চোখ রেখে নিঃশব্দে সেই লক্ষ লক্ষ মাইল পেরিয়ে যাওয়া টের পেয়ে সমস্ত শরীরে খাড়া রোমকূপ অনুভব করি। মনে হতে থাকে বহুদূর থেকে, সিঁড়িঘর থেকে কে যেন সিঁড়ি ভাঙছে...ভাঙছেই। অতসী, নিশ্চিত অতসী। ক্রমশ তিনতলা...চারতলা...পাঁচতলা...ক'শো তলা অন্ধকার পার হয়। তার পায়ের শব্দ সিঁড়িগুলিকে পরম্পরায় শিউরে দিয়ে আসতে থাকে। সে উঠছে...উঠছে।...কিন্তু কিছুতেই আর আমার কাছে উঠে আসতে পারে না অতসী। পলকে পলকে আমি লক্ষ মাইল পেরিয়ে যাচ্ছি...আ-মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে...আজন্ম এবং জন্মের আগেও। মাঝখানে শুধু কে যেন চেতনা দিয়ে এ চাঁদ ও অতসীর ধাঁধা তৈরি করে রেখেছিল।

অসহায় আমি চাঁদকে প্রত্যক্ষ ও সত্য জেনে ছাদের শানের ওপর হাত ঠুকে বিড়বিড় করে বলি—হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, আমি চাঁদ ও অতসীকে বাস্তবিক ভালবাসি।

স্মৃতি-কথা

আমার জীবনকথা

আমার জীবনকথা জানবার আগ্রহ কারই বা থাকবার কথা আর কেনই বা! আমি সামান্য মানুষ, আমার জীবনটাও বেজায় সাদামাটা, আমি তেমন কোনও অ্যাচিভার নই। আমার কৃতিত্বের ঝুলিতে কয়েকটি গল্প-উপন্যাস এবং কিছু ফিচার। তবে হ্যাঁ, এটুকু বলা যায় যে, আমার যা কিছু সামান্য খুদকুঁড়োর সঞ্চয় তা ছপ্পড় ফুঁড়ে আসেনি। খুব সামান্যর জন্যও আমাকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। অভাবের সঙ্গে, অপমানের সঙ্গে, অবহেলা ও উপেক্ষার সঙ্গে। আক্রান্ত হয়েও প্রতি আক্রমণে যাইনি কখনও, কেউ গাল দিলে উল্টে তাকে গাল দিইনি। আমার দোষ বিস্তর আছে, দু-একটা গুণ যা আছে তার একটা হল সহ্যশক্তি, ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং ভালোবাসা, আর এসব আমার জন্মগত গুণ নয়। রাগী, রগচটা, মারমুখো প্রতিআক্রমণাত্মক এক যুবক থেকে আমার এই রূপান্তর ঘটেছিল শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রকে আশ্রয় করার পর।

আমার উপন্যাসের ব্লার্বে আমার পরিচয়ে লেখা আছে আমার দেশ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। সুখিগঞ্জ মহকুমার বাইনখাড়া বা বানিখাড়া গ্রামে। সে ছিল বানভাসি অঞ্চল। বর্ষাকালে এ-ঘর থেকে ও-ঘর যেতে নৌকো লাগত। দেশের বাড়ি পাকা ছিল না। মাটির ছিল, তার ওপর বাঁশের বা টিনের বেড়া, চালে টিন। ঘর সব আলাদা আলাদা, বিচ্ছিন্ন, মাঝখানে উঠোন। এইরকমই ছিল তখনকার মধ্য বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলো। আমরা ধনী পরিবার নই, জমিজিরেতও খুব বেশি ছিল না। আমাদের বাড়ির পুরুষদের তাই লেখাপড়া শিখতে হয়েছে এবং চাকরি বাকরির জন্য বাইরে যেতে হয়েছে।

আমার দাদু, রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মোক্তারি পাশ ছিলেন। মোক্তারির পসার জমানোর জন্য তিনি ময়মনসিংহে চলে আসেন। ময়মনসিংহে প্রচুর ফৌজদারি মামলা হত। আর দাদুকে ময়মনসিংহে আনার পিছনে মুক্তাগাছার জমিদার বীরভদ্রবাবুর আগ্রহ ছিল বেশি। দাদু তাঁকে একসময় প্রাইভেট পড়িয়েছিলেন। সেই সুবাদেই ময়মনসিংহের বড় কালীবাড়ির কাছে কয়েক বিঘের বিশাল ভূখণ্ড তিনি দাদুকে বসবাস করার জন্য দেন। সেটা ঠিক দান ছিল না, যদ্দুর মনে হয় এই জমিতে জমিদারের যে সব প্রজা বসবাস করত তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ভারটাও দাদুর ওপরেই ছিল।

তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী দাদু ওখানে কয়েকটা ঘর তোলেন। মাটির ভিত, টিনের বেড়া, টিনের চাল, মাঝখানে বড় উঠোন।

প্রত্যেকটা ঘরই একটা অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আলাদা। ঘরগুলোর নাম ছিল পশ্চিমের ঘর, দক্ষিণের ঘর, পূবের ঘর, আর উত্তরের ঘরখানাকে বলা হত বড় ঘর। ঘরখানা মস্ত বড় আর একমাত্র ওই ঘরেরই পাকা ভিত ছিল। এই ঘরখানায় থাকতেন আমার দাদু ও ঠাকুমা। তবে আত্মীয়স্বজনের সমাগমে সেই ঘরের মেঝেতে ঢালাও বিছানা পেতে শোওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমার বেশিরভাগ সময়ই কাটত ওই বড় ঘরে দাদু

আর ঠাকুমার কাছে। দাদু ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আর আমার রাশভারী রাগী প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দাদু একমাত্র আমার কাছেই ছিলেন জলবৎতরলং। তাঁর কাছে আমার সাত খুন মাফ। তিনি আমার প্রতি এতটাই স্নেহপ্রবণ ছিলেন এবং এতটাই আমার বশীভূত যে তাঁর ভয়ে কেউ আমাকে শাসনও করতে পারত না। যদিও আমি ছিলাম এক নম্বরের দুষ্টু ও ডানপিটে।

ময়মনসিংহে আমার শৈশবের বোধহয় বছর চারেক কেটেছিল। তারপই হঠাৎ আমার উকিল বাবা রেলের চাকরি পেয়ে কলকাতায় গেলেন। চার-সাড়ে চার বছর বয়সে আমি আর দিদি মায়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে যাই। মনোহরপুকুর রোডে দোতলায় একটা দু-কামরার ফ্ল্যাটে আমাদের বাসা ছিল। বাড়িওয়ালার নাম যদু ঘোষ। ফ্ল্যাটের সামনে দুটি ছোটো খোলা ছাদ বা ওপেন টেরাস ছিল। পিছনে চওড়া বারান্দা। মা সেই বারান্দাতেই এক কোণে তোলা উনুনে রান্না করতেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। রাস্তার আলোয় ঠুলি পরানো। ঘরেও আলো আড়াল করার ব্যবস্থা। বিমান আক্রমণের ভয়ে বাধ্যতামূলক ব্ল্যাক আউট, আর বাড়ির সামনেই মাটি কেটে ট্রেঞ্চ বানানো হচ্ছে। সারাদিনে প্রায়ই সাইরেন বেজে উঠত, আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধ বিমান উড়ে যেত। বাড়ির সামনেই ছিল একটা পুকুর, সারাদিন সেই পুকুরে গা ডুবিয়ে বসে থাকত কয়েকটা মোষ। আমার দু-বছরের বড় দিদিকে করপোরেশন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। বাবা সকালবেলাতেই চলে যেতেন শিয়ালদায় তাঁর অফিসে। সারাদিন ফাঁকা বাসায় আমি আর মা। পাড়ায় আমার বয়সী কয়েকটা ছেলে ছিল, তাদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে নিচে নামতাম। দুপুরবেলা খাওয়ার পর মা মেঝেতে মাদুর পেতে আমাকে পাশে নিয়ে শুতেন। আমি শুতে রাজি নই, তাই মা আমাকে মহুয়া, চয়নিকা, পূরবী থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে শোনাতেন, আশ্চর্য এই যে, সেই বয়সেও কবিতার সম্মোহন আমাকে শান্ত করে রাখত। মাকে জড়িয়ে ধরে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। বলতে গেলে, মা-ই আমার ভিতরে সাহিত্যের বীজ প্রথম বপন করে দেন। আর বাবাও ছিলেন একনিষ্ঠ পড়ুয়া। আমাদের ঘরে খাট, চৌকি এসব ছিল না, দু-একটা চেয়ার, মোড়া জাতীয় বসবার আসন, ট্রাঙ্ক, বাক্স, আর ছিল বই।

বাবা বরাবর কাজের মানুষ। অফিসের কাজে তাঁর নিষ্ঠা ছিল সদাসতর্ক। আর মানুষ হিসেবে অত্যন্ত সৎ। কখনও সারা জীবনে একটি পয়সাও ঘুষ খাননি। এই সততাটি আমাদের অনেকটাই বংশগত। পয়সার আভিজাত্য না থাকলেও আমাদের এই সামান্য গুণটুকু ছিল।

এরই মধ্যে একদিন দিদির স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। দিদি বাড়িতে এসে বলল, রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন, শুনে মায়ের যে কী কান্না। আমি অবাক, এত কান্নাকাটি কেন? কারণ, তখন মারা যাওয়ার অর্থই বুঝি না যে। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে বাবাও যে কান্নাটা কাঁদল তাতে আমি ভ্যাবাচ্যাকা, দিদিকেই বারবার জিজ্ঞেস করি, মারা গেছে কি রে? দিদিও ভাল বলতে পারে না।

বোধহয় বছর খানেক আমরা কলকাতায় ছিলাম। তারই মধ্যে একবার ময়মনসিংহ থেকে জ্যাঠামশাই এসে আমাকে নিয়ে গেলেন সেখানে হাতেখড়ি দেওয়ার জন্য। আমার খুব আনন্দ, দাদু ঠাকুমার কাছে যাচ্ছি! হাতেখড়ির কিছুদিন পর দাদু ঠাকুমার কাছ থেকে আবার জ্যাঠামশাই আমাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

সম্ভবত কোনও কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে বাবা ট্র্যাফিক ইন্সপেক্টরের চাকরি পেয়ে গেলেন। টিআই পদটি এখনও আছে কিনা জানি না, কিন্তু তখন রেলের টিআই মানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদ। একটা গোটা সেকশনের ট্র্যাফিক ব্যবস্থার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। টিআই সাহেবকে তখন স্টেশন মাস্টার থেকে শুরু করে তাবৎ রানিং স্টাফ বাঘের মতো ভয় পেত।

বাবার প্রথম পোস্টিং হল কাটিহারে। বেশ বড় বাংলো, চারদিকে বাগান, বাংলো থেকে একটু তফাতে প্যান-ট্রি, অন্য দিকে বাবার সেলুনের বাবুর্চি অর্থাৎ রাঁধুনীর গোটা কোয়ার্টার, কিন্তু সেই বাংলো সাজানোর মতো আসবাব আমাদের নেই। ময়মনসিংহ থেকে মালগাড়িতে বুক করে মায়ের বিয়ের খাট আনানো হল, আর গোটা দুয়েক চৌকি। তখন এক ইংরেজ রেল কর্মচারী রিটায়ার করে দেশে চলে যাচ্ছেন, তিনি তাঁর

আসবাব বাবাকে সস্তায় বিক্রি করে দিয়ে গেলেন। বার্মা সেগুনের সোফা সেট, আবলুশ কাঠের ড্রেসিং টেবিল, বার্মা সেগুনের বিশাল ডিম্বাকৃতি ডাইনিং টেবিল এবং বেশ কয়েকটা চেয়ার, এইসব আসবাব এখনও আমাদের শিলিগুড়ির বাড়িতে আছে, ভাঙেনি বা নড়বড়ে হয়ে যায়নি।

বলতে গেলে আমার জ্ঞানোন্মেষ এই কাটিহারেই। শৈশব ছেড়ে বাল্যে প্রবেশ, দেহ চেতনার শুরু, নিজস্ব ভাবনাচিন্তারও সূচনা।

তখন আমার এক নম্বর ভালবাসার মানুষ ছিল দাদু, আর তারপরেই মা। দাদুকে হারিয়েছি সাত বছর বয়সে। তারপর থেকেই আমার জগৎ মা—মা।

কাটিহারে আমাকে স্কুলে ভর্তি করা হল। ক্লাস টু-তে। লেখাপড়ায় আমি চিরকাল অমনোযোগী। সেইজন্যই একজন প্রাইভেট টিউটর রাখা হয়েছিল। কম বয়সী সেই মাস্টারমশাই মানুষ যেমন ভাল, পড়াতেনও চমৎকার। কিন্তু স্কুলে আমি ছিলাম মার্কামারা দুষ্টু ও বদ ছেলে। ক্লাসের সবচেয়ে পাজি বদমাশদের সঙ্গেই ছিল আমার বন্ধুত্ব। নিত্য মারপিট, নানা অকাজ কুকাজ করতাম।

কাটিহারেই ঘটেছিল অবিস্মরণীয় সেই ঘটনা। নিশুতিরাতে একদিন আমার ঘুম ভেঙে গেল। আর শুনলাম মেমসাহেবের হাই হিলের শব্দ পিছনের বাগান দিয়ে হেঁটে এসে আমাদের ডাইনিং হলে ঢুকে ডাইনিং টেবিলের চারপাশে কয়েকবার চক্কর দিয়ে ফের ফিরে চলে গেল। কী ভয় যে পেয়েছিলাম তা বলার নয়। তারপর থেকে কিছুদিন বাদে বাদেই ওই একই ঘটনা। আর এই ঘটনা পরবর্তী পাঁচ ছয় বছর ধরে ঘটে চলল। যার ব্যাখ্যা আমার বুদ্ধির অতীত।

কাটিহারেই আমি গল্পের বই পড়া শুরু করি। সে যে কী নেশা তা বলার নয়। ওই অতি অল্প বয়সেই বড়দের উপন্যাস পড়ে ফেলতাম। মা বাবা অবশ্য আপত্তি করতেন না। সম্ভবত এই পড়া থেকেই আমার সাহিত্য প্রীতির জন্ম। বঙ্কিমও পড়েছি খুব অল্প বয়সে। আমাদের বাড়িতে শৌখিন জিনিস বা বিলাসিতার সামগ্রী বিশেষ ছিল না, কিন্তু বই ছিল, অনেক বই। বাড়িতে নিয়মিত আসত বার্লিনের চিঠি আর কার্টুনের পত্রিকা সচিত্র ভারত। আমি সেসব গোগ্রাসে পড়তাম। পুজোর সময় প্রতি বছর কেনা হত শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক আনন্দবাজারও আসত রোজ, আমি সবই পড়ে ফেলতাম। খবরের কাগজ তখন যুদ্ধের খবরে ছয়লাপ।

কাটিহারেই আমি বুঝলাম দুর্ভিক্ষ কাকে বলে। রোজ বাড়িতে ভিখিরি আসত অনেক। আমাদের বাড়ির নিয়মানুসারে কাউকে ফেরানো হত না। এক কৌটো চাল ছিল প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ। আমার মায়ের মন ছিল বড্ড নরম। আমাদের টানাটানির সংসারেও মা মাঝে মাঝেই দু-একজন ভিখিরিকে বসিয়ে খাওয়াতেন। বাসি-পচা খাবার নয়, গরম ভাত, ডাল, তরকারি। একবার মা মাংস রান্না করছিলেন। বুড়ি এক ভিখিরি গন্ধ পেয়ে বাইরে থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছিল। মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার থালা বাটি কিছু আছে? সে তাড়াতাড়ি তার আঁচল পেতে বলল, এখানে দাও। মা গরম মাংস হাতায় তুলে তার আঁচলে দিলেন আর বুড়ির সে কী হালুম হুলুম করে খাওয়া।

আমাদের বাড়িতে বরাবর সাধু সমাগম হত। বাবা মা দুজনেই ধর্মপ্রাণ মানুষ। আমার দাদু আর ঠাকুমাও তাই ছিলেন। ফলে বাড়িতে সাধুসন্তরা আসতেন, জ্যোতিষী, তান্ত্রিকদেরও যাতায়াত ছিল। আর আসতেন গান বাজনার লোক। আমার বাবার ছিল অনেক গুণ। অত্যন্ত সুপুরুষ, উচ্চশিক্ষিত, ভাল খেলোয়াড় এবং চমৎকার গানের গলা। টেনিসে ছিলেন ল কলেজ ব্লু, ক্রিকেট, ফুটবল এবং হকি একসময়ে চুটিয়ে খেলেছেন। রাগ সঙ্গীত ভালই গাইতেন। আমাদের বাড়ির ঘরোয়া জলসায় বিখ্যাত গায়ক নরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র আসতেন। তখনকার বিখ্যাত গায়ক রবীন মজুমদারও বেশ কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে এসে গান গেয়েছেন।

যেমন দুষ্টু ছিলাম তেমনি আমার অন্তর্গত একটি গভীর বিষাদও ছিল। সেই বিষাদের জন্ম আমার মাত্র ছয় সাত বছর বয়সে। আর সেই বিষাদের মূলে ছিল প্রশ্ন, আমি কে? এ আমি কোথায় আছি? আমার চারদিকে এই যে সব নির্মাণ এগুলো কী? এমন হত কিছুক্ষণ আমি নিজেকে এবং চারপাশকে কিছুতেই চিনতে

পারতাম না। মাথাটা ভোঁ হয়ে যেত, তখন গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করতাম, মা, আমার মাথাটা কেমন করছে। কাটিহারেই আমার ছোটো বোনের জন্ম হয়।

সেই শুরু। জীবনে বারংবার সেই অদ্ভুত বিষাদরোগ আমার ফিরে ফিরে এসেছে।

তিন বছর কাটিহারে ছিলাম আমরা। কত যে খুঁটিনাটি ঘটনার কথা মনে আছে তা লিখতে গেলে মহাভারত।

কাটিহারের পর আমরা চলে যাই মাল জংশনে। সে এক অতি নির্জন নিরিবিলি জায়গা। বাংলোটি কাঠের এবং খুঁটির ওপর তৈরি। অনেকটা জাহাজের মতো। পিছনেই বিস্তীর্ণ চা-বাগান, দিনে দুপুরে বাঘের বাচ্চা এসে খেলা করত পাশের মাঠে। সন্ধে হলেই ফেউ ডাকত।

আমি আর মা খুব ভুগতাম ম্যালেরিয়ায়। সেই বয়সেই আমার ম্যালিগন্যান্ট আর সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হয়েছিল। মাল জংশনে সেরিব্র্যাল ম্যালেরিয়ায় আমার মৃত্যুসংকট দেখা দিয়েছিল।

মাল জংশন থেকে বাবা বদলী হলেন দোমোহানিতে। তারপর ময়মনসিংহে। সেখানেই স্বাধীনতা এবং দেশভাগ, আমরা চলে গেলাম আসামে। প্রথমে আজিমগঞ্জ, তারপর লামডিং, বদরপুর ফের লামডিং, পাণ্ডু, এবং অবশেষে আলিপুরদুয়ার জংশন। এখানেই আমাকে কাছাকাছি কুচবিহারের বোর্ডিং স্কুল নৃপেন্দ্রনারায়ণে ভর্তি করে দেওয়া হল।

ওই স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল এবং কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আইএ পাশ করে পাকাপাকি চলে আসি কলকাতায়। হোটেল মেসে আমার দীর্ঘ আঠেরো বছর কেটেছে।

লেখালেখির কিছু চেষ্টা ছিল একসময়। কলকাতায় এম.এ পড়ার সময় আবার নতুন করে চেষ্টা শুরু হয়। খুব সম্ভব ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে আমার প্রথম গল্প জলতরঙ্গ দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়। বলতে কি তারপর আর আমাকে লেখা ছাপানোর জন্য বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি। সম্পাদকরা আমার লেখা চেয়ে নিতে থাকেন। এটা খানিকটা সৌভাগ্যই বলতে পারি।

মনে পড়ে...

আমার জন্ম পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ শহরে। আমরা দু'ভাই, দু'বোন। বাবা ছিলেন উকিল। পরে অবশ্য তিনি রেলে চাকরি নেন। অর্থাৎ বদলির চাকরি। তাই ছোটবেলায় বিভিন্ন জায়গায় থেকেছি। আজকের ছেলেমেয়েরা ভাবতেও পারবে না আমাদের ছোটোবেলাটা ছিল কতটা নির্মল! আমাদের সময়ে চাওয়া আর পাওয়া, দুটোই ছিল যৎসামান্য।

মনে পড়ে বলতে, ছোটোবেলার পুজোর দিনগুলোর কথাই আমার বেশি মনে পড়ে। সে এক অন্য পুজো। শরৎকাল এলেই পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ। তখনও ছুটি বহু দূরে। সাদা সাদা কাশফুল দেখলেই মনটা কেমন যেন হয়ে যেত। প্রকৃতি সেজে উঠত সম্পূর্ণ নতুন সাজে। দারুণ আনন্দে ভরে যেত মন।

পুজো হতো আমাদের দেশের বাড়িতে। তখন আমার বয়স মাত্র সাত-আট বছর। ঘরামিরা সবুজ কাঁচা বাঁশ দিয়ে তৈরি করত প্যান্ডেল। বড়দের সঙ্গে প্যান্ডেল সাজাতে হাত লাগাতাম আমরাও। আমরা বাড়ির ভাইবোনেরা রঙীন কাগজ লাগাতাম। ওই সাজানোর মধ্যে যে আমরা কি আনন্দ পেতাম তা বলে বোঝাতে পারব না। আমাদের প্রতিমা ছিল এক চালার। তাও মাত্র হাত তিনেকের। তবুও আড়ম্বরহীন সেই পুজো নিয়ে আমাদের আনন্দের শেষ ছিল না।

কতদিনের ব্যবধানে আজ এত জাঁকজমক দেখে ভাবি, আমরা কত সৌভাগ্যবান ছিলাম। কেননা, আমাদের বাড়ির সেই পুজো দেখতে আশপাশের বহু গ্রাম থেকে কত মানুষ আসতেন। অঞ্জলি দিতেন তারা। অষ্টমীর দিন পাঁঠার মাংস খাওয়া হত। সেসময়ে গ্রামের দিকে এত পুজো হত না। দশ-বারো মাইল হাঁটলে হয়তো একটা-দুটো পুজো দেখতে পাওয়া যেত। পুজোর বিকেলগুলোতে আমরা বেরিয়ে পড়তাম ঠাকুর দেখতে। দু-তিনটে দেখার আগেই পথ-ঘাট অন্ধকার হয়ে যেত। পা ব্যথা হয়ে যেত। তবুও তার মধ্যেই পুজোকে অনুভব করতাম আমরা। বিজয়াতে ছিল মিষ্টিমুখ পর্ব। বড় বড় নারকেলের নাড়ু। আর থাকত প্রণাম পর্ব। সেসব বড়ই অন্তরের। বড়ই অনুভূতির।

আমরা ভাই-বোনেরা পুজোয় মাত্র একটা করে নতুন জামা পেতাম। ওই একটা জামাতেই যে অনাবিল আনন্দের ব্যাপার ছিল তা এখনকার ছেলেমেয়েদের বোঝানো মুশকিল। তবে পুজোর সময় বিশেষ একটা ব্যাপার মনে পড়লে এখনও হাসি পায়। করতাম কি, পুরোনো জুতো পরে দেওয়ালে লাথি কষাতাম অতি সন্তর্পণে। কখনও আবার নিপুণভাবে ব্লেড চালাতাম জুতোয়। বলাই বাহুল্য, নতুন একটা জুতোর প্রত্যাশায়। এই পদ্ধতিটা দু-একবার সফলও হয়েছিল।

এবার পুজোর একটা বিশেষ গল্প বলি। আমাদের বাড়ির পুরোহিতের ছেলে ছিলেন সুরেনদা। সেই সুরেনদা একবার কোথা থেকে একটা দুর্গামূর্তি জোগাড় করে আনলেন। তার ইচ্ছে বাড়িতে পুজো হোক।

কিন্তু কে করবেন পুজো, সে তো অনেক ঝামেলার ব্যাপার। বাড়ির বড়রা কেউ মত দিলেন না। উল্টে সুরেনদাকে বকবকি করলেন। এদিকে দুর্গা প্রতিমাকে তো আর ফেলেও দেওয়া যায় না। তাই মহা মুশকিলে পড়লেন সকলে। অবশেষে এগিয়ে এলেন আমার ঠাকুমা। তিনিই সব খরচা দিলেন। দায়িত্ব নিলেন। আর ঠাকুমা দায়িত্ব নিলে বাকিরা তো আর বসে থাকতে পারেন না। অতএব এগিয়ে এল সবাই। এইভাবেই আমাদের বাড়িতে শুরু হল দুর্গাপুজো।

প্রতিদিন মায়ের কথা মনে পড়ে

আমার তো মা-ময় জীবন। মায়ের কথা বলতে গেলে এখনও চোখে জল এসে যায়। তিনি চলে গেছেন প্রায় সতেরো আঠারো বছর আগে। ছোটবেলায় চৈতন্য হবার পর থেকে মা'কে ঘিরেই আমার জীবন আবর্তিত হয়েছে। আমরা যৌথ পরিবারে মানুষ হয়েছি। ঠাকুমা, দাদু আমার কাছে খুব বড় ফ্যাক্টর ছিলেন। আমার জ্যেঠিমা: আমায় খুব ভালবাসতেন। বাবা বদলি হয়ে চলে আসার পর আমাদের আলাদা পরিবার হয়। অকপটে বলতে চাই, তখন আমার সমস্ত সত্তাটাই মা-ময় ছিল। তাঁকে ঘিরেই ছিল আমার সবকিছু। মা আমায় অসম্ভব ভালবাসতেন। আমিও তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা করতাম তাঁকে সর্বতোভাবে খুশি করতে। মায়ের সঙ্গে রাগারাগি হত, অভিমানও হত। আবার তাঁকে ছাড়া থাকতেও পারতাম না।

একটা সময় মাকে ছেড়ে থাকতে হয়েছিল। কারণ বাবার বদলির চাকরির জন্য আমায় হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে হয়েছে। সেখানে গিয়ে সবসময় মায়ের কথাই মনে হত। আজ এতদিন মা চলে গেছেন কিন্তু রোজ তাঁর কথা মনে হয়। আমার অসুখ বিসুখ হলে মা ঠিক টের পেতেন। অদ্ভুত ব্যাপার! হস্টেলে থাকি, অথচ মা বলতেন তোর শরীর খারাপ হলে আমার যেন কেমন লাগে।

আমি বরাবরই অন্যমনস্ক এবং বে-খেয়াল ছিলাম বলে তিনি আমার জন্য সবসময় চিন্তা করতেন। যে ছেলেটা অপদার্থ তার জন্য মায়েদের চিন্তা তো বেশি থাকে। বাবার ইচ্ছে ছিল, এম.এ পাশ করে অধ্যাপনা করি। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছাপূরণ করতে পারিনি। সেইজন্য তাঁর আমার ওপর একটু অভিমান ছিল। কিন্তু মা'র ছিল না। তখন আমি একটু আধটু লিখি। দেশ পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। মা তাতেই খুশি ছিলেন। একসময় শিক্ষকতা করেছি। নিশ্চয়ই তেমন কিছু বলবার মত নয়। তখনকার শিক্ষক শিক্ষিকাদের অবস্থা তো সকলরেই জানা আছে। এসব সত্ত্বেও মা কিন্তু বরাবর আমায় প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন।

একসময় খুব ম্যালেরিয়া হত। মা এবং আমি দু'জনে একই সময়ে রোগে আক্রান্ত হই। তখন আমরা থাকতাম কাটিহারে। বাবা রেলওয়েতে চাকরী করতেন। মা'র ১০৬ ডিগ্রি জ্বর আমারও তাই। দু'ঘরে দু'জন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি। মনে আছে, কে যেন হাতটা উল্টে বাবাকে কি একটা ইঙ্গিত করল। সেটা দেখে ভাবলাম মা মারা গেছেন। আমি তার পরমুহূর্তে ১০৬ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে মা-মা করে চিৎকার করতে করতে লাফ দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে তাকে জাপটে ধরলাম। মা তখন প্রায় অজ্ঞান। মাথায় জলপট্টি দেওয়া রয়েছে। তখন উপস্থিত সবাই, মা ভালো আছে, মা ভালো আছে বলতে বলতে আমায় ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

স্কুলে খুব দুষ্টু ছেলে ছিলাম। প্রায়ই শিক্ষকদের কাছে মার খেতাম। মায়ের কাছে এসে হাতদুটো লুকিয়ে রাখতাম। কিন্তু তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারতাম না। চিৎকার করে বলতেন, কী হয়েছে তোর হাতে। কে

তোকে মেরেছে, বল? ধরা পড়ার ভয়ে মা'র কাছে মিথ্যে কথা বলতাম। আমার দুষ্টুমির জন্য মা'কে খুব ভুগতে হয়েছে। কারণ, তিনি অত্যন্ত ধার্মিক, শান্ত মহিলা ছিলেন। আমার দুষ্টুমিতে তিনি জেরবার হয়ে যেতেন। আমার মত দুষ্টু ছেলের মা হয়ে তিনি খুবই বিপদে পড়েছেন।

মা'র নাম ছিল গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তো আমাদের চরিত্রে কোন দাগ ফেলতে পারে না। আমরা এইসব জায়গা থেকে অনেক পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করি। কিন্তু আসল বিশ্ববিদ্যালয় তো প্রকৃতি, পৃথিবী, মানুষ, সমাজ। তা থেকে যদি শিক্ষা না নেওয়া যায় তাহলে বই পড়ে মিস্ত্রিগিরি তথা ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ডাক্তারি সম্বন্ধে কী শিখলাম, সেগুলি অবশ্যই ইউজলেস হয়ে যায়। ওসব শিখে তো টাকা রোজগার করা যায়, ওকে কি প্রকৃত শিক্ষা বলে নাকি। ডাক্তারও কারিগর, ইঞ্জিনিয়ারও কারিগর ওই পর্যন্ত। ও দিয়ে সমাজ চলবে নাকি।

কিছু কিছু সঙ্কটের আমরা আজকাল প্রায়শই মুখোমুখি হচ্ছি। ঘনবদ্ধ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, বিবাহ জিনিসটাকে আস্তে আস্তে মানুষ অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। এখন মানুষ ক্রমশ বিবাহহীন সমাজের দিকে এগিয়ে চলেছে। এখনই যে ক্ষয়ের লক্ষণ তা মানুষ বুঝতে পারছে না। অথচ মানুষ এই ভাবনাকে সমর্থন করছে। দুঃখের বিষয় হল, মানুষের বুদ্ধির কোন জায়গায় একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। তবে এখনকার মানুষকে নিশ্চয়ই নির্বোধ বলা যাবেনা। তাদের মস্তিষ্ক অত্যন্ত ক্ষুরাধার। কিন্তু হৃদয়বত্তা একদমই নেই। এছাড়াও এখনকার মানুষদের দূরদৃষ্টির খুব অভাব। কেন পরিবার প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল, কেন বিবাহপ্রথার সৃষ্টি হয়েছিল! মানুষ তো একসময় যাযাবর জীবন যাপন করত। জংলী মানুষ, অরণ্যচারী মানুষ সমাজের কথা ভাবতেই পারেনি। কিন্তু প্রয়োজনেই তারা একবদ্ধ হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে পরিবার প্রথার সৃষ্টি হয়। এখন তা আবার ভাঙতে ভাঙতে দাঁড়িয়েছে নিউক্লিয়াস ফ্যামিলিতে। এখান থেকে যে সব ছেলেমেয়েরা বেরোচ্ছে সেগুলি হচ্ছে আধ খাওয়া চরিত্রের। ছোট ছোট পরিবার থেকে বেরোনোর জন্য তারা ভীষণ স্বার্থপর হয়। একটু আধটু আহা, উহু হয়ত করে কিন্তু কোন দায়দায়িত্ব নেয়না। সমস্ত সমাজ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। তাদের বিশ্বাস একটাই মন্ত্রে—চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা, যৌথ পরিবারের গুণাবলির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মা এই কথাগুলিই বলতেন বারবার।

ক্ষয়ের এই চিহ্ন আজকাল সর্বত্রই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যৌথ পরিবারের যে সব রক্ষাকবচ ছিল নিউক্লিয়াস পরিবারে সে সব নেই। অনেকের ঠাকুমা, দাদু এক বাড়িতে থাকে। মা-বাবার সঙ্গে ছেলেপুলেরা আরেক বাড়িতে থাকে। আবার সেই বাবা-মা একসময় বৃদ্ধাশ্রমে চলে যান।

এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেওয়া উচিত মায়েদের। তাঁরাই পারেন সংসারের সব ভাঙা জিনিসকে জোড়া লাগাতে। কারণ, এখন যেভাবে চলছে তাতে মানুষ ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছে। আমার স্থির বিশ্বাস, মায়েদের যথার্থ এবং সক্রিয় ভূমিকা আমাদের প্রকৃতভাবে বাঁচার জন্য বিশেষ জরুরী। যেমনভাবে আমি আমাদের মা'কে দেখেছি পরিবার যথাযথভাবে গড়ে তুলতে ও সত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি

কণ্ঠলাবণ্যে পরিপূর্ণ পরিবেশন

একাধিক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ইতিপূর্বে কীর্তনগায়িকা তৃষা বসুর সাংগীতিক নিবেদন উপভোগ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি সংগীতবিশেষজ্ঞ নই, তবু এই বৈরাগ্যমণ্ডিত সাধিকা শিল্পীর নিবেদনের রসাস্বাদন কঠিন হয়নি। কারণ, একে তো কীর্তনাঙ্গের যে কোনও গানেরই সর্বজনীন আবেদন রয়েছে, যা সহজেই মর্মে প্রবেশ করে এবং যে কোনও শ্রোতাকেই আন্দোলিত করতে পারে। তার ওপর তৃষা বসুর কণ্ঠমাধুর্যও তাতে নবতর মাত্রা যোগ করতে সক্ষম। শ্রীমতী বসু নব্য প্রজন্মের মানুষ, বয়সে প্রবীণা না হলেও তাঁর সাধনা-সিদ্ধ কণ্ঠস্বরটি যথেষ্ট পরিণত। তিনি যে নিয়মিত রাগসংগীতের তালিম নেন, তাঁর স্বরক্ষেপেও তার সাক্ষ্য আছে।

গত ২৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় কলকাতায় গ্র্যান্ড হোটেলের বলরুমে আয়োজিত আনন্দ-সন্ধ্যায়, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনায় তৃষা বসুর সংগীত পরিবেশন একটি সানন্দ বিস্ময়। যদিও অনুষ্ঠানের সূচি অনুসারে এটি ছিল একটি সংক্ষিপ্ত নিবেদন, তবু স্বল্প সময়ের পরিসরেও ভারী আন্তরিক ছিল তার পরিবেশনা। কপালে রসকলি, শুভ্র বসন, নিরাভরণা তৃষ্ণা মঞ্চে প্রবেশমাত্রই আবহে একটি ভাবগম্ভীরতার সঞ্চার হয়। সেই পরিবেশটি কণ্ঠলাবণ্যে পরিপূর্ণ করে দিলেন শ্রীমতী বসু।

এ দিনের নিবেদনটির বৈশিষ্ট্য হল, কীর্তনাঙ্গের গানে ধ্রুপদী রাগের মিশ্রণ। হয়তো খুব অভিনব নয়, কিন্তু বিশিষ্ট। কীর্তনের লোকায়ত আবেদনের সঙ্গে ঈষৎ রাগের সঞ্চার কোনও রসহানির কারণ ঘটায়নি, বরং নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

শ্রোতাদের সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা এবং অন্তে সহর্ষ করতালি তৃষার নিবেদনটিকে নন্দিত করেছে।

সংগীতকে বলি কণ্ঠস্বরের আবহনৃত্য। স্বরের ভিতরে নিহিত আনন্দ ও বিষাদ আবহে শরীরী হয়ে ওঠে। শ্রবণের ভিতরেও যেন একধরনের প্রত্যক্ষতা ঘটতে থাকে। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমকথাই কীর্তনের উপজীব্য বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, রাধা নামটির উৎপত্তি আরাধনা থেকে। এ কোনও কুলটা নারীর অভিসার তো নয়। পরমাত্মার অভিমুখে জীবাত্মার কষ্টসাধ্য ক্রমাধিগমন। তৃষার পরিবেশনায় সেই আকুলতা ছিল। আনন্দসন্ধ্যাকে এক অতিলৌকিক আনন্দে তিনি ভরিয়ে দিয়েছেন।

এ ছবিতে অনেকেই আত্মদর্শন করবেন

নন্দিতা এবং শিবপ্রসাদের জুটি ইতিমধ্যেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের হৃৎস্পন্দনে নতুন গতির সঞ্চার করেছে বলে শুনতে পাই। তাঁরা বাঙালি জীবনের নানা আবেগ, হাতাশা, সমস্যা-সঙ্কট, হার-জিত নিয়ে ছবি তৈরি করেন। বাংলা ও বাঙালিকে অনুপুঙ্খ চেনেন বলেই তাঁদের ছবিতে বাঙালিয়ানার স্পর্শ ও গন্ধ আছে। আর সেই জন্যই তাঁদের ছবি মুক্তি পেলে বাঙালি দর্শকও হামলে পড়েন। তাঁদের সাম্প্রতিকতম ছবি 'হামি' দেখার পরে আমার মনে হয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে উচ্চারিত প্রশংসাবাক্যগুলি কোনও অতিরেক নয়। এর আগে আমি ঘটনাক্রমে নন্দিতা-শিবপ্রসাদের 'রামধনু' নামে একটি ছবি টেলিভিশনে আংশিক দেখেছিলাম। স্কুলে বাচ্চাকে ভর্তি করানোর নৈমিত্তিক সমস্যা নিয়ে গল্প। ছবিটি আমার বেশ ভাল লেগেছিল। নির্মাণে ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তার ছাপ ছিল। আর ছিল বাস্তবানুগ, সঙ্গত সংলাপ। মানুষের বাক্য ও ব্যবহারের নানা মুদ্রাদোষ সমেত। বলা যায়, 'হামি' সেই ছবিটিরই একটি ক্রম।

কিন্তু 'হামি' সিকুয়েল নয়, বরং স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। অত্যন্ত সাম্প্রতিক, সংবাদমাধ্যমে বহুল প্রচারিত কয়েকটি ঘটনা থেকে এর নানা উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। পরিবেশটিও রচিত হয়েছে হালফিলের শহর কলকাতা নিয়েই, আর গল্পাংশে রয়েছে সমসময়ের শিশু-অভিভাবক-বিদ্যালয়ের সম্পর্কের ত্রিমুখী জটিলতা। অভিনব নয়, কিন্তু বড় আধুনিক। এ রকম বিষয় নিয়ে ছবি করতে যাওয়া অতিশয় কঠিন, কেননা ঘটমান বর্তমানকে অনুধাবন করতে গেলে বিভ্রান্তি ঘটে যেতেই পারে। নন্দিতা-শিবপ্রসাদ যে এই সাহসে ভর করেছেন, সেটাই সাধুবাদযোগ্য।

প্রথমেই যে কথাটি বলা দরকার, সেটা হল অভিনয়। এই ছবিতে প্রায় প্রত্যেকের অভিনয় এমন এক মানে পৌঁছেছে, যেমনটা বাংলা ছবিতে সচারচর দেখা যায় না। কোনও পরিস্থিতিতে এক জনের অভিনয় ঝুলে গেলেই গোটা দৃশ্যটা মার খেয়ে যায়, আর এমনটা সচরাচর হয়েই থাকে। এই ছবির অভিনয় এমন সূক্ষ্ম বোঝাপড়ার উপরে দৃশ্যায়িত হয়েছে যে, সমবেত অভিনয় হয়েছে অনেকটা অর্কেস্ট্রার মতো। আর তার মধ্যে স্বয়ং শিবপ্রসাদকে আমার মনে হয়েছে সবচেয়ে সহজাত অভিনেতা। তাঁর অভিব্যক্তি, বাঙগিয় চোখ ও মুখমণ্ডল এমনই বাস্তবানুগ যে, অবাক মানতে হয়। এক জন ভিতু, উদ্বিগ্ন, দুর্বল মধ্যবিত্ত বাঙালি মূর্ত হয়েছে তাঁর মধ্যে। তিনি হয়তো ভাল পরিচালক, কিন্তু ততোধিক শক্তিশালী এক জন অভিনেতাও।

পটভূমি একটি ঘ্যামা ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল। যে সব চরিত্রকে দেখতে পাই, তারা আমাদের নিত্য দিনের দেখা এবং চেনা মানুষজন। এমনকী, বাচ্চাগুলোকেও আমরা যেন রোজই ইতিউতি দেখতে পাই। সেই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে বোধিসত্ত্ব আর তনুরুচি, যাদের বয়স সাত বছর। নবাগতা তনুর সঙ্গে বোধিসত্ত্বের ভারী ভাব হয়ে যায় আর সেখানেই পাকিয়ে ওঠে নানা গন্ডগোল। সমস্যা বাচ্চাদের মধ্যে

নয়, তাদের অভিভাবকদের মধ্যে। আর শিশুদের সামান্য সামান্য আচরণও অভিভাবকদের চোখে কতটা গর্হিত হয়ে উঠতে পারে, তা নিবিষ্ট হয়ে দেখার মতো। অনেক মানুষই এই ছবিটির মধ্যে আত্মদর্শন করবেন। পুরসভার কাউন্সিলরের বউয়ের ভূমিকায় কনীনিকার দাপুটে অভিনয় ভোলার মতো নয়।

এক বিরল অভিনেতা

অঙ্গার নাটকটি যখন প্রথম দেখি তখন আমি বি এ ক্লাসের ছাত্র সদ্য উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় এসেছি। অঙ্গার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম দুটি কারণে। তাপস সেনের আলোর জাদুতে খনিগর্ভ জলে ভরে উঠছে—দৃশ্যটি ভোলার নয়। আর দ্বিতীয় চমক হল গোটা একটা দলের সম্মোহনকারী অভিনয়। অভিনয় যে এমন হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। আর ওই দলটির মধ্যে বেঁটেখাটো একজন ছিল, যার নাম তখনও জানা ছিল না, তার মতো এমন প্রাণবন্ত অভিনয় কল্পনাকেও হার মানায়।

রবি ঘোষের নাম তখনই অল্প বিস্তর কানে আসছে, পত্র-পত্রিকায় প্রশংসা বেরোচ্ছে।

সত্যজিৎ রায় অভিযান ছবিটা যখন করলেন তখন সেই ছবি দেখে মনে হয়েছিল, একটু কাটছাঁট করলে এবং সামান্য সংশোধন হলে এটি বাংলা সিনেমার ইতিহাসে একটি চিরকালীন শ্রেষ্ঠ ছবি হয়ে থাকতে পারত। আর এই দাবিতে রাফিয়ান মোটর ড্রাইভারের চরিত্রে সৌমিত্র, নায়িকার একটু নষ্ট—একটু রোমান্টিক চরিত্রে ওয়াহিদা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি সৌমিত্রর সহকারীর ভূমিকায় খুব গুরুতর ভূমিকা নয়—রবি ঘোষ সিনেমায় তাঁর প্রথম আবির্ভাবেই জানিয়ে দিলেন তিনি থাকবার জন্যই এসেছেন।

ভানু, জহর তখন মধ্য গগনে, তুলসী চক্রবর্তী থেকে শুরু করে নৃপতি চাটুজ্যে সকলেই রয়েছেন, তবু রবি ঘোষকে চিনতে আমাদের ভুল হল না। দুখানা বাক্যময় চোখ, মুখের নানা অর্থময় অভিব্যক্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য রাতারাতি তাঁকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছে দিয়েছিল।

তখন কফিহাউসে দুবেলা আড্ডা মারতাম। মাঝে মাঝে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই টেবিলে বসতাম। সেই আড্ডায় সৌমিত্র একদিন নিয়ে এলেন রবি ঘোষকে।

সেদিন রবি ঘোষ একাই বক্তা, আমরা শ্রোতা, সারাক্ষণ যে কত মজার কথা বললেন তার হিসেব নেই। মানুষটিকে দেখে খুব ভালো লাগল।

দুঃখের বিষয়, রবি ঘোষের সঙ্গে আর দ্বিতীয়বার আমার মুখোমুখি দেখা হয়নি। তা বলে রবি ঘোষ কখনো খুব দূরের মানুষ ছিলেন না। তাঁর আরও লক্ষ লক্ষ অনুরাগীর মতো আমার কাছেও রবি ঘোষ ছিলেন অতি চেনা, অতি আপনার একজন মানুষ।

কমিক অভিনেতাদের একটা ট্র্যাজেডি—তাঁরা জনপ্রিয় হন বটে, কিন্তু তেমন শ্রদ্ধা জনসাধারণের কাছ থেকে পান না। কিন্তু তার মানে এ নয় যে কমিক অভিনেতাদের কৃতিত্ব সিরিয়াস অভিনেতাদের চেয়ে কোনো অংশে কম, রবি ঘোষের অভিনয় দেখলেই বোঝা যায় শুধুমাত্র কথার ভঙ্গি বা এক্সপ্রেশন দিয়ে কত সহজে তিনি রসসৃষ্টি করতে পেরেছেন। এর জন্য যে বিরল প্রতিভা ও ক্ষমতার প্রয়োজন তা খুব কম মানুষেরই থাকে।

গুপী গাইন বাঘা বাইন-এ বাঘার ভূমিকায় রবি ঘোষ যে কী অসামান্য সূক্ষ্ম রসসৃষ্টি করেছেন তা ছবিটি বার কয়েক দেখার পর বুঝতে পারি। সাধারণত কমিক ভূমিকায় বাংলা ছবিতে ভাঁড়ামি এবং স্থূল রসসৃষ্টির প্রয়াসই দেখা যায়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ক্ষমতাবান ভালো অভিনেতা ছিলেন, 'নতুন ইহুদি' ছবিতে তাঁর চরিত্র চিত্রায়ণের বেদনার্ত দিকটা এত সুন্দর ফুটেছিল যে এই অভিনেতার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু তাঁকে দিয়ে বাঙাল ভাষায় কথা বলিয়ে যে স্থূল হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে তা এই অভিনেতাকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর বাঙাল ভাষাটাই বা কোন সুবাদে হাস্যরসের উপাদন হয়? এই ভাষায় এখনো আমি ও আমার পরিবারের সবাই কথা বলি, আরও লক্ষ লক্ষ মানুষও বলে। এই ভাষাটা এত হাস্যকর কী?

দুঃখের বিষয় সিনেমায় ভানুবাবুর বাঙাল ভাষা শুনে বাঙাল দর্শকও বোকার মতো হেসেছে। সুতরাং এই দর্শককুলের কাছে সূক্ষ্ম অভিনয়ের দাম কী? আমাদের ভাগ্য ভালো যে সত্যজিতের মতো উচ্চশ্রেণীর পরিচালক পেয়েছিলেন রবি ঘোষ, তাই মনের মতো চুটিয়ে অভিনয় করতে পেরেছেন।

রবি ঘোষকে নানা পরিচালকের ছবিতে কাজ করতে হয়েছে। ভালো বাংলা ছবি আর কটা হয়? বেশির ভাগই বাজে ছবি, কিন্তু ছবি যেমনই হোক পর্দায় রবি ঘোষকে দেখলেই আমি বরাবর প্রসন্ন বোধ করেছি।

তার কারণ এই মানুষটির উপস্থাপনাটাই ছিল একটা বিশেষ কিছু। রবি ঘোষ—এই নামটাই যেন ম্যাজিকের মতো কাজ করত।

দুঃখের বিষয় অতি ঝুল ছবিতে অতি রদ্দি ভূমিকায় অতি দুর্বল সংলাপ উচ্চারণ করে যেতেও হয়েছে তাঁকে। বাংলা ছবির অভিনেতার পক্ষে খুব বেশি বাছাবাছি করার উপায়ও তো থাকে না। সেইসব ছবিতে এই প্রতিভাবান অভিনেতার প্রতিভার অপপ্রয়োগ দেখে দুঃখ হয়েছে।

শুনেছি মানুষ হিসেবেও রবি ঘোষ খুব উঁচুদরের ছিলেন। পড়তেন, চিন্তা করতেন, মানুষকে পরামর্শ দিতেন, মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন সহজেই। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর ভূমিকাভিনয় দেখেও কিন্তু তাঁকে আমার বরাবরই একজন সজ্জন ও স্নেহপ্রবণ মানুষ বলে মনে হয়েছে। কোনো কোনো ছবিতে তাঁকে খলের ভূমিকায় দেখেও ধারণাটা পালটায়নি। হয়তো এটাই সত্যি কথা যে, সজ্জন ব্যক্তির মুখে চোখে তাঁর চরিত্রের ছাপ কিছুতেই ঢাকা যায় না।

বাংলা ছবিতে আজকাল আকর্ষণীয় কিছুই প্রায় থাকে না। দেখিও না বড় একটা। তার মধ্যেও আকর্ষণকারী যা দু-একটা জিনিস ছিল তার মধ্যে প্রধান রবি ঘোষের অভিনয়। তাঁর প্রস্থান মানে বাংলা ছায়াছবির আরও একটু বিবর্ণ হয়ে যাওয়া।

শাশ্বত আবেদনের ছবি

গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' কতটা আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক, সেটা বলতে গেলে বলতে হবে যে, গল্পটা যদিও খুবই মজাদার—কিন্তু খুবই ছোট। সত্যজিৎবাবু ওটাকে একটা বড় রূপ দিয়েছিলেন। সত্যি বলতে কী, সিনেমাটা যতটা আকর্ষণীয় লেগেছে, গল্পটা হয়তো ততটা আকর্ষণীয় নয়। লেখাটি সত্যজিৎবাবুর দাদুর লেখা, সেদিক দিয়ে ঠিক আছে—এটা নিয়ে হয়তো অন্য কেউ ভাবত না। সেদিক দিয়ে সব গল্পেরই প্রাসঙ্গিকতা আছে। আসলে গল্পটা আমি কিন্তু আগে পড়িনি। আমি ছোটবেলায় মফস্বলে থাকতাম—আর সেখানে এসব বই পাওয়া যেত না। বাচ্চাদের কাগজই তখন কম বেরোত। আর যা বেরোত, সেগুলো আমরা এফোর্ট করতে পারতাম না। এই গল্পটা আমি বড়বেলায় পড়েছি এবং নিতান্তই কৌতূহলবশত। যখন পড়ি, তখন যে খুব সাংঘাতিক কিছু লেগেছিল, তাও বলতে পারি না, নেহাতই মজার গল্প লেগেছিল। যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, গল্পে কোন চরিত্র সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে হয়তো গুপি গায়েনকেই বলব। কারণ ওকে দিয়েই গল্প শুরু—একজন গান গাইতে পারত না, আরেকজন অনাথ। এই দু-জন বিতাড়িত মানুষকে এক সাথে মিলিয়ে একটা মজার আবহ। আর যদি বলা হয় 'গু-গা-বা-বা' গল্প বা সিনেমা, তাহলে অবশ্যই বলব 'সিনেমা'। কারণ সিনেমাটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।

অভিনেতাদের কথা বলতে গেলে রবি ঘোষকে নিয়ে তো কিছু বলার নেই। কারণ উনি জাত অভিনেতা। আর তপেনও ইকুয়ালি ভালো, বিশেষ করে ওর এক্সপ্রেশন—যখন সেই গাঁয়ের বুড়োরা ওকে নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা করছে, মানে তানপুরাটা কী করে পেল? ঐ দৃশ্যটা। আর গল্পের থেকে বদলানো বলতে গেলে সেটা তো বদলাতেই হয়, আমারই তো অনেক গল্প নিয়ে সিনেমা হয়েছে। আসলে দুটো তো আলাদা মাধ্যম—একটা পড়ার, আর একটা দেখার। দুটোর কিন্তু অনেক তফাত। আমরা পড়ার মাধ্যমে অনেক কিছু বলতে পারি, কিন্তু সেগুলো দেখানো খুবই মুশকিল। সেখানে গ্রহণ বর্জনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এটাই কিন্তু একটা পরিচালকের কাজ। সেই কাজটা এই ছবির ক্ষেত্রে খুব ভালো করে হয়েছে বলে আমার মনে হয়। সব থেকে বড় কথা, কোনো তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাও এখানে তুলে ধরা হয়নি। প্রাসঙ্গিকতা বলতে আমরা এখানে বুঝি, ভালো ও মন্দের আবহমানকালীন দ্বন্দ্ব। বেশিরভাগ গল্পই তো তাই, বিশেষ করে ছোটদের ক্ষেত্রে তো সব ভাষায় জগৎটা গড়ে ওঠে ভালো ও মন্দকে কেন্দ্র করে। যেমন অহংকারী যে রাজা, সে হচ্ছে মানসিক রোগগ্রস্ত। একেক সময় তার মধ্যে থেকে অসুর বেরিয়ে আসে আবার একেক সময় সে হয়ে যায় শিশু, তখন তাকে মন্ত্রীই চালনা করে। রাজনীতি যদি বলো তো এটাই রাজনীতি। একটা রাজ্যের মানুষ গরিব, খেতে পায় না! আবার আরেকটা রাজ্যের মানুষ খেতে পায়, কিন্তু কথা বলতে পারে না। আমার কিন্তু কখনোই মনে হয়নি যে ছবিটা ছোটদের জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ ছোট বলতে তো খুব ছোটদের বলা হচ্ছে না। এই ছবিটা হচ্ছে একটা ল্যান্ডমার্ক ছবি, মানে এমন ঘটনা বাংলা ছবিতে প্রথম দেখানো হয়, আর যদি বলা হয় পছন্দের দৃশ্য—তাহলে বলব, প্রথমে ওই গাঁয়ের কিছু নিষ্কর্মা বুড়োমানুষ

—যারা গুপিকে নিয়ে রসিকতা করে। কারণ এমন নিষ্কর্মা মানুষ অনেকেই আছে, যাদের মাথায় খুব দুষ্টুবুদ্ধি খেলে!

আর ছবির গান নিয়ে বলতে গেলে বলতে হবে অনুপ মানে, অনুপ ঘোষালের গলা ছিল খুব উদার। গেয়েছেও খুব ভালো; তাছাড়া ও ছিল তখন নতুন। এই ছবিতে ওর গান ব্যবহার বলতে পার, সত্যজিৎবাবুর একটা মাস্টার-স্ট্রোক। কারণ এই গলাটা অন্য কারও সঙ্গে মেলে না। গানগুলোর কথা আর সুরও ছিল চমৎকার! এখনও গানগুলো সমান প্রাসঙ্গিক। আর হলে দর্শকরা সিনেমাটা দেখে বলেছিল—তপেন চট্টোপাধ্যায়ই বুঝি গানটা গাইছে!

ছবিটিতে ভূতের নাচ দেখানো হয়েছিল সেই ক্যালাইডোস্কোপিক ভঙ্গীতে। সেটাও দারুণ ছিল! তবে একটা ব্যাপার বলব, ভূতের রাজা যখন বর দিচ্ছেন তখন পিছনে ওই বালব দিয়ে স্টার বানানোর ব্যাপারটা আমার খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। বাকি যে ভূতের নাচ, সেটা নিয়ে তো কিছুই বলার নেই! মানে গোটা ব্রিটিশ পিরিয়ডটা উনি তুলে এনেছেন ওই নাচের মধ্যে দিয়ে। ওই জিনিস সত্যজিৎবাবু ছাড়া আর কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। আর ভূতের রাজার যে গলার স্বর সেটা তো ওঁর নিজের গলা—যন্ত্রের মাধ্যমে পালটে দেওয়া। ওটা আমার দারুণ লেগেছে! কিছু কিছু ছবি আছে, সেগুলো কখনো পুরোনো হয় না। যেমন চার্লি চ্যাপলিনের ছবি—সেগুলো তো বারবার দেখতে ইচ্ছে করে। এটাও ঠিক তেমনি একটা ছবি। পঞ্চাশ বছর পরও সবাই একই ভাবে ছবিটা দেখবে। এটা হচ্ছে একটা শাশ্বত আবেদনের ছবি।

সবথেকে বড় কথা গুপি-বাঘার তিনটে ছবির মধ্যে সবথেকে ইন্টারেস্টিং কিন্তু 'গুপি গায়েন বাঘা বায়েন।' আর সন্তোষ দত্তের তো তুলনাই নেই। সত্যি বলতে কি ওঁর অভাব এখনও টের পাই। সন্তোষ দত্ত কিম্বা রবি ঘোষ কেউ কিন্তু কারও চেয়ে কম নন। আমি একবার সৌমিত্র (চট্টোপাধ্যায়)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সন্তোষ দত্ত বোকা না বুদ্ধিমান ছিলেন?'

উত্তরে উনি বলেছিলেন—'বুদ্ধিমান না হলে, অমন বোকার পার্ট করা যায় না।' আসলে উকিল ছিলেন তো! সবথেকে বড়ো কথা, এই ছবিতে তো ওঁর ডবল রোল ছিল। দুটো চরিত্রই উনি দারুণ করেছিলেন—মানে কেউ কারোর চেয়ে এগিয়ে যাবে না! আর চিন্ময় রায় মোটামুটি—কারণ ওঁর চরিত্র তো কম ছিল, তবে সব মিলিয়ে ভালো। বলা যায় একটা শাশ্বত আবেদনের ছবি।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

তবু অর্পণে পূর্ণ রাজলক্ষ্মী

উত্থিত ভ্রু, কুঞ্চিত নাসিকা, অনবদমিত অহং, পরাক্রান্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে শরৎবাবু প্রায় অস্পৃশ্য। বিশেষ বিপণন-কৌশল ছাড়াই শরৎবাবু এখনও বিক্রয়যোগ্যতায় ভারতের এক নম্বর এবং যে কোনও ভারতীয় ভাষায় অনুদিত তাঁর গ্রন্থাদি লোকে গোগ্রাসে পড়ে। বুদ্ধিজীবীদের পরিভাষায় যিনি 'অপাঠ্য', তাঁর পাঠযোগ্যতাই যে প্রশ্নাতীত। যৌবনকালে যখন টমাস মান, জেমস জয়েস পড়তে গেছি, কবুল করতে দ্বিধা নেই বেশ কসরত করতে হয়েছে পাতার পর পাতা গল্পবিহীন বর্ণনা ও বিবরণ ও খুঁটিনাটি বিষয়কে হাইলাইট করার অমিত শ্রমসাপেক্ষ শিল্প-ব্যায়ামে। 'ডেথ ইন ভেনিস' পড়তে অসুবিধে হয়নি, 'ম্যাজিক মাউন্টেন' পড়তে হয়েছে, 'ডাবলিনার্স' পড়ে গেছি তরতর করে, 'ইউলিসিস' বা 'ফিনিগ্যানস ওয়েক' পড়তে গলদঘর্ম হতে হয়েছে। 'প্লাতেরো অ্যান্ড আই' পড়ে যেমন বিমুগ্ধ, 'টোনিও ক্রুগার' তেমনই চড়াই পেরোনো। কখনও কষ্ট হয়নি ডস্টয়েভেস্কি বা কামু বা কাফকার মুখোমুখি হতে, কিন্তু 'এজ অব রিজন' পড়ে মনে হয়েছে না পড়লেও খুব ক্ষতি হত না বোধহয়। কিন্তু আমি জানি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দীর্ঘ দিন সাহিত্য-কাননের ঘেরবেড়ার আশেপাশে ঘুরঘুর করে আমার প্রত্যয় হয়েছে যে, সাহিত্য নির্ধারণের কোনও সর্বজনগ্রাহ্য রীতিনীতি নেই, শেষ অবধি ওটি নির্ধারিত হয় ব্যক্তিগত মাপকাঠিতে। শুনেছি এলিয়ট সাহেব সশ্রদ্ধ ভাবে শেক্সপিয়রকে এবং অশ্রদ্ধার সঙ্গে ওডহাউসকে অপছন্দ করতেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তরুণ প্রজন্মের অনেকেই রীতিমতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে থাকেন। কারও কারও মুখে আমি জীবনানন্দের প্রবল নিন্দেমন্দ শুনেছি। রা কাড়িনি, কারণ বিষয়টা বিতর্কযোগ্যই নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই কি বিতর্কের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেছেন কোনও দিন?

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বটি অনেক উন্নাসিকের কাছেও তেমন 'অপাঠ্য' নয়। এর ভিতরে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন অনেকটাই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। এই প্রথম পর্বেরই অষ্টম পরিচ্ছেদে কিছুটা আকস্মিক ভাবে পিয়ারি বাইজি তথা রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদের মধ্যেই শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর সম্পর্কটা এমন মাখো-মাখো যে আমরা ইতিমধ্যেই শ্রীকান্তের ভিতরে ঢুকে পড়ে একাত্ম হয়ে রাজলক্ষ্মীর প্রেবে হাবুডুবু খাচ্ছি এবং শঙ্কিত হচ্ছি স্বভাবসিদ্ধ বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনিকার শরৎবাবু শেষ অবধি এই প্রেমে বজ্রাঘাত করে বসবেন কি না।

দ্বিতীয় পর্বে তৎকালীন বাঙালির পক্ষে দূরের দেশ বর্মা মুলুকে বোহেমিয়ান শ্রীকান্তর দুঃসাহসী পাড়ি। ভিন্নতর প্রেক্ষাপট, ভিন্ন কুশীলব, ভিন্নতর কাহিনি। প্রথম তিন পরিচ্ছেদের পর রাজলক্ষ্মী উধাও। উত্তর পুরুষে লেখা বলে রাজলক্ষ্মীর সমান্তরাল কোনও কাহিনির অবতারণাও সম্ভব নয়।

রাজলক্ষ্মী প্রতি পাঠক (এবং পাঠিকাদেরও) আকৃষ্ট হওয়ার কারণ তার বেদনাবহ জীবনকাহিনি।

কিন্তু গ্রাম্য কুসংস্কার ও তার ভয়াবহ পরিণামের কাহিনিটি শরৎচন্দ্র খুব সংক্ষেপে সেরেছেন। প্রশ্ন হল, রাজলক্ষ্মীও একজন গ্রামীণ, শিক্ষাদীক্ষাহীন মহিলা, নিষ্ঠুর এক সমাজে যার জন্ম ও টিকে থাকা। সেই রাজলক্ষ্মী কী ভাবে যে সপত্নীপুত্রকে পরম স্নেহে লালন করে সপত্নীকন্যাদের নিজের গাঁটগচ্চা দিয়ে বিয়ে দেয়, সেটা সাধারণ বুদ্ধিতে বোধগম্য হয় না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বেশির ভাগ নারীই তো তা-ই। রাজলক্ষ্মী মহত্ত্বে তাদের চেয়ে কম নয়, এই যা। রাজলক্ষ্মী কুসংস্কারচ্ছন্ন ও পরশ্রীকাতর ও সংকীর্ণমনা ও কাপুরুষ পুরুষদের দ্বারা শাসিত সমাজে ওই অপপুরুষদের দ্বারা তাড়িত ও অত্যাচারিত হয়েও নারীবাদী হয়ে ওঠেনি। সে গুড়গুড়ি খায়, বাইঠুমরি গায়, ধনীদের মনোরঞ্জন করে অর্থোপার্জন করে এবং তার পরেও সে কদাচ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে না। ভারতের শাশ্বত নারীসমাজের ধারাবাহিকতায় নিজের অবস্থান ঠিক করে নেয়। ব্যাপারটা বাস্তব নয় বলে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা ঠিক হবে না। বরং ওটাই বাস্তব। শরৎচন্দ্রের নারীদের সৃষ্টি পুরুষদের লোকশিক্ষার জন্যই। আমার তো তা-ই মনে হয়। হ্যাঁ, অবশ্যই আধুনিক মেয়েরাও শেখার উপাদান শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রের মধে বড় কম পাবেন না। শিখতে আগ্রহী হবেন কি না সেটা স্বতন্ত্র কথা। তবে দ্বিতীয় পর্বের মাঝামাঝি শ্রীকান্ত বন্ধুর বিয়ে উপলক্ষে দেশে ফিরেছে এবং ট্রেনে রাজলক্ষ্মী তাকে কথাপ্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য এই উক্তিটি করেছে—তোমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের ছোট মনে করে ছোট হয়ে যায়নি, তোমরাই তদের ছোট মনে করে ছোট করে দিয়েছ, নিজেরাও ছোট হয়ে গেছ।

রাজলক্ষ্মী বাইউলি, সম্ভবত গুড়গুড়ি খায়, মুজরো নিয়ে বড়লোকের এবং লম্পটদের মনোরঞ্জনের জন্য গান গেয়ে বেড়ায়। আবার সেই রাজলক্ষ্মী এত শুদ্ধাচারী যে সেই আমলের শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবারাও লজ্জা পেতেন। ট্রেনে-বাহিত খাবার সে খায় না, সামান্য অজুহাতেই উপোস করে, বাসী নোংরা কাপড়জামা বা এঁটোকাঁটা নিয়ে তার বিস্তর বাছবিচার, মেলানো শক্ত। নামমাত্র বিয়ে তো তার একটা হয়েছিল, এবং সেই বাবদে সে বিধবাও বটে। অথচ দেখছি বৈধব্যকে সে বিশেষ মানে-টানে না। এই সব বৈপরীত্য শরৎচন্দ্রের অন্যান্য নারী চরিত্রেও কিছু কিছু আছে। রাজলক্ষ্মীকে এই সব মানা ও না-মানার মধ্যে আমাদের কিন্তু খারাপ লাগে না। প্রথম পর্বের শেষ দিকে রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব, দ্বিতীয় পর্বের মাঝামাঝি গ্রামে এসে সে আর শ্রীকান্ত মোটামুটি স্বামী-স্ত্রী। পূর্বরাগ খুব প্রলম্বিত নয়, দু'জনের মৃদু ও মধুর মান অভিমান, ছেড়ে যাওয়া ও ফিরে আসার কয়েকটি পর্যায়ের পর রোগে ভোগা ও কপর্দকহীন শ্রীকান্ত একরকম আত্মসমর্পণ ও আত্মবিসর্জন দিয়েছে রাজলক্ষ্মীর একরোখা আপসহীন স্নেহ ভালবাসার কাছে। মাঝখানে অভয়া, কমললতার মতো কিছু ডাইভারশন আছে বটে, কিন্তু নারীজাতির প্রতি শরৎচন্দ্রের দুরারোগ্য শ্রদ্ধা এতটাই যে, এঁরা সবাই মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন।

ঠারেঠোরে বুঝতে পারা যায় যে শ্রীকান্তর রং কালো এবং সে মোটামুটি নিষ্কর্মা ও কর্মকুণ্ঠ। বকবক করা আর এখানে সেখানে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো ছাড়া বিশেষ কোনও মহৎ কর্ম সে করেনি। রাজলক্ষ্মী তা হলে তার কুলপ্লাবী এত ভালবাসায় তাকে ভরিয়ে দেয় কেন? সেই ছেলেবেলায় বঁইচির মালা দিয়ে মনে মনে বরণ করেছিল, শুধু সেই ভাবাবেগে? বিশ্বাসযোগ্যই নয়। চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তর সম্পর্কটা স্থির হচ্ছে না। বিরহ-মিলন, মিলন-বিরহ বা বিরহের সম্ভাবনা ও মিলনের আকুলতায় কাহিনি কিছু ভসভসে হয়ে উঠছে। যদিও গহর, কমললতা, কুশরী পরিবার এবং অন্যান্য উপকাহিনিতে একটি ক্যালাইডোস্কোপ রচিত হয়েছে। কাহিনির চৌম্বক আকর্ষণ বইটি হস্তচ্যুত হতে দেয় না ঠিকই, কিন্তু রাজলক্ষ্মী আর শ্রীকান্তর প্রেমপর্ব নিয়ে শরৎবাবু যে কিছুটা দিশেহারা তা বোঝা যাচ্ছে। এও বোঝা যাচ্ছে একজন বাইউলির জীবন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ধারণা কিছুটা ঝাপসা। বাইউলি থেকে গৃহবধূর রূপান্তরের ঘটনাটি বড় আকস্মিক। যেন খানিকটা দেবী চৌধুরাণীর পুনরায় প্রফুল্লতে রূপান্তর।

শেষ অবধি শাশ্বত ভারতীয় নারীর মডেল হয়ে ওঠার পথে যতেক বাধা সবই রাজলক্ষ্মীকে দিয়ে অতিক্রম করিয়েছেন শরৎবাবু। বিশ্বাসযোগ্যতার সুদৃঢ় স্তম্ভের ওপর মহিলাকে দাঁড় করানো সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু

শেষ অবধি রাজলক্ষ্মীকে আমাদের ভালই লাগে। তবে শ্রীকান্তর মতো ভ্যাগাবন্ডকে সে দেবতার আসনে বসিয়ে নিজেকে তার দাসী বলে ঘোষণা করায়, আমরা যারা তত ভাগ্যবান নই, বেশ একটু ঈর্ষাবোধ করতেই পারি। শরৎচন্দ্রের অনেক নারী-চরিত্রকেই আমি বুঝতে পারি না বটে, কিন্তু তাদের সবিশেষ শ্রদ্ধা করি, প্রেমে পড়ে যাই, আকুলতাও বোধ করি। রাজলক্ষ্মীও ব্যতিক্রম নয়।

প্রেমযাত্রা ফুরিয়ে যায়নি আজও

'মরিবার সময় যেন কাহারও একফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।' শরৎবাবুর এই করুণ প্রত্যাশার চেয়ে দেবদাস অনেক বেশি পেয়েছে। গত একশো বছর ধরে বাঙালি তথা ভারতবাসী 'দেবদাস' পড়ে ও সিনেমা দেখে যে কাঁড়ি কাঁড়ি চোখের জল ফেলেছে তাতে বন্যা হওয়ার কথা। দেবদাসের তাই আর মরাই হল না। তার করুণ মৃত্যুতে যারা চোখের জল ফেলেছে তারা মরে গেল, কিন্তু দেবদাস এখনও, একশো বছর পরেও দিব্যি মেয়ে-পুরুষদের চোখ নিংড়ে জল বের করে চলেছে। শরৎবাবু যখন হাতিপোতা গ্রামে পারুর শ্বশুরবাড়ির অদূরে তার মৃত্যু রচনা করলেন, তখন তিনিও বোধহয় আন্দাজ করেননি যে, মারতে গিয়ে তিনি বরং দেবদাসকে অমরত্বেই অভিষিক্ত করেছেন। তাই দেবদাস এখনও দিব্যি বেঁচে আছে। আরও অনেক দিন তার লম্বা আয়ু প্রলম্বিত হবে।

শরৎচন্দ্র, উপন্যাসের উপসংহারে দেবদাসকে পাপিষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। মিথ্যে নয়, দেবদাস পাপিষ্ঠ তো বটেই। কেননা, সে নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন? পারু বা পার্বতীর প্রতি তার দুর্মর ভালাসার জন্য কি? একেই বাল্যপ্রণয়ের গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে, তার ওপর দেবদাস তো পারুকে তার ক্রীতদাসী হিসেবেই ব্যবহার করেছে বাল্যবয়সে। আজ্ঞাবাহী, অনুগত এবং বশংবদ। পারু যখন তেরো বছর বয়সে যৌবনপ্রাপ্ত হল, তখনও দেবদাসের তেমন হেলদোল নেই। তেমন নাড়া খেল না, যখন খেতে বসে মায়ের কাছে শুনল যে, পারুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এমনকী, ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়ার পর, নিশুত রাতে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে পার্বতী যখন তার ঘরে গিয়ে চরণে ঠাঁই চেয়েছিল, তখনও তাকে একরকম নিবৃত্তই তো করেছিল দেবদাস। মা বাবা পছন্দ করছে না, নিচু বংশ, কন্যাপণ নেওয়া পরিবার ইত্যাদি। প্রত্যাখ্যাতা পারু ফিরে গেল এবং তারও পরে হঠাৎ দেবদাসের হুঁশ ফিরল যে, পারুকে ছাড়া তার চলবে না। ছিপের হাতল দিয়ে পারুর কপালে আঘাত—বড়জোর এটুকু ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তার ভিতর। পারুর বিয়ের পর যখন কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে সারারাত ঘাসে শুয়ে রইল দেবদাস, তখনও তার হৃদয়ে পারুর জন্য হাহাকার তেমন নেই। ধরে নিতে হবে দেবদাসের প্রেম বিলম্বিত। পার্বতীর প্রতি তার ভালবাসাটা সে বুঝতে পারেনি প্রথমে। পরে পেরেছে। এমনটা হতেও পারে। অন্তত অবাস্তব নয়।

দেবদাসের প্রেম বিলম্বিত হলেও পার্বতীর কিন্তু তা নয়। বালিকাবয়স থেকেই সে দেবদাসকে তার বরের আসনে বসিয়ে রেখেছে। সখী মনোরমাকে বলছে, তার বরের বয়স উনিশ-কুড়ি এবং তার নাম শ্রীদেবদাস। যখন বলছে তখন ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সুতরাং তার প্রেম নিয়ে বিভ্রান্তির

অবকাশ নেই। সম্ভবত দেবদাসের কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং ব্যক্তিত্বহীন আচরণে প্রত্যাখ্যাতা হওয়ার পরই সে বিনা প্রতিরোধে বিয়ে করে।

পারুর তেরো বছর বয়স হয়েছিল, এটা উপন্যাসে বলা আছে। তার অনতিপরেই তার বিয়ে হয়ে যায়, কিন্তু কতটা পরে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ধরে নেওয়া যাক, বিয়ের সময় পারুর বয়স হয়েছিল চোদ্দো। বড়জোর পনেরো। আর ভুবন চৌধুরীর বয়স প্রথমে শোনা গিয়েছিল চল্লিশের নীচে, পরে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে চল্লিশের ওপরেও হতে পারে। ধরা যাক, তার বয়স কম-বেশি চল্লিশ। অর্থাৎ পারুর সঙ্গে ভুবনের বয়সের পার্থক্য পঁচিশ বছর। এ যুগেও সায়রাবানু-দিলীপকুমার, ইমরান খান-জেমাইমা, মাইকেল ডগলাস-ক্যাথরিন জিটা জোনাস এবং আরও অনেক স্বামী-স্ত্রীর বয়সের তফাত ওরকমই। তবে ভুবন চৌধুরীর প্রথম পক্ষের ছেলে এবং মেয়ে আছে। মহেন্দ্র, বিনোদ, যশোদা। মহেন্দ্রর বয়স কুড়ি, যশোর অনুমান আঠারো-উনিশ, বিনোদ হয়তো-বা পারুর সমবয়সি। তা, এ যুগেও বিস্তর স্বামী বা স্ত্রীর আগের পক্ষের বড় বড় ছেলেমেয়ে থাকে। বিস্ময়ের কিছুই নেই। বিস্ময় রয়েছে অন্য দু'টি বিষয়ে। এক পারুর প্রতি ভুবনের আচরণ, আর পারুর কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ রাতারাতি একেবারে রানি রাসমণি হয়ে ওঠা।

প্রথমে ভুবনের কথাই ধরা যাক। সে নিজেকে বুড়ো ভাবে বটে, কিন্তু আসলে সে চল্লিশের একজন সক্ষম যুবাপুরুষ। আর সে আমলে এর চেয়ে অনেক বেশি বয়সেও তরুণী ভার্যা গ্রহণ ও সন্তান উৎপাদনের ভুরি-ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু ভুবন পারুকে বিয়ে করার পর এই অসম বিয়ের লজ্জায় জড়সড়। সে রাতে পারুর উলটোদিকে পাশ ফিরে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকে। শরীরমিলনে রত হয় না। এমনকী, বিমুখ যশোদাকে পারুর বশ করে ফেলার সংবাদে পারুর মাথায় হাত দিয়ে পিতৃস্থানীয়ের মতো আশীর্বাদ করে বসায় আমরা শুধু বিস্মিত নই, স্তম্ভিতও হয়ে যাই। একথা ঠিক, পিতা ও পতি এক ধাতুনিষ্পন্ন শব্দ, অর্থেরও খুব পার্থক্য নেই। তবে সম্পর্কের পার্থক্য আছে। তবু ভুবনের এই পিতৃসুলভ আচরণ তার বয়সোচিও নয়। তবে ভুবন চরিত্রটি ভারী অল্প কথায় সুন্দর রচনা করেছেন শরৎচন্দ্র। তার লজ্জা, সংকোচ, আত্মধিক্কারত তার উন্নত রুচিবোধ শুদ্ধ মানবিকতার পরিচায়ক।

কিন্তু পারুর কোনও সীমানা রচনা করেননি শরৎচন্দ্র। সে প্রথম দর্শনেই মহেন্দ্র বা মহেনকে বাবা-বাছা, আমার বড় ছেলে প্রভৃতি সম্বোধন করে বসে, যখন তার বয়স মেরেকেটে পনেরো। যশোদাকে আমার বড় মেয়ে বলে আদর-আপ্যায়ন। গায়ের গয়না খুলে দিয়ে নিরাভরণ হওয়া ইত্যাদি লজিক্যাল নয়। আরও দেখি, তার অমোঘ আকর্ষণে এইসব হুমদো-হুমদো ছেলেমেয়েরা তাকে অবিসংবাদী জননীর পদে বরণ করে নিয়েছে। এমনকী, ছোটছেলে বিনোদ তার সমবয়সি হয়েও বোর্ডিং থেকে গিয়ে ছোটমার স্নেহচ্ছায়ায় এমন বাঁধা পড়ে গেল যে, আর বোর্ডিং-এ ফিরেই গেল না। আমার সন্দেহ, মা সারদা আর রানি রাসমণি উভয়েরই ছায়াপাত নিজের অজান্তে শরৎবাবু পারুর ওপর ঘটিয়েছেন। ফলে পারু, তার ছটফটে উপোসি যৌবনে সাধিকার মতো হয়ে দাঁড়াল। যার কাম-কামনা নেই, যৌনতা নেই।

এ পর্যন্ত আমার জানা দুটো বাংলা আর দুটো হিন্দি চলচ্চিত্র দেবদাসকে নিয়ে হয়েছে। অন্যান্য ভাষাতেও হয়ে থাকতে পারে, আমার জানা নেই। আর প্রত্যেকটাতেই চুনিবাবুকে একটু খলচরিত্র করা হয়েছে। যেন-বা চুনির প্ররোচনায় দেবদাসের চন্দ্রমুখীর কাছে যাওয়া, মদ্যপান। উপন্যাসে চুনি সম্পূর্ণ অন্যরকম। সে নিজে একটু লম্পট এবং মাতাল বটে, কিন্তু দেবদাসকে সে কখনও ওই পথে নিয়ে যেতে চায়নি। বরং দেখা গেছে, সে বাস্তবিকই দেবদাসকে ভালোবাসে এবং তার মঙ্গলই চায়। দেবদাস গেছে জোর করে, প্ররোচনাটা তারই।

আর চন্দ্রমুখীকেই-বা কী বলি? সে কি বারবনিতা? বাইজি? তার কোনও লক্ষণই উপন্যাসে নেই। চুনিবাবুর সঙ্গে সেদিন চন্দ্রমুখীর ডেরায় গিয়ে দেবদাস খুবই বিরক্ত। কারণ, পার্বতীর বিয়ের পর তার হৃদয় সমস্ত নারীজাতির প্রতিই বিদ্বিষ্ট অর্থাৎ সুন্দরী যুবতীদের প্রতি। প্রথমদিনেই চন্দ্রমুখীকে তার কুৎসিত এবং বিশ্রী বলে মনে হল এবং তা চন্দ্রমুখীকে মুখের ওপর জানিয়েও দিল। আর সেই অপমান চন্দ্রমুখীর ওপর

এমন বিপরীত প্রতিক্রিয়া করল যে, দেবদাসকে দ্বিতীয়বার দেখার আগেই সে তার প্রেমে পাগল হয়ে দেহব্যবসা বন্ধ করে প্রায় যোগিনী হয়ে উঠতে লাগল।

শরৎচন্দ্র মেয়েদের দেবী বানাতে বড় ভালবাসেন, আর তার জন্য বিস্তর বাস্তব যুক্তি ও অসম্ভাব্যতাকে অতিক্রম করতে পিছপা হন না। সুতরাং দেবদাসের ক্ষণিক দর্শনে প্রেমে পাগলিনী হয়ে প্রায় রাতারাতি চন্দ্রমুখী যেভাবে শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে উঠল, তা একমাত্র রূপকথাতেই হয়ে থাকে।

শরৎবাবু শরীরী প্রেমে তেমন আগ্রহী নন। তাঁর বেশির ভাগ প্রেমই প্লেটোনিক। ঠিক আছে, কিন্তু ভালবাসা প্লেটোনিক হলেও তার পরিণতি যৌনমিলনে পর্যবসিত হওয়ার কথা। তেমন পরিণতি শরৎবাবু কোথাও দেখাননি তা নয়। তাঁর কিছু উপন্যাসে রেখেঢেকে তাও বলা আছে। কিন্তু দেবদাসে তিনি বড় বেশি দেহাতীত। চন্দ্রমুখীর সঙ্গে যখন দেবদাসের দেখা হল, দ্বিতীয়বার, তখন চন্দ্রমুখীর শুদ্ধিকরণ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। দেবদাস তার ঘরে বসে মদ খায় বটে, কিন্তু চন্দ্রমুখী তার এই অমিতাচার সমর্থন করে না। তাকে সংবরণ করার চেষ্টা করে।

দু-দুটো সুন্দরীর প্রেম পাওয়া সোজা কথা নয়। দেবদাস তা পেল কোন গুণে! পারু না হয় ছেলেবেলা থেকে ভালবেসে এসেছে। কিন্তু চন্দ্রমুখীর ভালবাসাটা বোঝা কঠিন। দেবদাস রূপবান এটা জানা যাচ্ছে, কিন্তু শুধু রূপ দেখে শ্রীচরণে বিকিয়ে যাওয়ার মতো তো চন্দ্রমুখী নয়! আসলে চন্দ্রমুখীকে দেবী না করলে শরৎবাবুর সোয়াস্তি ছিল না।

চন্দ্রমুখীর স্পর্শকে অপবিত্র মনে করত দেবদাস। সুতরাং তাদের দেহ সম্পর্ক হয়নি, ধরে নেওয়া যায়। পরে অবশ্য দেবদাসকে স্পর্শ করেছে চন্দ্রমুখী। এবং চন্দ্রমুখীকেও দেবদাস 'বউ' বলে ডাকতে শুরু করেছে। বর্ণে বিপ্র এবং পারিবারিক আভিজাত্য—এই দুই সংস্কার থেকে দেবদাস বেরোতে পারেনি কখনও। তার চারিত্রিক পতন শুধুমাত্র মদ্যপানেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। তাও কেন, তা স্পষ্ট নয়। পারুর জন্য? শরৎচন্দ্র দেবদাসকে লঘুচিত্তই বলেছেন। সে চট করে সিদ্ধান্তে আসে, পূর্বাপর বিচার করে না। তার ভাবনাচিন্তা গভীর নয়। সহজেই ভেসে যায়। এরকম চরিত্রের লোকেরা আবার সহজে ভুলেও যায়। কিন্তু দেবদাসের ক্ষেত্রে তা হল না। পারুকে সে চায়নি, তারপর চাইল, তারও পর তার বিরহে ভেসে গেল এবং আর-এক সুন্দরীর অবিশ্বাস্য ভালবাসাতেও তার বিরহজ্বালা জুড়োল না। আসলে শরৎবাবু দেবদাসকে মারবেন বলেই ঠিক করে রেখেছিলেন। সুতরাং মরতে তাকে হতই।

'দেবদাস' যে কাঁচা লেখা, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্যাচপেচে রোমান্টিক, অযৌক্তিক এবং অবিশ্বাস্য। সেটা যে-কোনও অভিজ্ঞ পাঠকই জানেন। কিন্তু রহস্যটাও সেখানেই। তাই যদি হবে, তা হলে গত একশো বছর ধরে এই অপরিণত, অপরিপক্ক কাহিনিটি এখনও পাঠকহৃদয়ে আসীন রয়েছে কী করে? এর ম্যাজিকটা কোথায়? শরৎবাবুর পরও বাংলা সাহিত্যে মেলা বাঘা লেখক এবং অসামান্য উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু সবাইকে টপকে এখনও শরৎবাবু এবং তাঁর উপন্যাসাবলি বাজার ধরে আছে কেমন করে? এবং কেন এখনও 'দেবদাস' পড়ে লোকে চোখের জল ফেলে? এই প্রশ্নের জবাবও ওই 'দেবদাস' উপন্যাসেই আছে। অভিনিবেশ সহকারে পড়লেই বোঝা যায়। কী অসামান্য এর গল্প বুননের শিল্প! সহজ ভাষায় রচিত এক-একটি পরিস্থিতি ও ঘটনা দোধারি তরোয়ালের মতোই পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করে। দু'বার তিনবার বহুবার পড়ে দেখলেও সেই একই অনুভূতি বারবার হবে। সেইজন্য একশো বছরেও দেবদাসকে মারা গেল না। তার গোরুর গাড়ি পার্বতীর বাড়ি অবধি পৌঁছতে পারেনি ঠিকই, পারুর সঙ্গে তার মিলনও হয়নি। কিন্তু ওই প্রেমযাত্রা ফুরিয়েও যায়নি আজও। শরৎবাবুকে যে কী বলি! বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে পাত্তা দেয় না বটে, সে তাদের বৌদ্ধিক অহং। কিন্তু আজও শরৎবাবুর কাছে শিখতে হয় গল্পরচনার শিল্প। এ জিনিস আর কেউ পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে কি না কে জানে!

লেখাই তাঁর জীবনের ব্রত

আশাপূর্ণা দেবীকে আমি অনেক দিন ধরে চিনি। অন্তত পনেরো-কুড়ি বছর তো হবেই। ব্যক্তিগত পরিচয় যখন হল, তখন এই মহীয়ষী মহিলার যে দিকটা আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করেছিল সেটা হচ্ছে তাঁর ভেতরে মাতৃভাব। আশাদি-র আরও অনেক পরিচয় পেয়েছি, ওঁর কাছে থেকে ওঁর জীবনের অনেক কথাও শুনেছি। তিনি যে-অবরোধের মধ্যে লেখালিখি শুরু করেছিলেন এবং ওই অবরোধের মধ্যে থেকেও সাংসারিক, একেবারে যাকে বলা যায় বেড়াজালের মধ্যে আটকে থেকেও জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে এত কিছু লেখা, এত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া, আমার কাছে তো এক অলৌকিক ব্যাপার বলেই মনে হয়েছে। শুধু কল্পনা দিয়েই তো আর এই জিনিস সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁর সাহিত্যিক হাওয়াটা যে-কোনও মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ কঠিন ছিল। কেন-না, তার শাসন ছিল, নানারকম বাধাবিপত্তি ছিল। আশাদি-র কাছে শুনেছি, এই সেদিন পর্যন্ত সমস্ত কাজ নিজে করেছেন। এই ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে। অথচ কোনও সময় তাঁকে অযথা সময় কাটাতে দেখিনি। নাতি-নাতনি, কাজের লোক, কোথায় কি হবে না হবে, সবকিছুই তিনি তদারকি করতেন।

কিন্তু এই জীবন থেকেও তিনি যে অসামান্য সাহিত্য রচনা করেছেন বা রচনা করে চলেছেন, তা অবশ্যই নিরলস, নিরন্তর সৃষ্টিশীল। আমার কাছে আশাদি আজও এক বিপুল বিস্ময় হয়ে আছেন। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যে কথাটা সর্বাগ্রে বলতে হয়, তা হল তার কোনও লেখাই পড়ার পর মনে হয়নি যে, এই লেখাটা না পড়লেও চলত। প্রত্যেকটা গল্প, প্রত্যেকটা উপন্যাস, প্রত্যেক লেখার মধ্যেই তাঁর যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, এটা অন্য কোনও বড় সাহিত্যিকও বোধহয় ধরে রাখতে পারেন না। আশাদি তো তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির জন্য যথেষ্ট সম্মান ও পুরস্কার পেয়েইছেন কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। একজন লেখককে ওভাবে চেনা যায় না। একজন লেখক বা লেখিকা তখনই গৃহীত হন যখন কোনও বুদ্ধিমান, ধীমান পাঠক বা পাঠিকা অন্তরের সঙ্গে তাকে গ্রহণ করে, তাঁর লেখা খোঁজে ও তাঁর লেখার ভেতর থেকে কিছু খুঁজে পায়। আমরা যারা একটু-আধটু লেখালিখি করি, যখন তাঁদের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করি, আশ্চর্যের বিষয় অনেকেরই নাম তখন উচ্চারিত হয় না, কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর নাম সবসময়েই উচ্চারিত হয় এবং আমরা প্রত্যেকেই প্রায় এই বিষয়ে একমত হয় যে, এরকম অসাধারণ ধীময়ী এবং পুরোনো মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয়েও আধুনিক যুগ জগতের সমস্যা, তাঁর গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকে যেভাবে তিনি লিখে যাচ্ছেন সেটা তাঁর কতটা কৃতিত্ব জানি না, কিন্তু আমাদের কাছে অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে হয়। আশাদি যে লিখেছেন এটা আমাদের ভাগ্যের কথা। বাংলাসাহিত্য এখনও তাঁর কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে এবং পাবেও।

অনেক দিন আগে তিনি যখন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন, তখন আমি দূরদর্শনে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেইসময় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাবার কথা উল্লেখ না করেও তাঁকে যখন নানা বিশেষণে ভূষিত করার চেষ্টা করছিলাম, তখন তাঁর কি কুণ্ঠা এবং লজ্জা এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেই সময় পরিচিত হয়েছিলাম নিরহংকার, শিশুর মতো এক মানুষ—আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে। কয়েক বছর আগে প্রায় বছর খানেকের মতো সময় আমি তাঁর প্রতিবেশী ছিলাম। সেই সময় আশাদি ও তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠছিল। সেই সূত্রে অভিজ্ঞতা হয়েছে, শুধু আশাদিই নয়, তাঁর ছেলে এবং পুত্রবধূও অত্যন্ত বিনয়ী এবং তাঁদের পরিবারের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। স্পর্ধা ও অহংকার এদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না, এটাই যেন বার বার মনে হয়েছে। একজন মহৎ মানুষ এবং মহৎ লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীকে আমার অন্তরের গভীর এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা সবসময়েই নিবেদন করি এবং প্রসাদের মাধ্যমে আমি আর একবার তাঁকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আশাপূর্ণা দেবীর কাছে যে সমস্ত টুকরো-টাকরা কথা শুনেছি, সেগুলি তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমেও প্রকাশ করেছেন। সেই আমলে বাড়ির বউ লিখবে, সেগুলি আবার ছাপা হবে—এসমস্ত কথা ভাবাই যেত না। এই কথাগুলিই যদি তাঁর মুখ থেকে কেউ শোনেন, তাহলে সেখানে একটা আলাদা মাত্রা যোগ হয়। ভারি সুন্দর কথা বলেন। ভীষণ আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কথার মধ্যে। তাঁর বিখ্যাত ট্রিলজি পড়লেই এই ধরনের সমস্ত কথাই জানা যাবে।

মেয়েদের নিয়ে বোধহয় আশাদি খুবই ভেবেছেন।

বোধহয় তিনি নিজে একজন মেয়ে বলেই ব্যাপারটা তাঁকে বেশি করে ভাবিয়েছে। কিন্তু যেহেতু আশাদির মধ্যে কোনও উগ্রতা নেই, সেহেতু তিনি তাঁর মতো করে যে নারী স্বাধীনতা বা তাঁর মতো করে যে নারীর অধিকারে বিশ্বাস করেন, তা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আগেই বলেছি, পুরনো মূল্যবোধগুলিতে তিনি খুবই বিশ্বাসী, সেইজন্য কোনও কিছুই তিনি ভেঙে ফেলতে রাজি নন।

আশাদির কাছে আমাদের প্রত্যাশাও অনেক, পেয়েছিও অনেক। নারীপ্রগতির নামে যদি আমরা নারীর লজ্জা, বাধা, বিপত্তি সবকিছুই গুঁড়িয়ে দিই তাহলে নারী তো তাঁর নারীত্ব হারাবে। নারী যদি তার নারীত্বে বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে, তাহলে তো পৃথিবীতে তার কোনও জায়গা হবে না। এই ভুলটা অনেক নব্য শিক্ষিতা মেয়েরা করেন, কিন্তু আশাদি তো আর এই ভুল করবেন না। কাজেই আশাদির জীবন-দর্শনটার একটা বড় পরিপ্রেক্ষিত আছে, বড় পটভূমি আছে। তিনি আগাপাশতলা ভেবে পূর্বাপর সমাজের গতিপ্রকৃতির নিরিখেই নারী-স্বাধীনতা বা নারীর অধিকারকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আশাদির নারীচরিত্র কখনই উগ্র নয়। উগ্রতাকে তিনি অপছন্দই করেন।

মোটামুটি নারীর স্থান কী হবে না হবে, সে বিষয়ে তাঁর ধারণা খুবই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। সেই বিষয়ে কোনও দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব তাঁর নেই। সেইজন্যই আমাদের আমলে লেখিকা হিসাবে আশাদির প্রাসঙ্গিকতা আছে।

অনেক লেখকই লেখালেখি করেন, আমরা বাহবা দিই, আবার ভুলেও যাই। নাম করব না, অনেক লেখক আছেন যাঁরা অনেক রকমের সমস্যা নিয়ে লেখেন। কিন্তু আশাদি তো লেখেন পুরো জীবনটাকে নিয়ে এবং পুরুষ, নারী, সমাজ—সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই সমস্যাটা বিচার করেন বলেই তাঁর লেখার ভিতর থেকে আমরা একটা সরল সত্যের সন্ধান খুঁজে পাই।

আধুনিকতার নামে সত্যকে অস্বীকার করে তো লাভ নেই। সত্যকে হারাব, মানুষও হবে না আবার বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হয়ে যাবে, তা কী করে হতে পারে? বাংলাসাহিত্যে আশাদি একটা যুগকে ধরে রেখেছেন বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য লেখক, লেখিকাদের মধ্যে তাঁর মতো শক্তিমান ও এত গুরুত্বপূর্ণ লেখক বা লেখিকা খুব কমই আছে। লেখকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আশাদির কোনও একটি লেখাকে ভালো লেগেছে, এ কথা বলব না, কারণ তাঁর সব লেখাই আমার ভালো লেগেছে। বিশেষ করে তাঁর ট্রিলজি, যার জন্য তিনি স্বীকৃতিও পেয়েছেন। তাঁর জীবনের একটা দিকেও হয়তো সেই লেখার মধ্যে আকাশিত হতে দেখি। তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি, ওই লেখাটি আত্মজীবনী-মূলক কিনা? তবে আমার মনে হয় এই লেখার মধ্যে আত্মজীবনী উপাদান যথেষ্ট রয়েছে। সেক্ষেত্রে এই লেখা একটা অতুলনীয় ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তাঁর লেখা প্রত্যেকটা ছোট গল্পই যেন মানুষের ছোট ছোট দিককে উন্মোচিত করে দেয়। একটা আলোর ঝলকানো দিয়ে দেখিয়ে দেয় জীবনের এইখানে এই সত্য, সেইখানে সেই আবিষ্কার আমি করেছি। তোমরা দেখো, এটা কি সত্য? ছোটদের জন্য তাঁর লেখা তো অসাধারণ বলা যায়।

আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাদা করে কোনও কথা বলিনি। কিন্তু আমার গুরুদেব ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর কাছে আমার স্ত্রী গিয়েছিলেন একটা লেখা চাইবার জন্য। তখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অনেক কথাই হয়েছিল। তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বরবিশ্বাসের একটা মস্ত বড় স্থান আছে আর ঈশ্বরবিশ্বাস তো আর কোনও ঠুনকো বিশ্বাস নয়। জীবনে ঈশ্বরের ভূমিকাকে মেনে নেওয়া বা তাঁর ওপর নির্ভর করা, এই ব্যাপারটা আশাদির নিশ্চিতভাবে আছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। লেখাকেই তিনি তাঁর জীবনের ব্রত করে নিয়েছেন। যে কারণে বয়স বা অন্য কিছুই তাঁকে ভেঙে ফেলতে পারছে না। অনেকের কাছেই এই ব্যাপারটা প্রফেশান। অনেকে হয়তো ব্যাপারটির প্রতি তেমন মনোযোগ দেন না। কিন্তু আশাদির কাছে তো আর তা নয়। আদর্শ হিসেবে, ব্রত হিসেবে তিনি কাজটিকে বেছে নিয়েছেন। তিনি সব সময়েই তাঁর লেখার মাধ্যমে একটা মুক্তির পথ, একটা জানালা খুলতে চেয়েছেন। এই জানালাটা হচ্ছে তাঁর সাহিত্য। এই জানালা খোলার ব্যাপারটাকে তাঁর জীবনের একটা লড়াই বলা যেতে পারে। কাজেই এই লড়াই তো তাঁর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে।

একবারের একটা মজার ঘটনার কথা বলি। যখন তিনি গোলপার্কে থাকতেন তখন আমায় বলেছিলেন, আমি গড়িয়ায় চলে যাচ্ছি। জানতে চাইলাম, গোলপার্ক থেকে গড়িয়ায় চলে যাচ্ছেন কেন? আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, দেখো, আমার বরাবরের ইচ্ছে ছিল আমি বড় রাস্তার উপর থাকব। লোকজন দেখব, গাড়ি-ঘোড়া দেখব। ওটা আমার একটা শখ। তা সে যেখানেই হোক না কেন? ধারে-কাছে ভালো জমি না পাওয়ায় আমায় দূরে যেতে হল। কিন্তু বড় রাস্তার উপর তো জমি পেয়েছি। সেই শখ তাঁর পূর্ণ হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীকে সেখানে সবাই চেনে। কোনও ঠিকানার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য এটা খুবই স্বাভাবিক, উনি যেখানেই থাকবেন, সেটা ওঁরই জায়গা হবে। আমরা অন্যের পাড়ার বসবাস করি, একটু ভয়ে ভয়ে থাকি, কারণ আমাদের সবাই চেনে না। কিন্তু আশাদির তো আর তা নয়। স্থানীয় অন্যান্য মানুষ পরিচয় দিয়ে বলেন, আমরা আশাপূর্ণা দেবীর পাড়ায় থাকি।

বুদ্ধদেব—এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

বুদ্ধদেবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কীভাবে, সেটা ঠিক মনে নেই, কেননা সে বহুকাল আগেকার কথা। তবে এটুকু মনে আছে কোনও একটা অনুষ্ঠানে হয়েছিল এবং ভীষণ ক্যাজুয়ালি হয়েছিল। এখনকার মতো এত ফরম্যালি নয়। তখন আমরা সবে ছাত্রজীবন শেষ করেছি। বুদ্ধদেব আমাকে হঠাৎ করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কী ব্যাপার, বংশীচন্দ্র না?' তারপরেই খুব চট করে বন্ধুত্ব হয়ে যায় আমাদের। তখন বন্ধুত্ব হতে বেশি সময় লাগত না। এভাবেই চট করে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল সুনীল বা সিরাজের সঙ্গে। আর যেহেতু ওই এক পালকের পাখি আমরা, সকলেই একটু আধটু লেখালেখির চেষ্টা করি, তাই খুব সহজেই একাত্ম হয়ে যেতে পারতাম। বন্ধু হিসেবে খুব ভালো ছিলাম আমরা। আমাদের মধ্যে কোনও ঈর্ষাকাতরতা ছিল না। কোনও পরশ্রীকাতরতা ছিল না, একে অন্যের সুখ-দুঃখে খুব তাড়াতাড়ি ইনভলভড হয়ে যেতে পারতাম আমরা।

বুদ্ধদেব গুহ আর আমার তো শ্রেণী এক নয়, জীবনের প্রথম দিকে আমাকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে। কলকাতা থেকে দূরে থাকতে হয়েছে আমাকে টাকার অভাবে। বালি স্টেশন থেকে এক মাইল ভেতরে থাকতাম। সেখান থেকেই প্রতিদিন কালীঘাটে আসতাম একটা স্কুলে পড়াতে। সেখানে একশো টাকা মাইনে পেতাম।

আর বুদ্ধদেব অত্যন্ত বনেদি বাড়ির ছেলে, ও নিজেও বড়ো চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। বালিগঞ্জের বিরাট বাগানবাড়িতে থাকত ওরা। বুদ্বদেব ভীষণ সুপুরুষ ছিল, তা এখনো দেখলে বোঝা যায়। এখন যদিও মোটা হয়ে গেছে, বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু আগে ছিপছিপে ছিল। ওরকম সুপুরুষ চেহারা আমাদের মধ্যে কারোর ছিল না। এছাড়াও ও খুব ভালো খেলোয়াড় ছিল। ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট খেলত। একসময় চুণী গোস্বামীও বুদ্ধদেবের ক্যাপ্টেন্সিতে খেলেছে। নানান গুণের সমন্বয় হল বুদ্ধদেব। যেমন শিকারের হাত, তেমন গানের গলা, অপূর্ব আঁকার দক্ষতা এবং অসাধারণ সাহিত্যপ্রতিভা সম্পন্ন। আমি ইয়ার্কি মেরে বলতাম, 'তুমি তো সব জায়গাতেই প্রশংসা মেরেছো, আমাদের তো একটাই মোটে খাতা।' আমার থেকে সব কিছুতেই সে অনেক বেশি বিশিষ্ট ছিল, আভিজাত্যে, রুচিতে, রূপে, গুণে। তবে সে অর্থে কোনও অহংকার ছিল না। তাই কোনওদিনই এসবের প্রভাব আমাদের বন্ধুত্বে পড়েনি। ও আমার খুব কাছেরই বন্ধু, লালা বলে ডাকি আমি।

বুদ্ধদেবের খুব অভিমান ছিল, আমি নাকি ওর লেখা পড়ি না। মাঝে মাঝেই আমাকে বলত, 'তুমি আমার লেখা পড়ো না, তোমরা কেউ আমার লেখা পড়ো না।' তবে আমি কিন্তু ওর অনেক লেখাই পড়েছি। আমার থেকেও আরও বেশি পড়েছে আমার স্ত্রী ও মেয়ে। ওরা বুদ্ধদেব গুহর একনিষ্ঠ ভক্ত। আমার অন্যতম একটি প্রিয় লেখা হল, 'কোয়েলের কাছে।' আমার সব থেকে ভালো লাগত ওর ছোটো গল্পগুলো, শিকারের

গল্পগুলো। আমার যদিও ব্যক্তিগতভাবে শিকার জিনিসটা পছন্দ নয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও শিকার পছন্দ করতেন না, ওঁর প্রকৃতি প্রেমটা ছিল একদম অন্যরকম। আর বুদ্ধদেব শিকারের উদ্দেশ্যেই জঙ্গলে যেত। ওর প্রকৃতি প্রেমটা বিভূতিভূষণের মতো নিরামিষ নয়।

যাই হোক, সে তো শিকারও অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে, টেনিস খেলাও ছেড়ে দিয়েছে। ঋতুর সঙ্গে এক অদ্ভুত রসায়ন ছিল ওর। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। বুদ্ধদেবের গান, লেখা সবকিছুই ভীষণভাবে আঁচড় কাটে আমার মনে। শেষে একটা কথা বলেই শেষ করতে চাই, বাংলার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলো বুদ্ধদেব গুহ।

বাঙালিয়ানা

বাংলা ভাষার বয়স খুব বেশি নয়। গদ্য তো মাত্র সে-দিন ভূমিষ্ঠ হল। কিন্তু অল্প সময়ে দৌড়টা বড় কম দেয়নি। দুশো বছর পুরবার আগেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যে কয়েকজন কথা-সাহিত্যিক নিজেদের প্রমাণ করে গেছেন।

আমি ভাবি, সাহিত্য ছাড়া বাঙালির আর আছেটা কী? ভাষা ছাড়াই বাঙালির আর কোনও আইডেন্টিটি আছে? তাও পয়সাওলা-বাঙালি, সাহেব-বাঙালি, প্রবাসী-বাঙালি এবং ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া বাঙালি এবং তস্য পুত্র-পৌত্রাদি এ ভাষায় কথা বলতে বেশ সঙ্কোচ বোধ করে। তাদের আমার মাইকেল মধুসূদনের গল্প শোনাতে ইচ্ছে করে। তারা যে মাইকেল মধুসূদনের শ্রীমধুসূদন হয়ে ওঠার গল্পটা জানে না তা হয়তো নয়। তবু মাঝে-মাঝে মনে করিয়ে দেওয়াটা বোধহয় দরকার।

ব্যবসা-বাণিজ্য, নাটক-সিনেমা-সিরিয়াল, রাজনীতি, শিল্পকর্মাদি—কোনও দিকেই বাঙালির দিগ্বিজয় নেই। তার ফুটবলও যায়-যায়। এক সময়ে বিজ্ঞানে বাঙালির কিছু নাম-ডাক ছিল। এখন আর সেই ব্যাপারেও বাঙালির নাম নেই। সাহিত্যের পিদিম আজও টিমটিম করে জ্বলছে। তাও উচ্চ সমাজের বাঙালি নাক সিঁটকে থাকে।

এ-কথা ঠিক, বিশাল ভারতবর্ষে বাংলা একটা প্রাদেশিক ভাষা মাত্র। হিন্দিভাষীদের তুলনায় সংখ্যালঘু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারের সুবাদেই হোক আর শরৎচন্দ্রের বিশাল জনপ্রিয়তার দরুণই হোক, আজও বাংলা সাহিত্যকে কিছুটা খাতির ভারতবর্ষের লোক করে থাকে। হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়ার অনেক বুদ্ধিজীবীও বাংলা সাহিত্যের খবর রাখেন, অনেকে ভাষাটা জানেনও। দিল্লির সাহিত্য আকাদেমির একটি সভায় অনেক হিন্দিভাষী সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আমার সঙ্গে সুবোধ্য বাংলায় কথা বলে চমকে দিয়েছিলেন।

এ-কথা ঠিক, ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি নয়। তুলনায় ইংরেজি অনেক বেশি প্রসারিত ভাষা। একটা শব্দের অজস্র প্রতিশব্দ ইংরেজিতে আছে, বাংলায় তত নেই। ইংরেজি ভাষা অতিশয় চোর ভাষা। দুনিয়ার যাবতীয় ভাষা থেকে নিত্যই তার অপহরণের কাজ চলে নিঃশব্দে। তাদের বাছবিচার বিশেষ নেই। বাংলা ভাষাতেও বিদেশি শব্দ বড় কম ঢোকেনি। তবু তার একটা সীমাবদ্ধতা আছে, আত্মীকরণের অভাব আছে।

অস্বীকার করে লাভ নেই, ইংরেজ না এলে বাংলা গদ্যের জন্ম ও অগ্রগতি আরও অনেক বিলম্বিত হত। বাংলা গদ্য জন্মাল ইংরেজের প্রয়োজনে এবং ইংরেজির হাত ধরেই শুরু হল তার চলা। ও-রকম সমৃদ্ধ একটা ভাষার সহায়তা না পেলে গত দুশো বছরে বাংলা গদ্য শৈশব-যৌবন পেরিয়ে পরিণত হয়ে উঠত কি

না সন্দেহ। আর অবশ্যই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, প্যারীচাঁদ, রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িকদের প্রতিভা ও প্রচেষ্টার সুবাতাসই এ ভাষার পালে ঝড়ের হাওয়ার বেগ এনে দিয়েছিল।

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নানা কারণেই বাঙালি আজ ভারতবর্ষের খুব-একটা পণ্ডিত মানবগোষ্ঠী নয়। নিতান্ত বাঙালি বলেই তাকে অন্যত্র কিছু অবহেলা বা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়।

কিন্তু বাঙালির একটা মস্ত গুণ, আজও অধিকাংশ বাঙালিই প্রাদেশিকতায় আক্রান্ত নয়। ভাষা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি কখনও মারমুখো হয়নি, প্ররোচনা থাকলেও নয়।

কথা হল, এ ভাষা কতদূর জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল? কতদূর কেজো এবং সম্মানীয়? এ ভাষা কতদূর সম্প্রসারণশীল? এর ভবিষ্যৎই বা কী?

যদি ঘটনাক্রমে বাংলাদেশের সৃষ্টি না হত, তা হলে পশ্চিমবঙ্গে আমরা এবং পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিরা একটা সঙ্কুচিত অস্তিত্ব নিয়েই বাস করতাম। কিন্তু বাংলাদেশ একটি আদ্যন্ত বাংলা ভাষাভাষী দেশ হয়ে ওঠায় অন্তত সে-দেশে একটা প্রাণবন্যার সিঞ্চন এই ভাষাটির মূলে লেগেছে। লক্ষ্য করছি, ইতিমধ্যেই সে-দেশের বাংলা ভাষা একটা চাল ও চরিত্র অর্জন করেছে। স্মার্টনেস কথাটা ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না জানি না, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যে-সব চিঠি পাই বা পত্রপত্রিকা, তাতে দেখি ভাষাটিকে তারা একটা ছিমছাম রূপ দিয়েছে। অনেক ক্রিয়াপদ উহ্য রেখে, অনেক অমিল শব্দকে মিলিয়ে সেই স্মার্টনেস। আর বাংলাদেশের কল্যাণেই ভাষাটা সারা পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত। ভাষাটির এই সম্মান আমাদের গর্বিত করে।

বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের তরুণেরা কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাখে না। তাদের একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে মাত্র। কিন্তু তারা এটা জানে, তাদের দেশ বাঙালির দেশ। আদ্যন্ত বাঙালির দেশ। ভাষার জন্য আমরা সেই লড়াইটা করিনি, যেটা তারা করেছে। ইদানীং ধর্ম বাংলাদেশের নিয়ামক হয়ে উঠলেও রাষ্ট্রোদ্ভাবের মূলে আছে বাংলা ভাষার প্রতি তাদের আপসহীন টান বা ভালবাসা।

বোধহয় সেই জন্যই লন্ডন বা নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশিরা, এমনকি তাদের নতুন প্রজন্মের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া তরুণেরাও ভাষাটাকে ভুলে যায় না। কারণ ভাষা তাদের কাছে মস্ত ব্যাপার।

বিদেশে বসবাসকারী বাঙালি শিশুদের কাছে ব্যাপারটা তা নয়। শুধু বিদেশ কেন, এ-দেশে এই কলকাতাতেই কত ইংলিশ-মিডিয়ামে পড়ুয়া ইংরেজি বলতে-বলতে দিগ্ব দিকশূন্য হয়ে যায়। ভুলেই যায় যে তারা লন্ডন বা নিউ ইয়র্কে নেই এবং ইংরেজিতে কথা বলে তারা কিছু কৃতিত্ব প্রদর্শন করছে না, বরং প্রকট করছে মানসিক দৈন্য ও কাঙালপনা। দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করলে যা হয়।

মাতৃভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে—এ-কথাটা যিনি উচ্চারণ করেছেন ভাষা-বাবদ তাঁকে জীবনে কম মূল্য দিতে হয়নি। ঠেকে শিখেছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

এক অধ্যাপক-বন্ধুর বাড়িতে এক দুপুরে গিয়ে দেখি, তিনি তাঁর সুন্দরী ছাত্রীর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলছেন। মেয়েটি অবাঙালি ভেবে আমি চুপ করে ছিলাম। একটু বাদে অধ্যাপক-বন্ধু ইংরেজিতেই যখন পরিচয় করিয়ে দিলেন, তখন বাঙালি নাম শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি বাঙালি নাকি?

উনি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ।

আমি কাঠ বাঙালের মতো বলে ফেললাম, তা হলে ইংরেজি বলছেন কেন? অধ্যাপক-বন্ধু তাড়াতাড়ি বললেন, আসলে ও তো এ-দেশে ছিল না, তাই। আমি মেয়েটিকে বললাম, ও। কোথায় ছিলেন, আমেরিকা? মেয়েটি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, না, দার্জিলিং!

আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বললাম, আপনি কি জানেন না যে দার্জিলিংও পশ্চিমবঙ্গে? শুধু তা-ই নয়, দার্জিলিঙের গোর্খারা চমৎকার বাংলা বোঝে, অনেকে বলতেও পারে।

আমি জানি, মেয়েটিকে অত লজ্জা দেওয়া আমার ঠিক হয়নি। তবে এর পর ঘণ্টাটাক মেয়েটি দিব্যি ঝরঝরে বাংলায় কথা বলে গেল।

আমি আমার বন্ধুটিকে পরে বলেছি, বাংলা যাদের মাতৃভাষা, তারা যখন নিজের বাঙালিত্বের ওপর ইংরেজিকে ঢাকনা হিসেবে ব্যবহার করে, তখন তারা কিন্তু খুবই সন্দেহজনক মানুষ। তারা দুর্বলচিত্ত, তরলমতি, অগভীর এবং বোকা। অধ্যাপক-বন্ধুটি প্রতিবাদ করেননি।

মার্কিন দেশে অভিবাসী বাঙালিদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মার্কিন কৃষ্টি ঢুকবে, এটা বেশি কথা নয়। নিউ জার্সিতে বঙ্গ সম্মেলনে গিয়ে সে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। একের পর এক তরুণ-তরুণী মঞ্চে উঠে সরবে তীব্রভাবে তাদের ওপর বাঙালিয়ানা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ করছে। দর্শকাসন থেকে ছেলেমেয়েদের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তাদের মা-বাবা। এই বাদানুবাদ থেকে প্রকট হয়েছে দুই প্রজন্ম ও দুই কৃষ্টির ব্যবধান। করুণ পরিস্থিতি, বাঙালি তার মাতৃভাষা ভোলে, কিন্তু গুজরাটি ভোলে না, পাঞ্জাবি ভোলে না, ভোলে না দক্ষিণ ভারতীয়; বাঙালি কেন ভোলে? বিশেষ করে হিন্দু বাঙালি? সেটা তার এলানো স্বভাবের দোষ, অনুকরণপ্রিয়তার দোষ, দুর্বলচিত্ততার দোষ। তাঁদের প্রশ্ন, কীভাবে ফেরাব ছেলেমেয়েদের? ওরা যে মার্কিন হয়ে যাচ্ছে! আমি বলেছি দেরি করে ফেলেছেন, এখন থেকে সাবধান হোন। ছেলেমেয়েদের শেখাবেন, বাইরে যা শিখছ শেখ, যখন ঘরে ফিরবে তখন পা মোছার মতোই ইংরেজি বোলচাল আর কালচারকে মুছে ফেলে ঢুকবে। বাংলা ছাড়া অন্য কথা চলবে না বাড়িতে।

বিদেশের বাঙালিদের তবু মনস্তাপ আছে। পশ্চিমবঙ্গে তা নেই। এমনিতেই উচ্চবিত্ত বাঙালিরা আর বাঙালি থাকতে চায় না। তারা যখন ক্লাবেটাবে যায়, ককটেল পার্টিতে জড় হয়—এই কলকাতাতেই—তখন দেখবেন সাহেব হওয়ার কী প্রাণান্তকর চেষ্টা! ইংরেজ চলে গেছে অর্ধ শতাব্দী হতে চলল—তারপর ইংরেজিয়ানার ভূত যেন আমাদের ঘাড়ে সিন্ধুবাদের সেই নাছোড় বুড়োর মতো চেপে বসে আছে। এ যে কী ধাষ্টামো তা বলার নয়।

বাঙালি যদি তার মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, তা হলে তার অধোগতি অনিবার্য। সে হবে না-ঘরকা, না-ঘাটকা। তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে না, থাকবে না ঐতিহ্যের গৌরব—যা একজন জুলু বা জাম্বিয়ানেরও আছে। বাঙালির ঘাড় থেকে ইংরেজির ভূত যত তাড়াতাড়ি নামে ততই ভালো।

কেন লিখি?

কেন যে লিখি তার জবাবদিহি করতে বসলে অনেক কথা। লেখক টেখক হবো বলে তেমন কিছু ভাবিনি তো ছেলেবেলায়। তখন কত কী হওয়ার ইচ্ছে হত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ভবঘুরে, খেলোয়াড়। তবে আমার পরিবারটি পড়ুয়া। আমারও ছেলেবেলা থেকে বই পড়ার নেশা ছিল। বঙ্কিমের লেখা পড়েই লেখালেখির ইচ্ছে হত মাঝে মাঝে। গোপনে গোপনে তাই কিছু কিছু গদ্য বা পদ্য লিখে রাখতাম খাতায়। তা সে ওরকম অনেকেই লেখে। সাহিত্যিক-কবি হওয়ার জন্য নয়, এমনিই খেয়ালখুশির লেখা।

তারপর লেখালেখি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন বি.এ. পড়ি, হোস্টেলে থাকি, ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। তিন চার বছর লেখালেখি করার কথা ভাবিওনি তখন। যখন এম.এ. পড়ি তখন তৎকালীন এক বন্ধুর লেখা মাঝেমধ্যে 'দেশ' পত্রিকায় বেরোয় বলে একটু উজ্জীবিত হয়ে ফের লিখতে উৎসাহ পাই। কিন্তু তেমন সুবিধে হচ্ছিল না, ধরেই নিয়েছিলাম কোনও স্কুল বা খুব বেশি হলে কোন কলেজে শিক্ষাকতার একটা চাকরি হয়তো জুটবে। তার বেশি স্বপ্ন না দেখাই ভাল। আমি যে একটু আধটু লিখতে পারি, সেটাই তখন বিশ্বাস হচ্ছিল না, আত্মবিশ্বাস বড্ড মার খেয়ে গিয়েছিল। নিজেকে বড্ড 'হেরো মানুষ' মনে হত।

কিন্তু ওই দুঃসময়েই হঠাৎ 'দেশ' পত্রিকায় জমা দেওয়া একটা গল্প প্রকাশিত হয়ে গেল। সেটা চমক এবং উল্লাস। তার পর থেকে আমাকে আর লেখা প্রকাশের জন্য আয়াস করতে হয়নি। 'দেশ' কর্ত,পক্ষ যেন আমাকে কোলে তুলে নিলেন।

আমি বলতে চাই যে, হ্যাঁ, আত্মপ্রকাশের একটা তাগিদ তো ছিলই, ছিল আমার কথা সকলকে জানানোর জন্মগত মানবিক ইচ্ছা। অর্থ বা যশের কথা তেমন ভাবিনি, শুধু জগতের সঙ্গে একটা সংযোগের সূত্র খুঁজেছি। লেখা আমার বাড়িয়ে দেওয়ার হাত, তাতে স্পর্শের ক্ষুধা।

'পথের পাঁচালী'-ই সেই উপন্যাস!

'যে বই লিখতে পারলে আমি বর্তে যেতাম'—এই প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলা যেতে পারে, কারণ বিশ্বসাহিত্যে মণিমুক্তোর তো অভাব নেই। কিন্তু আমি আমার মাতৃভাষার বহুপরিচিত একটি বই-এর কথা বলছি। সেই বইটি হচ্ছে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'। 'পথের পাঁচালী' পড়তে-পড়তে, অপুর মধ্যে আমি নিজের সত্তাকে খুঁজে পাই। অর্থাৎ অপুর সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে যাই। আমার মনে হয় 'পথের পাঁচালী'র অপু এমন একটা চরিত্র, যার সঙ্গে কি শহুরে, কি গেঁয়ো যে কোনও বালকই একাত্ম হয়ে যেতে পারে। অপুর আবেদন বিশ্বজনীন।

আর দ্বিতীয় কথা হল, অপুর ভেতর দিয়ে আমরা এক রূপের জগতে পরিক্রমণ করে আসি। সেই অভিজ্ঞতার কোনও তুলনা বাংলা সাহিত্যে নেই, বিশ্ব সাহিত্যেও খুব কম আছে। 'পথের পাঁচালী'র মজাই হচ্ছে এই যে এটি খুব ঘটনাবহুল নয়। একটা ঘটনা ঘটিয়ে তার নানা সংযোগ তৈরি করে যে উপন্যাস লেখা হয়। তাতে এক ধরনের কৃত্রিমতা থাকে। 'পথের পাঁচালী এই ধরনের কৃত্রিমতা মুক্ত। এখানে রয়েছে কিছুটা ছেড়ে ছেড়ে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কতগুলো বর্ণনা রয়েছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল এর ভাষার ভেতর দিয়ে ছাপিয়ে ওঠা অন্তর্লীন কবিত্ব। তার কোনও তুলনা নেই।

'পথের পাঁচালী'-র ভেতর অনেক মানুষ আছে। কিন্তু তারা ঘটনাসূত্রে আসেনি। তারা এসেছে গেছে কিছুটা নির্বিকারভাবে।

তাদের যেন একটা অন্য চোখ দিয়ে দেখা হয়েছে। স্বপ্নের মতো ছায়া ছায়া তাদের বিচরণ। কোনও সংঘর্ষের সূত্রে তারা পরস্পরের মুখোমুখি হয় না। কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই পরস্পরের মধ্যে।

দারিদ্র আছে, অভাব আছে, কুটিলতা আছে, জটিলতা আছে, কিন্তু সবকিছুকে যেন স্বপ্নেই নরম সৌন্দর্যবোধ দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে। আরও একটা মজার ব্যাপার হলো এই উপন্যাস গ্রামীণ পটভূমিতে হলেও কোথাও কিন্তু সাপের কোনও উল্লেখ নেই। সিনেমাতে একবার দেখানো হলেও, আমি খুব খুঁজে দেখেছি উপন্যাসে কোথাও সাপ নেই। অথচ গ্রামীণ পরিবেশের খাতিরে সাপ থাকাটা খুব স্বাভাবিক ছিল। আসলে সাপ একটা বীভৎসতার প্রতীক। তাই সাপকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন বিভূতিভূষণ।

এক টুকরো ঘটনার কথা বলছি। মনে পড়ছে ডাইনি এপিসোড-এর কথা। সে ভারি ডাইনি বুড়ি বলে সবাই তাকে এড়িয়ে যায়।

অপু তাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠল তখন ডাইনি বুড়ি বলছে খোকাটি কাদের বাড়ির? সুন্দর খোকাটি আমাকে দেখে কেন ভয় পেল?' মনটা কেঁদে ওঠে, ভিজে ওঠে।

ওরই মধ্যে হরিহর, সর্বজয়া, দুর্গা এই তিনজনকে খুব চেনা বলে মনে হয়। অথচ এই পরিবেশে কিন্তু আমি কোনওদিনই থাকিনি বা বড় হয়ে উঠেনি। এইখানেই বিভূতিভূষণের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। চরিত্রগুলো আমার চেনা কেউ নয়, অথচ মনে হয় যেন বহুদিনের পরিচিত। অপুর বাবার মধ্যে আমার বাবার, অপুর মায়ের মধ্যে আমার মায়ের ছায়া দেখতে পাই। এর চেয়ে বড়ো সাফল্য একজন লেখকের আর হতে পারে না। 'পথের পাঁচালী'র মতো কিছু লিখতে পারলে আর কোনও কিছু লেখারই প্রয়োজন হতো না।

ব্যোমকেশ ছিলেন আদ্যন্ত বাঙালি গোয়েন্দা

আমি ছেলেবেলা থেকে গোয়েন্দা কাহিনীর ভক্ত। বাঙালি এবং ইংরেজ কোনও গল্পের গোয়েন্দাই আমার অচেনা নয়। এক সময়ে সেই ছেলেবেলাতেই ঠিক করে ফেলেছিলাম বড় হলে ডিটেকটিভ হব। মুশকিল হল যাঁদের গল্প পড়ে আমাদের রোমাঞ্চ হয়, তাঁরা বাস্তবিকই গল্পের গোয়েন্দা। সত্যিকারের গোয়েন্দা হওয়ার সম্ভাবনা তাঁদের নেই। শখের গোয়েন্দা বা বেসরকারি গোয়েন্দারা কখনওই খুন বা ফৌজদারি কোনও বিষয়ে নাক গলাতেই পারেন না। ওটা সরকারি পুলিশের এক্তিয়ার। আর বেসরকারি গোয়ান্দা যাঁরা আছেন তাঁদর কাজ এতই অনুত্তেকজক এবং রোমাঞ্চহীন যে গল্পের ব্যোমকেশ বা ফেলুদা বা এরকুল পোয়ারো বা অন্য কারও সঙ্গে তুলনাই হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতটা গল্পের গোয়েন্দাদের বোঝার পক্ষে প্রয়োজনীয়। শরদিন্দুর ব্যোমকেশের সঙ্গে আমার পরিচয় আমার ইস্কুল জীবনে। ওঁর লেখায় এমন একটা প্রসাদগুণ আছে, তাঁর গল্প বলার ধরনটিও এত সুন্দর যে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সমস্ত মনোযোগ গ্রেফতার করে নেয়। আবার অন্য বিচারে শরদিন্দুর লেখার মধ্যে আমাদের পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা ভীষণভাবে উপেক্ষিত। তাতে অবশ্য তেমন কিছু ক্ষতি নেই, কারণ যে কোনও সাহিত্যেই শরদিন্দুর মতো লেখকেরও প্রয়োজন ভীষণভাবে আছে। আমি তো মন খারাপ হলে বা কিছুটা সময় ভালভাবে কাটানোর জন্য ইচ্ছে করেই শরদিন্দুর বই পড়ি। তাতে মনটা বেশ ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায়। ব্যোমকেশের চেহারা কেমন তা বাঙালি মাত্রই জানেন। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এই গোয়েন্দা বেশ রসিক লোক। একটু মোটাসোটা। তবে ব্যোমকেশ মাসকুলার নয়। কুংফু, ক্যারাটে জানে না। বন্দুক পিস্তল চালায় না। ঘুঁসোঘুঁসিতে তার সুনাম নেই। সে ধীর হলেও মারকুটে নয়। তবু বীরভক্ত বাঙালি তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। কেন করেছে তার জবাব আমি নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারি। সেটা হল বুদ্ধি, রসবোধ এবং রুচিশীলতা। সব মিলিয়ে ব্যোমকেশের মধ্যে একটা আদি বাঙালিয়ানা আছে। ডিডাকশন অর্থাৎ কার্য-কারণের সূত্র অনুধাবন করা, সূক্ষ্ম অনুমান-শক্তি এবং নানা বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞতা গোয়েন্দার প্রধান আয়ুধ।

ব্যোমকেশের মধ্যে সবই আছে, কিন্তু তাতে কোনও বিদেশি গল্প নেই, ছায়া নেই। শরদিন্দু অনেক সময়েই বিদেশি গল্প থেকে কাহিনীর আদল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেইসব গল্প আদ্যন্ত বাঙালিয়ানার আরকে সিক্ত। ব্যোমকেশের ধুতি বা পাঞ্জাবির ফাঁক দিয়ে কখনও পাতলুন বা টাই উঁকি মারেনি। আরও সাংঘাতিক কথা ব্যোমকেশের গল্প ফুরনোর অনেক আগেই লেখক তাকে সত্যবতীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। এবং তাদের একটি ছেলেও হয়েছে। দেশি-বিদেশি যত গোয়েন্দা কাহিনী আমি পড়েছি তাদের মধ্যে বিবাহিত গোয়েন্দার সংখ্যা খুবই কম। শরদিন্দু এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছেন।

যখন 'দুর্গরহস্য' পড়েছিলাম তখন এই গল্পের পরিবেশ রচনা, চরিত্রচিত্রণ, ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে রচিত প্লট আমাকে সম্মোহিত করেছে। গোয়ান্দা কাহিনী সাধারণত একবার পড়লেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয়বার পড়ার প্রয়োজন বা ইচ্ছে হয় না; কিন্তু 'দুর্গরহস্য' বা 'চিড়িয়াখানা' একাধিক বার পড়লে কিন্তু খারাপ লাগে না।

শার্লক হোমস থেকে শুরু করে সব গোয়েন্দারই একটা নীরব চিন্তার সময় আছে। যে সময়টায় তাঁরা টুকরো-টাকরা সূত্র, চরিত্র এবং ঘটনাকে জিগস' পাজল-এর মতো জোড়া দিতে দিতে গোটা ঘটনাকে সাজাতে চেষ্টা করেন। ব্যোমকেশের চরিত্রে এ জিনিসটা আছে। 'মাকড়সার রস' গল্পে ব্যোমকেশ রহস্যের কিনারা করার ভার অজিতের ওপর দিয়ে নিজে অন্য একটা কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অজিত তথ্যানুসন্ধানে নেমে অনেক সূত্র জড়ো করল বটে, কিন্তু সমাধানের ধারে কাছেও পৌঁছল না। ব্যোমকেশ শুধু অজিতের কাছে শুনে যেভাবে রহস্যের কিনারা করল তা যেমন মজার তেমনই ব্যোমকেশ চরিত্রটিকেও আমাদের অনেক প্রিয় করে তুলেছে। বোমকেশ অজিতকে খুবই ভালবাসত কিন্তু ডিডাকশনের ব্যাপারে যে অজিত খুব পোক্ত নয় এটা সে কখনও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়নি। আর অজিতকে নিয়ে ব্যোমকেশের যে নির্বিষ রসিকতা সেগুলো যে কোনও গোয়েন্দা কাহিনীর সম্পদ। কতগুলো জায়গায় ব্যোমকেশকে সেন্টিমেন্টাল, ভাবপ্রবণ, নৈতিকতা সম্পন্ন এবং স্বপ্নালু করে ফেলেছেন লেখক। 'বিষের ধোঁওয়া' নামে একটি গল্প আছে যাতে রহস্যের সমাধানের চেয়েও মানবিকতার দিককে অনেক বড় করে তোলা হয়েছে। ব্যোমকেশ এখানে ন্যায়দণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই।

হৃদয়বত্তা, রসবোধ, নির্ভীকতা, বন্ধুবৎসলতা সব মিলিয়ে ব্যোমকেশ গোয়েন্দা হয়েও আরও কিছু। আরও বেশি কিছু।

ব্যোমকেশের স্ত্রী সত্যবতী দেখতে সুন্দর ছিল না। একটি রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে সত্যবতীর চোখের জল ব্যোমকেশকে পেড়ে ফেলেছিল। তাদের মধ্যে অবশ্যই একটা রোম্যান্টিক প্রেমের ঘটনা ঘটেছিল, শরদিন্দু তা দেখাননি। ব্যোমকেশের এই প্রেম কি সহানুভূতিসঞ্জাত? কিন্তু সত্যবতী তেজি মেয়ে, সে সহানুভূতি বা দাক্ষিণ্যকে ভালবাসা বলে গ্রহণ করার পাত্রী নয়। হয়তো বা সত্যবতীর ব্যক্তিত্ব এবং শুচিতা কোনও-না-কোনও ভাবে আকর্ষণ করে থাকবে। ব্যোমকেশ-সত্যবতীর মধ্যে একটু আধটু খটাখটি হত। আর অজিতের সঙ্গে হত দুজনের খুনসুটি। সব মিলিয়ে ব্যোমকেশের পারিবারিক জীবনটি সাদামাটা হলেও আমাদের ওই সংসারটিতে ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসি। বাংলা গল্পের গোয়েন্দাদের মধ্যে কতকগুলো দিক দিয়ে ব্যোমকেশ কিন্তু অসাধারণ। এই অসাধারণত্ব আজ ব্যোমকেশকে তাঁর স্রষ্টার মতোই খ্যাতিমান করে তুলেছে। ব্যোমকেশ বলতে কে বা কাকে বোঝায় এটা কোনও শিক্ষিত বাঙালিকে শিখিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। সে বাংলা সাহিত্যে চিরজীবী।

সমাজ-চিন্তা

নারী স্বভাবতই এককচারিণী

'ব্রহ্ম'—অর্থাৎ বিস্তার। বিস্তারে গমনই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য কথাটার অর্থ অনেক প্রসারিত। অনেক কিছুই রয়েছে এর মধ্যে। এই বিধান প্রধানত পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের শাস্ত্রে নারীর ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্যের কোনও বিধান আছে কি না আমার জানা নেই। তবে এই ক্ষেত্রে সংকীর্ণ অর্থে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক অথবা দৈহিক সংসর্গ এই অর্থ ধরেই কথা বলছি।

একা মেয়েদের সবাইয়ের পটভূমিকা এক নয়, তাই তাঁদের সমস্যার চেহারাটাও বিভিন্ন। কেউ কুমারী, রূপ অথবা টাকার ঘাটতিতে বিয়ে হয়নি, এমন মেয়ে আমাদের দেশে খুব কম নয়। কেউ হয়তো স্বামী পরিত্যক্তা। আমাদের দেশের গরীব ঘরে, গ্রামের দিকে প্রচুর মেয়ে রয়েছেন যাঁদের অবস্থাটা এই রকম। বিবাহ বিচ্ছেদও হচ্ছে খুব বেশি সংখ্যায় অতএব একক নারীর সংখ্যাও বাড়ছে দিন দিন। নরনারীর বিজ্ঞান, যাকে আমরা যৌন বিজ্ঞান বলে জানি, সেখানে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, স্বভাবগত পুরুষ বহুগামী এবং নারী এককগামিনী। মেয়েদের মধ্যে একাধিক পুরুষের সাহচর্য লাভের প্রবণতা খুব কমই থাকে।

একা জীবনে নানান আত্মীয় পরিবৃত হয়ে থাকলেও একজন বিশেষ মানুষের পিপাসা সে কিছুতেই বর্জন করতে পারে না। বাগানে নানারকম গাছ থাকে তার মধ্যে কোনটা লতানে কোনটা শক্ত কাণ্ডের। যে গাছটা লতানে তার এই কোনও শক্ত কিছুকে জড়িয়ে ওঠাটা তার দুর্বলতা নয়, স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তেমনি প্রকৃতিগত দিক থেকে একজন মেয়ে চায় একজন পুরুষকে। সেই নিজস্ব মানুষকে ঘিরেই তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সকল স্বপ্ন রচনা। কোনও কারণে যখন তা ব্যর্থ হয় তখন যে সব সময় দ্বিতীয় পুরুষ খোঁজে তা নয়। এ-ব্যাপারে আগেই বলেছি নারী এককচারিণী। তবে আবার ওই প্রকৃ,তিগত দিক থেকে পুরুষকে আঁকড়ানোর প্রবৃ,ত্তি থেকে কিংবা নিছক দৈহিক প্রয়োজনেও যদি সে কোনও পুরুষকে গ্রহণ করে, ভ্রষ্টা হয়, তাকে আমি দোষ দিতে পারি না। তবে সেই পুরুষ তার জীবনে একমাত্র পুরুষ হবে।

ব্যভিচারী প্রবণতা সমর্থনযোগ্য নয়। সেই নারী সব সময়েই চাইবে সেই পুরুষকে জড়িয়ে ধরতে।

ঘুষ দেওয়া ও ঘুষ নেওয়া
নৈতিক বিচারে সমান অপরাধ

কিছুদিন আগে আমি দার্জিলিঙ মেলে একজন অতি অল্পবয়সী চেকারকে সদর্পে ঘুষ খেতে দেখেছিলাম। ছেলেটিকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল ও সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। এবং ঢুকেই যেভাবে ঘুষের রেট ঘোষণা করে লোকের থেকে টাকা নিচ্ছিল তা দেখে আমি মর্মাহত হয়েছিলাম। এত অল্পবয়সী ছেলে এভাবে ঘুষ খাচ্ছে—এটা আমাদের যুবসমাজের পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক মনে হয়েছিল। যদিও সেই ছেলেটির সঙ্গে আমাকেও আপোষ রফায় আসতে হয়েছিল। নইলে নিশুতি রাতে, মাঝপথে ট্রেন থেকে নেমে যেতে হতো। এই যে আপোষ রফায় আসা, এটা নিশ্চয়ই ঘুষ নেওয়ার মতোই সমতুল অপরাধ। তবু একটু তফাত আছে। ঘুষ যে নেয়, সে প্রত্যক্ষভাবে টাকাটা অর্জন করে। আর ঘুষ যে দেয়, সে পরোক্ষভাবে আদায় করে সুবিধে। কে কাকে 'করাপ্ট' করে এটা বলা মুশকিল। ঘুষখোর, ঘুষদাতার চরিত্র নষ্ট করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ঘুষদাতা নষ্ট করে ঘুষখোরের চরিত্র। অর্থাৎ এ ওকে ঘুষ দিতে এবং ও একে ঘুষ নিতে বাধ্য করে।

এ প্রশ্নের সঠিক সমাধান পাওয়া যাবে না। ডিম আগে, না মুরগি আগে—এরকমই এক চক্রাকার প্রশ্ন, যার সমাধান নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে। তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে। দুটো লাইন মনে আছে কারণ, ছেলেবেলায় এক মাস্টারমশায় দিনের পর দিন এ দুটো লাইন দিয়ে হাতের লেখা লেখাতেন। তখন অর্থ বুঝতাম না। কিন্তু পঙক্তিদ্বয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতো। আজ এই পঙক্তি দুটোর অর্থ আমি বুঝি। আর এ-ও বুঝি, এই রকম আরও কত ভালো কথা আছে যার গুরুত্ব আর এখনকার সমাজে একেবারেই নেই। এদেশে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে দুর্নীতি এত ব্যাপক আর গভীর, এত প্রকট ও প্রকাশ্য, যে অনেক সময় মনে হয়, এদেশ চালাচ্ছে বিকল্প সরকার। ঘুষখোর চেকার, ঘুষখোর কেরানি, ঘুষখোর পুলিশ, ঘুষখোর অফিসার, ঘুষখোর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার—এরা সবাই মিলে একটি সমান্তর সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের আইন আলাদা, জগৎ আলাদা। আমরা ঘুষ দেওয়া ও নেওয়াকে সমান অপছন্দ করি কিন্তু এ-ও জানি ঘুষ না দিলে কোনও কাজই হবে না। আমার চেনা একটি ছেলে, কিছুদিন আগে, পূর্ববাংলা থেকে চলে এসেছিল। তার দাদা মাত্র দশটি টাকা দিতে চায়নি বলে সেই ছেলেটি ভারতীয় নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এবং পরে বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচ করেও এ দেশের নাগরিকত্ব সে আর পেল না। এইসব দেখে মাঝে মাঝে এ-দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভারি হতাশা আসে।

'ইউ বিগিন বাই কিলিং আ ক্যাট, ইউ এন্ড বাই আ টাইগার। এ কথার ভেতরে একটি আদিম শব্দ। খুব সূক্ষ্মভাবেও যদি আমরা অন্যায় বোধ করি বা দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়ি, অথবা নৈতিকতা থেকে ভ্রষ্ট হই, তবে আমাদের অভ্যন্তরস্থ শয়তান আরমোড়া ভেঙে হাই তুলে বসে। একটু দিয়ে শুরু হয়। কিন্তু তার পরে পতন হতে থাকে অবারিত।

নৈতিকতার নির্দিষ্ট কোনো ডিগ্রি নেই। বাসের টিকিট ফাঁকি দিয়ে দশ পয়সার দুর্নীতি হয় আর বৃহত্তর অপরাধে কোটি টাকার হয়। এরকম ভাগ-বাটোয়ারা মানুষ দুর্নীতির ক্ষেত্রেও নেমে গেছে এবং এভাবেই ব্যাপারটা নেওয়া উচিত যে যতই সামান্য হোক না কেন, তাকে কিছুতেই হালকাভাবে নেওয়া যাবে না।

এক বন্ধু একবার আমাকে বলেছিল যে দেখ কোনো লোক হয়তো দশ টাকা ঘুষ খায় না, সে হয়তো একশো-হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষের প্রলোভন রোধ করতে পারে। কিন্তু তারও একটা ব্রেকিং পয়েন্ট আছে। হয়তো দশ হাজার, হয়তো দশ লাখ, এতে তার নৈতিক অবরোধ ভেঙে যায়। এবং ঘুষের কাছে পরাজিত হয় বিবেক।

আমাদের তাই 'বাই ডিগ্রী বিচার করে দেখতে হয় এর মধ্যেও কিছু সত্যতা আছে কিনা। তবে প্রলুব্ধ হন না, কিছুতেই ভাঙেন না—এমন কিছু মানুষ এখনো আছেন বলেই চন্দ্র-সূর্য উঠছে।

বাঙালি-জীবনটাই হিউমারাস!

বাঙালি জীবনে 'হিউমার' বা রঙ্গরসিকতা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তার কারণ বাঙালি মূলত আড্ডাবাজ জাত। খানিকটা কর্মবিমুখ একটু অলস। অলস লোকেদের কিছু জিনিস তীক্ষ্মধার হয়ে ওঠে, যেমন তার ভাষা, যেমন তার এক্সপ্রেশন।

এগুলোর ওপরেই তার মনোযোগ এবং চর্চা। এ-কারণে যাঁরা রকে বসে আড্ডা মারেন তাঁরাও এমন সব রসিকতা করেন যার মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধির ছাপ আছে। এই বুদ্ধিটা হয়তো যথাস্থানে প্রয়োগ করলে তাঁর জীবনের একটা কিছু হিল্লে হয়ে যেত! এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। আমাদের চারপাশে যে-বহমান জীবন, যে-বাঙালি জীবনযাত্রা, তার পথে ঘাটে, ঘরে সংসারে এই বঙ্গরসিকতার প্রকাশ আমরা ভালোই দেখতে পাই।

আমি নিজেও হয়তো একটু চিন্তাভাবনায় ব্যস্ত থাকি বা অনেক সময় অনেক সমস্যায় উদ্ব্যস্ত থাকি, তা সত্ত্বেও আমি আমার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যখন আড্ডা মারি তখন লক্ষ করি যে আমরা সবাই লঘু কথাবার্তা বা রঙ্গ-রসিকতা পছন্দ করি। আমার ছেলেমেয়ে অনেক ছোট, আমার ছেলে তো নিতান্তই শিশু। তাদের সঙ্গেও রঙ্গরসিকতা করতে আমি ছাড়ি না। আমি আদ্যন্ত বাঙালি বলেই এটা আমার স্বভাবজ ব্যাপার বলে আমার মনে হয়। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও হিউমারের অতি ধনী ঐতিহ্য আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিদ্যাসাগর—এঁরা একেবারে প্রাথমিক যুগের সাহিত্যিক। বাংলা ভাষা তখনও ভালো করে তৈরিই হয়নি। কিন্তু আমরা লক্ষ করি তারমধ্যেও বাঙালির সদাপ্রসন্ন জীবনমুখী হাস্যরস এবং অত্যন্ত জাগ্রত হিউমারবোধ। রসিকতা বা ভয়াবহ হাসিঠাট্টার সঙ্গে হিউমারের একটা তফাত আছে। বিশেষ করে সাহিত্যে আমরা 'হিউমার'-কে আলাদা একটা গুরুত্ব দিই। তার কারণ হিউমার শুধু হাস্যরসাত্মক ব্যাপারই নয়, হিউমার মানে সরস মনোভঙ্গি। একটা মানসিকতা। আমাদের জীবনকে দেখার যে-অভ্যাস তার মধ্যেই যদি হিউমারের মূল শিকড় না থাকে তাহলে কিন্তু আমার দেখার ভঙ্গির মধ্যে বা প্রকারান্তরে প্রকাশ ভঙ্গির মধ্যে এই হিউমার আসবে না। একটা মোটা মানুষ রাস্তায় হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। এটা অসঙ্গতি। এর থেকে হাস্যরসাত্বক একটা ব্যাপার হয় ঠিকই। এটা হিউমার নয়। হিউমার হল অন্য জিনিস। এর মধ্যে একটা মানুষের অপ্রস্তুত অবস্থা থাকতে পারে, সামান্য আঘাত থাকতে পারে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এক্সপ্রেশন তার প্রকাশ ভঙ্গি। বাঙালি খেতে খুব ভালবাসে। এটা নিয়ে রঙ্গরসিকতা হয়। বাঙালির বিয়েতেও নানা আচার। তা নিয়েও রঙ্গরসিকতার অভাব নেই। বাঙালিবাবু সমাজ, তাদের ভয়-ভীতি-কর্মবিমুখতা-স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদিতে নিরন্তর রঙ্গরসিকতার সাপ্লাই দিয়ে এসেছে। এর প্রতিটিতেই হিউমারের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে মজুত। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বাপ-ব্যাটার সম্পর্ক—এর মধ্যেও এই উপাদান যথেষ্ট। আমাদের সমাজে কত রকমের অন্যায় আছে, অবিচার আছে তার মধ্যেও রয়েছে হিউমারের এলিমেন্টস। আমাদের জীবন তো ছন্নছাড়া, ডিসিপ্লিনড নয়, উদ্দেশ্যহীন, আমরা কী হতে চাই জানি না—এইসব কিছু মিলিয়ে বাঙালি জীবনকে কিছুটা বিশৃঙ্খল বলা যেতে পারে। ধরা যাক দুটি মানুষের মধ্যে কাজের কথা হচ্ছে। এটি

যদি আমেরিকা হত তাহলে কাজের কথা ছাড়া আর কথাই হত না। কেন না নষ্ট করার মতো সময় তাদের নেই। কিন্তু দুই বাঙালি শুরুই করবে, 'আরে আসুন, আসুন। কী ব্যাপার'—ইত্যাদি দিয়ে। এক মিনিটের কাজের কথাটাকে তারা টেনে নিয়ে যাবে এক ঘণ্টায়। এই অনেক কথাতেই চলে আসে হিউমার। আমার এক বন্ধু। নামটা করছি না, শুধু এ-টুকু বলছি সে গলা বেচে খায়। সে একবার একটা কার্ফুতে পড়ে গিয়েছিল। গলি দিয়ে-গলি দিয়ে সে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎই গলি দিয়ে সে সবে একটা বড় রাস্তায় উঠতে যাবে সেই সময়ে এক সার্জেন্ট এসে তাকে চেপে ধরেছে, সেই মুহূর্তে ভয়ে তার এমন অবস্থা যে সে কোথায় থাকে বেমালুম ভুলে গেল। সার্জেন্ট যত বলে, ঠিকানা বলুন সে-কিছুই মনে করে বলতে পারে না। সে কেবলই বলতে থাকে, 'এইখানে' যাব। সার্জেন্ট যখন নাম জিজ্ঞেস করল, তখন সে নিজের নামটাও ভুলে গেছে। এটা ১৯৪৭-এর ঘটনা। তখন এমন ব্যাপার বাঙালি জীবনে প্রায়ই ঘটেছে প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনে। এ নিয়ে হিউমার তৈরি হতেই পারে।

আর একটা গল্প বলি। একটি মেয়ে এসেছে এক বিখ্যাত লেখকের কাছে। মেয়েটি লেখকটিকে উদ্দেশ্য করে হঠাৎই বলল, 'আপনার একটা চুল পেকে গেছে যে সব্বোনাশ কী হবে?' ভাবটা এমন যেন সাংঘাতিক একটা ওলট-পালট কিছু হয়ে গেছে। আমি মন দিয়ে কাজ করছিলাম। মেয়েটির হাহাকার শুনে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'একটা শোকসভা করলে কেমন হয়' মেয়েটি আমার মন্তব্য শুনে বলল, 'ছিঃ, আপনি নাকি লেগপুল করেন।' আসলে এভাবে 'হিউমার' করাটা বাঙালি জীবনে অহরহই ঘটে যায়।

বাঙালি জীবনে হিউমারের উপাদান এত বেশি রয়েছে যে বাঙালি জীবনটাকেই আমার মাঝে-মাঝে হিউমার মনে হয়।

দেহবর্জিত ভাববাদী,

রোম্যান্টিক প্রেম নিশ্চয়ই আছে

নরনারীর প্রেম বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেহকে অস্বীকার করে ঘটে না। কিন্তু তাহলেও শরীরবিহীন প্রেম সম্ভব। যেমন বয়ঃসন্ধির প্রেম। বয়ঃসন্ধির প্রেমে কিন্তু শরীরের ভূমিকাটা গৌণ। এটা নিজের জীবন অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। বয়ঃসন্ধির সময়, যখন ধীরে ধীরে জগৎ-সংসার, বিশেষ করে মেয়েদের বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছি আমরা, তখন মেয়েদের ঠিক শরীরগত ভাবে পাওয়ার তেমন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কিন্তু মুগ্ধতা থাকে, ভাললাগা থাকে। কোনও একটি মেয়েকে ভাল লাগলে, তার কাছে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করার ইচ্ছে থাকে। এই রোম্যান্টিক প্রেমে শরীরের ভূমিকা খুব কম।

কিন্তু পরবর্তীকালে যখন মানুষের বয়স বাড়ে এই রোম্যান্টিক অনুভূতিগুলো কমে যেতে থাকে। জীবনের কঠিন সত্যগুলো এসে দাঁড়ায় তার সামনে। তখন ধীরে প্রেমের রোম্যান্টিক দিকটা আবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে। তবে অনেকে থাকেন জন্ম-রোম্যান্টিক। অতএব এই ভাবনাটা তাঁদের থেকেই যায়। অতএব বয়ঃসন্ধির প্রেমে আবেগ অনুভূতিটাই প্রাথমিক সেখানে শরীরটা গৌণ।

অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি কেউ হয়তো কোনও মেয়েকে ভালবেসে, তাকে না পেয়ে সারা জীবন বিয়ে না করেই থেকে গেল। এই ক্ষেত্রে সেই মেয়েটির শরীর নয়, সেই মানুষটিই তার আকর্ষণের বস্তু। এইরকম শরীর-বিহীন প্রেম যেমন জীবনে ঘটে, তেমনই আমাদের কাব্যে-সাহিত্যে ছড়ানো রয়েছে এর অজস্র উদাহরণ।

আগেই বলেছি অল্প বয়সে দেহহীন প্রেম হতেই পারে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শরীরের প্রবেশ ঘটে প্রেমের এলাকায়। অবশ্য এটা খুব অস্বাভাবিক নয়। এর কারণ নরনারীর প্রেমে প্রকৃতির একটা স্বার্থ থাকে। সেটা হলো বংশবৃদ্ধি। প্রেম হলো, কি হলো না এটা প্রকৃতির জ্ঞাতব্য বিষয় নয়। তার প্রয়োজন বংশবৃদ্ধির। তাই বেশির ভাগ প্রেমেই দেহগত ভূমিকা থাকে। আমি মনে করি দেহ একটা মস্তো বড় কথা। তবুও দেহগত পিপাসা হয়তো অনেক মেয়েকে দিয়েই মেটানো যায়। কিন্তু প্রেম বা মোহ হয় একটি মাত্র মেয়েরই ওপরে। এখানে দেহগত আকর্ষণ থাকলেও সেটা প্রাথমিক নয়।

ইচ্ছে করলেই দেহটা বাদ দেওয়া যাবে। হয়তো একটি মেয়ে আমার দিকে তাকালেই আমার বাসনা পূর্ণ হয়ে উঠে। বা সে আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেই আমি অনেক কিছু পেয়ে যেতে পারি। আমি তাকে দেহগত ভাবে চাই না। এও তো প্রেম।

দান্তের রচনাতেও তো আমরা দেখছি, সেই যে বিয়েবাড়িতে একবার দেখা। সেই কয়েক মূহূর্তের দেখা, হয়ে গেল চিরন্তন মহাকাব্যের বিষয়। ওই মেয়েটিকে দান্তে কখনই শরীরী ভাবে পেতে চাননি।

যাকে ভালবাসি, তার কাছ থেকে প্রাথমিক ও একমাত্র চাওয়া শরীর নয় বলেই দেহবর্জিত প্রেম সম্ভব। এইরকম ঘটনা নিশ্চয়ই সম্ভব যে দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে সারাজীবনই হয়তো কোনও শারীরিক সম্পর্ক ঘটল না। অথচ একে অন্যকে ভালবেসেই কাটিয়ে দিল বাকি জীবনটা। কোনও মেয়েকে আমি চাইছি, কিন্তু দেহগত ভাবে নয়, সে আমার মনের দোসর। এটাও একান্ত বাস্তব ঘটনা। এ এক ভাববাদী, রোম্যান্টিক প্রেম।

আজকাল ছেলেমেয়েদের কাছে হয়তো এই প্রেমের স্বরূপ ব্যক্ত করা একটু শক্ত। কারণ ওদের 'তুই-তোকারি' সম্পর্কের মধ্যে রোম্যান্টিক অনুভূতির আনাগোনা বড় কম।

মানস-ভ্রমণ

উদযাপনের ছুতো খুঁজি

বেঁচে থাকার একঘেয়েমি কাটাতে আমরা এমন সব উপলক্ষ ও ছুতো খুঁজি যা আমাদের উদযাপনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

মহাকালের তুলনায় একটা দিন কি একটা বছরের যাওয়া-আসা বড় কোনও ব্যাপারই নয়। বরং অতি তুচ্ছ আর নগণ্যই বলা যায়। 'নতুন বছর' মানে ক্যালেন্ডারের পাতায় অদলবদল ঘটল। এইমাত্র। নতুন বছর মানে যে নতুন সূর্য উঠবে, তা নয় একেবারেই। এটা আমরা সবাই জানিও। তারপরেও কেন তবে 'নতুন'-এর সন্ধানে উদগ্রীব হই? আসলে আমরা নবীকরণ ভালবাসি। বেঁচে থাকার একঘেয়েমি কাটাতে আমরা এমন সব উপলক্ষ ও ছুতো খুঁজি যা আমাদের উদযাপনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সুযোগ করে দেবে সেলিব্রেশনের। বছরগুলিকে রিনিউয়াল করে আমরা আনন্দ করি। আশা, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা এসব ছাড়া তো মানুষ বাঁচতে পারে না। উৎসাহ ও উদ্দীপনা হারিয়ে জীবন কাটানোর কী-ই বা অর্থ? নতুনের দিকে যাত্রা আমাদের মন-কে তাই সজীব করে। উদ্দীপ্ত করে। নবীকরণকে আনুষ্ঠানিক মর্যাদায় বরণ করে নিয়ে আমরা একটু খুশি হতে চাই। এটুকুই লাভ। তা, কম কী?

উপবীতে আত্মোপলব্ধি

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন বাঙালির সমাজজীবনে এই দুটি অনুষ্ঠানেরই আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। একটি শিশু জন্মের পর থেকে বড় হওয়ার পথে পরিচিত হচ্ছে আমাদের এই দীর্ঘদিন লালিত আচারগুলির সঙ্গে। এতে সমৃদ্ধ হচ্ছে তার বাঙালি মনন। ধারাবাহিকভাবে টিকে থাকছে বাঙালির একান্ত-লালিত ঘরোয়া উৎসবগুলি। যদিও উপনয়ন ব্যাপারটি এখন যে-রকম উৎসবমুখর চেহারা নিয়েছে, প্রথমে তা ছিল না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নানা সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে পৈতেকেও আমরা আনন্দমুখর অনুষ্ঠানের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। অর্থাৎ, মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি স্বগৃহে অথবা ভাড়া করা বাড়িতে আত্মীয়-বন্ধুদের সমাবেশ। অতঃপর কবজি ডুবিয়ে দ্বিপ্রাহরিক অথবা রাত্রিকালীন আহার। বাঙালি খেতে ও খাওয়াতে ওস্তাদ। আত্মীয় বন্ধুদের রসনাতৃপ্তি তার সামাজিক অবস্থানের ভিত্তি-স্বরূপ। আর তাই অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এবং বিবাহের অনুষ্ঠান মানেই অপর্যাপ্ত ভোজনের ব্যবস্থা। তবে, অন্নপ্রাশন এবং উপনয়নের সঙ্গে বিবাহের পার্থক্য রয়েছে। প্রথম দু'টি অনুষ্ঠানের নায়ক একজনই। যাবতীয় কর্মকাণ্ড তাকে ঘিরে। বিবাহে আবার নায়ক-নায়িকার সমান অধিকার। উপনয়ন এবং অন্নপ্রাশনের ক্ষেত্রে কিন্তু রয়েছে প্রতিপালন, সংরক্ষণ এবং অতি-অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত রূপায়ণ।

উপনয়ন কোনও উৎসব নয়। এটি ব্রাহ্মণের পালনীয় কর্তব্য। পৈতেকে যাঁরা শুধু সুতো মনে করেন, তাঁদের পৈতে না-নেওয়াই ভাল। পৈতের মধ্য দিয়ে গোত্রের প্রধানের ঐতিহ্য বহন করেন সব ব্রাহ্মণ। পৈতে তাই ব্রাহ্মণের পতাকা। তবে, মনে করলে ভুল হবে যে, পৈতে-তে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে। প্রাচীনকালে কায়স্থ, বৈশ্য এমনকী, শূদ্ররাও পৈতে ধারণ করতেন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে তাঁদের পৈতের রং এবং উপকরণ আলাদা হত। যেমন, ব্রাহ্মণদের শ্রেণি অনুযায়ী পৈতের দৈর্ঘ্য পৃথক। কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের লোকেরা পৈতে ত্যাগ করেছেন। এঁরা যদি এখন পৈতে নিতে চান, তা হলে পৈতে ত্যাগের জন্য পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে পৈতে নিতে হবে। আজকালকার দিনে অবশ্য অনেক ব্রাহ্মণও পৈতে ধারণ করেন না, বা অনেকে দায়সারা পৈতে নেন। উপনয়ন এখন উৎসবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যেদিন পৈতে হয়, তার পর থেকে একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত ঘরে বন্দি থাকতে হয়। মা ভিন্ন অন্য কোনও নারীর মুখ দেখা যায় না। সাত্ত্বিক-নিরামিষ আহার করতে হয়। কিন্তু আজকাল কেউই এত কঠোর নিয়ম পালন করেন না। উপনয়ন হল মানুষের দ্বিতীয় জন্ম। এই কারণেই ব্রাহ্মণ 'দ্বিজ'।

আমার পৈতে হয়েছিল ষোলো বছর বয়সে। সেই সময় ওই গেরুয়া বসন, হাতে দণ্ডী, মুণ্ডিত মস্তক আমার মনে এক অদ্ভুত বৈরাগ্য এনে দিয়েছিল। বয়ঃসন্ধির সময়ে এই অন্যরকম আত্মোপলব্ধি যে কতটা প্রয়োজন, সেটা পরে বুঝতে পেরেছিলাম। আমার মনে আছে, দণ্ডী ভাসাতে গিয়েছিলাম নদীতে, তখন সবে

সূর্যোদয় হয়েছে। নদীর জলে ভেসে চলেছে আমার দণ্ডী, আমার গেরুয়া বসন। মনে হয়েছিল, এত বড় পৃথিবী পড়ে রয়েছে আমার সামনে। কেন ফিরব ঘরে? পৈতে না-হলে মনের এই গভীরতা আসে না। সুতরাং, এই অভিজ্ঞতার অত্যন্ত গুরুত্ব আছে।

অন্নপ্রাশন পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার। বাচ্চারা ছ-সাত মাস বয়সের আগে শক্ত খাবার খেতে পারে না। তাই অন্নপ্রাশনের রীতি চালু হয়েছিল। তবে, আজকের মায়েরা দু-তিন মাস বয়স থেকেই বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর আহার দেওয়ার চেষ্টা করেন। এটা ঠিক নয়। মাতৃদুগ্ধই সে-বয়সে শিশুর উপযুক্ত আহার। মায়ের দুধের সমান পুষ্টি আর কিছুতেই নেই। ছয়-সাত মাস বয়স পর্যন্ত তাই শিশুকে অন্য খাবার না-খাওয়ানোই ভাল। কিন্তু, তার পর থেকে বাচ্চার পক্ষে অন্য সহজপাচ্য খাবার উপযুক্ত। আমরা যেহেতু বাঙালি—অন্নই আমাদের প্রধান খাদ্য, তাই মুখে ভাত দিয়ে শিশুকে দুধ-ছাড়া অন্য খাবারের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। প্রাচীনকালে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ছোটদের আমিষ খাওয়া নিষেধ ছিল। কারণ, ছোটরা উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত খাবার হজম করতে পারে না। এখন যুগ পাল্টেছে। প্রাচীন রীতি আর মানা হয় না। সে-কালে নিয়ম ছিল বারো বছর বয়স পর্যন্ত ঘি খাওয়া যাবে না। এ-সব নিয়মই হয়েছিল স্বাস্থ্যের কথা ভেবে। আজকের 'হাই-টেক' দুনিয়ায় প্রোটিনযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবারই লোকের পছন্দ। অন্নপ্রাশন তাই এখন যতটা উৎসব, ততটা আর বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্য-সচেতনতা নয়।

কলকাতার আলো, অন্ধকার

নদী বা সমুদ্রের নৈকট্য ছাড়া পৃথিবীর কোনো বড় শহরই গড়ে ওঠেনি। নিদেন বড় কোনো জলাশয় থাকবেই কাছাকাছি। জলধারা, জলস্রোত বা জলপথের সঙ্গে শহরের সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছেদ্য। নদীর ধারে যাদের জন্ম তাঁরাই জানেন, একখানা নদী কত না মায়া বিস্তার করতে পারে। এক এক ঋতুতে তার এক এক রূপ বার বার দুধারের প্রকৃতিকে ভেঙে গড়ে দিয়ে যায়। বদলে দেয় মানচিত্র।

যদিও এ নদীর কথা নয়, তবু নদীই হোক নান্দীপাঠ। কলকাতা আর হাওড়া শহরকে দুভাগ করে দিয়ে বয়ে চলেছে যে হুগলি নদী তার কোনো মায়া নেই। সে বছর বছর ভাঙাগড়ার খেলা খেলে না, প্রকৃতি পাল্টে দেওয়ার সাধ্য তার নেই। দুধারের দুই প্রলয়ংকর শহরের চাপে জব্দ এক করুণ নদী, যাকে বৃহদাকার নর্দমাও বলা যায়। অত্যুক্তি হবে না। একটু উজিয়ে গেলে এই গঙ্গার বুকেই আজকাল বড় বড় চর পড়ে থাকতে দেখা যায়। কলকাতার রমরমা বন্দর জলের অভাবে খাবি খাচ্ছে।

এই ঘোলা গঙ্গায় ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে যে দু'টি শহর তাদের অবস্থাও বড় কম করুণ নয়। হাওড়ায় যাঁরা বাস করেন মৃত্যুর পর তাঁরা কেউ নরকে গেলে বিশেষ কষ্ট পাবেন না। এর চেয়ে আর কতটাই বা খারাপ হবে সেখানকার ব্যবস্থাদি?

আর কলকাতা?

কলকাতার জন্য এক কলসী চোখের জল ফেলব বলেই তো বসেছি।

এক বন্ধু বাসস্টপে দাঁড়িয়ে বহু বছর আগে বলেছিল, কলকাতায় যদি কখনো সাঙ্ঘাতিক একটা গণ-উত্থান ঘটে তবে তা কেন ঘটবে জানো? কনভেয়ান্সের জন্য। এই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষ অফিস কাছারি বা আর কোথাও যাবে বলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে আর বাস বা ট্রাম পায় না এর একটা প্রতিশোধ কলকাতার লোক নেবেই।

বলা বাহুল্য, কলকাতার লোকের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অজুহাত বহু। তার আবর্জনা, তার লোডশেডিং, তার ভাঙা গর্তে ভরা রাস্তা, তার ভীড়, তার জলকষ্ট, তার মশা, তার হাসপাতাল, তার দীর্ঘ মিছিল। ফর্দ বেড়েই চলবে। কিন্তু কথা হল, কলকাতার মানুষ এখনো প্রতিশোধ নেয়নি।

হয়তো নেবেও না।

বেশ কয়েক বছর আগে লাইট হাউসে একটা ইংরিজি ছবি দেখতে গেছি। এক দৃশ্যে নায়িকা সোফিয়া লোরেন তার সেক্রেটারিকে চেঁচিয়ে বলে উঠল, কলকাতায় আমার সব কারবার গুটিয়ে ফেল। সোফিয়া লোরেনের মুখে 'ক্যালকাটা' উচ্চারিত হতে শুনে লাইট হাউসের দর্শকরা হাততালিকে ফেটে পড়ল। আমরা

কলকাতার লোকেরা এমনই কাঙাল যে, এ শহরের নামটুকুও বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রীর মুখে উচ্চারিত হতে শুনলে শিহরিত হই।

তবু প্রশ্ন জাগে এ শহর কি আমাদের? এ শহর বাস্তবিকই কি কারো?

কলকাতা কতদূর পক্ষপাতহীন ও উদাসীন তা কোন শিশুকালে টের পেয়েছিলাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে যখন কলকাতার মনোহরপুকুরে বাস করতাম তখন আমাদের দোতলার জানালা দিয়ে দেখা যেত একখানা ঘোলাটে পুকুর। কর্দমাক্ত মোষের পাল সারা দিন সে পুকুরকে রগড়াতো। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবরোধে বন্দী রবীন্দ্রনাথও এরকম একটা পুকুরের কথা বলেছেন। সেই পুকুর তাঁর কল্পনাকে উস্কে দিত, বৃহৎ জগতের ছবিকে এনে দিত চোখের সামনে। মনোহরপুকুরের পুকুরটি ততদূর কৃতী ছিল না। তবে বর্ষায় মাঝে মাঝে তাতে ঘোর কালো আকাশের ছায়া পড়ত। মাঝে মাঝে টলটল করত জল। পুকুরের ধারে ধারে ঘাস, লতাগুল্ম উঁকি দিত। প্রকৃতির কিছু ভেজাল তখনও ছিল কলকাতার মধ্যে। এসপ্ল্যানেডে গাছ, পার্কে ঘাস, ফুটপাথে কৃষ্ণ বা রাধাচূড়া। ছাতিম বা বকুল ফুলের গন্ধ পাওয়া যেত এই তো কয়েক বছর আগেও। আর সেই চল্লিশের দশকে তো কথাই নেই। দাদু বা বাবার হাত ধরে পথ চলতে চলতে বাংলা সাইনবোর্ড দেখলেই হ্যাঁচকা টান মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে ফেলতাম। আর ওইভাবেই রপ্ত হল বাংলা অক্ষর জ্ঞানের একটা পর্ব। পার্কের স্লিপ থেকে গড়িয়ে পড়ে শেখা গেল মাধ্যাকর্ষণ। আকাশে প্লেন ও পাড়ার ট্রেঞ্চ দেখে শিখলাম 'যুদ্ধ' কথাটার মানে। শিখলাম ব্ল্যাক আউট, ব্ল্যাক মার্কেট, এ আর পি, আরও কত কী। শুধু কলকাতায় টানা বাস করে গেলেই আপনা থেকে কত কী শেখা হয়ে যায়। মায়ের মুখে শুনে শুনে যখন চয়নিকা মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে তখনই এক বিষণ্ণ দুপুর বয়ে আনল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ। লোকটাকে চিনি না, দেখিনি কখনো, তবু মনে হল, ব্যাপারটা ভাল হল না। কলকাতার এক দক্ষ ডেন্টিস্ট আমার পোকায় ধরা দুটো দুধে দাঁত উপড়ে ফেলল একদিন। চিনলাম সাহেব-মেম।

তারপর চলে যেতে হল কলকাতা ছেড়ে দীর্ঘ প্রবাসে। কিন্তু শিশুকাল থেকেই এক তীব্র আকর্ষণ চুম্বকের মতো টানত কলকাতার দিকে। একদিন ফিরে আসবই, উন্মোচন করব কলকাতার রহস্য।

রহস্য কথাটাই রহস্যময়। বাগবাজার, শ্যামবাজার, মধ্য কলকাতার যেসব পুরোনো দেড়শো দুশো বছরের পরিবার বাস করেন তাঁদের কাছে কলকাতার কোনো রহস্য নেই। দেহাত থেকে আসা যে লোকটা শরীর খাটিয়ে পয়সা রোজগার করছে তার কাছেও নেই। যে সব লোক কলকাতাকে ভাড়া খাটায়, কলকাতাকে নিত্যদিন বেচে আর কেনে, যে কলকাতাকে বারবনিতার মতো ব্যবহার করে, তার কাছে এ শহর রহস্য হারিয়ে বসে আছে কবে। সে কখনও দেখবে না শীতের কলকাতায় গভীর রাতের কুয়াশায় একখানা ট্রামগাড়ি ঝুমঝুম করে কেমন রূপকথার রাজ্যে বাঁক নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। সে শুনেও শুনবে না আধো জাগা ইহুদি রমণীর গান। সে কখনও দেখে না দূরগামী হরিণের পা কেমন বৃষ্টির মতো ছুটে যায় বর্ষার কলকাতায়। চীনে বাদামের মতো বিশুদ্ধ বাতাস? শুনে সে হেসে উঠবে।

দূর থেকে চুম্বক-পাহাড়ের মতো অবিরল একটা টান আমাকে টানত। উত্তর বাংলা, বিহার, আসামের পাহাড়ে জঙ্গলে যেখানেই গেছি, যতই শৈশব ছাড়িয়ে উঠছি, টান তত বাড়ে। বড় সাধ হয়, কলকাতায় যাবো। আমাদের এক অশিক্ষিতা আত্মীয়া মফস্বলের বাস গুটিয়ে কলকাতায় সপরিবারে ডেরা বেঁধে চিঠি লিখলেন, আমরা পরশুদিন ক্যালকাটায় এসেছি। সেই চিঠি পড়ে সে কী হাসাহাসি। তবু গোপনে তাঁকে খুব হিংসেও হয়েছিল। যত যাই হোক, তিনি তো কলকাতায় পৌঁছে গেছেন। সেই কলকাতা—যার অন্ধগলি, গ্যাসলাইট, প্রাচীন বাতাস জমে থাকা বুড়ি থুত্থুরি, ফ্যানটাসি, স্বপ্নঘোর, অলৌকিক।

আমার মতো আর কত লোককে টানছে কলকাতা। তাদের মধ্যে যেমন রয়েছে এলেবেলে, মাঝারি, তেমনি রয়েছে বাঘা বাঘা প্রতিভার অধিকারীও। মফস্বলে আজকাল ভাল ডাক্তার বদ্যি পাওয়া যায় না, বৈজ্ঞানিক নেই, প্রযুক্তিবিদ নেই, মেলে না ভাল দর্জি বা রাঁধুনি, কবি বা গদ্যকার। সবাইকেই কালক্রমে টেনে নেয় কলকাতা। মফস্বল ফাঁকা হয়, ভূতুড়ে হয়, মলিন হয়ে পড়ে। মহাশোষণকারী এই শহর গোটা

বাংলাকে নিরক্ত করে দিল প্রায়। আর একটা শহর স্বনির্ভর, স্বশাসিত, সগৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারল না। আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, সিউড়ি, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার যেখানেই যান দেখা যাবে দশ বিশ পঁচিশ বছর আগে যা ছিল হাল সেরকমই বা তার চেয়ে খারাপ। কলকাতার বিপুল চাহিদা মেটাতে গিয়ে এসব শহর হয়ে গেল ছিবড়ে। একমাত্র শিলিগুড়ি এক অস্বাস্থ্যকর চটকে দিন দিন ধাঁধিয়ে উঠছে বটে, কিন্তু সেটা উজ্জ্বলতা নয়। টাকার চমক।

পঞ্চাশের দশকে আনমনা কবি জীবনানন্দ ট্রামচাপা পড়লেন। ক'দিন যমে মানুষে টানাটানি। শেষ দিকটায় বড্ড বাঁচবার সাধ হয়েছিল। বারবার বলতেন 'বাঁচিয়ে দে ভাই, বাঁচিয়ে দে।' তবু রাখা গেল না। 'বড় কবি' শুনে বিধান রায়ও গিয়ে দেখে এসেছিলেন।

উত্তর বাংলায় বসে খবরের কাগজে খবরটা দেখে তক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিই, ট্রাম চাপা পড়ে মরতে হবে। কিন্তু তার হ্যাপা বড় কম নয়। ট্রাম চলে শুধু কলকাতায়। সুতরাং চাপা পড়তে হলে কলকাতা ছাড়া গতি কী?

পঞ্চাশের দশকেরই মাঝামাঝি একদিন কলকাতা রওনা হওয়া গেল। অজুহাত পড়াশুনো। চোখে স্বপ্ন, শরীরে রোমাঞ্চ, মনে মোহাবেশ। কলেজ স্ট্রিটে বিদ্যাসাগর মশাই যে সব দোকানে দোকানে চটি ফটফটিয়ে ঘুরে ঘুরে বই দেখতেন, যে-বাড়ির জানালা দিয়ে বালক রবীন্দ্রনাথ অসীমের দিকে তৃষিতের মতো চেয়ে থাকতেন, যে ময়দানে গোষ্ঠ পাল পাঁচিল হয়ে দাঁড়াতেন, যেখানে আছে মেট্রো সিনেমা হল আমি সেইসব জায়গায় ঘুরে বেড়াবো? আমি দেখতে যাবো ফিয়ার লেন, মুর্গীহাটা, হাতিবাগান, স্টার থিয়েটার, খিদিরপুর ডক, তালতলা, টেরিটিবাজার?

এই নামগুলোই তখন আমাকে ওলটপালট করে দেয়।

পঞ্চাশের দশকেও লোকে মূল্যবৃদ্ধির কথা বলত। কলকাতায় পা দিয়ে যে ব্যাপারটা আমাকে প্রথম অবাক করে তা হল, দাম। যে কোনো জিনিসের দামই মফস্বলের চেয়ে সস্তা। তা ছাড়া এমন অনেক জিনিসই কলকাতায় পাওয়া যায় যা মফস্বলে মাথা কুটলেও পাওয়া যায় না। এখনও সেই ব্যবস্থার খুব একটা হেরফের হয়নি। তার চেয়েও বড় কথা পয়সা ফেললে কলকাতায় খাঁটি সর্ষের তেল, জলহীন গোদুগ্ধ, অস্ট্রেলিয়ার মাখন, সরবাটা ঘি বা প্রকৃত ছানার সন্দেশ পাওয়া যায়।

ছেলেবেলায় শুনেছি গ্রামে টাটকা সব্জী, ফল দুধ ইত্যাদির খুবই সুলভ্যতা। প্রকৃত চিত্র ঠিক তার উল্টো। কলকাতার অদূরে যে কোনও গ্রামে গেলেই দেখা যাবে মরসুমি সব্জী, দুধ বা মাছ মেলেই না। ঘানির তেল সেখানে রূপকথার গল্প।

তবে কি গাঁয়ে শাকসব্জী ফলে না? তাহলে কোথায় ফলে? এ প্রশ্ন অবশ্যই বোকাটে। কারণ কলকাতার অদূরে যা কিছু উৎপন্ন হয় তার সবটাই বোঝা বয়ে ব্যাপারীরা নিয়ে আসে কলকাতায়। কলকাতা তার বাদিত মুখে অনন্ত খিদে নিয়ে বসে আছে।

চোখের সামনে গত ত্রিশ বছর ধরে কলকাতাকে বিবর্ণ থেকে বিবর্ণতর হতে দেখছি। ভিড় বাড়ছে দুগুণ চৌগুণ দশগুণ।

আমাদের বাল্যকালে কলকাতায় যে সবুজ দেখা যেত পঞ্চাশের দশকে তার অনেকটাই লোপাট। তবু প্রত্যহ বিকেলে গোলদিঘিতে বেড়াতে এসে কিছু ঘাস মাড়ানোর শৌখিনতা উপভোগ করেছি। বেঞ্চে জায়গা পাওয়া যেত বসবার। সাঁতার বা জলক্রীড়া শেষ হলে সন্ধ্যায় মনোরম একটু নির্জনতাও পাওয়া যেতে এই তো সেদিন গোলদিঘির ভিতর দিয়ে বহুকাল বাদে শর্ট কাট করতে গিয়ে ভারী কষ্ট হল মনে। তিলকূটের ওপর মাছির মতো ভিড়। মলমূত্রের গন্ধ। সবুজ প্রায় লোপাট।

তবু বলি কলকাতা বাস্তবিকই এক নির্জন শহর। এত ভিড়, তবু লক্ষ লক্ষ মানুষ চলছে ফিরছে নিজস্ব এক নিঃসঙ্গতার অবরোধে। পরস্পর যোগাযোগহীন অদ্ভুত এক একাকিত্ব জনবহুল কলকাতায় যত টের পাওয়া যায় তত তার কোথাও নয়।

হোস্টেলের ঘরে শুয়ে গভীর রাতে শুনতে পেতাম টানা-রিকশার ঠুনঠুন, মড়া নিয়ে যাওয়ার হরিধ্বনি, থানার পেটা ঘড়িতে প্রহর ঘোষণা, মাতালের অস্ফুট হামবড়াই।

কলকাতাকে আবিষ্কার করতে হলে পায়ে হেঁটে ছাড়া উপায় নেই। বারবার গলির গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে পথ খুঁজে বের করে নিতে হবে। কলকাতায় নবাগত আমি উত্তর কলকাতার ভুলভুলাইয়াতে বহুবার পথ হারিয়েছি, কানাগলিতে ঢুকে অপ্রস্তুত বড় কম হইনি, বিস্তর সন্দিহান চক্ষু আমাকে জরিপ করেছে বারবার।

আবিষ্কারও বড় কম করিনি। লর্ড ক্লাইভের আমলের বাড়ি, সম্পূর্ণ অসূর্যম্পশ্যা গলি, সঙ্কীর্ণ পথের শেষে আচমকা এক মুঠো পার্ক, চিরস্থায়ী অন্ধকারে আচ্ছন্ন বাড়ির জানালায় প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো কিশোরীর মুখশ্রী, কলতলায় জমে থাকা হাজার বছরের শ্যাওলা দেওয়ালের ফাটলে হাজারো কাঁকড়াবিছের বসত।

ছেলেবেলায় যখন প্রথম পর্যায়ে কলকাতায় বসত করতাম তখনকার একটি দৃশ্য দেখার কথা কোনোদিনই ভুলব না। দাদুর হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়ে দুজনে পথ হারিয়ে ফেললাম। বেশ নির্জন একটা রাস্তায় দাদু দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছেন। পাশেই একটা বাড়ির ভেজানো জানালা দেখিয়ে দাদু আমাকে বললেন, দেখ তো বাড়িতে কেউ থাকলে জিজ্ঞেস কর মনোহরপুকুরে কোনদিক দিয়ে যাবো। আমি টপ করে রকে উঠে দ্বিধাহীন হাতে জানালাটা খুলে ভিতরে তাকিয়ে হাঁ। এরকম দৃশ্য কখনো দেখিনি। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী বিবস্ত্র হয়ে পরস্পরের সঙ্গে কুস্তিই করছে নাকি?

নরনারীর সঙ্গমদৃশ্য জীবনে সেই প্রথম প্রত্যক্ষ করে যে ভয় পেয়েছিলাম সে ভয় এখনো মাঝে মাঝে শিউরে দেয়। পুরুষটা রক্তচক্ষুতে নীরবে আমাকে ভৎর্সনা করেছিল। হয়তো স্বামীটি রাত্রিতে কাজে যায়, দিনের বেলা ছাড়া তার স্ত্রী-গমনের সময় হয় না। হয়তো সে আসলে স্বামীই নয়, অবৈধ প্রেমিক। অসময়ই তাদের মিলনের সঠিক সময়। কিংবা কে জানে কী। তবে কলকাতার কথা ভাবলেই আমার ওই দৃশ্যটা মনে পড়ত। অবেলায় অসতর্ক সঙ্গমে রত দুটি নরনারী।

আশ্চর্যের বিষয় এই, এখন নরনারীর মিলন আরও অসতর্ক ও প্রকাশ্য হয়েছে। দুপুরের ভিক্টোরিয়া, গঙ্গার ধার, সন্ধের পর বিশেষ জায়গায়, দাঁড়ানো ট্যাকসি, সাঁঝরাতের অফিসঘর, লেকের ধারের ঝোপ, কিছু পার্ক সর্বত্রই নির্জনতার সন্ধানে হয়রান কামার্ত নরনারীর নির্লজ্জ প্রণয়লীলা দেখা যাবে। এইসব দৃশ্যাবলী পনেরো বিশ ত্রিশ বছর আগে বিরল ছিল। চক্ষুলজ্জার কিছু অবশিষ্ট ছিল তখনও। এখন আর নেই। অন্য কাউকে গ্রাহ্য না করার এই বেপরোয়া মনোভাব কেন এল তা সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মনে হয় কিছু পশ্চিমী পাগলামির বাতাস এদেশের আবহাওয়ায় জীবাণু ছড়িয়েছে। আর এক মস্ত কারণ আবডালের অভাব। কলকাতায় গোপনীয়তা রক্ষা করার মতো জায়গারই যে বড় টানাটানি।

জায়গার টানাটানি কতটা প্রবল তার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলাম পূর্ণ দাস রোডে এক মাদ্রাজী রেস্তোরাঁয় বসে। সেখানে ঢোকার পরই আসবাব এবং শ্রীছাঁদ দেখে কেমন যেন রেস্তোরাঁ বলে মনে হচ্ছিল না। চেয়ার টেবিল সবই ফোল্ডিং, সাজসজ্জাও তেমন নেই। ন্যাড়া ন্যাড়া ভাব। ঘরের কোণে ডাঁই করে রাখা শতরঞ্চিতে জড়ানো বিছানা, তাকে র‍্যাকে ঘর গেরস্থালির জিনিস। জিজ্ঞেস করে করে ক্রমে জানা গেল, আসলে এটা একটা ফ্ল্যাট। জনা পনেরো দক্ষিণ ভারতীয় ছেলে মেস করে থাকে। দিনের বেলা তারা অফিসে বা কাজে গেলে তাদেরই দুতিনজন এই রেস্তোরাঁ চালায়।

স্থানাভাবে আমারই এক বন্ধুকে ইট দিয়ে উঁচু করা চৌকির ওপর রাত্রিবেলা ভীষণ অস্বস্তির সঙ্গে শুতে হত। কারণ চৌকির তলায় অন্য বিছানায় শুতো তার সদ্য বিবাহিত দাদা ও বউদি। এ ব্যবস্থা দিনের পর দিন চলেছিল।

হ্যারিসন রোডে আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ের কাছে একটি বাড়ির দেওয়ালে ছ' থেকে সাত ইঞ্চি চওড়া একখানা তাকে একজন দেহাতী পান সিগারেটের দোকান দিয়েছিল। কাঠের ফোল্ডিং তক্তা লাগিয়ে সে চওড়ায় আরও ছ'ইঞ্চি যোগ করতে পেরেছিল। দোকান চলত রমরম করে। একদিন লক্ষ করি, দোকানের

নিচের দিকে অনুরূপ একটি তাক রয়েছে, তার সামনের দিকে লম্বালম্বি কয়েক টুকরো কাঠ দিয়ে একটু অবরোধ। প্রশ্ন করে জানা গেল, সে ওই তাকে শোয়। কী ভাবে শোয় সে ওই পৌণে এক ফুট চওড়া জায়গায়? একগাল হেসে সে জানাল, কাত হয়ে শুলে হয়ে যায়। আর সামনে কাঠের তক্তাগুলো তাকে পতনের হাত থেকে বাঁচায়।

গড়িয়াহাট থেকে শুরু করে শ্যামবাজার অবধি বেশ কয়েক হাজার লোক ফুটপাথে রান্না করে খায়, বাসন মাজে, দন্তধারণ করে, মলমূত্র ত্যাগ করে, কাপড় কাচে, শোয়। কলকাতা বস্তুত তাদেরই বলে মাঝে মাঝে মনে হয়।

আমার এক বন্ধুর ধর্মতলা স্ট্রিটের অফিসের উল্টোদিকে রোজ ভোরবেলা একখানা প্রাইভেট কার এসে একজন ভিখিরিকে নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে দিয়ে যেত। সারাদিন বসে বসে ভিক্ষে করত সে। দুপুরে এক সময়ে উঠে গিয়ে কাছের এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে ভিতরের দিকে একটু আড়ালে বসে খাওয়া সেরে নিত। রাতের দিকে সেই গাড়িখানা এসে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যেত তাকে। সেই ভিখিরিটা এখনও ওখানে বসে কিনা জানি না। এও জানি না তার মতো আর কত আছে কলকাতায়। তবে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে একজন ছিল ঠ্যাং ফাঁক করে, লাঠিতে ভর দিয়ে, শরীরে অসহ্য কৃত্রিম কাঁপুনি তুলে, বিকৃত বীভৎস এক গলায় পথচারীদের পথ আটকে ভিক্ষে চাইত। দশ বছর লক্ষ করার পর তাকে একদিন জিজ্ঞেস করি, এভাবে হাঁটতে কষ্ট হয় না? নরমাল হাঁটলে তো হয়। খুবই রেগে গিয়েছিল সে আমার ওপর।

নফর কুন্ডু লেনটা কোথায় জিজ্ঞেস করলে আমরা অনেকেই জবাব দিতে পারব না, কিন্তু নফর কুণ্ডু কেন খানিকটা খ্যাতিমান তা আমরা অনেকেই পাঠ্যবই মারফৎ জানি। ম্যানহোলের মধ্যে বিপন্ন দুই সাফাই কর্মীকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি বিষাক্ত গ্যাসে মারা যান। একবার কলকাতাবাসের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম দিকে মেসবাড়ির মধ্যে এক চিলে ম্যানহোলে পা দিতেই বিনা আয়াসে অর্ধেক শরীর চলে গেল কলকাতার বিষাক্ত গর্তে। ঢাকনাটা খাড়া হয়ে গর্তের অর্ধেক আটকে না রাখলে আমার সর্বাঙ্গই বিসর্জিত হওয়ার কথা। কলকাতায় নফর কুণ্ডুর মৃত্যু বহু কাপুরুষেরও হয়েছে। আজও বিবাদী বাগের মিনিবাসের লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে আপনি যদি নিচের দিকে সর্তক দৃষ্টি না রাখেন তবে নফর কুণ্ডুর পরিণতি আপনার অনায়াসেই হতে পারে অথচ তাঁর শহীদত্বটুকু আপনি পাবেন না।

কলকাতা থেকে দূরে বসবাসকারী এক বিখ্যাত সাহিত্যিক একবার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলেছিলেন, ও শহর...ও শহর একদিন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে শেষ হয়ে যাবে, দেখো। কেন হচ্ছে না বলো তো এতদিন ধরে?... প্লেগ বা কলেরা লেগে যাবে, মড়কে শেষ হবে... কলকাতার তলা দিয়ে ভোগবতী বয়ে যাচ্ছে, জানো? ধীরে ধীরে ভিতে ক্ষয় ধরাচ্ছে, আস্তে আস্তে বসিয়ে দিচ্ছে শহর...আর গঙ্গা তো গতি পরিবর্তন করল বলে। তখন দেখো স্রোতের মুখে কুটোকাটার মতো কেমন ভেসে যায় তোমাদের কলকাতা...

তিনি একা নন, এরকম বহু মানুষেরই অভিশাপ নিত্যদিন, কলকাতার ওপর বর্ষিত হচ্ছে। তাঁদের দোষ নেই। কোনও না কোনও কারণে তাঁরা কলকাতা থেকে নির্বাসিত অথবা কলকাতা তাঁদের বর্জন বা অমনোনীত করেছে। তাঁদের আর কলকাতায় আসা, কলকাতার মানুষ হয়ে ওঠা হয়নি। রাগ আরও গভীরে প্রোথিত এ কারণেও হতে পারে।

এইসব শাপশাপান্ত যে কলকাতার গায়ে লাগে না তা কিন্তু নয়। নিরন্তর অভিশাপেরও একটা জোর আছে, তরঙ্গভিঘাত আছে। আমরা হয়তো কলকাতার কুম্ভীপাকে বাস করি বলে টের পাই না, কিন্তু লোকে যখন একে মৃত নগরী বলে তখন হয়তো খুব মিছে কথা বলে না। পাতাল রেল, গঙ্গার ওপর দু' নম্বরী পোল, শেয়ালদা আর ব্রাবোণ রোডে উড়াল পুল—গয়নাগাটি কলকাতাকে বড় কম পরানো হয়নি। তবে কিনা যৌবনে বঞ্চিত রেখে বুড়ো বয়সে এত সাজগোজ কি কলকাতাকে মানায়? নাকি ঢাকা যায় তার মুখে মৃতের বিবর্ণতা?

বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল হাড়কাটা গলির কাছে, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের হোস্টেলে। প্রথম কিছুদিন সভয়ে ও গলিটা এড়িয়ে গেছি। বউবাজারে বাজার করতে যেতে ওইটেই ছিল সহজ পথ। যেদিন পরিষ্কার দিনের আলোয় ও-গলিতে পা দিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলাম সেদিনই ভয় ভেঙে গেল। পতিতাপল্লী বলে চেনার জো নেই তো, স্বাভাবিক মানুষজন স্বাভাবিক সব মেয়ে। কে পতিতা কে বলে দেবে? তাছাড়া গৃহস্থ ও পতিতালয় গায়ে গায়ে মিলেমিশে বসত। কোনো কোনো দরজায় অবশ্য চুণের দাগে লেখা আছে সাবধান গৃহস্থের বাড়ি। গৃহস্থ ও পতিতাদের এরকম সহাবস্থানও অন্যত্র খুব কম আছে। একদিন শীতের সকালে হাড়কাটা দিয়ে বউবাজারে যাওয়ার সময় দুটি অল্পবয়সী মেয়েকে রক-এ বসে থাকতে দেখেছিলাম। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কানে এল একজন অন্যজনকে বলছে, আমরা কী হলাম বল তো।

আজও ওই বাক্যটি আমার কানে লেগে আছে। শুধু কথাই তো নয়, সেটি বলার ভঙ্গি, উচ্চারণ এসব কিছুর মধ্যে আপাতলঘু ওই নারীকণ্ঠে গভীর বিষাদ অন্তর্নিহিত ছিল। আমরা কী হলাম বল তো—এই শ্বাসরোধকারী প্রশ্ন যেন দুনিয়ার আহ্নিক গতিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার উপক্রম করে। সন্ধেবেলা এসপ্ল্যানেড ধর্মতলার চত্বরে এক বিস্তারিত এলাকায় এরকম ছেলেধরা মেয়েরা ঘুরে বেড়ায় গলির মুখে, ঈষৎ অন্ধকার আনাচে কানাচে। উগ্র সাজগোজ। আগে বুঝতে পারতাম না, আজকাল পারি। মেট্রোর সামনে বা উল্টোদিকে চশমা-চোখে বুকে বইখাতা চেপে ছাত্রীর ছদ্মবেশে যে সব দেহ ব্যবসায়িনী শিকার খোঁজে তাদেরও আর চিনতে ভুল হয় না। লক্ষ করে দেখছি, তারাও জানে কে খদ্দের আর কে খদ্দের নয়।

বিদ্যাসাগরমশাই কোনো একদিন নাকি সারা সন্ধে প্রতীক্ষারতা এক বারবনিতাকে কিছু টাকা দিয়ে বলেছিলেন, মা, আজ গিয়ে বিশ্রাম নাও। বিদ্যাসাগরমশাইয়ের মতো গাটসওলা বাঙালি তো আর জন্মাল না। কিন্তু এইসব মেয়েদের মুখে উগ্র প্রসাধন ভেদ করে যে হতাশা যে বিষাদ ফুটে ওঠে তা অনুভব করলে কোন মানুষের না মন দ্রব হয়? আড়কাঠি, দালাল, গুণ্ডা, বাড়িওলা কত পাওনাদারই না এদের শুষে খাচ্ছে রোজ। প্রেমহীন, কামহীন, ভাবলেশহীন পুতুলের মতো নারীদেহ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গাঁ-গঞ্জে মফস্বলে ঋতুর আবর্তন খুব স্পষ্ট অনুভব করা যায়। আকাশ বদলায়, বাতাস বদলায়, ফুল ফল সব্জী বদলায়, বদলে যায় প্রকৃতির রং। গত প্রায় তিন দশক কলকাতায় বসবাস করে গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীত ছাড়া আর কোনও ঋতুকে অনুভবই করা যায়নি। গ্রীষ্মটাই কলকাতার সবচেয়ে দীর্ঘ ঋতু। আমার নিজস্ব হিসেবে কলকাতার ন'মাস গ্রীষ্মকাল। দু' মাস বর্ষা। শীত মেরেকেটে এক মাস। সেই শীতও ফিনফিনে, শৌখিন। এক একবার এমনও হয়েছে যে, জানুয়ারির প্রায় গোড়া থেকেই সোয়েটার বর্জন করে ঘরে সিলিং পাখা চালাতে হয়েছে। প্রকৃতিহীন শানবাঁধানো শহরে রোদের তাপ চৌগুণে চড়ে যায়। গ্রীষ্মে দুপুরের দাহ চারদিকে এক সম্মোহন বিস্তার করে রাখে, যাকে ঠিক বাস্তব বলে বোধ হয় না। তার ওপর কলকাতার গরম হল ঘেমো গরম। কষ্ট বেশি। লু বয় না বটে, কিন্তু দম আটকে আসতে থাকে।

প্রতি বছর না হলেও, এক এক বছর কালবোশেখীর দমকা ঝড় বয়ে যায়, এই শহরের ওপর দিয়ে। পড়ে যাওয়ার মতো গাছও বিশেষ নেই আর, কিছু টি ভি অ্যান্টেনা উড়ে যায়, খোলের চাল খসে পড়ে, টেলিফোনের তার ছেঁড়ে।

বর্ষা যখন নামে তখন ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধের জন্য উন্মুখ হই। চোখ খোঁজে জানালার বাইরে কদম গাছ। দেখতে ইচ্ছে হয় নদী বা পুকুরে জলের ওপর জল পড়ার দৃশ্য। ধুলোটে গাছ বৃষ্টিতে নেয়ে কেমন যৌবনে ফিরে যায়, কেমন উদ্বাহু নৃত্যে নাচে ঘাসের খোকারা, কী আপর্থিব গন্ধে দোলনচাঁপা ভরিয়ে দেয় বাতাস তা কলকাতা কখনো জানবে না। অবশ্য কলকাতায় আছে ব্যক্তিগত বাগান, ব্যক্তিগত দোলনচাঁপা, মালিকনাধীন ঘাস, গন্ধরাজ লেবুর গাছ। কিন্তু সে সব বিরল ভাগ্যবানদের ব্যক্তিগত প্রকৃতিচর্চা। আর যেতে পারা যায় বোটানিকসে, লেকে বা ময়দানে ঘাস বা গাছ দেখতে। প্রায়ই মেহনতে পোষায় না।

শান-বাঁধানো এই শহরে প্রকৃতি না থাক, কিছু স্থাপত্য আছে। মাঝে মাঝে মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো বাড়ি চোখে পড়ে যায়। ময়দানের দূরত্ব থেকে চৌরঙ্গীর দিকে চোখ পড়লে নিউ ইয়র্কের আকাশরেখার আভাস

পাওয়া যায়। টাটা বিল্ডিংসের ছাদ থেকে একবার দক্ষিণের দিকে চেয়ে আবাক হয়ে ভেবেছিলাম, এ কি কলকাতা? না কি বিদেশের কোনো শহর? লবণ হ্রদের রাস্তায় হাঁটলে পদে পদে চোখে পড়বে স্বপ্নসম অত্যাধুনিক নকশায় তৈরি বাড়ি। অনেকটা প্রসার চারদিকে থাকায় এইসব বাড়ির সৌন্দর্য বহুগুণ বেশি হয়ে চোখে পড়ে।

কিন্তু তবু বলতেই হয় কলকাতার গগনচুম্বি অট্টালিকা, অসাধারণ সব বাসগৃহ বেশির ভাগই বাঙালীর নয়। মধ্যবিত্ত বাঙালীর কথা ওঠে না, উচ্চবিত্ত বাঙালীও ঐশ্বর্যের টক্করে অনেক পিছিয়ে। এইসব বাড়ি প্রায় সবই অবাঙালীর। কলকাতার ধন সম্পত্তি, কলকাতার ঐশ্বর্য কলকাতার বাণিজ্য সিংহভাগই তাদের দখলে। শুধু তাই-ই নয়, বিস্কুট থেকে শুরু করে প্রসাধনদ্রব্য, পরিধেয় থেকে শুরু করে ওষুধ, ইলেকট্রনিক দ্রব্য থেকে শুরু করে দেশলাই অবধি আসছে পশ্চিম, দক্ষিণ উত্তর ভারত থেকে। প্রতিদিন লাখো লাখো টাকা চলে যাচ্ছে বাইরে। কোটি কোটি টাকা চলে যাচ্ছে কলকাতায় কায়িক শ্রম, ছোটো বা বড় ব্যবসা করতে আসা অবাঙালীদের হাত ফেরতা হয়ে ভারতের নানা জায়গায়। কলকাতার বাবু বেকারেরা এই ব্যবস্থা একরকম মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। যে সব বাঙালী ব্যবসাদার মোটামুটি করে খাচ্ছে তাদের অধিকাংশেরই নেই উদ্ভাবনী শক্তি, দূরদৃষ্টি, বড় হওয়ার ইচ্ছে, সেবাবৃদ্ধি বা যুগোপোযোগী ভাবনাচিন্তা। ক্ষুদে ব্যবসাদারদের মধ্যে সে সব বাঙালী নেমেছে তারা অধিকাংশই ফুটপাথের মক্কেল। তারা যেসব জিনিস বিক্রি করে সেগুলির উৎপাদন কোথায় হয়, কারা করে কে জানে, তবে সেইসব জিনিস ব্যবহার করতে গেলে মনে হবে যে, এইসব ক্ষুদেরা বিশেষ বড় হতে চায় না। এদের লক্ষ্য কুইক মানি। দামে বা জিনিসে ঠকানো, চড়া মেজাজ, কথায় কথায় খদ্দেরকে অপমান, ঠুনকো ইয়ার্কি কখনো গুডউইল তৈরী করতে পারে না। অথচ এরা অহরহ তাই করে।

কলকাতা যে বাঙালীর নয় এ অনেক পুরোনো কথা। বরং বাঙালী এই বলে গৌরব করতে ভালবাসে যে, এ মহানগরী বাস্তবিকই মহামানবের সাগর। কোন কুক্ষণে জীবনানন্দ একখানা পঙক্তি লিখে ফেলেছিলেন ভুল করে 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।' আমার ধারণা এটা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না মোটেই, দূরদ্রষ্টার আসন তিনি কদাচিৎ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর ওই পঙক্তিটি এখন পুরসভা থেকে শুরু করে মেট্রো রেল সবাই অম্লান বদনে ব্যবহার করে বিজ্ঞাপনে হোর্ডিং-এ। নিতান্তই অ্যালিটারেশনের ঝোঁকে লেখা ওই লাইন নিয়ে আমরা যতই ল্যালাই না কেন, আমাদের কল্পলোকের তিলোত্তমা সেই যে অন্তর্জলীতে বসেছে আর তার নড়বার নাম নেই।

আড়েদিঘে অবশ্য কলকাতা বাড়ছে। ভয়াবহরকমে বেড়ে উঠছে উঁচু দিকেও। এই বৃদ্ধি স্বাস্থ্যের লক্ষণ না অসুখ তা ভেবে দেখবার বিষয়। তবে যে সব এলাকা কলকাতা থেকে এই সেদিন বিচ্ছিন্ন ছিল, সত্তর দশকেও যেখানে শেয়াল ডাকত, হ্যারিকেন জ্বলত যে সব জায়গার গা থেকে এখনো পঞ্চায়েতী শাসনের গন্ধ যায়নি সে সবও এখন 'ক্যালকাটা' তকমা পেয়ে যাচ্ছে। চব্বিশ পরগনার অনেকটাই খাবলে নিয়েছে কলকাতা। খাঁই আরও বাড়বে।

দক্ষিণ কলকাতার এক বিখ্যাত পার্কের জমি দখল করে একজন জ্যান্ত মানুষ নিজের নামে একখানা 'হল' বানিয়ে ফেললেন। তাঁকে মদত দিলেন তৎকালীন সরকার। সেই হল রমরম করে চলছে এবং হল-এর সেই বিখ্যাত মালিক দু পয়সা আয় করছেন। এ জিনিস ভারতবর্ষের অন্য শহরে ঘটতে পারত বলে আমার মনে হয় না। কলকাতায় সব কিছুই ঘটে। ওই পার্কটি আমার শৈশবে ধাত্রীর মতো ছিল। গাছপালা স্লিপ দোলনা বেঞ্চ নিয়ে চমৎকার একটু শ্বাস ফেলার জায়গা। সেখানে ওই কুশ্রী দখলদারি আজও আমাকে পীড়া দেয়। কতখানি স্বার্থপর বিবেকহীন হতে পারে এ শহরের মানুষ, ওই হলটি তার মূর্তিমান প্রমাণ।

ব্যক্তিগত বাড়ি বা মালিকাধীন ফ্ল্যাটের অন্তহীন চাহিদায় কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ফাঁকা সব জমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা যেখানে ফুটবল খেলত, বাচ্চারা বেড়াত, বৃদ্ধেরা নিদাঘের বিকেলে স্মৃতিচারণ করতে আসত তা লোপাট হয়ে যাচ্ছে দ্রুত বেগে। এই লোপাট হয়ে যাওয়াটা কতদূর অবিমৃশ্যতার পরিচায়ক,

কতটা অবিবেচনার কাজ তা পুরপিতারা ভেবে দেখার সময় পান না। পরিবেশদূষণ নিয়ে যখন একদিকে কাঁড়ি কাঁড়ি চোখের জল ফেলা হচ্ছে তখন অন্যদিকে এক নির্বোধ বদান্যতায় কলকাতার প্রকৃতিকে করা হচ্ছে উচ্ছেদ। এই স্ববিরোধের পাপ ভবিষ্যতে অনেক অভিশম্পাতের কারণ হয়ে রইল।

তবে দুঃখ করে, ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হয়ে লাভ নেই। আমরা যেমন, আমাদের কলকাতাও তো তেমনই হবে। আমাদের চরিত্রই কলকাতার সর্বাঙ্গে ফুটে আছে। উদ্যমহীন, গতিহীন, নির্বিকার, অসঙ্গতিতে ভরা, ধুলোটে, ক্ষয়াটে, নিশ্চরিত্র।

কোন আহাম্মক মনুমেন্টের মাথাটা লাল করেছিল জানি না। তবে অজান্তে সে বোধহয় এইটেই বোঝাতে চেয়েছে যে এখানে সব প্রগতির গতি রুদ্ধ হয়েছে। কলকাতার আর এগোনোর প্রয়োজন নেই।

তবু মাটির তলায় কলকাতা একটু এগিয়েছে। পাতাল রেল এখন কলকাতার নবতম বিস্ময়, বিংশ শতকীয় শিহরণ। হট্টগোল জল্পনা অনেকদিন ধরেই চলছিল। বিশ্বের সব বড় শহরে যখন পাতাল রেল বহু পুরোনো, প্রায় মধ্যযুগীয় ব্যাপার হয়ে এল তখন ভারতবর্ষের একমাত্র পাতালরেল চালু হয়েছে কলকাতায়। মাত্র দু'তিন কিলোমিটার। তা হোক, তবু তো হল। হিমানীশ গোস্বামী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর আমি বিগত বইমেলার সময় এক সন্ধেবেলা সওয়ার হয়ে পড়লাম পাতালরেলে। যত দূরেই যাই ভাড়া এক টাকা। মিনিবাসের চেয়েও বেশি। সীটে গদি নেই। কামরা বেশ ছোটো। শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হবে কিনা জানি না, তবে এখনো নেই। বেশ ভীড়। লোকাল ট্রেনের চেয়ে অভিজ্ঞতা ভিন্নতর কিছু হল না। তবে মাটির তলা দিয়ে যাচ্ছি এই অনুভূতির রোমাঞ্চ তো ছিলই। একপেশে এই পাতাল রেলের দাক্ষিণ্যে কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলের লোক এক নারকীয় যন্ত্রণা থেকে কিছুটা রেহাই পাবেন। তবু তাঁরা কলকাতার মোট জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ? পাতাল রেলের দাক্ষিণ্যে বঞ্চিত বাকি কলকাতা কিন্তু ঝুলতে ঝুলতে অনন্ত ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে এবং থেমে থেমে ধুঁকতে ধুঁকতে পৌঁছবে অফিসে কর্মস্থানে। তবু এই একটি ব্যাপারে কলকাতা যে আর তিনটে মহানগরকে টেক্কা দিল আপাতত সেইটেই আমাদের দগদগে ক্ষতস্থানে সামান্য প্রলেপ। তবে কালক্রমে তা ফের শিয়ালদা-বনগাঁ লোকালের অনিয়মিততায় আক্রান্ত হলে সেটাও আমাদের জাতীয় চরিত্র বলে ধরে নিতে হবে।

কত খোঁড়াখুঁড়ি করে এবং কত না যত্নে এই তো মাত্র কয়েক বছর আগে হাওড়া স্টেশনে তৈরি হল সাবওয়ে। প্রথম প্রথম সাবওয়ে ছিল ঝকঝকে চমৎকার, জুতো পায়ে নামতে দ্বিধা হত। মাস দুই আগে সাবওয়েতে নামতে গিয়ে দেখলাম আবর্জনা, কাগজের টুকরো, টিকিট, সিগারেট আর দেশলাইয়ের বাক্সে সিঁড়ি প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে, ধাপে ধাপে বসে গেছে ভিখিরি, হকার। শোনা যাচ্ছে সাবওয়েতে সময়বিশেষে চুরি ছিনতাই হয় সর্বাধিক। এত সুন্দর একটি নির্মাণের এই কদর্য পরিণতি দেখে কষ্ট হল। কিন্তু অন্য রকম হওয়ারও তো কথা নয়।

এই তো সেদিন বেলমুড়ির কাছাকাছি একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। রাত্রিবেলা শুতে গিয়ে দেখি মশারির ব্যবস্থা নেই। গৃহস্বামী অভয় দিয়ে বললেন, ভয় নেই, মশা কামড়াবে না।

বাস্তবিক একটিও মশা নেই। গাছপালা, ঝোপঝাড়, ডোবা, জলাশয়ে ভরা একটি গ্রামে মশাহীন রাত্রি কাটাতে গিয়ে ভাবছিলাম, উত্তর ও মধ্য কলকাতায় পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে আমরাও কোনদিন মশারি খাটাইনি। ও অঞ্চলের লোকেরা মশারির ব্যবহারই জানত না। আজ তারা পাইকারি হারে মশারি কিনছে। ম্যালেরিয়া জেঁকে বসছে কলকাতায়। দশতলার ফ্ল্যাটে যারা বাস করে তারাও বলে, মশা নাকি লিফটে উঠে সেখানেও শোষণ শুরু করেছে।

তেমনি বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে রাস্তার কুকুর। কলকাতায় যত লোককে বছরে কুকুরে কামড়ায় তত বোধ হয় গ্রামাঞ্চলেও নয়। লোডশেডিং-এ পথ-চলতি মানুষের পা কুকুরের লেজে পড়তেই পারে। কুকুরদের সংখ্যা বাড়ছে এক ভয়াবহ হারে। এরা চোর দেখলে চুপ করে থাকে, ভদ্রলোককে কামড়ায়। কলকাতার জাতীয় চরিত্র আর কি। এই সব কুকুরদের মেরে ফেলা হোক এটা নিশ্চয়ই কেউ চাইবেন না। কিন্তু এদের শহর

থেকে সরিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসতে তো বাধা নেই। যেখানে অস্তিত্ব রক্ষার স্পোর্টিং চান্স অন্তত তারা পেয়ে যাবে। বুনো কুকুরেরা তো দিব্যি বেঁচে বর্তে আছে। কলকাতার কুকুরেরা তেজবীর্য বা গৃহরক্ষা কোনো কাজেই খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি। মাঝরাতে কলকাতার স্নায়ুতাড়িত মানুষের পলকা ঘুম ভাঙিয়ে দিতে তারা অকারণ বিশাল দলীয় কোন্দলে শামিল হয়, নয়তো ও পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে বার্তাবিনিময় করতে থাকে অক্লান্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কলকাতার প্রতি আমাদের আচরণ মাতৃহন্তার মতো। তবু এই সর্বংসহা, রক্তশূন্য, সূতিকায় আক্রান্ত, অক্ষম, রোগাভোগা মা যেন ধুঁকতে ধুঁকতেও তার নাবালক নাবালিকা সন্তানদের পরিচর্যা করে যাচ্ছে। তাদের বায়নারও তো শেষ নেই।

মাঝে মাঝে ভাবি, পূর্ববঙ্গ যদি ভিন্ন রাষ্ট্র না হত তাহলে অখণ্ড বাংলায় আর একটি বড় শহর হতে পারত ঢাকা। কলকাতা আর ঢাকা ভাগাভাগি করে নিত ব্যবসাবাণিজ্য আর প্রতিভার চাপ। দুটো শহরই হতে পারত সুন্দর ছিমছাম। মহারাষ্ট্রে আছে বম্বাই আর পুনে, উত্তরপ্রদেশে আছে লখনউ, এলাহবাদ, বেনারস ইত্যাদি। পশ্চিম বঙ্গে কলকাতা এক এবং অদ্বিতীয়। কলকাতার পাশাপাশি অন্য কোনো শহর পাল্লা টানতে গজিয়ে উঠল না। যদি শিলিগুড়ি হয় তো হবে। কিন্তু তাতে কলকাতার ওপর চাপ কমে যাবে কিনা তা বলা শক্ত।

টিনের তোরঙ্গ বগলে বিছানা আর চোখে বিস্ময় নিয়ে পঞ্চাশের দশকে যে কিশোর কলকাতায় পা দিয়েছিল আজ তার বয়স বেড়েছে বটে, কিন্তু সেই বিস্ময় একেবারে মরে যায়নি এখনো। মাঝে মাঝে কুয়াশা বা বৃষ্টিপাতে এই ধূসর শহরে ঘনিয়ে ওঠে অলৌকিক আবছায়া। চেনা শহরে এসে লাগে অচেনার রহস্যময়তা। মনে হয়, কই এ শহরে পা দিইনি তো কখনো! নিদারুণ গ্রীষ্মের বিকেলে মিনিবাসে বসে ঘামতে ঘামতে অকস্মাৎ এক ঝলক বেলফুলের গন্ধে আমূল আনমনা হয়ে লক্ষ করি সামনের আসনে মরাল-গ্রীবার ওপরে বেলফুলে জড়ানো খোঁপা ভেঙে পড়ে আছে। তার মুখ দেখতে পাই না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এক শুষ্ক পিপাসার নিবারণ হয়ে যায় ধীরে ধীরে। বলাই সিংহ লেন ধরে যে ফুটফুটে কিশোরীটি ব্রাহ্ম গালস স্কুলে পড়তে যেত, তার জন্য পিপাসার্তের মতো দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থেকেছি জানালায় আজ সে কোথায় কোন ঘর আলো করে ছেলেপুলে মানুষ করছে কে জানে, সেই হোস্টেল বাড়ি ছেড়ে আমিও কতদিন চলে এসেছি তবু আজও এক কিশোর যেন ঠিকই দাঁড়িয়ে থাকে বলাই সিংহ লেনের কুশ্রী গলিটার দিকে চেয়ে, সেই কিশোরীও আজও কয়েক মুহূর্তের জন্য সেই গলিকে স্বর্গীয় আলোয় ভরে দিয়ে হেঁটে যায়। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের সেই চির প্রদোষে আচ্ছন্ন মেসবাড়ি আলো না জ্বেলে, যেখানে কলতলায় কয়েক দশকের শ্যাওলা, বাথরুমের বাইরে অশ্বত্থ গাছ আর ভিতরে তক্ষক, যেখানে ছিল লক্ষ লক্ষ ছারপোকার সঙ্গে নিত্য সহবাস, সেখানেও স্বপ্নে ভরা মাথা নিয়ে একটি কিশোর দিনের পর দিন পরতে পরতে পারিপার্শ্বিকের ওপর চাপিয়ে নিত নিজস্ব বর্ণ-গন্ধ-ছবি। ঊষর কলকাতা হয়ে যেত স্বপ্নের উদ্যান, ব্যাবিলন। আজও হয়। আজও আমরা বোধহয় সঠিক কলকাতায় বাস করি না। খানিক কলকাতায় খানিক এক স্বপ্নের শহরে।

অমৃতযাত্রা

অমৃত চাই, চাই মৃত্যুর চির-নির্বাসন।

চাই নির্বাধ আয়ু, অফুরান ভোগ, যতিহীন গতি—

এক ক্ষমার অযোগ্য বঞ্চনার ইতিহাস রয়ে গেছে কুম্ভযোগের আদিতে। সেই বঞ্চনার স্মৃতিই কোন প্রাগৈতিহাসিক পুরানবর্ণিত যুগ থেকে বহন করে আসছে কুম্ভের তীর্থ চতুষ্টয়।

মৃত্যুশাসিত জগতে অমৃতের আকাঙ্খা নেই কার? মানুষ বা জীবজগৎ কোন ছার, ওই যে অসীম গগনে বিস্তৃত মহাজগৎ তারও ক্ষয় আছে। আছে পূণর্জন্মও। যাকে বলে কল্পান্ত, কল্পারম্ভ। কিন্তু পূণর্জন্ম এক প্রহেলিকা, আমাদের সাধারণ ধ্যানধারণায় তা প্রকট ও নিশ্চিত নয়। আমরা ইহজন্মের কথা জানি, পরজন্মের দোলাচল সম্ভাবনা নিয়ে এই জীবনকেই অনন্ত প্রসারিত করতে চাই না কি? সুরাসুরও তাই চেয়েছিল। চিরশত্রু সুর ও অসুর, দেবতা ও দানবদের ঐ এক জায়গায়, এক দুর্মদ আকাঙ্খার ঘাটে মিল হয়েছিল। অমৃত চাই, চাই মৃত্যুর চির-নির্বাসন। চাই নির্বাধ আয়ু, অফুরান ভোগ, যতিহীন গতি।

দেবতা ও অসুরদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে ছেদ পড়ল। দু-পক্ষই বসলেন যুক্তিতে। সমঝোতা হল। ক্ষীরসাগর মন্থন করে তুলে আনতে হবে অমৃত, দু-পক্ষই ভাগ করে নেবেন। মৃত্যুর অবসান ঘটিয়ে আবার সংগ্রামে নামা যাবে। মৃত্যুহীন যুদ্ধের কথা কেউ কখনও শোনেনি। তবু সেই অসম্ভব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে সমুদ্র মন্থনের বিশাল অপ্রাকৃত আয়োজন হল। স্বয়ং বিষ্ণু কূর্মের রূপ ধরে সাগরতলে অসীন হলেন, তাঁর পৃষ্ঠে স্থাপিত হল মন্থনদণ্ডরূপে মন্দার পর্বত, রজ্জুর ভূমিকা নিলেন বাসুকী। দুই চিরশত্রু ও ভ্রাতা দেবতা ও অসুর দুদিকে অবস্থান করে সাগর মন্থন শুরু করলেন। মথিত সাগরের তলদেশ থেকে উঠে আসতে লাগল গুপ্তরত্নাবলী, ঐরাবত, পুষ্পক রথ, পারিজাত, লক্ষ্মী, সুরভি, একে একে। সমুদ্র আজও রত্নগর্ভা। আজও তা অনেক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আকর। সর্বশেষে অমৃতকুম্ভ নিয়ে উঠে এলেন ধন্বন্তরি। মন্থন শেষ হল, সফল হল এত আয়োজন ও শ্রম। সুরাসুর আনন্দে কোলাহল করে উঠলেন।

সম্পদের সঙ্গেই জন্ম নেয় ঈর্ষা, বিদ্বেষ, বিশ্বাসঘাতকতা ও বঞ্চনা। অসুরদের অমরত্বে বরণ করার কোনো বাসনাই ছিল না দেবতাদের। অসুর অমর হলে তাদের চলবে কেন! সুতরাং এক হীন ষড়যন্ত্রে ও নির্লজ্জ কৌশলে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত হরণ করলেন কুম্ভ। ছুটলেন স্বর্গের দিকে। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশে অসুররাও তাড়া করলেন তাকে। জয়ন্ত নানা কৌশলে তাদের এড়িয়ে যেতে লাগলেন। দেবতারাও নামলেন কুম্ভর ওপর প্রাণান্তকর লড়াইতে। কিংবদন্তী হল, স্বর্গে পৌঁছনোর আগে মোট বারোটি স্থানে জয়ন্ত কুম্ভ স্থাপন করেছিলেন। এর মধ্যে আটটিই দেবলোকে, মাত্র চারটি স্থান মর্তধামে। এই চারটি স্থান হল, নাসিক,

উজ্জয়িনী, প্রয়াগ ও হরিদ্বার। এই চার জায়গাতেই কিন্তু অমৃত চলকে পড়েছিল কুম্ভ থেকে। ফলে পবিত্র হল নাসিকের গোদাবরী, উজ্জয়িনীর শিপ্রা, প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গম ও হরিদ্বারের গঙ্গা।

তবু অমৃত কুম্ভকে রক্ষা করা যায়নি। লড়াইতে দেবতাদের হারিয়ে কুম্ভ দখল করে নিল অসুররা, এককথায় ঠোঁটের কাছে অমৃতের পাত্র, শুধু চুমুক দেওয়া বাকি। কিন্তু মানুষের যেসব রন্ধ্রপথে শনির প্রবেশ তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ রন্ধ্রটিকে কাজে লাগালেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এক অপরূপ মোহিনীর বেশ ধরে এসে ছলাকলায় ফের কুম্ভটি হস্তগত করলেন।

বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে এবং সূর্য মেষ রাশিতে থাকলে হরিদ্বারে কুম্ভের যোগ। বৃহস্পতি মেষ রাশিতে, চন্দ্র সূর্য মকরে এবং তিথি অমবস্যা হলে প্রয়াগে কুম্ভযোগ। নাসিকে কুম্ভযোগ আসে যখন বৃহস্পতি ও সূর্য যান কর্কটে। উজ্জয়িনীর কুম্ভযোগ ঘটে যখন তুলা রাশিতে বৃহস্পতি চন্দ্র ও সূর্যের সঞ্চার ঘটে, এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে। পৌরাণিক যে-কোনো ব্যাপারেই থাকে মতান্তর, বিতর্ক। থাকারই কথা। দেবাসুরের লড়াই বা অমৃত কুম্ভ প্রাপ্তি থেকে গোটা গল্পটাই তো যে কেউ উড়িয়ে দিতে পারে গাঁজাখুরি বলে, কিন্তু এ যে রূপক, এক ঘটনাগুলি নয়, অন্তর্নিহিত বার্তাটিই যে সত্যের বাহক তাও বুঝতে দেরী হয় না।

দেবতাদের একদিন আমাদের এক বছরের সমান। সুতরাং জয়ন্ত যে বারোটি জায়গায় বারোদিন ঘটস্থাপন করেছিল তা বারো বছরের পাল্লা। ক্ষীরসাগরের অবস্থান হিমালয়ের উত্তরে ছিল বলে কিংবদন্তী, অসম্ভব নয়, কারণ হিমালয় যে সমুদ্রগর্ভ থেকেই উত্থিত হয়েছিল তা আজ স্বীকার করে নিতে বাধা নেই। তার উত্তরে কোথাও সমুদ্রের অস্তিত্ব থাকা খুবই সম্ভব। কিছু পূর্বদিকে তো সমুদ্র আছেই। কিন্তু সত্যের সঙ্গে কল্পনা ও আলোকসামান্য গল্প বোনার ক্ষমতা দিয়ে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করেই তো এই সব উপলব্ধির লোকায়ত প্রসার ঘটানো হয়েছিল। জানি অসম্ভব তবু আমার কখনো এইসব পৌরাণিক কাহিনীকে অসত্য মনে হয় না।

নাসিক, উজ্জয়িনী, প্রয়াগ ও হরিদ্বার এই চারটি জায়গাতেই বারো বছর পর পর অমৃত কুম্ভযোগ ঘটে। অর্থাৎ গড়ে তিন বছর পর পর পূর্ণ কুম্ভ যোগ আসছে। তবে নাসিক এবং উজ্জয়িনীর পূর্ণকুম্ভ তেমন নাম-ডাকওলা নয়। নাসিকের গোদাবরী অতি অগভীর নদী, কোথাও কোথাও তা বৃহৎ একটি নালা বলে মনে হবে। সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের অবগাহন অসম্ভব। রামচন্দ্রের বনবাসের পথ পরিক্রমা করতে গিয়ে একদা আমাকে নাসিকে কয়েকদিন অবস্থান করতে হয়েছিল। তখন গোদাবরীর হাল দেখে বড় দুঃখ হয়েছিল মনে। কোনও নদীর মৃত্যু বা মুমূর্ষু অবস্থা আমার সহ্য হয় না। গোদাবরীর প্রতি আমাদের উদাসীন নিষ্ঠুর অবহেলা আমাদের জাতীয় চরিত্রের দৈন্যকেই প্রকট করে দেয়।

উজ্জয়িনীর শিপ্রার হালও খুব সুবিধের নয়। পূর্ণ কুম্ভে সেখানে অবশ্য একটু বেশি ভিড় হয়, কিন্তু হরিদ্বার বা প্রয়াগের সঙ্গে তা একেবারেই তুলনীয় নয়।

পূর্ণকুম্ভ ছাড়া প্রয়াগে অর্ধ কুম্ভের একটা যোগ হয়। হরিদ্বারেও অর্ধ কুম্ভের একটা আয়োজন হয়েছিল বটে, কিন্তু সাধু সমাগম ঘটেনি বলে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সাধু সমাগম ছাড়া কুম্ভ লবণহীন ব্যঞ্জনের মতো। সাধুদের বিচিত্র এবং বিশাল সম্মিলনই কুম্ভমেলার প্রাণ। সকলেই অবগত আছেন, কুম্ভে সাধুদের সমবেত করার এই সাধু উদ্যোগ নিয়েছিলেন ভগবান শঙ্করাচার্যদেব। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁর যে সব প্রচেষ্টা ছিল, তার মধ্যে অন্যতম কুম্ভে সাধু সম্মিলনী। উদ্দেশ্য ছিল, বেদবিগর্হিত আচরণ থেকে মানুষকে বিরত করে তাদের মঙ্গল সাধনের জন্য সঠিক পথনির্দেশ করা। সাধু সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে ভাব বিনিময়ের এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আর কোথায়? যে উদ্দীপনা যে সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে কুম্ভ সম্মিলনীর প্রবর্তন তা যদি কুলক্ষণে সাধু আর উদ্দেশ্যহীন মানুষের হুজুগে হট্টরোলে পরিণত হয়ে থাকে তবে সে দায় শঙ্কারাচার্যের নয়।

বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো আর বাঙালীকে হরিদ্বার চেনানো একই কথা। কাশী এবং হরিদ্বার বাঙালীর চষা ভূমি। সারা বছর এসব জায়গায় বাঙালীদের আনাগোনা, বাঙালীদের বসতেরও অভাব নেই। পুণ্য স্থান বলেই শুধু নয়, এই হরিদ্বার হয়ে হিমালয়ের রম্য স্থানগুলিতে যাওয়া সহজ। হরিদ্বারকে ঘাঁটি করে নিলে

অনেক সুবিধেও। ভ্রমণবিলাসী বাঙালী এখানে আসে হাজারে হাজারে। হরিদ্বারের 'হর কি পৌড়ি।' থেকে কনখল অবধি বিস্তৃত ভূভাগ তাদের নখদর্পণে।

কনখলের এক অবাঙালী পুস্তক বিক্রেতা পরিষ্কার বাংলা ভাষায় আমাকে ডেকে বলেছিল, 'নিয়ে যান হরিদ্বার গাইড বই, বাংলা বই আছে।' কৌতূহলী হয়ে তার কাছ থেকে একটি ছোটো বই কিনে ফেললাম। লেখক অবাঙালী, নাম নাথজী। অবাঙালীর লেখা বাংলা বইখানিতে ভাষার যে জগাখিচুড়ি ঘটেছে তা আমার ভারী মিষ্টি লাগল। একটু উদ্ধৃতি দিই 'হরিদ্বার বলুন অথবা হরদ্বার বা...আর কিছুই! এই বিবাদাস্পদ বিষয়টা আমাদিগকে পূর্ণ রূপে বিবেকী মানুষ এবং অধি বক্তা, শৈব ও বৈষ্ণব, সন্ত মহাৎম্য আর মঠাধীশ এবং মণ্ডলেশ্বরদের উপরে তর্ক-বির্তকের জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু এটা নিশ্চয় রূপে বলা যায় যে এটা একটা দ্বার—একটা স্বর্গদ্বার, একটা ভগবদ ধাম! জানেন কেন? কারণ পরম পুনীত, পূণ্যসলিলা, পতিত পাবনী গঙ্গা নিজের প্রচণ্ড রূপ ছেড়ে সর্ব্ব প্রথম এইখানেই শান্তরূপে প্রবাহিত হয় এবং হিমালয়ের হিমাচ্ছাদিত পর্ব্বত শৃংঙ্খলাও এইখান থেকেই আরম্ভ হয়। গঙ্গার সুরম্য তট, সুরভিত বাতাবরণ, নৈসর্গিক সৌন্দর্য, ঋষি মুনিদের তপশ্চর্য্যার প্রভাব, ত্যাগ ও পরোপকারের ভূমি, স্যাত্বিক বিহার, শান্ত চিত্তবৃত্তি এই সবগুলি একত্রিত হয়ে কোনোই সাংসারিক প্রাণীর আত্মবিমোচন করতে পারে। অতএব এখানে এসে প্রাণী সহজেই প্রাকৃতিক ও সার্ব্বভৌম সত্তার বিশেষ প্রভাবটাকে ভাবিবার জন্য বাধ্য হয়ে যায়। সন্ধ্যার সময় শ্রীভাগীরথী-গঙ্গার শংখ ও ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে আরতি তার মনকে ঝংকৃত করে দেয়—ও আত্মার পর শান্ত সুরম্য বাতাবরণের প্রভাব একটা অজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের দ্বার খুলে দেয়, যাহার দ্বারা প্রাণী মাত্র স্বয়ংকে ঈশ্বরের সমীপে অনুভব করে। কিন্তু এত ভাবুক যেন না হয়ে যায়ৎ রাজা ভগীরথকে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও ধন্যবাদ দেওয়া এখানে আবশ্যক, যার কঠিন তপস্যা ও হিমালয় পর্ব্বত-সর্ব্বেক্ষণ থেকে গঙ্গাকে সর্ব্বসাধারণের প্রাপ্ত করেছে। এই মহান কার্য্যে রাজা ভগীরথের সাহায্যে কৈলাশনিবাসী শ্রীশঙ্কর করেছিল। এনে আবার একটা বিবাদাস্পদ বিষয় হয়ে যায় যে এই কাজ অভিযান্ত্রিক ও তকনীকী ছিল অথবা ধার্মিক ও আধ্যত্মিক। আমি আবার এইটাকে বিবেকী মানুষদের চর্চ্চার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি।'

অনেকটা কমলকুমার মজুমদারের ভাষার মতো, তবু বেশ জোরালো আর প্রাঞ্জল। বর্ণনার বাড়াবাড়ি থাকলেও হরিদ্বার সম্পর্কে ভক্ত মানুষদের ধারণা একই রকম। এ এক পবিত্র দেবভূমি কোন এবং আধ্যাত্মিক লোকের দুয়ার। গরুড় পুরাণে সপ্ত মোক্ষদায়ক তীর্থের মধ্যে হরিদ্বার একটি। 'অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরীদ্বারা বতী দৈব সপ্তেতে মোক্ষদায়কঃ।।' হরিদ্বারকে হরদ্বার বা মায়াপুরী নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। 'হরি' না 'হর' এটাও এক ঘোরতর 'বিবাদআস্পদ' ব্যাপার। শৈব বৈষ্ণবে এই নিয়ে লড়ালড়িও বড় কম হয়নি। তবে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন প্রধানের সঙ্গেই হরিদ্বারের সম্পর্ক ছিল। রাজা শ্বেত তপস্যা করে ব্রহ্মার বর লাভ করেন এবং এই স্থানকে ব্রহ্মপুর নামে আখ্যায়িত করেন। ব্রহ্মকুণ্ড তারই স্মারক বহন করছে। শিবালিক বা মনসা দেবী পর্বতে হয়েছিল শুম্ভ নিশুম্ভের সেই ঘোরতর যুদ্ধ। হরিপুর খুর্দ-এর দিকে এগিয়ে গেলে সপ্ত ঋষির আশ্রম, যেখানে কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, অত্রি, গৌতম, জমদগ্নি এবং বশিষ্ট তপস্যা করেছিলেন। সপ্ত ঋষির সম্মানে গঙ্গাকে কোনো প্রাগৈতিহাসিক কালে সপ্ত ভাগে ভাগ হতে হয়েছিল এইখানে। এখান দিয়েই একদা পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণে গিয়েছিলেন। ভীমগোড়া সেই সাক্ষ্য বহন করছে। এইখানেই ছিল খাণ্ডব বন, পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সময় যেখানে আত্মগোপন করেন। এসেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও মহাত্মা বিদুর। এই পথেই হৃষিকেশ গিয়েছিলেন ভরত, যার নামে একটি মন্দির সেখানে বিদ্যমান। বদ্রীনারায়ণ যাত্রার পথ এখান থেকেই শুরু। অতএব তাঁর হরি নাম থেকে জায়গা হরিদ্বার হয়েছে। শিবের পরম ধাম পঞ্চকেদার দর্শনের জন্য শৈবরা এই পথ দিয়েই যান, সুতরাং এর হরদ্বার হতেও বাধা নেই। আর গাঙ্গোত্রী থেকে বেরিয়ে পর্বতসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে সর্বপ্রথম সমতলে প্রবাহিত হলেন গঙ্গা এইখানেই। সুতরাং গঙ্গাদ্বার বললেও বলা যায়। তবু এটা 'বিবাদাস্পদ' ব্যাপারই হয়ে আছে। থাকবেও।

এমনিতে হরিদ্বার শহর ছোটো। হরি কি পৌড়ি থেকে রেলস্টেশন এবং পশ্চিম দিকে আরও খানিকটা পর্যন্ত শহরের বিস্তার। গঙ্গা নহর পেরিয়ে হরিপুর খুর্দ অবধি শহরের আর একটি ভাগ। শিবালিক পর্বতমালা আর চণ্ডী পাহাড়ের মাঝখানে প্রবাহিনী গঙ্গা উপত্যকায় এই মনোরম শহরটি বহুকাল ধরে বিশ্ববাসীকে আকর্ষণ করছে। মনোরম বললাম এর অবস্থানগত প্রাকৃতিক বাতাবরণের জন্য, নইলে ভারতবর্ষের আর পাঁচটা তীর্থক্ষেত্রের মতোই শহরটি নোংরা, ঘিঞ্জি, গলিঘুঁজিতে ভরা। অসাধু ব্যবসায়ী, চোর, পকেটমার, ছিনতাইকারীর অভাব নেই, কোথাও কমতি নেই ভিখিরি, বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠরোগীর। ভয় ছিল, এই ছোট্ট শহর কী করে পূর্ণকুম্ভের বিশাল জনস্রোতকে সামলাবে। প্রায় তিনমাস স্থায়ী কুম্ভ পর্বের শুরু ফেব্রুয়ারিতে, শেষ এপ্রিলের অন্তে। শিবরাত্রির পর প্রধান স্নানযোগ গেছে অমাবস্যায়। আগত মকর সংক্রান্তি। উত্তরপ্রদেশ সরকারের আশা ও আশঙ্কা, এই স্নানযোগে সত্তর লক্ষ লোকের আগমন ঘটবে। সকলেরই লক্ষ হরি কি পৌড়ি বা ব্রহ্মকুণ্ড। ওইখানে স্নান করলেই মোক্ষলাভ।

বাঙালী উচ্চারণে বরাবরই হর কি পৌড়ি শোনার হর কি প্যারি। ভারী রোমান্টিক নাম। প্যারি বা পিয়ারি শুনলে কার না রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু পৌড়ি শব্দটির অর্থ ঘাটের সিঁড়ি। নিতান্তই অ-রোমান্টিক ব্যাপার। হর বা হর কি পৌড়ির ব্রহ্মকুণ্ড বহুকাল আগেই শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছিল। বালি খুঁড়ে জল বের করে পুণ্যার্থীরা তা গায়ে ছিটিয়ে নিতেন। চণ্ডী পাহাড়ের পাদদেশ ছুঁয়ে নীলধারা নামে আখ্যাত গঙ্গার প্রবাহ বয়ে গেছে। ব্রহ্মকুণ্ড থেকে তা অনেকটা দূরে। ব্রহ্মকুণ্ডকে জলসিক্ত করতে সপ্তধারায় বাঁধ দিয়ে শহর দিয়ে জল প্রবাহিত করায় ব্রহ্মকুণ্ড এখন জলময়, স্রোতোময়ী। স্রোত মেল ট্রেনের মতোই তীব্র। তবে গভীরতা খুবই কম। ডুবজলও নয়। এই নহর আর নীলধারার মাঝখানে বিশাল ভূখণ্ড বেলওয়ালা, চণ্ডী এবং পন্ত দ্বীপ নামে চিহ্নিত। রাড়ি বেলওয়ালার মাঝখান দিয়েও বয়ে গেছে গঙ্গার আর একটি ধারা। ভীমগোড়ায় বাঁধ দিয়ে এই ধারাটিকে আটকানো হয়েছে, ফলে খালটি শুকনো। বর্ষায় যখন গঙ্গা প্রলয়ংকরী রূপ নেয় তখন এই ধারাটিকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। জলমধ্যবর্তী এই ভূখণ্ডেরই পশ্চিমে কনখল। কনখল থেকে হরিদ্বার হয়ে সেই হৃষিকেশ অবধি মন্দির, আশ্রম, আখড়া অগুন্তি, অশেষ। তারই মাঝে মাঝে সাধারণ মানুষের বসত, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ধর্মশালা, দোকান বাজার, পুলিশ ফাঁড়ি।

সাতাত্তর সালে প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল হরিদ্বারে এসে তা বহুদূর বিস্তারিত হয়ে গেল। প্রয়াগের মাঠ যত বড়ই হোক তবু তার পরিমাপ করা যায়। হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভের সমাবেশ যে কী বিশাল এবং কত দূর বিস্তৃত তার কিনারা করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। বিস্ময় অবিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

এপ্রিলের সাত তারিখে হরিদ্বারে এসে প্রথমটায় আঁচ করতে পারিনি, এবারকার মেলার বিশালত্ব। ক্রমে ক্রমে ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে গেছে। এ এক মানুষের বৃহদারণ্য। একদিকে শিবালিক ও অন্যদিকে চণ্ডী পাহাড় অবধি বিশাল উপত্যাকায় দুটি নদীর তট জুড়ে এবং হৃষিকেশের রাস্তার দু'পাশে মাইলের পর মাইল শুধু নানা আকারের তাঁবু আর ছাউনি। পশ্চিমে কনখল অবধি কেবলই নজরে পড়বে মানুষের অস্থায়ী বসত। অসংখ্য। অগুন্তি। আর এই বিশাল মানুষের মেলায় যাতে অলক্ষে সঞ্চার না ঘটে মহামারীর, সেই জন্য সারা শহরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় যত্রতত্র ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্লিচিং পাউডার, জলে মেশানো হচ্ছে অতিরিক্ত মাত্রায় ক্লোরিন, গভীর রাতে কয়েকটা ভূতুড়ে গাড়ি এক অদ্ভুত যন্ত্রণার শব্দ করতে করতে সারা শহর ভরে দিচ্ছে কীটনাশকের ধোঁয়ায়। হরিদ্বারে একটিও মশা বা মাছি খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন। রোগ-বালাইও বলতে গেলে, নেই। আর ভীড়ের মধ্যে ব্লিচিং পাউডারের মতোই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পুলিশ, হোমগার্ড, আধা সামরিক বাহিনীকে। সর্বত্রই লাঠি আপসে তারা মানুষকে তাড়া করছে, ধমকাচ্ছে, এ রাস্তা থেকে ও-রাস্তায় চালনা করছে। তাদের তৎপরতা আসলে ভয় থেকে। এই অলৌকিক ভিড় দেখে তারা আমূল ঘাবড়ে গেছে, আগে থেকেই চাপিয়ে রাখতে চাইছে নিজেদের অবিসংবাদী কর্তৃত্ব। যাতে প্রধান স্নানের দিন মানুষের বন্যাকে সামলানো যায়।

ভীড়ের কোনো চরিত্র নেই, ব্যক্তিত্ব নেই, শৃঙ্খলাবোধ বা মায়াদয়া নেই। সাধুদের বেলায় তা আরও প্রকট। লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিন থাকতে নয়, এই সত্য যে তাদের ক্ষেত্রে কতটা ফলিত তা কুম্ভে এলে বোঝা যায়। সভ্যতা ভব্যতার বালাই তাদের নেই, মেজাজ প্রভূত মাত্রায় উগ্র, বেপরোয়া, হিংস্র। উলঙ্গ সাধুরা যখন মিছিল করে বোরোয় তখন তাদের হাবভাব দেখলেই বোঝা যায় সামান্য উসকানি পেলেই তারা যে-কাউকে শূলে গেঁথে ফেলতে বা মাড়িয়ে যেতে দ্বিধা করবে না। শিখ উগ্রপন্থীদের চেয়েও এদের সম্পর্কেই পুলিশের ভয় বেশি। আদিম গুহামানবের মতো লম্বা জটা চুলদাড়ি ও নতমুখ নুঙ্কু সমেত তারা যখন পথ পরিক্রমা করে তখন আমাদের পারিপার্শ্বিকটাই যেন আদি প্রস্তরযুগে ফিরে যেতে থাকে। শূল ও লাঠির ঘায়ে তারা যে কতজনের ক্যামেরা ভেঙেছে তার হিসেব নেই। আবার এই আদিম গুহামানবদেরই দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থাতেই স্কুটার বা মোপেড চালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘুরছে ঘোড়ার পিঠে চেপেও, আখড়ায় বসে শুনছে টু-ইন-ওয়ান-এ হিন্দি গান, প্রেমসে টানছে ভক্তের দেওয়া কিংস বা ক্ল্যাসিক সিগারেট। গাঁজা, মদ, গুলি, চরস, ভাঙ, চা, কোনো কিছুতেই অরুচি নেই। সাধুরা যে কুলক্ষণে হয়ে গেছে তাতে আর সন্দেহ কী?

তবু কুম্ভ মানেই সাধু। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় গঙ্গাদ্বীপ থেকে মাইল দু-তিন দূরে সুইস কটেজে আমার আস্তানা ছিল। রোজ সকালে হেঁটে গঙ্গাদ্বীপে সাধুদের আখড়ায় চলে যেতাম। সারাদিন কাটত আখড়ায়, আখড়ায়। সাধুরা নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেও। সন্ধে বা অনেক রাত অবধি বসে বসে শুনেছি তাদের জীবনবৃত্তান্ত, বৈরাগ্যের কারণ, সন্ন্যাসের ইতিহাস। সাধুদের উচ্চাকাঙ্খা, ক্যারিয়ারিজম, গুরুত্যাগ ইত্যাদির কথা তখন লিখেছিলাম। লিখেছি তাদের ক্লেশদায়ক পরিক্রমার কথাও। কিন্তু সেই নিরন্তর একগুঁয়ে সাধুসঙ্গ করার পিছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল এই অধ্যাত্ম-জীবনে তাদের প্রাপ্তির কথা জানা।

আজও সেই জিজ্ঞাসার জবাব মেলেনি। নম্র বৈষ্ণব, প্রশান্ত শৈব, চঞ্চল নানকপন্থী কাউকেই বাদ রাখিনি।

হর কি পৌড়ি যাওয়ার পথে প্রধান রাস্তার ওপরেই এক সারি বাড়ির পিছনে একটি চত্বরে পঞ্চ অগ্নি দশনামী জুনা আখড়ায় এবারও হানা দিয়েছি।

সন্ধে পেরিয়ে গেছে। ঢোকার মুখেই পাহারাদার গোছের কয়েকজন বস্ত্রাবৃত সাধু পথ আটকানোর মৃদু চেষ্টা করেছিল। এড়ানো কঠিন হল না। সাধু দর্শনে যাবো, এর চেয়ে বিনম্র অজুহাত আর কী হতে পারে? সাধুরাও দর্শনার্থীদের পছন্দ করে, যদি তারা স্পর্ধিত কৃপণ কিংবা উচ্চকণ্ঠ না হয়। সাংবাদিক সঙ্গীদের শিখিয়ে দিলাম, প্রণাম ইজ এ মাস্ট। ইন্টারভিউ নেওয়ার মতো করে প্রশ্ন কোরো না, ভক্তের মতো কোরো। কিছু দিও।

তবু ঢোকার মুখেই বিপত্তি। ফটকের ভিতরে আধা-অন্ধকার, জলে থিক-থিক করছে। সাধুরা এখানে বর্তন ধোয়, আঁচায়। এক বাচ্চা সাধুর পিঠে কার যেন টর্চের গুঁতো লাগল। কিশোর সাধু ফুঁসে উঠল তৎক্ষণাৎ, বাবু, কিঁউ মুঝকো মারা? অপরাধী লজ্জিত মুখে বললেন, লাগ গিয়া বাবা, মারা নেহি। আগর মারা হ্যায় তো তুম ভি মুঝে মারো।

বাচ্চা সাধু আর ঝামেলা বাড়াল না। একটু হাসলও।

একা সাধুসঙ্গ করা একরকম, দল বেঁধে গেলে অন্যরকম। সকলেই সাংবাদিক। বিভিন্ন কাগজে তারা প্রতিবেদন লিখবে। যা কিছু খুঁটিনাটি দেখবে বা শুনবে তাই লিখে দেবে। এক্সক্লুসিভনেস-এর আশা করা বৃথা। সবচেয়ে সমস্যা হল, আমি ছাড়া কারও সাধুসঙ্গ করার অভিজ্ঞতা নেই। প্রত্যেকেই খানিকটা ভীত, সঙ্কুচিত, অনভ্যস্ত পরিবেশে অস্থিরমতি। তাদের দোষও নেই, সাধুরা রক্তচক্ষু। সন্দেহসংকুল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বেশির ভাগ চোখই অতিকায় ক্ষুরধার। তাতে আমন্ত্রণ নেই, ক্রোধ ও বিরক্তি আছে। সকলেই আমাকে সামনে ঠেলে দিচ্ছে। একজন ভীতু ফটোগ্রাফার তার বিশাল ক্যামেরার ব্যাগটি লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

প্রণামীর মতো সফল চাবি আর কিছু নয়। প্রণামী সব সাধুকেই নরম করে কাদামাটির মতো মেখে ফেলে। সেই সঙ্গে একটি নিরহংকার প্রণাম। একটু সরল হাসি, জোড়হাত, সামান্য গদগত ভাব।

একজন তরুণ-দর্শন সাধুকে এই ভাবেই পটানো গেল। সাধু প্রসন্ন হয়ে বলল, বোলো বেটা, কঁহা সে আ রহে হো।

হিন্দিতে বললাম, কলকাতা থেকে। দর্শন তো মিলল, এবার কিছু উপদেশ দিন।

সাধু হিন্দিতে বলল, আমার কাছে কী শুনবে? ওই যে আমার গুরুজী বেদীর ওপর বসে আছেন, ওঁর কাছে শোনো। কিন্তু ঝট করে যেও না। আগে প্রণাম করো, প্রসন্ন করো, তারপর কথা বলবে।

কত বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়েছেন আপনি?

কত হবে, চব্বিশ।

তাহলে এখন আপনার বয়স কত?

চুয়াল্লিশ।

চুয়াল্লিশ! কই, মনে হয় না তো!

হাঃ হাঃ, আমাদের বয়স! সংসারীরা কী বুঝবে তার। গুরুজীর বয়স কত জানো? চার পাঁচ শ' বছর।

গুরুজী একজন গিরি। জটা ও দাড়ি মিশমিশে কালো, ছিপছিপে পাকানো শরীর। চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ। প্রণাম করতেই জিজ্ঞেস করলেন, ক্যা কাম করতে হো?

পত্রকার।

গুরুজী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে হিন্দিতে বললেন, বলেছিলাম কিনা, এরা পত্রকার!

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি যে খবরের কাগজের লোক তা দেখেই বুঝেছি। এদেরও বলেছিলাম, দেখে মনে হচ্ছে এরা পত্রকার।

আপনারা ত্রিকালদর্শী, সবই তো জানেন।

সন্ন্যাস নিয়ে কথা উঠল। কী করে ঘটল আপনার সন্ন্যাস? কী করে মিলল গুরু?

এই যে তুমি, বলো তো তুমি কি করে এসে গেলে আমার কাছে? এইভাবেই ঘটনা ঘটে যায়। প্রারব্ধ। আমারও ঘটে গিয়েছিল। সেই কোন বালক বয়সে, দুধের দাঁতও বুঝি ভাল করে পড়েনি, জীবনে লেগে গেল বৈরাগ্যের রং। এক রমতা যোগীও এসে গেলেন। ব্যস, শুরু হয়ে গেল এই জীবন।

আচ্ছা, নাগা সাধুদের মধ্যে বাঙালী নেই?

থাকবে না কেন? অনেক আছে।

এখানে আপনাদের আখড়ায় আছে?

না। তবে আছে। খুঁজে দেখলে পেয়ে যাবে।

আখড়ার পর আখড়ায় যান, সাধুর পর সাধুর সঙ্গে কথা বলুন, দেখবেন মোটামুটি বাল্য-কৈশোর-যৌবনেই এরা সন্ন্যাস নিয়েছে। বেশির ভাগই অনপড়, গাঁওয়ার, আনাড়ি মানুষ। সাক্ষরতা সম্পন্ন সাধুর সংখ্যা হাতে গোনা যায়। খুব ভাল করে খুঁজলে দেখা যাবে এদের অনেকেই স্বাভাবিক গার্হস্থ্য জীবনে পেটের অন্ন জোটাতে পারত না, কিংবা পেয়েছিল কোনো গভীর শোক কিংবা ভোগ করছিল হতাশা। খুঁজলে ফেরার, খুনী, ডাকাত, অপরাধী যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি পাওয়া যাবে অসহায় বোকা অপদার্থ লোকও। জটাজুট, দাড়ি গোঁফ, বিভূতি ও নগ্নতা এক অতিশয় ধূর্ত ছদ্মবেশ। এর আড়ালে অনেক কিছুই লুকোনো যায়।

তবু সকলেই তা নয়। একজন সাংবাদিক আখড়ার এক বুড়ো সাধুকে তাঁবুর বাইরে থালি ধোওয়ার সময় একা পেয়ে একটু খেজুরে আলাপ করতে গিয়েছিল। কাঁহা সে আ রহেঁ হেঁ? কিউঁ সন্ন্যাস লিয়া? গোছের প্রশ্ন। সাধু কানে খাটো, বোধহয় একটু জড়বুদ্ধিও। প্রশ্ন শুনে 'আঁ আঁ' করতে লাগল। পিছনে বিশাল-বপু এক গুরুজী চা খাচ্ছিল, শিষ্যের করুণ অবস্থা দেখে বাজখাঁই গলায় সেই তরুণ সাংবাদিককে এক পেল্লায় ধমক, কিঁউ ডিসকাস করতা হ্যায়? অ্যাঁ? যাও হিঁয়াসে, রাস্তা সিধা হ্যায়।

সাংবাদিক ভড়কে পিছিয়ে এল। তারপর উত্তেজিত গলায় বিড়বিড় করতে লাগল, জানি সব ব্যাটা জালি। বোমা মেরে উঁড়িয়ে দেওয়া উচিত শালাদের। ফোরটুয়েণ্টি কোথাকার।

এরকম প্রতিক্রিয়া এ বয়সে স্বাভাবিক। তাকে ঠাণ্ডা করার জন্যই পিঠে হাত রেখে বললাম, ঘাবড়াবার কিছু নেই। সাধুদের তাড়া আমি বহু খেয়েছি। সকলেই ওরকম নয়।

সে উত্তেজিত গলায় বলল, জালি, জালি। এগুলো আবার সাধু নাকি? সাধুফাদু সব বাজে ব্যাপার। প্যারাসাইটস, নন প্রোডাকটিভ এলিমেণ্টস, অসভ্য।

বিশাল আখাড়া-চত্বর দিয়ে যেতে যেতে তাকে বোঝানোর নানা চেষ্টা করছি, কিন্তু অপমানিত ক্ষুব্ধ সাংবাদিক তখন স্থানত্যাগের জন্য হনহন করে আগে আগে হাঁটছে।

ঠিক এই সময়েই খোলা আকাশের নিচে ধুনির সামনে উপবিষ্ট দিগম্বর এক তরুণ নাগা আমাদের সবাইকে ছেড়ে তাকেই ডাকল, আরে ইধর আও বেটা। আও না। ডরনে কো কোই বাত নহি, আ যাও।

কিন্তু ক্ষুব্ধ সেই যুবা তখন একটু অপ্রতিভ এবং ভীতও বোধ করছে। একবার সাধুর দিকে সন্দিহান দৃষ্টিক্ষেপ করেই সে চলে যাচ্ছিল। তার হাত চেপে ধরে থামিয়ে বললাম, এ যখন ডাকছে তখন একটু বসেই যাই চল। আর যাই হোক, এ তো বকবে না। বোধহয় মারবেও না।

পিছনে তাঁবু, সামনে একটা চৌকো গর্তে ধুনি জ্বলছে। সাধু মানেই ধুনি। যতক্ষণ বসে ততক্ষণ নিরন্তর তা জ্বলবেই। পাশেই ঊর্ধ্বমুখ কয়েকটা ত্রিশূল মাটিতে গাঁথা। ধুনির তিন দিকে তিনখানা অপরিসর চাটাই।

থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের সঙ্গে দেখা এখানেই। সাধুর দুই প্রধান চেলার মধ্যে একজন বামনবীর, অন্যজন ঊর্ধ্ববাহু। বামনবীর অতিশয় অতিথিবৎসল। ছোটো ছোটো হাত-পা সবেগে নেড়ে সে আমাদের আসন গ্রহণ করতে বলছে, মুখে খুবই প্রশ্রয়ের হাসি, আরে বৈঠো, বৈঠো, গুরুজীসে মিলো। কাম বনেগা।

আমাদের সঙ্গী ফটোগ্রাফার কিছু ভাবপ্রবণ লোক। প্রণাম করতে সাষ্টাঙ্গে একেবারে শুয়ে পড়লেন মাটিতে। তারপর কে জানে কেন, নাগা গুরুজীর সারা ভারতবর্ষের ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পায়ের ওপর মুখ ঘষতে লাগল। কণ্ঠ রুদ্ধ, চোখে জল। তাঁকে বহু কষ্টে তুলতে হল মাটি থেকে। তবে তার ওই ভাবাবেগ দেখে গুরুজী প্রসন্ন। কুণ্ড থেকে ভস্ম তুলে আমাদের কপালে তিলক এঁকে দিলেন একে একে।

আমাদের একজন একটু তরল কণ্ঠে বলে উঠলেন, সপ্তমী চড়াও বাবা, সপ্তমী। এই লেও পাঁচ রুপোয়া।

বামনবীর হাঁ-হাঁ করে উঠে বলল, জরুর।

তার তৎপরতা দেখার মতো। চোখের পলকে অন্ধকারে হাত গুঁজে ছোটো গাঁজার কল্কে বের করে আনল সে। সযত্নে সেজে ফেলল। ধুনির আগুনে প্রজ্জ্বলিত কলকে ঘুরতে লাগল হাতে হাতে।

আমি সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করি, এক ফোটো খেঁচেগা বাবা?

কিউ নেহি? লে, খিঁচ লে?

কিন্তু মুশকিল ফটোগ্রাফারকে নিয়ে। ভদ্রলোক ভীতু, নার্ভাস, তার ওপর ভাবাবেগে ভাসমান। ফটো তোলার কথায় রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন, বাবার ন্যাংটো ফটো তুলতে পারব না। না, অসম্ভব। পাপ হবে।

বাবা স্বয়ং রাজি, রাজি কেন আগ্রহই দেখাচ্ছেন, কিন্তু ফটো খিঁচনেওলার অবস্থা খুবই করুণ। অনেক কষ্টে তাকে রাজি করালাম বটে, কিন্তু বামনবীর ঊর্ধ্ববাহু ও গুরুজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পোজে বসা আমাদের সেইসব ছবি নাকি ওঠেনি শেষ অবধি।

ফ্ল্যাশ লাইট ঝলসেছিল ঠিকমতোই। ফিলমও ঘুরেছিল। কিন্তু ফটোগ্রাফার ভদ্রলোকের ধারণা গুরুজীর যোগ বিভূতির ফলেই ফটো ওঠেনি।

রাত বাড়ছে। ধুনির আগুনে রুটি সেঁকা চলছে আখড়ায় আখড়ায়। তাঁবুর নিচে সাধুরা সেবায় বসেছে। খাবার নিতান্তই তুচ্ছ। রুটি এবং ঘ্যাঁট, সঙ্গে ভক্তদের দেওয়া ফল বা মিষ্টি।

পরম নিশ্চিন্তে বিভিন্ন তাঁবুর অভ্যন্তরে প্রায়ান্ধকারে সাধুদের গা ঘেঁষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে অস্ফুট গলায় আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে সাহেব ও মেম। গায়ে উলোঝুলো পোশাক, ঘিনপিতের বালাই নেই, বায়নাক্কা নেই।

তারা ধর্মপিপাসু, গুপ্তচর, মতলববাজ সংবাদশিকারী যাই হোক, আমাদের চেয়ে তারা অধিকতর অনায়াসে সাধুদের ঘনিষ্ঠতম চক্রের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। সাধুরাও জানে ডলারের দাম এবং বিদেশীদের বদান্যতার কথা। কুম্ভমেলা বা এখনকার যে কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠানে সাহেবদের আগমন কেন এত বেশি ঘটে তা গবেষণার বিষয়। হয় তারা হুজুগে, নয়তো ভারত সম্পর্কে আগ্রহী, কিংবা তারা ভারতীয় সংস্কৃতি অভিসারী। যাই হোক সাহেবদের আগমন ঘটে হাজারে হাজারে। হরিদ্বারের প্রতিটি হোটেল, আশ্রম, আস্তানা, বিদেশীতে ঠাসা। তাদের হাতে হাতে ঘুরছে দুর্দান্ত দামী স্টিল ও মুভি ক্যামেরা, ছোট ক্যাসেট রেকর্ডার। লক্ষ্য করেছি একটা ব্যাপারে তারা সাঙ্ঘাতিক সতর্ক। তেষ্টায় বুক ফেটে গেলেও তারা সাদা জল খাবে না। সর্বদাই এমন কি খাওয়ার সময়েও তারা খাচ্ছে সফট ড্রিংকস। হরিদ্বারে এবারকার উত্তপ্ত কুম্ভে এই জিনিসটিই বোধ করি বিক্রি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এই মাদক-নিষিদ্ধ আমিষ-বর্জিত শহরে বিদেশীদের আমি কখনও প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে দেখিনি। সে কাজ ভারতীয়রা করেছে। সাধুরাও টেনেছে গাঁজা, চরস, গুলি, ভাঙ। কে তাদের ধরবে? নাঙ্গা সে খুদা ভি ডরতে হেঁ।

আমরা যাঁর কাছে ভিড়লাম তিনি হরিভারতী নাগাবাবা। তাঁর ঠিকানা, হনুমান মন্দির, গরজাল। হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার লোরপুর তহশিলে সদুযাঁতে তাঁর স্থায়ী আখড়া। তবে কদাচিৎ সেখানে অবস্থান করতে পারেন। সারা বছর নিরন্তর চলেছে পরিক্রমা এবং চরবৃত্তি। যেখানেই যোগ ঘটছে সেখানেই চলে যাচ্ছেন সদলবলে।

সাতাত্তর সালে প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভে সাধুদের সঙ্গে মিলেমিশে এই একই ব্যাপার দেখেছি। হিমালয়ের অভ্যন্তরে নির্জন তুষারাবৃত গিরিগুহায় বিরলে কারা তপস্যা করেন জানি না, কিন্তু এইসব সাধুরা সারা বছরই পরিক্রমার পথে চলেছে। দলবদ্ধভাবেই এরা থাকে। পারস্পরিক বোঝাপড়াও চমৎকার নিজেদের মধ্যে।

কিছুক্ষণ বসবার পর উঠে পড়তে হল। রাত বাড়ছে। সাধুরা খাবে, শোবে। তাদের ভোররাত্রে উঠতে হয়।

হরিদ্বারে পা দেওয়ার তৃতীয় দিন অমাবস্যার যোগ। পুণ্যস্নান। আতঙ্কিত প্রশাসন আগে ভাগেই ব্যবস্থা নিয়েছে নানারকম। তার মধ্যে প্রধান হল পুলিশের তৎপরতা। উত্তরপ্রদেশ ঝেঁটিয়ে পুলিশ আনা হয়েছে হরিদ্বারে, তৎসহ আধা সামরিক ও সামরিক বাহিনী। আছে স্কাউট, গাইড, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। কিছু পুলিশের অধিকাংশই হরিদ্বার শহর ভাল চেনে না। তাদের কাছে রাস্তা জিজ্ঞেস করলে অম্লানবদনে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দেয়। সারাদিন তাদের কাজ হল লাঠি আস্ফালন করে পথচারীদের কিপ টু দি লেফট এবং শৃঙ্খলা শেখানো। কিন্তু যে জনবন্যা স্টেশন এবং বাস আড্ডা থেকে শহরের দিকে বয়ে আসছে তার অপ্রতিহত গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং বশে রাখা খুব উঁচুদরের প্রশাসনিক দক্ষতা ছাড়া সম্ভব নয়। এপ্রিলের আট তারিখে ভোরবেলা উঠে হোটেলের বারান্দা থেকে হরিদ্বারের প্রধান সড়কটির দিকে তাকিয়ে আমারও আতঙ্ক হচ্ছিল। বাস্তবিক সত্তর লক্ষের আগমন ঘটবে যে হুঁশিয়ারি ছিল এতো দেখছি সে হিসেবকে ছাড়িয়ে যাবে। স্টেশনের উল্টোদিকে বড় রাস্তার ওপরে আমাদের হোটেল। রাস্তার দিকেই আমার ঘর এবং সামনে ব্যালকনি। ফলে হরিদ্বারে প্রবেশের প্রধান ফটকটি আগলে বসে আছি। অবস্থানগত এই সুবিধে ভোগ করছি বটে, কিন্তু নিচের ওই জনস্রোতে গা ভাসিয়ে না দিলে কিছুতেই এই কুম্ভের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাবে না। আমি জনতার একজন, এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে, অতএব ভীড়ের মধ্যে নেমে যাওয়া গেল।

ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলে এবং প্রবল জনস্রোতের টানে ভেসে যেতে থাকলে ধীরে ধীরে অহংবোধ সংকুচিত হয়ে যেতে থাকে। মিলিয়ে যেতে থাকে আত্মপরিচয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা। ক্রমে এক জান্তব আমিতের জৈব বোধ ছাড়া মানুষ তার ব্যক্তিগত ইতিহাস আদ্যন্ত হারিয়ে ফেলতে থাকে। আমি কোন তালেবর, তার আর ভেবে দেখতেও ইচ্ছে যায় না। আগে যে চলেছে, পাশে যে রয়েছে, পিছনে যে আসছে তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী, মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্ত আকিঞ্চন,

ভাষা আলাদা, ধর্মবিশ্বাসে পার্থক্য, রুচি পোশাক আভিজাত্যের পার্থক্য তো ছেড়েই দিলাম। এক অনিবার্য নিয়তি এই বিভিন্ন 'আমি'কে মেশাচ্ছেন একপাত্রে। ঘুঁটছেন, মন্থন করছেন, মিশিয়ে দিচ্ছেন।

ভীড়ের মধ্যে পাক খেতে খেতে এইভাবেই মূল রাস্তা ছেড়ে মোতি বাজারের সংকীর্ণ গলির মধ্যে গিয়ে পড়ি। বাঁ পকেটে মানিব্যাগ, তাতে কিছু টাকা। সেটা চেপে ধরতেই হয়। শুধু ওইটুকু আত্মবোধ বজায় রেখে ভেসে যেতে থাকি। দমবন্ধ করা গরমে ঘামতে ঘামতে যখন হর কি পৌড়িতে গিয়ে উঠলাম তখন স্নিগ্ধ সজল এক ঝলক বাতাস এসে মায়ের মতো কপালে হাত বুলিয়ে গেল।

তা বলে ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে যে ভীড় কম তা নয়। তবে এখানে অনেকগুলো পুল থাকায় গঙ্গা নহরের মাঝখানে বাঁধানো দ্বীপের মতো চমৎকার চাতাল থাকায় ভীড়টা ছড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। যোগ থাকুক না-থাকুক এইখানে ব্রহ্মকুণ্ডের বিশাল ঘাট ও আঘাটা জুড়ে দিন রাত অবিরাম স্নান চলছে। রাত বারোটা, একটা দুটো তিনটে চারটে যখনই আসুন এখানে, দেখবেন তখনও স্নানের বিরাম নেই। সেই স্নান দেখে ভারী লোভ হতে লাগল। কিন্তু আমার উপায় নেই। পরনে প্যান্ট শার্ট, পায়ে জুতো মোজা। এসব ছাড়লেও গচ্ছিত রাখব কার কাছে? এত মানুষের মধ্যে বিশ্বাসভাজন কাউকে চিনে বের করব কি করে?

সুতরাং রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে স্নানপর্ব দেখতে থাকি। কিন্তু পুলিশ এসে কর্কশ কণ্ঠে 'হঠো হঠো' বলে ছাগল-গোরু তাড়ানোর মতো করে হটিয়ে দেয়। কেন যে হটায় তা তারাই জানে।

ধীরে ধীরে জলের কাছ বরাবর নেমে যাই। বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, চলছে, ঘুরছে, ফিরছে—মানুষ আর মানুষ। সাধুসন্ত গেরস্ত গেঁয়ো শহুরে দেশী বিদেশী। এক অন্তত প্রবাহ চলেছে উৎস থেকে সাগরের দিকে। শুধু সে-ই একমুখী বেগবতী। তাকে উপলক্ষ করেই আসা। আমার, সকলের। হরিদ্বারে দিনের বেলায় এখন বেশ গরম। জলের ধারে এসে বসলে সে গরম আরও ভয়ংকর। কারণ এখানে বাতাসের আর্দ্রতা বেশি। বাতাস তেমন নেই।

স্রোতের মধ্যে অগুন্তি নুড়ি পাথর গড়িয়ে চলেছে। যে কোনো পাহাড়ী নদীর জলেই থাকে, ডিম্বাকৃতি বা গোল মসৃণ ও সুন্দর নুড়ি। তবু হরিদ্বারের নুড়ি পাথরের নীল বেশি। অনেকেই সংগ্রহ করে দিয়ে যায়।

পড়ন্ত বিকেলের আলো যখন জলে গভীর রঙের বিস্তার ঘটাচ্ছে তখন দল বেঁধে হর কি পৌড়িতে এসেছি। আগামী কাল সকালে অমাবস্যার স্নান। প্রচণ্ড ভীড়। হঠাৎ ইচ্ছে হল এই হাজারটা লোক যেমন করছে আমিও তেমনই করলে ক্ষতি কী?

দলে এক বউদি ছিলেন। চমৎকার মানুষ। নিজে শরীর খারাপ বলে জলে নামতে পারেন না। তবে আমাকে বললেন করুন না স্নান। ওই তো ওই একটা লোক বসে স্নানের জাঙ্গিয়া বিক্রি করছে।

এ কথায় কিছু সাহস পেয়ে দশটাকা দিয়ে একখানা জাঙ্গিয়া কিনেই ফেলি। তবে হরিদ্বারের গঙ্গায় নেমে যে দুটি পঙক্তি মাথায় ভেসে এল তা ঈশ্বর গুপ্তের শীত সম্পর্কিত একটি কবিতার। 'জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত, আঁক করে কেটে লয় বাবা।'

বাস্তবিকই এত ঠাণ্ডা জলে নেমে অভ্যাস নেই। নামতেই গোটা শরীর জমে গেল। অথচ দেখতে পাচ্ছি দুদিকের ঘাটেই অসংখ্য মা-বাপ তাদের শিশুদের কোলে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে একসঙ্গে ডুব মারছে।

তিনটে ডুব মারতেই শরীর শক্ত হয়ে গেল ঠাণ্ডায়। অথচ আমার আশপাশ দিয়ে খরস্রোতে ভেসে যাচ্ছে সাঁতারু। স্নানার্থীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে অবস্থান করে বোধহয় কোটি জন্মের যাবতীয় পাপ মিশিয়ে দিচ্ছে গঙ্গা নহরে।

উঠে এসে শুকনো জামাকাপড় পরে নিতেই কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে শরীরে প্রবল ঘাম দিতে লাগল। ভারী ঝরঝরে লাগল নিজেকে।

গঙ্গা নহরের দক্ষিণ ধারটা কাঠের পাটাতন দিয়ে বাঁধ দেওয়া। এরকম প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ আর দেখিনি কোথাও। কাঠের পাটাগুলো লোহার ফ্রেমে আঁটা বটে, কিন্তু তা এমনই ফঙ্গবেনে যে, এই হাজার হাজার টন জলের চাপ কি করে সহ্য করছে তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। স্লুইস গেটওলা পাকা ড্যাম তৈরি হচ্ছে রেড়ি

বেলওয়ালার বাইপাসের ধার ঘেঁষে। যতদিন তার কাজ শেষ না হয় ততদিন এই বাঁধই গঙ্গাকে নহরে ধরে রাখবে, উপচাতে দেবে না।

পশ্চিমে খানিক এগিয়ে নহর দুভাগ হয়েছে। তার আগে থেকেই দক্ষিণ ধার কয়েক কিলোমিটার অবধি চমৎকার বাঁধানো ঘাট দিয়ে সাজানো। ভীড় যত লক্ষেরই হোক, গঙ্গা নহরের দক্ষিণ ধারে অনায়াসেই স্নান করা যায়। কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই ব্রহ্মকুণ্ড। হুড়োহুড়ি, গাদাগাদি, ঝাঁপাঝাঁপি সেখানেই সর্বাধিক।

অমাবস্যার দিন বেশ বেলায় নাগাদের মিছিল বেরোল। লাউড স্পিকারে বাজছে চটুল হিন্দি গান, ফিলমি ভজন এবং যথাবিহিত 'জয় জগদীশ হরে।' সর্বাগ্রে জুনা আখড়ার এক সার নাগা। পিছনে ভাড়া করা তাঞ্জামে শোভিত গুরুজী। তাদের পরনে গেরুয়া পোশাক।

অগ্রবর্তী এইসব নাগাদের প্রীতির চোখে দেখে এমন লোক বিরল। বস্তুত নাগাবাবারা জানে যে, তাদের সম্পর্কে পুলিশ, প্রশাসন জনসাধারণের মধ্যে একটা ভীতির ভাব আছে। আর এই ভয়টাকেই তারা খুব নিপুণভাবে কাজে লাগায়। অগ্রবর্তীদের অনেকেরই হাতে লাঠি, তলোয়ার, ত্রিশূল। সেগুলো ঘোরাতে ঘোরাতে তাদের আক্রমণাত্মক অঙ্গভঙ্গি, সামান্য প্ররোচনাতেই যে কারও দিকে তেড়ে যাওয়া, মাঝে মাঝে শারীরিক কসরৎ প্রদর্শনের চেষ্টা—এ সবের মধ্যে একটা লোক-দেখানো মানোভাব খুবই প্রকট। তাদের দাপটে সকলেই জড়োসড়ো। পুলিশ নাগাদের নিরাপত্তার জন্য এবং হাঙ্গামা এড়াতে রাস্তার দুধারে ব্যালকনি বা জানালায় দণ্ডায়মান মানুষদের সরিয়ে দিল পোর্টেবল লাউড স্পিকারে হুংকার ছেড়ে। ফটো তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নাগাবাবারা প্রায় আমাদের চোখের সামনেই জনা চার পাঁচের দামী ক্যামেরা নির্দ্বিধায় লাঠির ঘায়ে ভেঙে দিল। পুলিশ কেড়ে নিল বহুজনের ক্যামেরা এবং রোলটি বের করে তবেই তা ফেরত দিল। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও মানুষ অবশ্য ফটো তুলতে ছাড়েনি।

নাগাবাবাদের মিছিল বিশাল। আদিম গুহামানবের মতো তারা চলেছে তো চলেইছে। জটাজুটধারী সাধুদের পর মুণ্ডিত নাগারা। তাদের পর সাধুনীরা। এঁদের পরনে অবশ্য গেরুয়া বসন ছিল, যদিও সংক্ষিপ্ত। আর দর্শকদের কৌতূহলের মাথায় ঠান্ডা জল ঢেলে তারা বেশিরভাগই বৃদ্ধা অথবা অতিশয় কুরূপা। অগ্রবর্তী সাধুদের নাচানাচি লাফালাফি এবং আস্ফালন মিছিলের মধ্যবর্তী বা পশ্চাদভাগের সাধুদের মধ্যে দেখা যায় না। তারা শান্ত, সুশীল বালকের মতোই হেঁটে যায়। এই মিছিল দেখার জন্য রাস্তার দুপাশে যে প্রচণ্ড ভীড় জমে গিয়েছিল তাও এক দ্রষ্টব্য ঘটনা।

বুঝতে পারছি এই অভূতপূর্ব জনসংখ্যার আচমকা চাপ এই ছোটো শহর সইতে পারছে না। শহরের মধ্যভাগে গাড়িঘোড়ার চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেও শুধুমাত্র পদচারীদের ভীড়কেই সামলানো শক্ত হচ্ছে। চৈত্র অমাবস্যার স্নানে গমনেচ্ছু যাত্রীদের পুলিশ ঢুকিয়ে দিল মোতি বাজারের সংকীর্ণ গলিতে। সম্ভবত পকেটমারদের সুবিধার্থেই। একেই মোতি বাজারের রাস্তা সরু এবং ভীড়াক্রান্ত। লক্ষ মানুষের ঠেলাঠেলিতে সেখানেই প্রাণান্ত হওয়ার কথা বহু মানুষের। হয়নি যে আমাদের সৌভাগ্য। শোনা গিয়েছিল কুম্ভে আট হাজার চোর ও পকেটমার এসেছে। তাদের সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে, তবে তারা যে এসেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল মোতিবাজারে চৈত্র অমাবস্যার দিন সেই ভীড়ে। চোখে এক্স-রে যন্ত্র লাগানো না থাকলে কী করে যে বোঝা যায় কার ব্যাগে কোন ঘুপচিতে কত টাকা আছে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু এই নমস্য পকেটমাররা সেদিন যে কলা-নৈপুণ্য দেখিয়েছিল তা বোধহয় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবি রাখে। আমার পরিচিত এক ফটোগ্রাফারের বিশাল ব্যাগে একটা কোনা কেটে তার দু হাজার টাকা সরিয়ে নিয়েছে। আর একজনের গেছে যথাসর্বস্ব, ভিক্ষে করে তবে ফিরতে পারবে স্বস্থানে। এক মোতি বাজারেই সেদিন টাকা পয়সা গয়নাগাটি মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকা হস্তান্তরিত হয়েছে। তবে যাদের গেছে তারা অনেকেই দার্শনিকতায় উপনীত হয়ে বলেছে, তীর্থে গেল, ভালই হল, পাপ কেটে গেল। কিংবা আগের জন্মের ঋণ ছিল বোধহয়। কিংবা তাঁর জিনিস তিনিই নিলেন। ইত্যাদি।

চৈত্র অমাবস্যায় মাত্র এক দেড় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে তীর্থযাত্রীদের আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে। তবে স্নানের ঘাটে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকেরা এক সুশৃংখল ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠুভাবেই ঘটিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের স্নান। কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে দেননি। স্নানের প্রধান ঘাটের ব্যবস্থাপনা ছিল তাঁদেরই হাতে। সেবাকার্যে তাঁদের বিপুল অভিজ্ঞতার ফলেই বোধহয় তাঁরা এই কৃর্তত্ব পেয়েছিলেন। তৎপর ছিলেন ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও। বলার কথা, এই দুই সংগঠনের অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবকই বাঙালী।

বাঙালী হরিদ্বারে এবার এত বেশি সংখ্যক যে উত্তর প্রদেশে আমি না পশ্চিমবঙ্গে তা গুলিয়ে যাচ্ছিল। ভীড়ের মধ্যে প্রায়শই কেউ না কেউ খপ করে হাত ধরে ফেলে হাস্যমুখে উচ্চকিত কণ্ঠে বলে উঠেছে আরে, আপনি। এবার কুম্ভে চেনামুখ এত পেয়েছি যার হিসেব নেই। কুণ্ডু ট্রাভেলস, কুণ্ডু স্পেশাল এবং অন্যান্য ট্রাভেল এজেন্সি হাজারে হাজারে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে নিয়ে এসেছেন কুম্ভে। বিস্তর হোটেল তাঁরা সম্পূর্ণ বুক করে রেখেছিলেন আগে থেকেই। তাঁদের হাত ধরে যাঁরা তীর্থে এসেছেন তাঁদের সিংহভাগই মহিলা। চোদ্দই এপ্রিলের মহাজনস্রোতে যখন হরিদ্বার টালমাটাল, ভেঙে পড়ছিল ব্যবস্থাপনা, ফুরিয়ে গেল হোটেলের খাবার, তখন সেই দুর্দিনে দুজন অভুক্ত বাঙালী লেখককে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে কুণ্ডু ট্রাভেলসের তীর্থযাত্রিণীরা পরম যত্নে খাইয়েছিলেন দুদিন ধরে। জলখাবার পর্যন্ত।

চণ্ডী দ্বীপে পাইলট বাবার খোঁজে বেমক্কা ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত এক বিশিষ্ট বাঙালী সাহিত্যিক ভারত স্কাউটস ও গাইডসের এক কর্তাব্যক্তির নজরে পড়ে যান। রক্ষা। তাঁর শিবিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও তৃষ্ণা নিবারণের পর পাইলট বাবার আস্তানা খুঁজে পাওয়া শক্ত হল না। কিন্তু ফেরার পথ দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর। ভিড় ঠেলে ফেরা রীতিমতো কঠিন। সেই সময়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তাঁদের গাড়ি দিয়ে যে সাহায্য করেছিলেন তা এক চমৎকার অভ্যন্তরের পরিচায়ক। ড্রাইভারের অভাবে প্রবীণ এক স্বামীজীই গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দিলেন হোটেলে। মামুলি ধন্যবাদটুকু পর্যন্ত কানে তুলতে চান না।

পতঙ্গ অগ্নি জুনা আখড়ায় হরিভারতীর কাছে হানা দিই। এক সকালে। দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, আও কলকাত্তাওয়ালে। তবিয়ৎ আচ্ছা?

প্রণাম করে চাটাইয়ে বসলাম। আমার অনুগামী দুজন ফটোগ্রাফার। সাধুদের ফটো তোলা যে কী ভীষণ শক্ত ও বিপজ্জনক কাজ তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। মেজাজ হল তো দিল, নইলে ক্যামেরা ভেঙে দিতেও দ্বিধা করে না। বিশেষত নাগারা।

অমর ভারতীকে যতবার দেখি ততবারই ভারী কষ্ট হয়। অমর ভারতী ঊর্ধ্ববাহু। গত দশ বছর ধরে ডান হাত অ্যান্টেনার মতো উঁচুতে তোলা। কোন ব্রহ্মলোক থেকে কি রকম আধ্যাত্মিক তরঙ্গাভিঘাত ওই অ্যান্টেনায় এসে লাগে সে রহস্য আমরা সংসারী কি করে বুঝব? তবে নিরন্তর উত্তোলিত থাকার ফলে শরীরের বিধি ছেড়ে কথা কয়নি। হাতটা শুকিয়ে গেছে, এসে গেছে শক্ত কেঠো ভাব। আঙুলগুলো বেঁকে গেছে শুকনো ফুলের পাপড়ির মতো। তাতে লম্বা নখ জড়াজড়ি করে আছে একটা আর একটার সঙ্গে। অমর ভারতীর ওই কষ্ট এবং তার রূঢ় মুখে মাঝে মাঝে ফুটে ওঠা সরল হাসি আমাকে যুগপৎ বেদনা ও আনন্দ দিয়েছে।

হরিভারতী ধুনির ওপর একটা ডেকচি বসিয়ে মাদার ডেয়ারির প্যাকেট থেকে দুধ ঢালছিলেন। তার চেলা অমর ভারতী উসকে তুলছিল আগুন। কিলোটাক দুধ ঢালবার পর হাত মাটিতে মুছে হরিভারতী বললেন, বোলো আখবরওয়ালে, ক্যা হালচাল।

আচ্ছাই হ্যায় মহারাজ।

হরিভারতীর হাসিটা ভারী সপ্রাণ, সতেজ। চোখ দুটোয় কিছু ধূর্তামি আছে। তা থাক। এ লোকটাকে কখনো বস্ত্রাবৃত দেখিনি। সর্বদাই উদ্দোম, কিন্তু কখনোই বেমানান নন।

নির্দ্বিধায় হরিভারতী আমার কাছে ধুনির জন্য এক কুইন্ট্যাল কাঠের দাম চাইলেন। টাকাটা তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিল ফটোগ্রাফার বিবেক দাস।

ফোটো খিচোঁগে? বহোৎ আচ্ছা ক্যামেরা হ্যায় তুমহারা পাস।

জী মহারাজ।

তৎপর ফটোগ্রাফারা সঙ্গে সঙ্গে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত ক্যামেরা তাক করে ছবির পর ছবি তুলে যেতে লাগল। একজনের হাতে একটা ইনস্ট্যান্ট ক্যামেরা দেখে হরিভারতী হাত বাড়ালেন, এয়সা এক ক্যামেরা দো গে মুঝে?

শুনে প্রমাদ গুনলাম। ক্যামেরাটার দাম আড়াই হাজার।

হরিভারতী দেখলাম ক্যামেরা মোটামুটি চেনেন। ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে আমাদের দিকে ক্যামেরা তাক করে স্যাটার টিপে দিল বার দুই। সাধুদের সেই দৃশ্য দেখে সে কী হাসি!

যখন ফটোগ্রাফাররা ঝটাপট ছবি তুলছে এবং আমি সাধুদের নিবিড় চক্রের মধ্যে ঢুকে গেছি তখনই দেখা গেল আমাদের দেখাদেখি একজন দুজন করে দর্শক এসে আশেপাশে বসে পড়ছে। এতক্ষণ তারাও আখড়ায় ঘুরছিল কিন্তু কারও কাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি।

কিন্তু হরিভারতী অন্য কারও প্রতি দৃকপাতও করছেন না। তিনি আজ এই কলকাত্তাওয়ালের প্রতিই প্রসন্ন।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার উপাস্য কে?

দত্তাত্রেয়। সমঝা?

যত দূর জানি দত্তাত্রেয় এক ঋষি। বিষ্ণু র অংশ।

মাথা নেড়ে বললাম, নেহি।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ। আমরা এই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের এই তিন দেবতার উপাসক।

কথাটা পরিষ্কার হল না। আমার শোনার ভুল হতে পারে। তবু নোট করে নিলাম।

দর্শন কি রকম হয় মহারাজ?

হরবখৎ। সব সময়েই দর্শন হচ্ছে। নাম চলছে।

অমর ভারতী ব্রুকবণ্ড চায়ের একটা প্যাকেট ভেঙে দুধের ডেকচিতে ঢেলে দিতে দিতে বলল, এখনও দর্শন হচ্ছে। তোমার মুখ দেখেও হচ্ছে।

শঙ্কিত হয়ে বলি, আমাকে দেখে কী দর্শন হচ্ছে মহারাজ?

তোমার মধ্যে শ্যামকে দেখছি। শ্যাম। সমঝা?

ঘাড় নাড়লাম। তবে গৌরবান্বিত বোধ করলাম না। কারণ, দর্শন যদি হয়েই থাকে তবে তা দর্শনকারীরই গুণ। আমার নয়।

ফটোগ্রাফাররা অবিরল ছবি তুলে যাচ্ছে। নানা অ্যাঙ্গেল থেকে।

মাঝবয়সী শান্ত চেহারার কিংকরভারতী এদের দলের সাধু নন। তিনি মহন্ত উমাশঙ্কার ভারতীর শিষ্য। আড্ডা জমে উঠতেই তিনি এসে বসে গেলেন আমাদের সঙ্গে। নয় বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। এখন বয়স তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ। কথা একটু বেশিই বলে। জৌনপুর জেলায় গোপীঘাটে তার আখড়া।

হরিভারতী ঠিকানা চাইলেন, বাড়ি এবং অফিস দুইয়েরই।

কোন ভাষায় ঠিকানা লিখব মহারাজ?

অংরেজি, হিন্দি যো মন চাহে লিখো, পড় লেঙ্গে।

হিন্দি লেখা তেমন আসে না, ইংরিজিতেই লিখে দিলাম।

হরিভারতী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দুষ্টু হাসিটি হেসে বললেন, যখন তোমার বাড়ি বা অফিসে গিয়ে হানা দেবো তখন ভয় পাবে না তো!

এই বেশে যাবেন কি?

না না, কাপড় পরে নেবো।

নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলে বললাম, তাহলে ঠিক আছে।

কিংকরভারতী উসুখুসু করছেন, বললেন, চলো, আমার গুরুজীর সঙ্গে মিলবে চল। ওই যে তাঁবু।

হরিভারতী চা না খাইয়ে ছাড়তে নারাজ। দোটানায় পড়ে গেছি। তবে চা খেতে ভক্তি হচ্ছিল না। দুধ ভাল করে ফোটেনি, ধুনির ছাই তার মধ্যে অজস্র উড়ে উড়ে মিশেছে। দুধকে পাতলা করতে অমর ভারতী কমণ্ডুলু থেকে একটু আগেই ঠান্ডা জল ঢেলেছে। ও চা যে কী বস্তু হবে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। সাধুরা ওই চা-ই অম্লান বদনে খাবে জানি। ওইখানেই সাধুর মাহাত্ম্য। আমার তো তত যোগবল নেই। তাই মিনমিন করে বললাম, হোটেলের খানা খেয়ে পেট গড়বড়। চা চলছে না।

হরিভারতীর হাত থেকে রেহাই পেলাম। কিংকর এক রকম হিড়হিড় করে হাত ধরে টেনে নিয়ে ফেললেন তাঁর গুরুজীর কাছে। উমাশঙ্কর ভারতীর বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। শুখা প্রণামে খুশি নন। কিংকর বললেন, সেবা লাগাও। কুছ সেবা লাগাও। গোর লাগো।

সেবা এবং গোর লাগা দুই কার্যের পর উমাশঙ্করের হাত বরাভয়ে উত্তোলিত হল।

কথাবার্তা চলছিল মামুলি চালে। হঠাৎ সমস্ত ছন্দ এবং তাল কেটে দিয়ে হুহুঙ্কারে মাঝখানে এসে পড়লেন স্বামী দিগম্বর রামকৃষ্ণ অবধূত। কালিঢালা রং, বিশাল বপু, বিপুল জটা, মুখে দুর্দান্ত ক্রোধ। পুরো নাঙ্গা। প্রথমেই প্রশ্ন, ফটো খিঁচোগে?

ভয়ে ভয়ে বললাম, আজ্ঞা দিজিয়ে।

দুর্দান্ত দিগম্বর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, কিঁউ নেহি? খিঁচো। লেকিন ফটো ভেজনে পড়েগা। পাত্তা লিখ লেও।

লিখলাম, শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী দিগম্বর রামকৃষ্ণ অবধূত। খেরাবতী। পোঃ বানপুর। জিলা ললিতপুর। উত্তর প্রদেশ।

দিগম্বর অনেকগুলো পোজ দিলেন ফটোর জন্য। শূল উঁচিয়ে আমাকে বললেন, ছবি যদি না পাঠাও তবে দেখ নেবো।

হোটেলের লবিতে বউদি আবিষ্কার করলেন সলাজ এক সদ্য বিবাহিত মার্কিন দম্পতীকে। গলায় গাঁদা ফুলের মালা।

বউদি বললেন, দেখুন, দেখুন, ওরা সদ্য বিয়ে করেছে।

পরে দোতলার করিডোরে সেই দম্পতীকে দেখে এগিয়ে গেলাম।

আর ইউ নিউলি ম্যারেড?

দুজনেই লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল, ইয়েস, ইয়েস।

কংগ্রচুলেশনস।

ওঃ থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।

বরটি বড়সড় চেহারার, হ্যাণ্ডসাম। বউটি ছোটোখাটো, কিউট।

আলাপ করে জানা গেল তারা দীক্ষান্তে নতুন নাম নিয়েছে। ছেলেটির নাম হয়েছে মজিদ, মেয়েটির বিসমিল্লা। দুজনেই সুফি সাধক এনায়েৎ বিলায়েৎ খানের শিষ্য। গুরুজী হিন্দু তীর্থেই ঘোরেন। প্রতিবার কুম্ভে আসেন। রয়েছেন আমাদেরই হোটেলে দোতলারই ৯বি ঘরে।

জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে?

নিশ্চয়ই। তবে ওঁর সেক্রেটারি ওমরকে বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইতে হবে। ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। আমরাও দাঁড়িয়ে আছি কখন থেকে। ডাক এলে ঘরে যাবো।

১৪ তারিখ ভোর কুম্ভমেলার এত সতর্কতাকে ব্যর্থ করে দিল। সেই মর্মান্তিক ঘটনা এখন ইতিহাস। বলে লাভ নেই। তবে এরকম কিছু না-ঘটাই ছিল বিচিত্র। সত্তর লক্ষ নয়, জনসমাগম দেখে আমাদের তো ধারণা হয়েছিল, কোটিকেও ছাড়াল বুঝি। সেদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তার পা দেওয়ারও জো ছিল না। অথচ ওই ভিড়েই বুড়োবুড়ি কাচ্চাবাচ্চাও তো কত হর কি পৌড়িতে ডুব দিয়ে এল। হয়তো ওই ক'টি ডুবের পিছনে বহু কালের প্রস্তুতি, কষ্টের সঞ্চয়, দীর্ঘ রেল বা বাস যাত্রা, অনিদ্রা, অনাহার, দুঃসহ শরীরী ক্লেশ এবং ওই অসহনীয় ভিড়ে ঘণ্টা পাঁচেক শ্বাসরোধকারী হাঁটি হাঁটি পা পা। ওই স্নানে কত পুণ্য হয় তা আমাদের বোধ ও বুদ্ধির অগম্য। তবু তাদের তৃপ্ত উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়, কে জানে হয়তো সত্যিই পাপ কাটে, নইলে সামান্য একটু স্নানের জন্য অত অমানুষিক কষ্ট সহ্য করার পরও তো কই মলিনতা নেই মুখে।

একজন তরুণী মেমসাহেবের সঙ্গে প্রায়ই হোটেলের লাউঞ্জে দেখা হত। বেশ দেখতে। ছিপছিপে, মুখখানা ঢলঢলে। মাঝে মাঝে চোখাচোখি হত। যেদিন ফুরিয়ে গেল হোটেলের খাবার সেদিন ডাইনিং হল-এ গিয়ে একটু রাগারাগি করছিলাম। মেমটি অপলক চেয়ে ছিল আধো অন্ধকার একটি কোণ থেকে। সে অবশ্য বিরল সৌভাগ্যবতীদের একজন যে খাবার পেয়েছে।

চলে আসছি। মেম উঠে এল দল ছেড়ে।

করিডোরে পা দিয়েছি দুজনে। মেমসাহেব বলল, কবে চলে যাবে?

বিস্মিত হয়ে বলি, কাল।

একটি শিউলি ঝরানো হাসিতে আমাকে ঢেকে দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, ওয়েল, উই সিওর উইল মিট এগেন।

কী নরম, উত্তপ্ত তার হাত।

বললুম, নিশ্চয়ই। আবার কুম্ভে। বেশি দেরি তো নেই।

পরিশিষ্ট

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্বহস্তে লিখিত কুলপঞ্জি

শীর্ষেন্দু-র লেখা কুলপঞ্জির প্রতিমুদ্রণ